প্রথম প্রকাশ
নববর্ষ ১৩৯২
এপ্রিল ১৯৮৫

প্রকাশক
সমীরকুমার নাথ
নাথ পাবলিশিং
২৬ বি পণ্ডিতিয়া প্লেস
কলকাতা ৭০০০২৯

প্রচ্ছদপট
গৌতম রায়

মুদ্রক
পি. কে. পাল
শ্রীসারদা প্রেস
৬৫ কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রীট
কলকাতা ৭০০০০৯

রমেশচন্দ্র মজুমদার

সুকুমার সেন

নিশীথরঞ্জন রায়

শ্রদ্ধাস্পদেষু

নিবেদন

আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এ কালের প্রবাদপ্রতিম ব্যক্তিত্ব। বাংলা তথা ভারতের শিক্ষা-সংস্কৃতি-ভাষাতত্ত্ব ও সমাজজীবনে তাঁর অবদানের প্রসঙ্গ ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এই মহৎ মানুষকে জানা-বোঝা ও পরিমাপ করার প্রচেষ্টাও কম দুরূহ নয়। তবুও কেন এই প্রচেষ্টায় যুক্ত হলাম, সে সম্পর্কে যৎসামান্য নিবেদন করি।

আমার পিতা সুধীরকুমার মিত্রের সংগ্রহে কিছু প্রাচীন পত্র-পত্রিকা ও দুষ্প্রাপ্য বই আছে জানতে পেরে, আচার্য সুনীতিকুমার সেগুলি সুষ্ঠভাবে রক্ষা করা'র পরামর্শ আমাকে দেন। তাঁরই ঐকান্তিক উৎসাহে ১৯৬৮-তে "আশুতোষ পাঠমন্দির" নামক একটি পাঠাগার স্থাপন করা হয়। আমৃত্যু আচার্য প্রধান উপদেষ্টা হিসাবে পাঠমন্দিরের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ২৯ মে ৭৭ আচার্যের আকস্মিক প্রয়াণে স্বভাবতই পাঠমন্দিরের পক্ষে ৪ জুন ৭৭-তে কলকাতায় একটি স্মরণসভায় শ্রদ্ধা জানানোর ব্যবস্থা হয়েছিল। আচার্য রমেশচন্দ্র মজুমদারের সভাপতিত্বে ঐ সভায় শ্রদ্ধা জানান তৎকালীন প্রধান বিচারপতি শঙ্করপ্রসাদ মিত্র, উপাচার্য সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায়, তৎকালীন পৌরপ্রশাসক শিবপ্রসাদ সমাদ্দার, মনোজ বসু, অন্নদাশঙ্কর রায়, দীনেশচন্দ্র সরকার, জরাসন্ধ, সুধাংশুমোহন বন্দোপাধ্যায়, বিজনবিহারী ভট্টাচায, গজেন্দ্রকুমার মিত্র, আশুতোষ ভট্টাচার্য, সুধীরকুমার মিত্র, ক্ষিতীন্দ্র-নারায়ণ ভট্টাচায, নন্দগোপাল সেনগুপ্ত প্রমুখ আরো অনেকে। সভাপতির ভাষণে রমেশচন্দ্র মজুমদার উপস্থিত বক্তাদের উদ্দেশে স্থায়ী ও সুচিন্তিতভাবে সুনীতিবাবুর বিবিধ বিষয়ের উপর বিশেষভাবে লিখিত শ্রদ্ধা জানানোর জন্য পরামর্শ দেন, এবং এ ব্যাপারে স্মরণসভার উদ্যোক্তা "আশুতোষ পাঠমন্দির"-কে উদ্যোগী হ'তে আহ্বান জানান। পাঠমন্দিরের সম্পাদক হিসাবে স্বভাবতই নিতান্ত এক সাহিত্যকর্মীর হাতে এই বিরাট দায়িত্ব বর্তায়। বিষয় ও লেখক নির্বাচনের ব্যাপারে রমেশবাবু বহু পরামর্শ ও ব্যক্তিগত চিঠিপত্রাদি লিখে দিয়ে এই বিরাট পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপ দিতে সাহায্য করেছেন।

গ্রন্থের পরিকল্পনার সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্তের পর রমেশচন্দ্র মজুমদার, নীলমাধব সেন, অনিল কাঞ্জিলাল, পুলিনবিহারী সেন, এবং সুমন চট্টোপাধ্যায়ের

মূল্যবান্ পরামর্শে লেখার বিষয়ে দেশবিদেশের প্রায় পঞ্চাশজন লেখককে চিঠিপত্র দিয়ে এবং প্রায় ষাট জন বিশিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে যোগাযোগ করেছি। বেশিরভাগ লেখকই দেরীতে হলেও, সুনীতিবাবুর প্রতি শ্রদ্ধাবশত পরিশ্রম করে লেখা দিয়েছেন। অনেকে আবার একজন মানুষ সম্বন্ধে একাধিক লেখার অসুবিধে থাকায় পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত তাঁদের আচার্যের উদ্দেশে লেখাগুলি এই গ্রন্থে পুনর্মুদ্রণের জন্য দিয়েছেন।

কিছু কিছু ক্ষেত্রে পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত কয়েকটি মূল্যবান্ লেখা, লেখক বা পত্রিকার সম্পাদকের অনুমতি নিয়ে পাঠকদের স্বার্থে গ্রন্থে সংকলিত করা হয়েছে যেমন, "পরিচয়" শ্রাবণ ১৩৮৪ থেকে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, গোপাল হালদার, অমলেন্দু বসু, অনিল কাঞ্জিলাল, চারুচন্দ্র সান্যাল, আজাহারউদ্দিন খান, সুকুমারী ভট্টাচার্য্য, রথীন মৈত্র, শুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায়; "কথা-সাহিত্য" জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৪ থেকে সুকুমার সেন, প্রমথনাথ বিশী, মনোজিৎ বসু; "আভা" আষাঢ় ১৩৮৪ থেকে নির্মলচন্দ্র ভট্টাচার্য, শিশিরকুমার বন্দোপাধ্যায়, সুধীরকুমার মিত্র; "বাংলাসাহিত্য পত্রিকা" কলি-বিশ্ব ৭৭-৭৮ থেকে ক্ষুদিরাম দাস, দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু, প্রদ্যোৎ সেনগুপ্ত; "সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা" বৈশাখ-আশ্বিন ১৩৮৪ থেকে রমেশচন্দ্র মজুমদার, বনফুল; "যুগান্তর" ২২শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৪ অন্নদাশংকর রায়; "পশ্চিমবঙ্গ" নভেম্বর ১৯৭৮ থেকে পবিত্র সরকার; "অমৃত" নববর্ষ ১৩৮৫ থেকে নবনীতা দেব সেন; "দেশ" ২৮, ৬, ৭৭ থেকে অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য; "বসুমতী" জুন ৭৭ থেকে ছায়া চট্টোপাধ্যায়; Bhabans Journals 3. 7. 77. থেকে S. R. Tikekar-এর লেখা নেওয়া হয়েছে। উল্লিখিত লেখাগুলির জন্য সংশ্লিষ্ট পত্র পত্রিকার সম্পাদকের কাছে ঋণ কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করছি।

নীহাররঞ্জন রায় বইটির নামকরণ করে দেন। নানাভাবে সাহায্য করেছেন, রমেশচন্দ্র মজুমদার, পুলিনবিহারী সেন, অনিল কাঞ্জিলাল, নীল-মাধব সেন, আশুতোষ পাঠমন্দিরের সভাপতি প্রেমেন্দ্র মিত্র এবং সুনীল দাস। জিজ্ঞাসা-প্রকাশিত "Suniti Chatterjee : Scholar and the Man" এবং "জীবন কথা" গ্রন্থ থেকে কয়েকটি ছবি পুনর্মুদ্রণ করেছি। আচার্য-পুত্র সুমন চট্টোপাধ্যায়ের সদাসর্বদা আগ্রহ এবং নাথ পাবলিশিংয়ের সমীর নাথের সাহসী পদক্ষেপ ছাড়া এই গ্রন্থ প্রকাশ করা সম্ভব হতো না। রমেশচন্দ্র মজুমদার, বনফুল, জরাসন্ধ, আশুতোষ ভট্টাচার্য, দীনেশচন্দ্র সরকার প্রমুখ লেখকদের প্রয়াণে আন্তরিক দুঃখিত। তাঁদের অমর আত্মার শান্তি কামনা করি।

বিশেষ অসুবিধেবশত কয়েকটি আমন্ত্রিত লেখা গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত করতে না পারায় ক্ষমাপ্রার্থী। গ্রন্থপ্রকাশে বিলম্ব ও কিছু মুদ্রণের ত্রুটির জন্য আন্তরিক দুঃখিত।

আমাদের সাহিত্য-সংস্কৃতি জীবনের বহু স্বনামধন্য ব্যক্তি আলোচ্য সংকলনে সুনীতিকুমারের জীবন ও জীবনের নানা কথা ব্যক্ত করেছেন। তাঁর ছাত্র বা ছাত্রস্থানীয় অনেকেই নানা আলোয় আচার্যকে বোঝবার ও বোঝাবার প্রয়াস পেয়েছেন। নানা কারণেই তাই এই সংকলনগ্রন্থটি সুনীতিকুমারের জীবন তথা বাংলার শিক্ষা-সংস্কৃতির এক উল্লেখযোগ্য দলিল হিসেবে পরিগণিত হবার দাবী রাখে। সুনীতিকুমারের প্রতি অপরিসীম শ্রদ্ধা ও তাঁর অনুরাগী হিসেবেই এই সংকলনের গুরুত্বপূর্ণ কাজে হাত দিতে সাহস পেয়েছি। আমার প্রচেষ্টা সামান্যতম সফল হলেও কৃতার্থ হব।

মিত্রাণী — পল্লব মিত্র

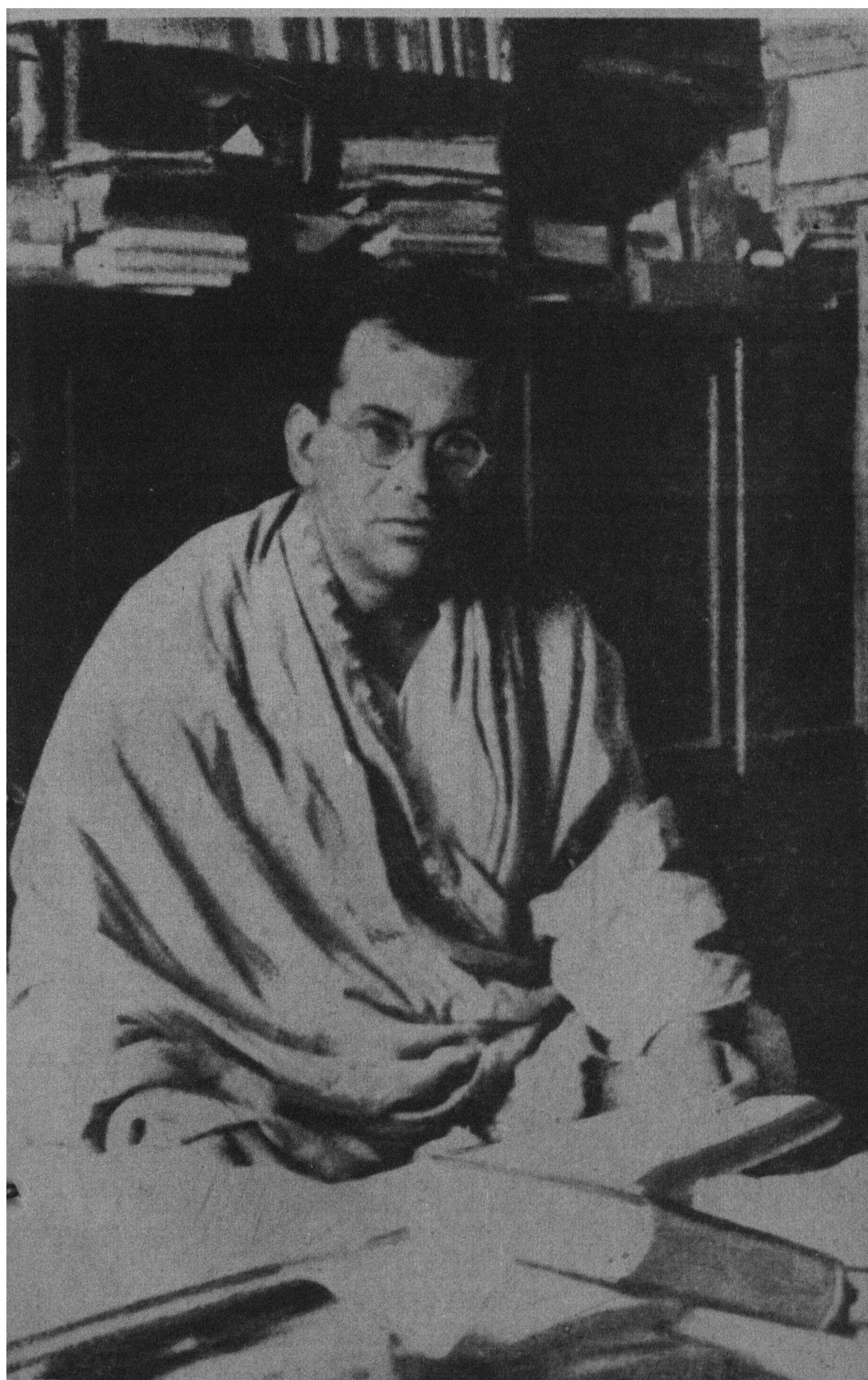
২ কালী লেন / কলিকাতা

১ বৈশাখ ১৩৮১

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা

সমসাময়িক দৃষ্টিতে সুনীতিকুমার



আশুতোষ পাঠমন্দীর আয়োজিত সুনীতিকুমারের স্মরণসভা (৪ই জুন ১৯৭৭)। এই সভায় সভাপতি ছিলেন রমেশচন্দ্র মজুমদার। ছবিতে উপস্থিত বাঁদিক থেকে অন্নদাশঙ্কর রায়, পলাশ

বন্ধু সুনীতিকুমার

রমেশচন্দ্র মজুমদার

রবিবার ২৯শে মে অপরাহ্নে কলিকাতা রেডিয়ো অফিস হইতে টেলিফোনে একজন আমাকে বলিলেন, আপনি সুনীতি চ্যাটার্জী সম্বন্ধে কিছু বলিবেন, আমরা আসিতেছি। আমি বলিলাম—কি ব্যাপার? উত্তর হইল—আপনি জানেন না? কিছুক্ষণ পূর্বে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে—আমরা তাঁহার বাড়িতে যাইতেছি, সেখান হইতে আপনার নিকট যাইব। শুনিয়া স্তম্ভিত হইলাম। একটু পরে বলিলাম, আমিও তাঁহার বাড়িতে যাইতেছি, সেখানেই দেখা হইবে। আধ ঘণ্টার মধ্যে তাঁহার বাড়িতে গেলাম, দেখিলাম পাড়ার কয়েকটি ছেলে দাঁড়াইয়া আছে। তাহারা বলিল, হাসপাতালে সুনীতিবাবুর মৃত্যু হইয়াছে। এ জীবনে আর তাঁহার দেখা মিলিল না।

সুনীতিবাবুর বয়স হইয়ছিল ৮৭ বৎসর, তাঁহার মৃত্যু অপ্রত্যাশিত নয়—কিন্তু ইহা এতই আকস্মিক যে আমি বেদনায় অভিভূত হইলাম। আমার শরীর বড়ই দুর্বল, সুতরাং এই দুঃসংবাদে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া—কিছুকাল অপেক্ষা করিয়া চলিয়া আসিলাম। কিন্তু বাড়িতে আসিবার পরও নীরবে এই বেদনার অনুভূতি সহ্য করিবার সুযোগ হইল না। রেডিয়ো, টেলিভিশন ও কয়েকটি সংবাদপত্র হইতে অনবরত টেলিফোন—কিছু বলিতে হইবে। যথাসম্ভব কিছু বলিয়া অথবা পরদিন বলিবার আশ্বাস দিয়া সকলকে নিরস্ত করিলাম। কিন্তু প্রায় সারা রাতই প্রিয় বন্ধুর মহাপ্রয়াণের কথা এবং অতীত দিনের অনেক স্মৃতি মাথার মধ্যে ঘুরিতে লাগিল, কেবলই মনে হইতে লাগিল আজ বঙ্গদেশে তথা ভারতে সুনীতিবাবুর শ্রেণীর মনীষী-সাহিত্যিক অতিশয় দুর্লভ—নাই বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। তার পর ছাত্রজীবন হইতে তাঁহার সমগ্র জীবনের অনেক স্মৃতি মনে জাগিল। আমি যে বছর (১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে) প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে এম. এ. পাশ করি, সুনীতিবাবু সেই বছর (১৯১১ খ্রীঃ) ইংরেজী সাহিত্যে বি. এ. অনার্স পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। তার পরেও পূর্বের ন্যায় কলিকাতা University Institute-এ তিনি ও তাঁহার সহপাঠী শিশির ভাদুড়ী, নরেশ মিত্র প্রভৃতির সঙ্গে প্রায়ই দেখা হইত। পরবর্তী জীবনে সুনীতিবাবুর নাট্যাভিনয়ে বিশেষ আগ্রহ ও আসক্তি জন্মে—তাহার উৎপত্তি সম্ভবতঃ এখানেই হয়। ইহাদের সকলের সঙ্গেই এখানে আমার

যে ঘনিষ্ঠ প্রীতির সম্বন্ধ জন্মিয়াছিল, আমরণ তাহা অক্ষুণ্ণ ছিল। সুতরাং প্রায় সত্তর বৎসর সুনীতিবাবুর ও আমার মধ্যে সৌহার্দ্য বর্তমান ছিল।

সুনীতিবাবু ইংরেজী সাহিত্যে এম. এ. পাশ করিলেও তাঁহার বৈশিষ্ট্য ছিল ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধে প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি। আজীবন তিনি বহু গ্রন্থ লিখিয়াছেন—কিন্তু Origin and Development of the Bengali Language নামক গ্রন্থই তাঁহার প্রথম ও প্রধান কীর্তি। ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে ইহা প্রথম প্রকাশিত হয়। ইহার বহু পূর্বে দীনেশচন্দ্র সেন বঙ্গভাষা সাহিত্য সম্বন্ধে গ্রন্থ লিখিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন। কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে লিখিত সুনীতিবাবুর গ্রন্থ সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির—শুনিয়াছি যখন এই বিষয়ে সুনীতিবাবু বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য একটি Thesis লেখেন তখন পরীক্ষকগণ এই সম্পূর্ণ অভিনব প্রণালী সম্বন্ধে বিরূপ মন্তব্য করিয়াছিলেন।

সরকারী বৃত্তি পাইয়া সুনীতিবাবু লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন এবং Indo-Aryan Philology সম্বন্ধে Thesis লিখিয়া D. Litt. উপাধি প্রাপ্ত হন (১৯২১ খ্রীঃ)। অতঃপর প্যারিসে যাইয়া সেখানেও গবেষণা করিয়া সম্মানিত উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে দেশে ফিরিয়া তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের Khaira Professor of Indian Linguistic and Phonetics নিযুক্ত হন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াও তিনি ১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের Emeritus Professor of Comparative Philology নিযুক্ত হন।

ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধে সুনীতিবাবু বহু গ্রন্থ লিখিয়াছেন। "Origin and Development of the Bengali Language" গ্রন্থের কথা পূর্বেই বলিয়াছি। ১৯৭০-৭২ খ্রীষ্টাব্দে বিলাতের Allan Unwin কোম্পানি তিন খণ্ডে ইহা পুনঃপ্রকাশ করিয়াছেন। অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে কয়েকখানির উল্লেখ করিতেছি :

১। India and Ethiopia from the 7th Century B. C.

২। Kirata-Janakirti—The Indo-Mongoloid.

৩। Religious and Cultural Integration of India.

৪। Indo-Aryan and Hindi.

৫। Iranianism.

৬। Bengali Phonetics.

৭। বাংলাভাষা প্রসঙ্গে।

ইহা ব্যতীত বোম্বে হইতে আমার সম্পাদনায় প্রকাশিত একাদশ খণ্ডে সম্পূর্ণ 'History and Culture of the Indian People' গ্রন্থের প্রায় প্রতি খণ্ডে তিনি বঙ্গভাষা, হিন্দী প্রভৃতি সম্বন্ধে লিখিয়াছেন।

ভাষাতত্ত্ব-বিশেষজ্ঞ হিসাবে তিনি কেবল ভারতবর্ষে নহে, আমেরিকা, আফ্রিকা এবং উত্তর-পশ্চিম এশিয়ায় বহু সভা-সমিতিতে নিমন্ত্রিত হইয়া বহু ভাষণ দিয়াছেন, এখানে তাহার বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া অসম্ভব। ভাষাতত্ত্ব ও সাহিত্য ছাড়াও তিনি অন্য বিষয়ে খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। নাট্যকলা সম্বন্ধে তিনি একজন বিশেষজ্ঞ ছিলেন। তিনি বঙ্গদেশের Legislative Council-এর সভাপতি নির্বাচিত হইয়া অতিশয় দক্ষতার সহিত তাঁহার কর্তব্য পালন করিয়াছেন।

মৃত্যুকাল পর্যন্ত তিনি জাতীয় অধ্যাপক ও দিল্লীতে সাহিত্য একাডেমির সভাপতি এবং আমাদের বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সভাপতি ছিলেন। ভারত সরকার তাঁহাকে 'পদ্মবিভূষণ' উপাধি দিয়াছিলেন।

১৯৭০ খ্রীষ্টাব্দে 'নালন্দা মহাবিহার' তাঁহাকে ও আমাকে 'বিদ্যাবারিধি' উপাধি দান করেন। আমরা দুই জন একসঙ্গে নালন্দায় যাই ও তথায় একত্রে বাস করি। এই কয়দিনের সান্নিধ্যের স্মৃতি কখনও ভুলিব না। প্রাচীন নালন্দার ধ্বংসাবশেষের মধ্য দিয়া ভ্রমণ করিতে করিতে কত বিষয়ের আলোচনা হইয়াছে। নালন্দা হইতে প্রাচীন রাজগৃহে গিয়াছিলাম। যাইতে যাইতে পথে আমাদের সঙ্গী নালন্দার ভাইস চ্যান্সেলার একটি ময়রার দোকান দেখাইয়া বলিলেন, এখানে খুব ভালো মিঠাই তৈরি হয়। সুনীতিবাবু তৎক্ষণাৎ গাড়ি থামাইয়া দুই একটি মিষ্টি খাইয়া কলিকাতায় তাহার কয়েক সের নিয়া যাইবার ব্যবস্থা করিলেন। রাজগৃহে যাইয়া উষ্ণ প্রস্রবণে স্নান করিলেন।

রাজগৃহের এই কয়টি দিনের স্মৃতি কখনো ভুলিব না। কারণ এইরকম সুযোগেই মানুষের প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায়। আমার ঘনায়মান জীবন-সন্ধ্যায় একজন আযৌবন সুহৃদের সঙ্গে কয়েকদিন নালন্দায় বসবাসের কাহিনীর সহিত সুনীতি-বাবুর প্রসঙ্গ শেষ করিলাম।

আমার জানা সুনীতিকুমার

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

সুনীতিকুমারের সঙ্গে আমার পরিচয় কখন হয়, তা ঠিক মনে পড়ছে না ; তবে ঘনিষ্ঠ হই ১৯১৭-১৮ সালে। তখন শান্তিনিকেতনের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মতান্তর হওয়ায় আমি কাজ ছেড়ে কলকাতায় সিটি কলেজে গ্রন্থাগারিক হয়ে আছি। প্রসঙ্গত বলি, রবীন্দ্রনাথ সে সময়ে বিদেশে ছিলেন এবং দেশে ফিরে সব শুনে ডেকে পাঠালেন। ১৯১৮ সালের পুজোর পর আবার আশ্রমে ফিরে আসি। কলকাতায় থাকাকালীন সুনীতিকুমারের সঙ্গে এতই অন্তরঙ্গ হই যে, ১৯১৯ মে মাসে আমার বিবাহে তিনি সাক্ষী ছিলেন। বিবাহ ব্রাহ্মমতে হয়েছিল—নিয়মানুসারে বরপক্ষের দুজন সাক্ষীর 'সহি'র প্রয়োজন। এই দুই সাক্ষী হলেন—সুনীতিকুমার ও নরেন্দ্রনাথ সেন। নরেন্দ্রনাথ সেন জাতীয় শিক্ষা পরিষদে আমার সহপাঠী ছিলেন। পরবর্তীকালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনস্তত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক হয়েছিলেন।

সুনীতিকুমার অত্যন্ত গোঁড়া হিন্দু। ব্রহ্মণ্যধর্মের শ্রেষ্ঠত্বে বিশ্বাসী। কিন্তু আমার এই ব্রাহ্মবিবাহে তিনি কোনো আপত্তি করেন নি। তাঁর এই দিকটির কথা বড় কেউ জানেন না—তাই ব্যক্তিগত কথা সত্ত্বেও বললাম। এই ১৯১৯ সালের শেষ দিকে গভর্ণমেণ্ট বৃত্তি পেয়ে তিনি বিলাত যান ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধে গবেষণার জন্য। ১৯২০ সালে রবীন্দ্রনাথ বিলাতে গিয়েছিলেন, সেই সময়ে তিনি যেতেন রোটেনস্টাইনের বাসায়। সেখানে বহু সাহিত্যিকের সমাবেশে সুনীতিকুমারের আনাগোনা ছিল। তিনি একদিন রুশ চিত্রশিল্পী নিকোলাস রোয়েরিখ ও তাঁর দুই পুত্র জর্জ রোয়েরিখ এবং এস. রোয়েরিখের সঙ্গে কবির পরিচয় করিয়ে দিলেন। এঁদের সম্বন্ধে পরে কোনো প্রবন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করব। এখানে এইটুকুই আমার বক্তব্য—তিনি কেবল যে ভাষাবিদ্ ছিলেন তা নয় ; তাঁর শিল্পী-মন খুঁজত Four Arts-কে। তাই দেখি চিত্রশিল্পে তাঁর যেমন আগ্রহ, তেমন ছিল অভিনয় শিল্পে। তাঁর বিশেষ বন্ধু ছিলেন শিশির ভাদুড়ী, বোধহয় সহপাঠীও ছিলেন।

আমি কলকাতায় আছি এমন সময় একদিন সুনীতিকুমার এসে বললেন আজ সন্ধ্যায় শিশির ভাদুড়ীর অভিনয় হচ্ছে—শরৎ চাটুজ্জের 'ষোড়শী'। থাকি সমাজপাড়ায়—শ্বশুর মশায় গোঁড়া ব্রাহ্ম—যাব থিয়েটার দেখতে! যাক, লোভ সংবরণ করতে পারলাম না। গেলাম। একেবারে অনভ্যস্ত। সুনীতিকুমার টেনে

নিয়ে বসালেন সামনের সারিতে। অনবদ্য অভিনয় দেখলাম শিশিরকুমারের—আর মনে আছে গাজনের দলের গান এবং নাচ। কিন্তু রাত হয়ে যাচ্ছে বলে ভয় হচ্ছে। তাই কিছুটা দেখে পালিয়ে এলাম—স্ত্রীকে বলেছি কিনা মনে নেই। এই ছিল মানসিক অবস্থা। তারপর একদিন 'স্টার থিয়েটার'-এ 'একক দশক শতক'-এর শতরাত্রি উদ্‌যাপন উপলক্ষে নাট্যশালায় উপস্থিত হয়ে অভিনয় দেখা, অভিনেতাদের পুরস্কার বিতরণ, তাদের সঙ্গে ফটো তোলা—সবই করতে হয় কালবদলের হাওয়ায়।

বিশ্বভারতী সম্পর্কে সুনীতিকুমারের গোঁড়ামি ছিল এককালে। শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের নাচগান তিনি পছন্দ করতেন না; এ বিষয়ে কবিকে পত্রও দেন। কিন্তু তার জন্য কবি কোনোদিন কোনো ক্ষোভ প্রকাশ করেন নি। পরবর্তীকালে সুনীতিকুমারের মতের পরিবর্তন হয়, কনিষ্ঠা কন্যা শুচিকে বিশ্বভারতীতে পড়তে পাঠিয়েছিলেন।

১৯২৭ সালে কবি বর্মা, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, সিযাম সফরে যান। সে সময়ে কবির সঙ্গে যে কজন সঙ্গী ছিলেন তার মধ্যে সুনীতিকুমার অন্যতম। সুনীতিকুমারের 'দ্বীপময় ভারত' বইটি যাঁরা পড়েছেন তাঁরা নিশ্চয়ই সুনীতিকুমারের 'দিনপঞ্জী' পড়ে বিস্মিত হয়েছেন। কতো বিচিত্র বিষয়ে তাঁর আগ্রহ ছিল তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা রয়েছে বইটিতে। রবীন্দ্রনাথ 'যাত্রী' নামক বইটিতে লিখেছেন—"আমাদের দলের মধ্যে আছেন সুনীতি। আমি তাঁকে নিছক পণ্ডিত বলেই জানতুম। অর্থাৎ আস্ত জিনিসকে টুকরো করা ও টুকরো-জিনিসকে জোড়া দেওয়ার কাজেই তিনি হাত পাকিয়েছেন বলে আমার বিশ্বাস ছিল। কিন্তু এবার দেখলুম, বিশ্ব বলতে যে ছবির স্রোতকে বোঝায়, যা ভিড় করে ছোটে এবং এক মুহূর্ত স্থির থাকে না, তাকে তিনি তালভঙ্গ না করে মনের মধ্যে দ্রুত এবং সম্পূর্ণ ধরতে পারেন আর কাগজ-কলমে সেটা দ্রুত এবং সম্পূর্ণ তুলে নিতে পারেন। এই শক্তির মূলে আছে বিশ্বব্যাপারের প্রতি তাঁর মনের সজীব আগ্রহ। তাঁর নিজের কাছে তুচ্ছ বলে কিছুই নেই, তাই তাঁর কলমে তুচ্ছও এমন একটি স্থান পায় যাতে তাকে উপেক্ষা করা যায় না। সাধারণতঃ একথা বলা চলে যে, শব্দতত্ত্বের মধ্যে যারা তলিয়ে গেছে শব্দচিত্র তাদের এলেকার সম্পূর্ণ বাইরে, কেননা চিত্রটা একেবারে উপরের তলায়। কিন্তু সুনীতির মনে সুগভীর তত্ত্ব ভাসমান চিত্রকে ডুবিয়ে মারেনি এই বড়ো অপূর্ব। সুনীতির নীরন্ধ্র চিঠিগুলি তোমরা যথাসময়ে পড়তে পাবে—দেখবে, এগুলো একেবারে বাদশাই চিঠি। এতে চিঠির

ইম্পিরিয়ালিজম, বর্ণনাসাম্রাজ্য সর্বগ্রাহী, ছোটো বড়ো কিছুই তার থেকে বাদ পড়েনি। সুনীতিকে উপাধি দেওয়া উচিত, লিপিবাচস্পতি কিংবা লিপিসার্বভৌম কিংবা লিপিচক্রবর্তী।"

সুনীতিকুমারের 'দ্বীপময় ভারত' সম্বন্ধে আমি আমার 'রবীন্দ্রজীবনী'র তৃতীয় খণ্ডে যা লিখেছি তা উদ্ধৃত করা বোধহয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না—"কবির সঙ্গে অনেকেই ইতিপূর্বে বা ইতঃপরে সফরে গিয়াছেন। কিন্তু এরূপ তথ্য কেহই সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করেন নাই; অথবা প্রকাশ করিবেন যখন সত্যাসত্য বিচারের অবকাশ খুবই সংকীর্ণ হইয়া যাইবে। সুনীতিকুমার কবির জীবনকালেই তাঁহার তথ্যাদি সকলের জন্য লিপিবদ্ধ করিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাহার মধ্যে ভুল, ভ্রান্তি, মিথ্যা যদি কিছু থাকিত তাঁহা সমসাময়িকরাই প্রতিবাদ করিয়া সত্য প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিতেন, এই দিক হইতে সুনীতিকুমারের গ্রন্থ অমূল্য। এই গ্রন্থের ঘটনারাজি অবিসম্বাদীভাবে সত্য বলিয়া আমরা গ্রহণ করিয়াছি।"

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সুনীতিকুমারের মতভেদ হয়েছে মাঝে মাঝে। কবি এক পত্রে হেমন্তবালা দেবীকে লিখেছেন—"আমার বন্ধু সুনীতি সজনীকান্তের ঘনিষ্ঠ বন্ধু এমন কি আমার দৃঢ় বিশ্বাস শনিবারের চিঠিকে তিনি আমার বিরুদ্ধে গোপনে উত্তেজিত করতে সহায়তা করেন। ও তাতে আনন্দ বোধও করে থাকেন। সেজন্য আমি যদি সুনীতির সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করতুম—তাহলে তার চেয়ে লজ্জার কথা আমার পক্ষে কিছু হতে পারত না। সুনীতির সমাজমতের সঙ্গে আমার বিরোধ থাকাতে তিনি নিশ্চিত বিশ্বাস করেন যে আমি হিন্দু সমাজের শত্রু অতএব কঠিন শাস্তির যোগ্য—অতএব সেই শাস্তির ব্যবস্থা করা তিনি কর্তব্য বলেই মনে করেন। শাস্তির প্রণালী ও রুচি সম্বন্ধে মানুষের স্বভাব ও শিক্ষা দায়ী —সে সম্বন্ধেও আমাদের আদর্শের সঙ্গে তাঁদের মিল না থাকতে পারে কিন্তু তাই নিয়ে যদি আমি বিবাদ করতে পারি তবে সেইটেই যথার্থ গ্লানির বিষয় হত।" ঘটনাটি ১৯৩২ সালের। কিন্তু এটাই যদি শেষ কথা হত তবে উভয়েই ছোট হয়ে যেতেন। রবীন্দ্রনাথের যেমন ছিল ভোলবার শক্তি, সুনীতিকুমারের ছিল তেমনই মনের ব্যাপ্তি।

সুনীতিকুমার ১৯১৩ সালে ইংরেজি ভাষায় এম. এ. পাশ করলেন। তারপর একদিন ভাষার আশ্চর্য রহস্য চিন্তা করে বিস্মিত হলেন—মন নিবিষ্ট হল ভাষাচর্চায়। তিনি খুঁজছেন মনের মতো বাঙলা ব্যাকরণ। অনেক বই পড়ে তাঁর মনে হল রামমোহন আর নকুলেশ্বর বিদ্যাভূষণ ছাড়া আর কেউ বাঙলা ভাষার

ভিতরকার প্রকৃতি ধরতে পারেন নি, বা সেদিকে নজর দেন নি। তিনি লিখেছেন —"এমন সময় পেয়ে গেলুম রবীন্দ্রনাথের বাঙলা-ভাষাতত্ত্ব-বিষয়ক প্রবন্ধের সংগ্রহ 'শব্দতত্ত্ব'। এগুলির মধ্যে একটি জিনিস দেখে মনে মনে কবির সমীক্ষাশক্তির শত-সহস্র সাধুবাদ দিতে লাগলুম। এমন ক'রে তাঁর পূর্বে বাঙলা ভাষার বৈশিষ্ট্য আর কারও তো চোখে পড়ে নি।" দীর্ঘ বারো বৎসর পরিশ্রমের পর যখন Origin and Development of the Bengali Language কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত হল, তখন তার ভূমিকায় সুনীতিকুমার লিখলেন "The first Bengali with a scientific insight to attack the problems of the language was the poet Rabindranath Tagore……।" রবীন্দ্রনাথও তাঁর 'বাঙলা ভাষা পরিচয়' গ্রন্থটি উৎসর্গ করেন সুনীতিকুমারের করকমলে।[১] এটাই কবির শেষ উল্লেখযোগ্য গদ্য গ্রন্থ। এই গ্রন্থটি পাবার পর সুনীতিকুমার ও তাঁর স্ত্রী কমলাদেবী শান্তিনিকেতনে আসেন। সেই সময়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে যে ছবি তোলা হয়, সেটিই মনে হয় রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সুনীতিকুমারের শেষ ছবি। ছবিটি তোলেন বিখ্যাত আলোকচিত্র শিল্পী শম্ভু সাহা।

কবির মৃত্যু হয় ১৯৪১ সালের ৭ আগস্ট। এর পর ছত্রিশ বৎসর সুনীতিকুমার জীবিত ছিলেন। সেই সঙ্গে বিশ্বভারতীর সঙ্গে যোগাযোগও নিবিড় ছিল। বিশ্বভারতীতে এসে বহুবার বক্তৃতা দেন। প্রথম সরকারীভাবে প্রদত্ত বক্তৃতা হচ্ছে, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত 'কমলা বক্তৃতা'।[২] বিষয় ছিল 'Indian Synthesis and Culture'। অনুষ্ঠানটি হয় চীনাভবনে। সেই সভায় সুনীতিকুমারের বিশেষ ইচ্ছায় আমাকে সভাপতিত্ব করতে হয় ১৯৫৯ অগস্ট ১৬। 'কমলা বক্তৃতা' রবীন্দ্রনাথও দিয়েছিলেন—তাঁর ভাষণের বিষয় ছিল 'মানুষের ধর্ম'।

সুনীতিকুমারের বিশিষ্ট গ্রন্থ The World Literature and Tagore (মুদ্রিত হয় ১৯৭৬ সালে) বিষয়ক ভাষণগুলি বিশেষভাবে স্মরণীয়। এই গ্রন্থের শেষ প্রবন্ধ 'জীবন দেবতা'। এই গ্রন্থটি বিশেষভাবে পড়বার জন্য আমি আজকের

---

১. ৭ কার্তিক ১৩৪৫। বইটি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত। ১৯৩৮।

২. আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের মৃত কন্যা কমলার নামে চল্লিশ হাজার টাকার একটা তহবিল বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্তে অর্পণ করা হয়।

তরুণদের কাছে আবেদন করছি। কেন করছি তা তাঁরা বইটি পড়লেই বুঝতে পারবেন। এই ভাষণগুলি প্রদত্ত হয় 'নৃপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বক্তৃতা' রূপে ১৯৬৮ সালের এপ্রিল মাসে। পাঠকদের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে কে এই নৃপেন্দ্রচন্দ্র এবং কেনই বা এই বক্তৃতাদানের ব্যবস্থা। সংক্ষেপে বলি নৃপেন্দ্রচন্দ্র ছিলেন ইংরেজির অধ্যাপক। কালে অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করে চিত্তরঞ্জনের আদর্শে দেশসেবায় ব্রতী হন। আরও পরে কিছুকাল রেঙ্গুনের এক ইংরেজি দৈনিকের সম্পাদক হন। চিত্তরঞ্জনের মৃত্যুর পর দেশে ফিরে আসেন এবং দেশ-সেবায় আত্মনিবেদন করে বহুবার কারাবরণ করেন। তাঁর আত্মজীবনী At the Cross Road-এ সমকালীন বহু ঘটনা আছে। এই নৃপেন্দ্রচন্দ্রের পুত্র বিনয়েন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সুনীতিকুমারের বিশেষ বন্ধু। বিশ্বভ্রমণে আফ্রিকায় সুনীতিকুমারের সঙ্গে বিনয়েন্দ্রনাথের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা হয়। শুধু তাঁর সঙ্গেই নয়, সুনীতিকুমারের স্ত্রী কমলাদেবীর সঙ্গে বিনয়েন্দ্রনাথের স্ত্রী সুমিত্রাদেবীর ঘনিষ্ঠতা হয় Monrovia-য় (Liberia)। সুনীতিকুমার তাঁর 'Africanism' গ্রন্থের একটি পরিচ্ছেদে বর্ণনা করেছেন—"He was living in Liberia with his wife and daughters, and the two Misses Banerjea with their mother were very popular figures in Monrovia society." বিনয়েন্দ্রনাথ তাঁর পিতার স্মরণে 'বিশ্বভারতী'র হস্তে কয়েক সহস্র অর্থ দান করেন। বিনয়েন্দ্রনাথের বিশেষ ইচ্ছায় সুনীতিকুমারকে বিশ্বভারতীতে এই বক্তৃতায় আহ্বান করা হয়।

সুনীতিকুমার শেষ আসেন ১৯৭৩ সালে বিশ্বভারতীর Humanities Building-এর ভিত্তি স্থাপন এবং বৃক্ষরোপণ উৎসবের জন্য। এই সময়ে সুনীতি-কুমার আমার সঙ্গে দেখা করেন এবং প্রায় দু-তিন ঘণ্টা উভয়ের মধ্যে বিচিত্র বিষয়ের আলোচনা চলে। বিশেষভাবে আলোচনা করি রবীন্দ্রনাথের 'জীবনদেবতা' সম্বন্ধে। এই তাঁর সঙ্গে শেষ দেখা। তার আগে বহুবার 'সুধর্মা'তে গেছি, কতো আলোচনা করেছি। তাঁর স্ত্রী তখন জীবিত ছিলেন। সুনীতিকুমার যেমন খেতে ভালোবাসতেন, তেমন খাওয়াতেও। কমলাদেবী আগেই গেছেন। তাঁর পুত্র বোম্বাইতে, মেয়েরা শ্বশুরবাড়ি। সুনীতিকুমার তাঁর 'সুধর্মা'য় থাকতেন জ্ঞান সাগরে ডুবে। তারপর একদিন সন্ধ্যায় T. V. দেখতে বসে হঠাৎই তাঁর চলে যাওয়ার সংবাদ পেলাম। একে একে অন্তরঙ্গরা সব চলে যাচ্ছেন—স্মৃতিভারে আমি পড়ে আছি।

সুরসিক সুনীতিকুমার

বনফুল

শ্রদ্ধেয় আচার্য সুনীতিকুমারের সম্বন্ধে কি লিখিব ভাবিতে গিয়া একটু মুশকিলে পড়িয়াছি। তাঁহার বিপুল বিদ্যার জয়জয়কার করিলেই কি তাঁহার প্রতি সম্যক্ শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হইবে? তিনি ভাগ্যবান ছিলেন, বরাবরই গভর্নমেণ্টের সুনজরে পড়িয়া বড় বড় পদাধিকারী হইবার সৌভাগ্য তাঁহার হইয়াছিল। এই ঘটনাগুলিকে বিস্ফারিত করিয়া ধরিলেই কি তাঁহার স্বরূপ প্রকাশিত হইবে? না। রাজার মণি-মুক্তা-খচিত মুকুট, বা বহু-মূল্যবান্ রাজপরিচ্ছদের বর্ণনায় রাজার প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায় না। রাজা নামক ব্যক্তিটির পরিচয় অন্য মাপকাটি দিয়া মাপিতে হয়। সে মাপকাটি প্রত্যেকের অন্তরে থাকে। সে মাপকাটি এক রকম নয়। আপনার সুনীতিকুমার আর আমার সুনীতিকুমার এক ব্যক্তি না-ও হইতে পারেন।

প্রতিভাবান্ ব্যঙ্গ-সাহিত্য-রচয়িতা ও কার্টুনিস্ট ডাক্তার বনবিহারী মুখোপাধ্যায় মেডিক্যাল কলেজে আমার শিক্ষক ছিলেন। তিনি আমাকে একটি অদ্ভুত উপদেশ দিয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন—যদি কাহারও নামে নিন্দা শোন, তাঁহার সহিত গিয়া আলাপ করিও। দেখিবে নিশ্চয় তিনি গুণী লোক। এদেশে গুণী লোকেরাই সর্বদা নিন্দিত হন। রামমোহন রায় হইতে শুরু করিয়া সব গুণী ব্যক্তিই এদেশে নিন্দিত ও লাঞ্ছিত হইয়াছেন। এদেশের লোক বিদ্যাসাগরের বাড়িটা পর্যন্ত পোড়াইয়া দিয়াছিল। পেচকেরা আলো সহ্য করিতে পারে না।

আমি যখন 'শনিবারের চিঠি'তে লেখা শুরু করি তখন মাঝে মাঝে শনি-চক্রের আড্ডায় যাইতাম। সেখানে মাঝে মাঝে সুনীতিবাবুর নাম শুনিতাম। দুই একজন তাঁহার নিন্দাও করিতেন। বলিতেন তিনি নাকি দাম্ভিক, তিনি নাকি খোশামোদ-প্রিয়, তিনি নাকি নানা মতলবে ঘোরেন। তাঁহার সহিত আলাপ করিবার কৌতূহল মনে জাগিল। কিন্তু আমি ভাগলপুর হইতে মাঝে মাঝে আসিতাম। বেশীক্ষণ থাকিতে পারিতাম না। তবু ভাগ্যক্রমে হঠাৎ একদিন দেখা হইয়া গেল। শনিবারের চিঠির অফিসের টেবিলে খবরের কাগজ পাতা, তাহার উপর প্রচুর মুড়ি ও বেগনি স্তূপীকৃত, সকলের মুখ চলিতেছে, তর্কের তুফান বহিতেছে, এমন সময় সুনীতিবাবু প্রবেশ করিলেন, তাঁহার হাতেও বেশ বড় এক ঠোঙা চিনা-বাদাম। তাঁহার প্রাণবন্ত স্পর্শে আমাদের আড্ডা আরও জমিয়া

উঠিল। সেই আমার সহিত তাহার প্রথম পরিচয়। তাহার পর পরিচয় ঘনিষ্ঠতর হইয়াছে এবং হৃদয়ঙ্গম করিয়াছি আমার গুরুদেব বনবিহারীবাবু যাহা বলিয়াছিলেন তাহা সত্য। বাঘের পিছনে যেমন ফেউ লাগে এদেশে ভালো লোকদের পিছনে তেমনি লাগে নিন্দুকেরা।

আজ আত্ম-বিশ্লেষণ করিতে বসিয়া নিজেকেই প্রশ্ন করিতেছি সুনীতিবাবুকে এতো ভালো লাগিয়াছিল কেন? মন যে উত্তর দিতেছে তাহাতে বিস্মিত হইয়া যাইতেছি! যে ভাষা-বিজ্ঞানে গাঢ় পাণ্ডিত্যের জন্য তিনি বিশ্ব-বিশ্রুত, সে ভাষা-বিজ্ঞান সম্বন্ধে আমি সম্পূর্ণ অজ্ঞ। তিনি সৃষ্টি-ধর্মী বা কাব্য-ধর্মী কোনও উল্লেখ-যোগ্য পুস্তক রচনা করেন নাই। তাঁহার সমস্ত রচনাই গবেষণামূলক প্রবন্ধ। তবু কেন তাঁহাকে ভালো লাগিয়াছিল? প্রথম কারণ বোধহয় তিনি সুরসিক ছিলেন বলিয়া। যদিও তিনি কাব্য লেখেন নাই, কিন্তু কাব্যরস উপভোগ করিবার ক্ষমতা তাঁহার প্রচুর ছিল। রবীন্দ্রনাথের একজন ভক্ত ছিলেন তিনি। নিজেও তিনি রসিক পুরুষ ছিলেন। কথায়-বার্তায় তাঁহার রসিক মনের পরিচয় অনেকেই পাইয়াছেন। তাঁহাকে ভালো লাগিবার ইহা একটা কারণ বটে, কিন্তু একমাত্র কারণ নহে, আরও কারণ আছে। তাঁহার চরিত্রের মধ্যে একজন নির্ভীক যোদ্ধা ছিল। বিরোধীদের দেখিয়া তিনি কখনও পিছু হটেন নাই—আস্তিন গুটাইয়া আগাইয়া গিয়াছেন। যাহা ভালো বলিয়া, সত্য বলিয়া মনে করিয়াছেন তাহার জন্য শেষ পর্যন্ত লড়িবার সাহস ও সামর্থ্য তাঁহার ছিল। তাঁহার এই পৌরুষের জন্য তাঁহাকে খুব ভালো লাগিত আমার। ভালো লাগিবার আর একটি কারণ তাঁহার স্ত্রী। তাঁহাকে বৌদি বলিয়া ডাকিতাম এবং তিনি সত্যই আমাকে দেবর-তুল্য স্নেহ করিতেন। আমার মেয়ের জন্য পাত্রও খুঁজিয়া ছিলেন তিনি। সে সময় যখন তাঁহার বাড়িতে যাইতাম তখন খোলা গায়ে সুনীতিবাবুর যে জ্যেষ্ঠ-তুল্য সহৃদয় রূপ দেখিয়াছি তাহা বাঙালী মধ্যবিত্ত ভদ্রঘরের গৃহকর্তার চেহারা। সেখানে কোনও আতিশয্য নাই। বাহাদুরি দেখাইবার চেষ্টা ছিল না, তাহা শুধু সৌজন্য ও ভালবাসার অকৃত্রিম প্রকাশ। একটি পুস্তকের সন্ধানে একদিন তাঁহার বাড়িতে গিয়া তাঁহার পুতুল-সংগ্রহটি দেখিয়াছিলাম। শিশুসুলভ আনন্দের সহিত আমাকে পুতুলের পর পুতুল দেখাইয়া মুগ্ধ করিয়া দিয়াছিলেন তিনি। মনে হইয়াছিল যেন এক প্রৌঢ় শিশুর খেলাঘরে বসিয়া আছি।

আরও কয়েকটি কারণে তাঁহাকে ভালো লাগিত। সেগুলি কিন্তু গুণ নহে, দোষ। তিনি খুব আড্ডাবাজ লোক ছিলেন, পরনিন্দা পরচর্চা করিতেন। মাঝে

মাঝে এমন সব কথা বলিতেন যাহা প্রকাশ্যে বলা যায় না। অনেক বড়লোকের হাঁড়ির খবর রাখিতেন তিনি। সেগুলি মাঝে মাঝে নিম্নকণ্ঠে বলিতেনও। কোনও সভায় তাঁহার কাছে বসিলে কানের কাছে ফিস ফিস করিয়া নানারকম গল্প বলিতেন। নিজে যখন সভায় বক্তৃতা দিতেন তখন বক্তৃতার প্রসঙ্গ হইতে প্রায়ই দূরে সরিয়া যাইতেন। বক্তৃতার বিষয় হয়তো বঙ্গ-সংস্কৃতি, কতক মিনিট পরেই দেখা যাইত তিনি গ্রীক নাটক লইয়া মনোরম বক্তৃতা করিতেছেন। সে বক্তৃতা বিষয়-বহির্ভূত হইলেও শুনিতে খুব ভালো লাগিত। শ্রোতারা মন্ত্রমুগ্ধবৎ শুনিতেন সে বক্তৃতা। ছোট নদীর সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতে গিয়া তিনি সাগর-মহাসাগরে অনায়াসে চলিয়া যাইতে পারিতেন, তাঁহার জ্ঞানের পরিধি এত বড় ছিল। বক্তৃতা করিতে শুরু করিলে তাঁহার সময়ের জ্ঞান থাকিত না। ইহা বক্তৃতার গুণ নহে, দোষ। কিন্তু এই জন্যই তাঁহাকে ভালো লাগিত।

তাঁহাকে ভালো লাগিত আর একটা কারণে। তিনি খাদ্যরসিক ছিলেন এবং যে কোনও খাদ্য প্রচুর পরিমাণে খাইয়া হজম করিতে পারিতেন। বাংলা-সাহিত্য-সংসারের দাদামশাই স্বর্গীয় কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের অশীতি-বর্ষ-পূর্তি উপলক্ষে আমরা চল্লিশজন সাহিত্যিক তাঁহার পূর্ণিয়ার বাড়িতে গিয়া তাঁহাকে শ্রদ্ধা নিবেদন করি। পূর্ণিয়া যাইবার পথে আমার বাড়িতে মণিহারীতে, সাহিত্যিকরা একদিনের জন্য আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। সঙ্গে সুনীতিবাবুও ছিলেন। খাওয়ার আয়োজন হইয়াছিল বাঙালী রীতিতে। কম্বলের আসন, কলাপাতা এবং ছোট বড় মাটির খুরি। নিরামিষ নানারকম তরকারি, কিছু ভাত, মাংসের কোর্মা, বিরিয়ানি, মাছ ভাজা, মাছের কালিয়া, মাছের অম্বল, পায়েস এবং দই। আমি ও আমার ভাইরা পরিবেশন করিতেছিলাম, আমার বাবা প্রত্যেক অতিথির পাতের কাছে গিয়া দেখিতেছিলেন কাহার কি লাগিবে। সুনীতিবাবু বিরিয়ানি এবং কোর্মা দুইবার চাহিয়া লইলেন। তখন বাবা বলিলেন—একটি বড় রুই মাছের গোটা মুড়া আলাদা রান্না করা হইয়াছে, সেটি কি আপনাকে আনিয়া দিব? সুনীতিবাবু একটু হাসিয়া বলিলেন—দিন। সে মুড়োটির তিনি সদ্‌গতি করিলেন। এই সে দিন, মাত্র পাঁচ বৎসর আগে, তিনি আমার ছোট ছেলের বিবাহে নিমন্ত্রণ খাইয়া গিয়াছিলেন আমার কলিকাতার বাড়িতে। তখনও বিরিয়ানি, ভেটকি মাছের ফ্রাই এবং মিষ্টান্ন বারবার চাহিয়া লইয়া যে প্রাণোচ্ছলতার পরিচয় দিয়াছিলেন তাহা অসাধারণ। তিনি প্রচুর কঠিন কঠিন ভাষা হজম করিয়াছিলেন, প্রচুর খাদ্য হজম করিবার শক্তিও তাঁহার ছিল। অতি-ভোজন গুণ

নয়, দোষ। কিন্তু এই জন্যই তাঁহাকে ভালোবাসিতাম, শ্রদ্ধা করিতাম। তাঁহার দেহ বেশ বলিষ্ঠ ছিল, মনও বেশ বলিষ্ঠ, শিশুসুলভ নানা কৌতুহলে তিনি মশগুল হইয়া থাকিতেন। জীবনকে পরিপূর্ণভাবে উপভোগ করিবার আগ্রহই তাঁহাকে সংস্কারমুক্ত করিয়াছিল। তাঁহার আর একটি দোষ, নিজের প্রিয় ছাত্রদের সম্বন্ধে পক্ষপাত। অসংখ্য ছাত্র তাঁহার, তাঁহারাও বিরাট একটি নক্ষত্র-মণ্ডলের মতো সমুজ্জ্বল। সুনীতিকুমার এই গর্বে সদা গর্বিত থাকিতেন এবং তাঁহাদের উন্নতির জন্য পক্ষপাতিত্ব করিতেও দ্বিধা করিতেন না।

তাঁহার বিশাল মনীষা জ্ঞানের জন্য তাঁহাকে ভক্তি করি, শ্রদ্ধা করি। কিন্তু সেই মনীষী জ্ঞানী ব্যক্তিটি আমার নাগালের বাহিরে। যে লোকটিকে নাগালের মধ্যে পাইয়াছিলাম তাঁহাকে ভালো লাগিত তাঁহার নানাবিধ মানবিক দোষগুণেরজন্য —ঠিক যে জন্য ভালো লাগে দুরন্ত দামাল প্রাণবন্ত শিশুকে।

পণ্ডিতের পরিচয় পুস্তকেরা বহিবে গৌরবে
বিরোধ পরিচয় বল কোথা রবে ?

সুনীতবাবুর মুখ্য ভূমিকা

সুকুমার সেন

সুনীতিবাবু প্রচণ্ড পণ্ডিত ছিলেন। তাঁর পাণ্ডিত্যের অবধির তাঁর জ্ঞানের সীমানার রীতিমতো মাপজোখ করবার বিষয়। সে কাজে অধিকার কার বেশি আছে তা জানি না। তবে এইমাত্র জানি যে সে মাপজোখ করা হলে তা বোঝবার লোক বোধ হয় এদেশে নেই। আশা করি পাঠকেরা আমার এই কথায় রাগ করবেন না। আমার অভিজ্ঞতা সুনীতিবাবুর মত পরিপক্ক না হলেও তা হালকা অথবা অল্প-দিনের নয়। আমি জানি যে আমরা, এখনকার পণ্ডিতাভিমানীরা লেখাপড়া নিয়ে প্রায়ই ছেলেখেলা অথবা ভেলকিবাজি করে থাকি। আত্মোন্নতিস্পৃহাহীন সত্যকার জ্ঞানার্থী দু-চারজনের বেশি আমার চোখে পড়ে নি। তবে বলতে পারেন আমার চোখ ভাল নয়, আমার দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ। সে কথা মানি।

বাঙালী—এবং কিছু কিছু অপর অঞ্চলের ভারতবাসী—আমাদের কাছে সুনীতিবাবুর মুখ্য পরিচয় ঘটেছিল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। এদানীং রাধাকৃষ্ণনের পরেই অ-বিজ্ঞান বিভাগে ('কলা-বিভাগ' বললুম না, কেন না "কলা" শব্দটি এখানে অন্য দ্যোতনা এনে দেয় আমার কাছে—) সব চেয়ে খ্যাতনামা অধ্যাপক বলে সুনীতিবাবুর নাম ছিল। রাধাকৃষ্ণনের মত সুনীতিবাবুও খুব অল্প বয়সে University Professor হয়েছিলেন।

খয়রার রাজার দানে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আশুবাবুর উদ্যোগে কয়েকটি University Professor-এর পদ সৃষ্টি করেছিল। তার একটিতে সুনীতিবাবু বিলেতে থাকতেই নিযুক্ত হয়েছিলেন। সে পদের বিষয় ছিল ভাষা-বিজ্ঞান। আমি তখন ভাষাবিজ্ঞান বিভাগে পড়ি, সিক্স্‌থ ইয়ারে উঠেছি। পূজার আগেই তাঁর নিয়োগের খবর কাগজে বেরিয়েছিল। আমার অধ্যাপক তারাপুরওয়ালাকে জিজ্ঞাসা করেছিলুম, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ফোনেটিক্‌সের বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক হয়ে আসছেন। তিনি বোধ হয় আমাদের শুধু ফোনোটিক্‌সেরই ক্লাস নেবেন। অধ্যাপক বললেন, তিনি সব পেপারই পড়াতে সমান সমর্থ। অধ্যাপক তারাপুর-ওয়ালা ছিলেন যেমন পণ্ডিত তেমনি ভদ্র ও সহৃদয়। তাঁর কথায় সুনীতিবাবুকে দেখবার আগেই তাঁর সম্বন্ধে আমার মনে শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রম জেগেছিল। সে হল ১৯২২ সালের কথা।

পূজার ছুটির পরে ইউনিভার্সিটি খুলেছে। তাঁকে প্রথম দেখলুম দ্বারভাঙা বিলডিঙের উত্তর-পূর্ব প্রবেশপথের দু-চারটি সিঁড়ি বেয়ে তিনি উঠছেন, আমরা নামছি ক্লাস শেষ করে বিকেলবেলায়। কে যেন তাঁকে আমায় দেখিয়ে দিয়ে বললে, এই সুনীতিবাবু। দেখলুম তাঁকে। গায়ে পাড়দার সবুজ শাল পৈতের ধরনে গায়ে জড়ানো, পায়ে শুঁড়তোলা জরিদার নাগরা জুতো। পরনে ধুতি পাঞ্জাবি। গম্ভীর মুখ। সিঁড়ির দিকে চোখ। ভাবলুম এইবার তিনি আমাদের পড়াবেন। কিন্তু ক্লাস নিতে তাঁর দুচার-দিন দেরি হয়েছিল। শুনলুম তিনি বিলেত থেকে এসেই কঠিন প্লুরিসিতে পড়েছিলেন। আশুবাবু তাঁকে দেখতে গিয়েছিলেন তাঁর বাড়িতে।

আমরা দুটিমাত্র ছাত্র ছিলুম ভাষাবিজ্ঞানের ষষ্ঠবার্ষিক শ্রেণীতে। একদিন অধ্যাপক তারাপুরওয়ালা জানিয়ে দিলেন যে অতঃপর সুনীতিবাবু আমাদের সপ্তাহে দুটি করে ক্লাস নেবেন। ক্লাস দুটি হবে জয়েণ্ট। একটি ষষ্ঠবার্ষিক সংস্কৃতের সঙ্গে অপরটি ষষ্ঠবার্ষিক বাংলার সঙ্গে। (শ্যামাপ্রসাদবাবু তখন বাংলার ষষ্ঠবার্ষিক শ্রেণীতে পড়েন।)

সংস্কৃতে ছাত্রসংখ্যা তখন খুব কম ছিল। আমাদের বছরে ছিল আট-দশজনের মত। তাও আবার সবাই সব দিন আসত না। আমাদের ক্লাস রুম ছিল দ্বারভাঙা বিল্ডিঙের চারতলায় পূবমুখী একটি ছোট ঘরে। এই ঘরে আমাদের যুক্ত ক্লাসে কুলিয়ে যেত। তারাপুরওয়ালাও এই ঘরে ক্লাস নিতেন। এই ঘরে সুনীতিবাবু আমাদের প্রথম ক্লাস নিয়েছিলেন এবং বরাবর নিতেন। বাংলার সঙ্গে যে জয়েণ্ট ক্লাস হত তার কোন ঘর নির্দিষ্ট ছিল না। কখনো দ্বারভাঙা বিল্ডিঙের একতলায় সিঁড়ির দু পাশের কোন একটি ঘরে কিংবা পশ্চিম-দুয়ারী একটি ঘরে। কখনো বা তিনতলায় পিশেল হলে অথবা পশ্চিমদিকের অন্য ঘরে। বাংলায় তখন ছাত্রের সংখ্যা যতদূর মনে পড়ছে তিরিশ-পঁয়তিরিশের মত। আমরা সুনীতিবাবুর বাংলা ক্লাসেও যেতুম। তবে সে ক্লাসে আমার নিজের টান ছিল না। আমি প্রাকৃত ও বাংলা এই দুটি পেপারের বদলে থিসিস তৈরি করছিলুম (সুতরাং সে দুটি বিষয়ে আমায় পরীক্ষা দিতে হয় নি।) আর বাংলা ক্লাসে তিনি যা পড়াতেন তা আগেই পড়েছিলুম তারপুরওয়ালার ও বিজয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের কাছে। তবে সংস্কৃতের সঙ্গে সুনীতিবাবু যা পড়াতেন তাতে অনেক কিছু অভিনব ছিল আমার কাছে। ইউরোপে তাঁর অধীত বিদ্যা যে কতটা ফলপ্রসূ হয়েছিল তা বোঝা গিয়েছিল এই পড়ানো থেকে। এই প্রসঙ্গে নিজের কথা একটু বলি।

একদিন সংস্কৃত-ভাষাবিজ্ঞানের ক্লাসে তিনি Accent পড়াচ্ছিলেন। তাঁর পড়ানো শেষ হলে আমি একটি প্রশ্ন করেছিলুম। তার উত্তরে তিনি বলেছিলেন যে তাঁর কাছে এ বিষয়ে মেইয়ের (Meillet) দেওয়া নোট আছে। আমি যদি তাঁর বাড়ি যাই তবে সে নোট আমাকে টুকে নিতে দিতে পারেন। সেকালে আমরা শিক্ষকদের ভক্তি করতুম ভয়ও করতুম, তাঁদের গায়ে পড়বার কথা তো ওঠেই না। (মাস্টার মশায়রা তখন শান্তিনিকেতনি স্টাইলে দা-কাটা হন নি!) আমি বিনীত ভাবে বললুম, স্যার আমি অবশ্য কাছেই থাকি। আপনি যদি অনুগ্রহ করে পরের ক্লাসের দিনে এনে দেন তো ভাল হয়। তিনি কী বুঝলেন জানি না। পরের ক্লাসের দিনে তিনি সে নোটটি এনে দিতে ভোলেন নি।

সুনীতিবাবু সরলচিত্ত কিন্তু রাশভারি ব্যক্তি ছিলেন। তাঁকে স্বভাবতই গম্ভীর বোধ হত। তাঁর পাণ্ডিত্যের খ্যাতি গাম্ভীর্যের সঙ্গে মিশে গিয়ে ছাত্রদের মনে কিছু ভীতির সঞ্চার করত। তাঁর কোন ক্লাসে কেউ কখনও কিছুমাত্র গোলমাল করবার প্রবৃত্তি অনুভব করে নি।

আমাদের সংস্কৃত ক্লাসে তিনি একদিন বোর্ডে দেখাচ্ছিলেন কী ভাবে Indo-European ভাষায় reconstruction করা যায়। ক্লাস শেষ হলে আমি জিজ্ঞাসা করেছিলুম, 'স্যার, এমন প্রশ্ন কি পরীক্ষায় থাকতে পারে? সঙ্গে সঙ্গে তিনি গম্ভীর মুখে গম্ভীরতর স্বরে উত্তর দিলেন, 'Is it a proper question to ask ?' আমি তো মরমে মরে গেলুম। তবে এইখানে বলে রাখি যে আমাদের প্রশ্নপত্রে সেবারে তেমন প্রশ্ন এসেছিল। সে প্রশ্নপত্র সুনীতিবাবুই রচনা করেন। প্রশ্নের মধ্যে একটু ভুল ছিল। আমি উত্তরপত্রে তা নির্দেশ করে দিয়েছিলুম। সে ১৯২৩ সালের কথা। কিন্তু এ ব্যাপারটি তিনি ভোলেন নি। ১৯২৬ সালের দিকে তাঁর বাড়িতে আমি অধ্যাপক শহীদুল্লাহকে প্রথম দেখি। শহীদুল্লাহের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিয়ে সুনীতিবাবু বলেন, 'ইনি আমার প্রশ্নে ভুল দেখিয়েছিলেন।' সুনীতিবাবুর মহত্ত্বের এই একটি ক্ষুদ্র কিন্তু অ-তুচ্ছ প্রমাণ। মনে হচ্ছে না সেই দিনে কিংবা আর এক দিনে আমি একটি থিসিস লিখে বিশ্ববিদ্যালয়ে জমা দেবার আগে তাঁকে দেখাতে যাই। তিনি এক জায়গায় ভুল দেখিয়ে সংশোধন করে নিতে বললেন। তখন সুনীতিবাবু লিখতেন দোয়াত কলমে। দোয়াতে কলম ডুবিয়ে সংশোধন করতে গিয়ে কিছু কালি ছিটিয়ে পড়ে গেল। সুনীতিবাবু বললেন, 'তাই তো এ কী হল।' তখন সেখানে শহীদুল্লাহ ছিলেন। তিনি বলে উঠলেন, 'কেন ভালই হয়েছে। ভাল হবে! সেকালের লোকে দলিলপত্র লিখে শেষে একটু কালি

ছিটিয়ে দিত একটু দোষ রাখবার জন্যে। সে দোষের জন্যে অশুভ দেবতার দৃষ্টি তার উপর পড়ত না।' শহীদুল্লাহের কাছে সেই দিন এই জ্ঞানটুকু পেয়েছিলুম।

ইউনিভার্সিটিতে সুনীতিবাবু ইংরেজী বাংলা সংস্কৃত পালি ফারসী উর্দু ফরাসী ভাষাবিজ্ঞান ইসলামী ইতিহাস ইত্যাদি বিবিধ বিষয়ে ক্লাস নিতেন। তবে তিনি সব ক্লাসেই পড়াতেন ইংরেজীতে। এ বিষয়ে একটি মজার কথা আছে। একবার সুনীতিবাবু তিন মাস ছুটি নিয়ে ইউরোপে যান। আমার উপর ভার দিয়ে যান ষষ্ঠবার্ষিক বাংলা ক্লাস নেবার। আমি তো পড়াতে গেলুম। সেই বাংলা বিভাগে আমার প্রথম পড়ানো। প্রথম দিনেই ছেলেরা ধরে বসলে, 'স্যার, বাংলায় বলুন।' আমি বললুম, 'সুনীতিবাবু ইংরেজীতে পড়ান। আমি কেন তাঁর প্রথা কাটব?' ছেলেরা বললে, 'বাংলায় বললে আমরা ভাল করে বুঝতে পারব।' আমি বললুম, 'তাই হবে।' আমি বাংলায় পড়াতে লাগলুম।

যথাকালে সুনীতিবাবু ফিরে এলেন। আমিও বাংলা ক্লাস নেওয়া ছেড়ে দিলুম। অল্প কিছুদিন পরে বাংলার ছেলেদের দুজন চাঁইয়ের সঙ্গে দেখা হল। তারা বললে, 'স্যার, সুনীতিবাবু আমাদের উপর রেগে গেছেন।' আমি বললুম, 'সে কী কথা। তিনি তো সহজে রাগবার মানুষ নন। আপনারা কী করেছিলেন?' তারা বললে, 'তিনি বিলেত থেকে ফিরে এসে যখন ক্লাস শুরু করলেন তখন আমরা তাঁকে বলেছিলুম বাংলায় পড়াতে। তিনি বললেন, কেন বাংলায় পড়াব? আমরা বলেছিলুম, সুকুমারবাবু বাংলায় পড়াতেন। শুনে সুনীতিবাবু বললেন, সুকুমারবাবু বাংলায় পড়িয়েছিলেন বেশ করেছিলেন। আমি বাংলায় পড়াব না।' এই কথা শুনে আমি ছেলেদের আশ্বাস দিলুম, 'সুনীতিবাবু একটুও রাগেন নি।'

সাধারণ অধ্যাপকদের মত সুনীতিবাবু প্রশ্নপত্রের দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়-গুলি নির্বাচন করে এলোধাবাড়ি পড়াতেন না। পড়াতেন সিলেবাস অনুযায়ী ধারাবাহিক ভাবে। এই কারণে তাঁর পড়ানো ছিল একটু দ্রুতগতি। একই বিষয় বছরের পর বছর পড়াতে পড়াতে তাঁর পড়াবার tempo ক্রমশ দ্রুত থেকে দ্রুততর হয়ে পড়েছিল। তিনি যা পড়াতেন তা সাধারণ ছাত্রের পক্ষে শুনে গেলেই চলত না। মনে রাখবার জন্যে লিখে নিতে হত। কেন না সে সব কথা কোন একটি দুটি বইয়ে লভ্য ছিল না। সুতরাং ছেলেরা তাঁর লেকচার টুকত। আগাগোড়া টুকে যাওয়া অনেক সময় কোন একটি ছাত্রের সাধ্যে কুলতো না। দু-তিনজনে মিলে টুকে নিয়ে মেলাতে হত। শুনেছি বাংলা ক্লাসে শেষের দিকে এমন অবস্থা হয়েছিল যে চার-পাঁচটি ছেলে পাঁচ-দশ মিনিটের পালা করে পর পর লিখে যেত। সেগুলি

জোড়া দিলে সেদিনের লেকচার পাওয়া যেত।

সুতরাং বোঝা যাচ্ছে সুনীতিবাবু পাইকারি হারে শিক্ষক ছিলেন না, তিনি ছিলেন ছোটখাটো ক্লাসের আদর্শ মাস্টার মশায়, যেখানে তাঁর কথা শুনতে শুনতে বুঝে নিয়ে প্রশ্ন করা যেত—সেই সব প্রশ্ন যার উত্তর আর কারও কাছে মিলত না। কিন্তু তাঁর হাজার হাজার ছাত্রের মধ্যে ক'জন তাঁর কাছে এমনি করে পাঠ নিতে পেরেছিল?

সুনীতিবাবু আসল ইউনিভার্সিটি প্রফেসার অর্থাৎ মহৎ অধ্যাপক ছিলেন। যে বিষয়ে তিনি ব্যাখ্যা করতেন তার আনুষঙ্গিক অন্যান্য বিষয়ও জানিয়ে দিতেন। তাতে করে অধ্যেতারাও তাঁর বিচক্ষণতার পথ লক্ষ্য করতে সমর্থ হত। কিন্তু আমাদের দেশের শিক্ষা জ্ঞানলাভের জন্যে নয়, পরীক্ষা পাসের ছাপ পাবার জন্যে। পরীক্ষার জন্যে পড়তে পড়তে যদি একটু-আধটু জ্ঞান তলিয়ে পড়ে যায় তো মন্দ কী? কিন্তু জ্ঞানের বোঝা ভারি হলে চলবে না। তাতে পরীক্ষার কলম হোঁচট খেয়ে ভোঁতা হয়ে যাবে। আগেই বলেছি সুনীতিবাবুর পড়ানো পরীক্ষা-লক্ষ্যভেদের শিক্ষাদান ছিল না। নিন্দার কলরব উঠবে এই আশঙ্কা করেও বলছি যে আজ আমরা সুনীতিবাবুর পড়ুয়া বলে গৌরবে বুক ফোলাচ্ছি বটে কিন্তু তাঁর শিক্ষা আমরা কতটুকু গ্রহণ করতে পেরেছি?

সুনীতিবাবুর যে কদাপি কোন জিজ্ঞাসু ছাত্র ছিল না এমন নয়। কিন্তু তাঁরা সংখ্যায় নিতান্ত অল্প এবং অনেকেই অবাঙালী এবং দু-একজন ছাড়া তাঁরা কেউ-ই এম. এ. পরীক্ষার্থী ছিলেন না। অজস্র বাঙালী ছেলে পাস করেছে তাঁর ক্লাস করে, তার কাছে বেশি নম্বরও অনেকে পেয়েছে, সার্টিফিকেটও অনেকে আদায় করেছে। সম্বন্ধ এইখানেই চুকে গেছে যদি পরবর্তী কালে আবার সার্টিফিকেট প্রয়োজন না হত। তবে অবাঙালী ছাত্ররা তাঁর সঙ্গে যথাসম্ভব শ্রদ্ধার সম্পর্ক বজায় রেখে এসেছে, তাঁকে শুধু সার্টিফিকেটের ক্র্যাংকিং মেশিন বলে স্মরণ করে নি।

বাঙালীর মধ্যে এক সম্প্রদায় আছেন যাঁরা সুনীতিবাবুর ক্লাস না করেও তাঁর ছাত্র। এঁরা কেউ কেউ তাঁর অধীনে গবেষণা করেছেন। কেউ কেউ বা তাঁর বই প্রবন্ধ পড়ে শিক্ষালাভ করেছেন। এঁরা সুনীতিবাবুর আসল ছাত্র। কখনও এঁরা সুনীতিবাবুকে অবজ্ঞা অথবা উপেক্ষা করেছেন বলে শুনি নি।

আজ সুনীতিবাবু নেই। এই শূন্যতার মধ্যে তাঁর সত্তা আরও যেন গভীর ভাবে অনুভব করছি।

একটি ব্যক্তিত্বের বিকাশ

প্রমথনাথ বিশী

১৯৩৫ সাল। ধর্মতলা স্ট্রীটের ৫৬ নম্বর বাড়ি থেকে বঙ্গশ্রী পত্রিকা বের হয়, সজনীকান্ত দাস সম্পাদক, সহকারী সম্পাদক কিরণকুমার রায়। আপিসের ঢালা ফরাসে দুপুর আর বিকালে সাহিত্যিকদের আসর জমে ওঠে। দুপুরে স্কুল কলেজ আপিস পালিয়ে আসেন অনেকে; সকাল বেলাতেও লোকের অভাব হয় না, তাঁরা বোধহয় বাড়ি পালিয়ে বা বাজার পালিয়ে আসেন। পরিমল গোস্বামী আসেন— দামী ক্যামেরার মতো মন আর ক্যামেরার চাবি টিপবার মতো মৃদু কণ্ঠস্বর; ভূলুণ্ঠিত চাদর ও উদাস নেত্রে নৃপেন চাটুজ্জের প্রবেশে প্রমাণ হয় যে সংসার ত্রিতাপের অধীন; প্রকাণ্ড একঠোঙ্গা তেলেভাজা হস্তে কবি কৃষ্ণধন দে দৃষ্টান্ত যোগে প্রমাণ করেন যে নব রসের বাইরেও রস আছে; সদ্যপ্রবিষ্ট নলিনীকান্ত সরকারের স্নিগ্ধ হাসিটিতে বুঝতে পারা যায় যে জিহ্বাগ্রে যে রসিকতাটি এতক্ষণ পাখা গুটিয়ে অপেক্ষা করছিল এবারে আসরের মধ্যে গিয়ে পড়বে; বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় শেয়ালদা স্টেশনে নেমেই সোজা এসেছেন, পায়ের জুতো, গায়ের জামা, মুখের কোমল শ্যামশ্রী তারস্বরে ঘোষণা করছে যে মানুষটি গ্রামীণ সভ্যতার প্রতিনিধি; বিনা ভূমিকায় হাত বাড়িয়ে দিলে বুঝতে হবে একটি বিড়ি চাই; বিড়িটা নিয়ে সকলের আপত্তি সত্ত্বেও পাখা বন্ধ করে দিলেন, জোর বাতাসে তাড়াতাড়ি জ্বলে শেষ হয়ে যাবে, অপরের বিড়ি সম্বন্ধেও তাঁর এতখানি সতর্কতা; ডক্টর সুশীল দে মাঝে মাঝে আসেন, মাজিত হাসি, মাজিত রুচি, মাজিত চশমা, মূর্তিমান কলকাতার বনেদী কালচার; মোহিতলাল আসলে বুঝতে হবে আর কারো কথা বলা চলবে না, যারা জানে চুপ করে যায়, জানে না এমন লোকের দিকে নীরব ভর্ৎসনায় তিনি ফিরে তাকান, তাতেও না বুঝলে বলে ওঠেন, পয়সা খরচ করে অনেক দূর থেকে এসেছি এখন থামুন; কাঠের সিঁড়ির উপরে ভারী পায়ের শব্দ শোনা গেলে বুঝতে হবে ব্রজেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় আসছেন, ঘরে প্রবেশ করেই তিনি বলবেন সংবাদ প্রভাকরের ফাইলে আজ অমুকের সম্বন্ধে যে সংবাদ পেয়েছি ছাপলে—, কথা শেষ হয় না কেননা ইতিমধ্যে কৌটো থেকে একটি পান মুখবিবরে প্রবিষ্ট হয়ে ভাষাপথকে কিঞ্চিৎ সঙ্কীর্ণ করে তুলেছে; মাঝে মাঝে আসেন তারাশঙ্কর,

শীর্ণ চেহারা, অপ্রগল্‌ভ, কথা বললে ভূয়োদর্শন প্রকাশ পায় ; ওদিকে প্রেমেন্দ্র ও প্রমথ কোন গুরুতর সমস্যার সমাধানে প্রবৃত্ত হয়ে টেবিলে মেরেছে মুষ্ট্যাঘাত, সমস্যা যেমন তেমনি আছে, টেবিলের উপরকার পুরু কাঁচখানা শতখণ্ড হয়ে ভেঙে গিয়েছে ; আপিস পালিয়ে আসেন অরবিন্দ দত্ত, এসেই সেদিনকার প্রতিপক্ষকে বেছে নিয়ে পাশে বসেন ; আর এই তুমুল ও বিচিত্র কলরবের মধ্যে মিশরের যুগল পিরামিডের মতো অচল অটল নীরব সম্পাদক ও তাঁর সহকারী। এই হচ্ছে বঙ্গশ্রী আপিসের নিত্যকার চেহারা। প্রায় প্রত্যহ আসেন সুনীতিকুমার। গায়ে গরদের কোট, গরদের চাদর, মুখের মধ্যে চানাচুর ও গ্রীক কোটেশন। বলেন আগে মোড়ের দোকানটা থেকে কিনে খেতাম, এখন অনেক ছাত্র হয়ে গিয়েছে, সঙ্কোচ হয়। চানাচুরটা ঘরে ঢুকে সংগ্রহ করেছেন। বঙ্গশ্রী আপিসের একটি অলিখিত নিয়ম ছিল, কেউ কারো বয়স জিজ্ঞাসা করত না, কারণ সকলেরই বিশ্বাস সকলে আর সকলের চেয়ে ছোট। সুনীতিবাবু অবশ্য এ নিয়মের মধ্যে পড়েন না, তবু জিজ্ঞাসা করিনি, এখন হিসাব করে দেখছি ৪৪/৪৫-এর কম হবে না। হিসাব করতে গিয়ে চমকে উঠতে হয়। তখন নিজে ৪৫-এর কত নীচে ছিলাম আর আজ কত উপরে! "সে যে আজ হল কতকাল।" সেই সময়ে বঙ্গশ্রী আপিসের সাহিত্যিকদের চরিত্র-চিত্রণ করে লঘুকলমে যে কবিতাগুলো লিখেছিলাম তৎকালীন শনিবারের চিঠিতে বেরিয়েছিল। সুনীতিবাবুর সম্বন্ধেও লিখেছিলাম। এই উপলক্ষে সেটি পাঠককে উপহার দিতে ইচ্ছা করি।

'পুরাতন পঞ্জিকা'

বিশ্ববাণী বাসা বাঁধে কার ভিত্তি গায় ?
হিব্রু হতে হিন্দুস্থানী কোথা লটকায়
দেয়ালের আগাগোড়া। সংস্কৃতি-জেল
কাহার প্রাসাদ বল নবীন ব্যাবেল ?
ভাষাতত্ত্বে সেকেন্দার ভারতী-বাণীর
সুযোগ্য কে প্রতিনিধি ? কাহার গভীর
বচনের বাঁকে বাঁকে নবীন বিস্ময়
সুনীতিকুমার তিনি, অন্য কেহ নয়।
যাঁর সনে আলাপনে অর্ধঘণ্টা কাল
আপনারে মনে হয় নেহাৎ বাঙাল

কিংবা ইস্কুলের ছেলে ! গর্বমুক্ত মন
মূর্খতম পার্শ্বিকেরে গ্রীক কোটেশন
অসঙ্কোচে বলে যান। বিদ্যাভরপুর,
তবু কার ভাল লাগে ছোলা চানাচুর,
শাস্ত্র হতে এ জীবন বড় কাছে যাঁর
সুবিখ্যাত অধ্যাপক সুনীতিকুমার।

আমাদের দেশে মানুষের ব্যক্তিত্ব সবই কেমন এক ছাঁচে ঢালা, বৈচিত্র্য নেই। আবার গোড়াতে যেখানে বৈচিত্র্য দেখতে পাওয়া যায় শেষ পর্যন্ত তা বিকশিত হয়ে ওঠে না, কেমন যেন থমকে থেমে দাঁড়িয়ে যায়। এর একটা কারণ মানুষের ব্যক্তিত্বকে বাইরে থেকে যা গড়ে তুলতে সাহায্য করে সেই বৃহৎ জীবনস্রোত আমাদের দেশে ক্ষীণধারায় প্রবাহিত। গ্রামের চেয়ে জীবনস্রোত শহরে প্রবলতর। গ্রামের লোকের ব্যক্তিত্বের চেয়ে শহরের লোকের ব্যক্তিত্ব অধিকতর বিকশিত, বৈচিত্র্যও বেশি। আবার পাশ্চাত্ত্যের তুলনায় আমাদের দেশে জীবনস্রোত ক্ষীণতর। এ দেশে ব্যক্তিত্বের বৈচিত্র্য ও বিকাশ অপেক্ষাকৃত অপরিণত। ডিকেন্সের যে কোন উপন্যাস ও প্রায় সমসাময়িক বঙ্কিমচন্দ্রের যে কোন উপন্যাস পাশাপাশি রেখে তুলনা করলে প্রভেদটা বুঝতে পারা যাবে। বঙ্কিমচন্দ্রকে বিচিত্র মানুষের সন্ধানে দূরবর্তী কালের ইতিহাসে প্রবেশ করতে হয়েছে, ডিকেন্স ২।১ বার ছাড়া সে প্রয়োজন অনুভব করেন নি।

আমাদের দেশে যাঁরা যথার্থ বড়, যেমন বিদ্যাসাগর, মধুসূদন, কেশবচন্দ্র প্রভৃতিকে ছেড়ে দিয়ে অপেক্ষাকৃত নীচের ধাপে নেমে এলে দেখা যায় যে সমস্ত মানুষের ব্যক্তিত্ব নিতান্ত বৈশিষ্ট্য-বর্জিত। সৌভাগ্যক্রমে মাঝে মাঝে ব্যতিক্রম দেখতে পাওয়া যায়। সুনীতিকুমার সেই রকম একটি দুর্লভ ব্যতিক্রম। আর দশজনের সঙ্গে তাঁকে মিশিয়ে ফেলবার উপায় নেই। তাঁর চেহারা, কাপড়, পোশাক, চশমা, চলনবলন সমস্তই বিশিষ্টকে ঘোষণা করছে। আবার সেই সঙ্গে যদি তাঁর জ্ঞান ও বুদ্ধির চরিত্রকে ধরা যায় তবে তা আরও উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। তার উপরে আবার যখন দেখি যে তাঁর ব্যক্তিত্ব বয়সবিশেষ বা অবস্থাবিশেষে এসে থেমে যায় নি, বিকশিত হয়েই চলেছে, তখন বিস্ময়ের অন্ত থাকে না।

সুনীতিবাবুর সঙ্গে আমার দীর্ঘকালের পরিচয়। প্রথম একদফা তাঁকে দেখেছি শান্তিনিকেতন-বিশ্বভারতীর পরিবেশে। দ্বিতীয় দফা দেখেছি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে, বঙ্গশ্রী পত্রিকা ও শনিবারের চিঠির আড্ডায়। তৃতীয় দফায় দর্শন

এখনো চলছে। তাঁর সম্বন্ধে সবচেয়ে আমাকে যা আকর্ষণ করেছে তা হচ্ছে তাঁর ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্য ও বিকাশ। পাণ্ডিত্য তাঁর অগাধ ও বিচিত্রপথগামী ; এক্ষেত্রে তিনি প্রায় তুলনারহিত। কিন্তু তার চেয়েও বড় তাঁর সদাজাগ্রত মনের অসীম কৌতূহল ও জীবন সম্পর্কিত ভূয়োদর্শন। নানাদেশ ঘুরে নানারকম লোক ও সমাজ দেখে মানুষ সম্বন্ধে একটি নিরাসক্ত জ্ঞান তিনি অর্জন করেছেন। তাঁর মতো বিচক্ষণ Humanist বর্তমানে অল্পই আছে। অষ্টাদশ শতকে ইংলণ্ডে ও ফ্রান্সে অনেক মনীষীর মধ্যে এই শ্রেণীর মনশ্চরিত্র দেখতে পাওয়া যায়। লর্ড চেস্টারফিল্ড ইংলণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী ওয়ালপোলের পুত্র সাহিত্যিক ওয়ালপোল কিম্বা ফ্রান্সে যাঁরা Encyclopaedist নামে পরিচিত তাঁদের সঙ্গে সুনীতিকুমারের এ বিষয়ে সমতা! পোশাকী সর্বজনীনতার চর্চা অনেকেই করে। এঁদের সর্বজনীনতা বা Cosmopolitanism পোশাকী নয়, একেবারে অঙ্গীভূত। এঁরা দুশো বছর আগেকার লোক হলেও সুনীতিবাবুকে দেখবামাত্র বুঝতে পারতেন, পাশের যে কোন একটা Tavern-এ ঢুকে পড়ে ছোট একখানি টেবিলের চারপাশে বসে তৎকালীন Scandal ও চিরকালীন সত্যের মিশ্র আলাপনে নিমগ্ন হতেন। উনবিংশ শতকে এ ধারার পরিবর্তন ঘটল। উনবিংশ শতকের পণ্ডিত জগৎবিস্মৃত, অষ্টাদশ শতকের পণ্ডিত জগৎসচেতন। এই ভিন্ন দুই শ্রেণীর মনকে সুনিপুণভাবে চিত্রিত করেছেন আনাতোল ফ্রান্স, উনিশ শতকে জন্মেও যিনি মনে মনে অষ্টাদশ শতকের লোক! সুনীতিবাবুকে Humanism-এর পদবীতে পৌঁছে দিয়েছে তাঁর ব্যক্তিত্বের বেগ। আবার জগৎ সম্বন্ধে ভূয়োদর্শন সাহায্য করেছে তাঁর ব্যক্তিত্বকে বিকশিত হয়ে উঠতে। তাঁর ভূয়োদর্শন ও ব্যক্তিত্ব পরস্পরের আনুকুল্য করে যে মানুষটি গড়ে তুলেছে তার নাম সুনীতিকুমার।

মূর্ত জীবন্ত জিজ্ঞাসা

প্রেমেন্দ্র মিত্র

বিজ্ঞানের ছাত্র হিসেবে আমি অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েছি। আচার্য সুনীতিবাবুর কাছে পড়বার সৌভাগ্য তাই আমার হয় নি। তা না হলেও ছেলে বয়স থেকেই তাঁর সম্বন্ধে বিস্ময় সম্ভ্রম মেশানো একটা কৌতূহল আমার মনে গড়ে উঠেছিল।

আমার মনের যা গতিপ্রকৃতি তাতে ছেলে বয়সে তাঁর নামের সঙ্গে আমার পরিচয় হবার কথা নয়। কিন্তু সেই পরিচয়টাই হয়েছিল অপ্রত্যাশিত ভাবে সাহিত্যের সম্পর্কেই অন্য এক দিক থেকে।

স্কুলের গণ্ডি যখন পার হব হব করছি, সাহিত্যের জগতে একটি মাসিকপত্র তখন দারুণ সাড়া জাগিয়েছিল। পত্রিকাটির নাম যে 'সবুজপত্র' ছিল তা বোধ হয় বলবার দরকার নেই। বড়দের কাছ থেকে চেয়ে চিন্তে নিয়ে বুঝি না বুঝি সে মাসিকপত্রের সামনের থেকে পেছনের মলাট পর্যন্ত আগাগোড়া সমস্তই পড়তাম। লেখকদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ আর প্রমথ চৌধুরীই যেখানে প্রধান সেখানে আর একটি অজানা নাম কি করে আমার মনে যে লেগে গিয়েছিল সেইটেই আশ্চর্য। লেখকের নামটা লক্ষ্য করেছিলাম ৫-৬ বার লেখাটার জন্যেই অবশ্য। গল্প উপন্যাস কবিতা কি সাহিত্যের প্রবন্ধ নয় লেখাটি—আমাদের বাংলা দেশের বহু অদ্ভুত গ্রামের নাম নিয়ে। চেঙ্গাইল, বাউরিয়া, হাউর গোছের সব নামের আপন রহস্য কি তারই হদিস দিতে গিয়ে লেখক বলেছিলেন যে এসব নামের মধ্যে বাংলাদেশের আদি নৃতত্ত্ব ভাষাতত্ত্বের অনেক খেই লুকিয়ে আছে। সেই ছেলে বয়স থেকে রেল-পথে যেতে যেতে গুস্করা ভেদিয়া কি খ্যায়রাক মগরা ধরনের অদ্ভুত যে সব নাম আমার কাছে মজার লেগেছে সেগুলির তাৎপর্য যে কত তা বোঝাবার জন্যেই লেখা লেখকের নামটি মনে গাঁথা হয়ে গিয়েছিল।

সে লেখকের নাম সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।

শুধু একটা লেখা পড়েই যাঁর নামটা মনে করে রেখেছিলাম সেই মানুষের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও ঘনিষ্ঠ পরিচয় হল আরো প্রায় কুড়ি বছর বাদে। সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 'উপাসনা' কাগজটি তখন চরিত্র চেহারা ও নাম-পাল্টে 'বঙ্গশ্রী' হয়েছে। সম্পাদক সজনীকান্ত দাস। বঙ্গশ্রীর অফিস তখনকার ধর্মতলা স্ট্রীটের একটি বাড়ির দোতলায় কটি ঘরে। তার মধ্যে সম্পাদকের ঘরটি সাধারণ অফিস নয়,

একটি অবারিতদ্বার মজলিসখানা। অবারিতদ্বার সকলের জন্যে না হলেও বঙ্গশ্রী সম্পর্কিত সাহিত্য-জগতের তরুণ প্রবীণ কয়েকজন যখন খুশি সেখানে আড্ডা জমাতে পারেন। সে আড্ডার প্রধান একটি আকর্ষণ ছিলেন ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। কখন কবে হঠাৎ তিনি এসে হাজির হবেন তার কোনো ঠিক নেই। কিন্তু একবার এলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা একেবারে শিকড় গাড়িয়ে আমাদের বসিয়ে রাখতেন তাঁর অফুরন্ত রসাল আলাপচারিতায়। তাঁর সে আলাপে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের কোন্ বিষয় যে না থাকত তা বলা শক্ত। আর এমনি সরস তাঁর বলার ধরন আর ভাষা যে সাধারণ স্মৃতিচারণ ত বটেই জ্ঞানবিদ্যায় অতি দুরূহ কঠিন তত্ত্বও আমাদের মত শ্রোতারও দাঁতভাঙা কিছু না হয়ে উপাদেয় মধুর হয়ে উঠত।

তাঁর বিদ্যা আর পাণ্ডিত্যের খ্যাতি তখনই পৃথিবীজোড়া। কিন্তু আমাদের সঙ্গে বসে যেন সমান দরের সমবয়সীর মত আলাপ চালিয়ে যেতেন।

বঙ্গশ্রীর সেই মজলিসে সুনীতিকুমারকেই শুধু নতুন দিক থেকে আবিষ্কার করি নি, সত্যকার বৈদগ্ধ্য আর পাণ্ডিত্য যে কি বস্তু তার প্রথম আভাস পেয়েছিলাম,—এক পাণ্ডিত্য আছে যা শুষ্ক তথ্যের নিষ্প্রাণ সংগ্রহের বেশী কিছু নয়। কিন্তু জ্ঞান বিদ্যা আর পাণ্ডিত্য যে কি উদ্বেল উত্তেজনার ব্যাপার হতে পারে সুনীতিবাবুর মত মানুষের সান্নিধ্যে আসবার সৌভাগ্য না হলে তা জানা যায় না। সুনীতিবাবু ছিলেন যেন সাক্ষাৎ মূর্ত জীবন্ত এক জিজ্ঞাসার শিখা। যেখান দিয়ে যখন যাচ্ছেন চির সজাগ আছেন সন্ধানী শিখা হিসাবে। খুঁজতে খুঁজতে যাওয়াই তাঁর জীবন, যা পাচ্ছেন তাও ছড়িয়ে দিয়ে যাচ্ছেন আশ্চর্য এক সমৃদ্ধ মনের দীপ্তি হিসেবে।

সুনীতিকুমারের প্রথম লেখা পড়ে যখন কৌতূহলী হয়েছিলাম তখন তাঁর বয়স ত্রিশে পৌঁছয় নি। তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয়ের সৌভাগ্য যখন হয়েছিল তখন তিনি পঞ্চাশের কাছে। সেদিন তাঁকে যা দেখেছিলাম সাতাশী বছর বয়সেও তাঁর সই আসল মূল চেহারা-চরিত্রের কোনো তফাৎ হয়েছিল কি? বিন্দুমাত্র না। সেই অক্লান্ত অবিরাম জ্বলন্ত জাগ্রত জিজ্ঞাসা। যে কোনো বিষয়ের একটু খেই পেলেই হল। অনর্গল বয়ে আসবে তাঁর অসামান্য মনের বিদ্যুৎদীপ্তি-বিচ্ছুরিত আলোচনার ধারা। বাইরে থেকে শুনলে যা দাঁড়ায় সেই সাতাশী বছর বয়সটা তাঁর নিতান্ত ছিল মিথ্যে। নিত্যজাগ্রত জ্বলন্ত জিজ্ঞাসা হিসেবে তাঁর যৌবন ছিল অক্ষয় ও অফুরন্ত।

আচার্য সুনীতিকুমার

অন্নদাশঙ্কর রায়

সুনীতিকুমারকে আমি প্রথম আবিষ্কার করি বাল্যকালে 'প্রবাসী'র পৃষ্ঠায়। যত দূর মনে পড়ে প্রথম পৃষ্ঠায়। বর্ষপঞ্জী বা সেই জাতীয় একটি গ্রন্থের ভূমিকা লিখেছিলেন তিনি। ভূমিকাটি 'প্রবাসী'তেও প্রকাশিত হয়েছিল। সে এক বিরাট প্রবন্ধ। তথ্যবহুল, যুক্তিপূর্ণ অথচ চিত্তাকর্ষক। তার আগে আর কোথাও তাঁর আর কোন রচনা পড়ি নি। প্রথম দর্শনেই শ্রদ্ধা। তার পরে তিনি আবার কোথায় নিরুদ্দেশ হয়ে যান। বিদেশ থেকে উচ্চতর শিক্ষা লাভ করে তিনি এদেশের একজন গণ্যমান্য অধ্যাপক হন। কিন্তু যে বিষয়ের অধ্যাপক হন সে বিষয় আমার অধীতব্য নয়।

একবার শান্তিনিকেতনে গেছি। সেইখানেই তাঁকে প্রথম দেখি। যতদূর মনে পড়ে সেটা বোধহয় জাভা যাত্রার প্রাক্কালে। ফিরে এসে তিনি সুদীর্ঘ ভ্রমণ-বৃত্তান্ত লেখেন। কিছুই তাঁর দৃষ্টি বা শ্রুতি এড়ায় না। রবীন্দ্রনাথও লিখেছিলেন। কিন্তু তাঁর সেটা সৃষ্টিধর্মী। আমরা কবির বর্ণনা পড়ে মুগ্ধ হই। আর বিদ্বানের বিবরণ পড়ে জ্ঞান লাভ করি।

সুনীতিবাবুর সঙ্গে আমার মুখোমুখি আলাপ যত দূর মনে পড়ে সর্বপ্রথম ঘটে রাজশাহী জেলার নওগাঁ শহরের পাবলিক লাইব্রেরীর একটি অনুষ্ঠানে। সুনীতিবাবুকে কলকাতা থেকে আমন্ত্রণ করে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। আর আমি তো সেই সময় ও জেলার ম্যাজিস্ট্রেট। আরও আগে ছিলুম নওগাঁর মহকুমা-ম্যাজিস্ট্রেট। আমরা দুজনে মেঝের উপর পাশাপাশি বসে ছিলুম। তিনিও ভাষণ দেন, আমিও ভাষণ দিই। তারপর অন্যান্যদের বক্তব্য শুনি। অন্যমনস্ক ভাবে কখন এক সময় আমাদের দুজনের মাথা ঠোকাঠুকি হয়ে যায়। বাপ রে! সে কী নিরেট মাথা! ব্যথা সহ্য করি।

সুনীতিবাবুর সঙ্গে অন্তরালে কিঞ্চিৎ ভাষাতাত্ত্বিক আলোচনা হয়েছিল। তিনি আমার প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেন। সেইবার কি অন্য কোন বার তিনি বলেছিলেন যে, মুখোপাধ্যায়, বন্দ্যোপাধ্যায়, চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি পদবীগুলি দুই শতাব্দীর বেশী পুরাতন নয়। মুখার্জি, ব্যানার্জি, চ্যাটার্জি তো বৃটিশ আমলের। পূর্বে কী ছিল, তিনি সেকথাও আমাকে বলেছিলেন। চল্লিশ বছর পরে মনে আসছে না।

আবার কবে তাঁর সঙ্গে আলাপ হয় ও কোথায় তা ভুলে গিয়েছি। শুধু মনে আছে তিনি বলেছিলেন, 'ইলিয়াড ও অডিসি পড়েন নি? আপনার জন্যে চমৎকার একটি ভোজ অপেক্ষা করছে। হোমারের ভূয়সী প্রশংসা করেন। আরেকবার বলেন, 'কাব্য হিসাবে কোরান অতি অপূর্ব। আরবী সাহিত্যের পরম ঐশ্বর্য।' তিনি যে কেবল দেশ-বিদেশের ভাষা চর্চা করতেন তা নয়, সাহিত্য চর্চাও করতেন। আর ধর্ম সম্বন্ধে তাঁর সমান ঔদার্য ছিল। একবার তাঁর বাড়িতে গিয়ে সাক্ষাৎ করি। তখন তিনি আমাকে ভিতরে নিয়ে গিয়ে দেখান দেয়ালে উৎকীর্ণ রয়েছে বিভিন্ন ধর্মের বাণী। বিভিন্ন ভাষায় ও লিপিতে। বাড়িটির নামও 'সুধর্মা।'

শুনেছি কিছু দিনের জন্যে তিনি হিন্দু মহাসভার প্রভাবে উগ্র হিন্দু হয়েছিলেন। সেটা বোধহয় মুসলিম লীগের উপদ্রবের প্রতিক্রিয়া। দেশ ভাগের পর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় নিরাপদ হয়। তিনিও নিরাপদ। আমি তো পরে তাঁর কথাবার্তায় উগ্র হিন্দু মানসিকতার লক্ষণ লক্ষ্য করি নি। তিনি ছিলেন রবীন্দ্র-নাথের একান্ত অনুরক্ত ভক্ত। সুতরাং বিচ্যুতি যদি ঘটে থাকে তবে সেটা সাময়িক। কিছু দিন তিনি হিন্দী নিয়েও মেতেছিলেন। হিন্দীপ্রেমী বলে হিন্দী-ভাষী মহলে তাঁর যে দীর্ঘ দিনের পরিচয়, সেটিকেও তিনি মূল্যবান মনে করতেন।

শুনেছি ভারতীয় সংবিধানের যে বাংলা অনুবাদ হয় সেটি নাকি দেবনাগরী লিপিতে মুদ্রিত হয় ও তার জন্যে দায়ী নাকি সুনীতিকুমার। এ নিয়ে কখনো তাঁর সঙ্গে মোকাবিলা হয় নি। তবে একবার তিনি আমাকে বলেছিলেন, 'বাংলা-ভাষা নাগরী লিপিতে লিখিত হবে আমি এর বিরোধী। কারণ তা হলে পূর্ববঙ্গের সঙ্গে আমাদের সাহিত্যিক বিচ্ছেদ ঘটে যাবে। এসব প্রশ্নে তিনি ও আমি ছিলুম এক পালকের পাখি। তাই আমাদের বনত ভালো। ওপারের মুসলমানদের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি টান যতই তীব্র হয় ওদের প্রতি সুনীতিবাবুর টানও তেমনি তীব্র। তখন ধর্মের ব্যবধান কোথায় মিলিয়ে যায়। ওরা ওঁকে সাদরে নিমন্ত্রণ করে ঢাকায় নিয়ে যায়। পনেরো দিন ধরে গেস্ট হাউসে থেকে তিনি নাকি একদিন ফরমাশ করতেন মোগলাই খানা, একদিন ইউরোপীয় খানা, একদিন চাইনিজ খানা, একদিন বাংলাদেশী খানা।

তাঁর ফিরে আসার কিছুদিন পরে আমাদেরও ডাক পড়ে। সেই গেস্ট হাউসেই উঠি। সেই খানসামা বলে, চ্যাটার্জি সাহেবকে যেমন খাইয়েছি আপনাদেরও তেমনি খাওয়াব, যেদিন যেমনটি চান।'

সুনীতিবাবুর সর্ব ভোজ্যে সমান অনুরাগও তাঁর চরিত্রের একটি বৈশিষ্ট্য।

তা না হলে কি তিনি সব দেশ দেখতে চাইতেন, সুযোগ পেলেই বেড়াতে বেরোতেন ? সাত সমুদ্র তেরো নদীর পারে রূপকথার মন্ত্রীপুত্রের মতো তাঁর যাত্রা। তেমনি, ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে তাঁর গতি। সর্বত্র বিদ্বান বলে তাঁর অভ্যর্থনা। ভারতের সাহিত্য একাডেমির তিনিই সর্বপ্রথম বেসরকারী নির্বাচিত সভাপতি। ভাষাঘটিত বিরোধে তাঁর রায়ই ছিল অধিকাংশের কাছে মান্য। কোংকনী কি স্বতন্ত্র একটি ভাষা, না মারাঠীর অন্যতম উপভাষা, এই বহু-বিতর্কিত প্রশ্নে তাঁর অভিমত ছিল কোংকনীর স্বাতন্ত্র্যের পক্ষে। এই প্রসঙ্গে আমি তাঁকে টেলিফোন করলে তিনি বলেন, প্রতিবেশী দুটি ভাষার বেলা যে ভুলটা করেছিলেন একশো বছর আগে বাংলার পক্ষের কয়েকজন, সেই ভুলটাই করছেন মারাঠীর পক্ষের পণ্ডিতগণ।

কোংকনীকে সাহিত্য একাডেমি স্বতন্ত্র একটি ভাষা বলে স্বীকার করে নিয়েছে। মরাঠীর অস্বতন্ত্র দাবী অগ্রাহ্য হয়েছে। সুনীতিবাবুর পরিচালনায় সাহিত্য একাডেমির স্বীকৃত ভাষার তালিকা বেশ বেড়ে গেছে। রাজস্থানী, মণিপুরী, ডোগরি এখন আর উপভাষা নয়। যেখানে ভাষার সংখ্যা বাইশে দাঁড়িয়েছে সেখানে সুনীতিবাবুর মতো একজন বহুভাষাবিদের সভাপতিত্ব অবশ্য প্রয়োজনীয়। তাঁর অবর্তমানে যিনি সভাপতি হবেন তিনি কখনো তাঁর শূন্যতা পূরণ করতে সমর্থ হবেন না। এ ক্ষতি অপূরণীয়। সেইজন্যে সুনীতিবাবু একটা টার্ম শেষ করার পরও আর একটি টার্ম ভোগ করছিলেন। আরো কয়েক মাস বাকী ছিল। এই বয়সেও তাঁর যাতায়াতে বিরাম ছিল না। তবে বাঙ্গালোরে গত এপ্রিল মাসে যে বিশেষ অনুষ্ঠান হয় তাতে তিনি যোগ দেন নি। অসুস্থ ছিলেন।

আমার কলকাতার বাসায় একদিন সুনীতিকুমারের পদার্পণ আমাকে চমৎকৃত করে। সঙ্গে রবীউদ্দীন আহমদ। তাঁরা একটা ইন্দো-ইতালিয়ান সোসাইটি স্থাপন করেছিলেন। তার নামের জন্যে একটা মনোগ্রাম দরকার। তাঁদের নকসার খসড়াটা তাঁরা আমাকে দেখান ও আমার অভিমত জানতে চান! এসব দিকেও সুনীতিবাবুর আগ্রহ ছিল। তাঁর বাড়িতে গেলেও দেখতে বলতেন তাঁর শিল্প-সংগ্রহ। শেষের বার দেখা করতে যাই আমার পুত্রকে নিয়ে। সে তার লেখা একখানি বই উপহার দেয়। বিদায় দেবার সময় নিয়ে যান সেই ঘরে যে ঘরে ছিল উত্তরবঙ্গের একটি প্রাচীন বিষ্ণুমূর্তি। অনেক অর্থব্যয় করে সেখান থেকে আনিয়েছিলেন। তাকে যত্ন করে রাখার জন্যে একটি পাদপীঠ নির্মাণেও বহু অর্থ ব্যয় হয়েছিল। মনে হলো, সুনীতিবাবু কেবল শিল্পরসিক নন, ধর্মজিজ্ঞাসু। তাঁর ধর্ম-জিজ্ঞাসার আর একটি দৃষ্টান্ত রবীউদ্দীনের সঙ্গে মিলিত হয়ে দারা শিকোহ্

রামমোহন সমিতি প্রতিষ্ঠা ও সেই উপলক্ষে রবীউদ্দীনের সঙ্গে তারকেশ্বরের ওদিকে এক দুর্গম গ্রামে যাত্রা। পথের বর্ণনা শুনে আমি নিরস্ত হই, কিন্তু পরে যখন আহার্যের বর্ণনা শুনি, তখন ধর্মজিজ্ঞাসার চেয়ে রসজিজ্ঞাসা বা রসনাজিজ্ঞাসা প্রবল হয়ে ওঠে।

প্রাচীন সংস্কৃতের মতো প্রাচীন গ্রীকেও সুনীতিবাবুর প্রভূত আগ্রহ ছিল। তিনি ছিলেন আর্যভাষামাত্রেরই অনুরাগী। আর্যরা একটি জাতিগোষ্ঠী নয়, একটি ভাষাগোষ্ঠী। এটাই বিংশ শতাব্দীর সুধীজনের মত। সুনীতিকুমারেরও। এই ভাষাগোষ্ঠীর শ্রেষ্ঠ কাব্যকীর্তি ইলিয়াড অডিসি, তথা রামায়ণ মহাভারত। কিন্তু কাব্য আর ইতিহাস এক জিনিস নয়। যেমন উপন্যাস আর ইতিহাস এক জিনিস নয়। যেমন নাটক আর ইতিহাস এক জিনিস নয়। ইলিয়াডের ঐতিহাসিকতা নিয়ে যদি সংশয় থাকে তবে রামায়ণের বেলাও সংশয় থাকা বিচিত্র নয়। অকারণ নয়। পরবর্তীকালে রামায়ণকে বৈষ্ণবেরা তাঁদের ধর্মগ্রন্থ ও রামকে তাঁদের উপাস্য অবতারে পরিণত করেছেন। তা বলে পরবর্তীকালের সিদ্ধান্তকে পূর্ববর্তীকালে ঐতিহাসিক সত্যে পরিণত করা যায় কি? পুরাতত্ত্ব চর্চা করলে গ্রীকের সঙ্গে সংস্কৃতর কেবল ভাষাগত সদৃশ্য নয়, ভাবগত সাদৃশ্যও পাওয়া যায়। কাহিনীগুলো ধারণাগুলো তত্ত্বগুলো কে যে কার কাছ থেকে নিয়েছে সেটা এতকাল পরে জোর করে বলা শক্ত। কিন্তু নেওয়া যেখানে চলে, দেওয়াও সেখানে চলে। যেমন বাণিজ্যে। গ্রীকরা যদি ভারতীয়দের কাছ থেকে নিয়ে থাকে তবে ভারতীয়রাও গ্রীকদের কাছ থেকে নিয়েছে। সুনীতিবাবুর বক্তব্য প্রমাণিত না হলেও অযৌক্তিক নয়। এর দরুন তাঁকে শেষ বয়সে সাহসের সঙ্গে লড়তে হয়েছে। এই সংস্কারমুক্ত পৌরুষের সামনে মাথা আপনি নত হয়।

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়

ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমার শেষ দেখা হয় গত ২৮শে এপ্রিল ১৯৭৭ তারিখে। সেদিন রামকৃষ্ণ মিশন ইন্সটিটিউট অব কালচারের কার্যনির্বাহক সমিতির অধিবেশন ছিল। তিনি তার অন্যতম সহসভাপতি। আমরা উভয়েই সেদিন সেই সভায় উপস্থিত ছিলাম। সভার শেষে তিনি আমার কুশল প্রশ্ন করার পর আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম তিনি কেমন আছেন। তিনি উত্তরে বললেন তাঁর চোখের ছানি তাঁকে কষ্ট দিচ্ছে; শীঘ্রই তার শল্য চিকিৎসার ব্যবস্থা করবেন।

তারপর হঠাৎ ২৯শে মে তারিখের সন্ধ্যা ছ'টার সংবাদে ঘোষিত হল যে তিনি হঠাৎ হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে পরলোকগমন করেছেন। শুনে অত্যন্ত মর্মাহত হয়েছিলাম। এ শোক শুধু জাতির নয়, আমার ব্যক্তিগত শোকও বটে। কারণ, কয়েক বছর হল তাঁর স্নেহ আকর্ষণ করবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। আর এর একটি কারণ ছিল। তিনি যেমন স্বাস্থ্যোজ্জ্বল শরীর নিয়ে আশি বৎসর অতিক্রম করবার পরও তরুণের উৎসাহ নিয়ে ঘুরে বেড়াতেন, তাতে মনে হয়েছিল তিনি প্রাচীন ঋষিদের আদর্শে শতায়ু হয়ে জন্মগ্রহণ করেছেন। তাঁরা বলতেন কুর্বন্নেবেহ কর্মাণি জিজীবিষেৎ শতং সমাঃ'। তাঁর এ জীবনের আদর্শ ছিল তাই। সুতরাং হঠাৎ আশির কোঠায় তার পরিসমাপ্তি একান্তই অপ্রত্যাশিত ছিল।

ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় সৌজন্যমূলক আচরণের জন্য বিশেষভাবে খ্যাত ছিলেন। শুনেছি তিনি ছাত্রদেরও 'তুমি' বলে সম্বোধন করতেন না। শুনেছি তিনি পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম নেওয়া এড়িয়ে যেতেন। কিন্তু আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হতে জেনেছি, তাঁর সৌজন্যের তুলনা হয় না। ব্যাপারটি এখানে সংক্ষেপে বলা যেতে পারে। একদিন সকালে হঠাৎ তিনি আমাকে ফোনে ডাকলেন। ফোন ধরতেই বললেন, "আপনার কাছে ক্ষমা চাইছি।" পরস্পর কথার মধ্য দিয়ে তাঁর এই উক্তির কারণ যা জানা গেল তা হল এই : কোনও এক বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্মসংক্রান্ত অভিজ্ঞতা সম্পর্কে গবেষণার একটি পরিকল্পনা গৃহীত হয়। তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হয়। এই প্রসঙ্গে তাঁর কাছে এমন কিছু মানুষের নাম চাওয়া হয় যাঁরা বিশ্ববিদ্যালয়টির কার্যের নৈতিক সমর্থন দিতে প্রস্তুত আছেন।

সেই প্রসঙ্গে তিনি আমার নামও পাঠাতে উপদেশ দেন ; তবে যাঁদের ওপর এই তালিকা পাঠাবার ভার ছিল তাঁদের বলেছিলেন আমার সম্মতি নিয়ে যেন আমার নাম পাঠান হয়। পরে তিনি জানতে পেরেছিলেন আমাকে জিজ্ঞাসা না করেই তাঁরা আমার নাম পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। তাই তিনি নিজে অত্যন্ত লজ্জিত বোধ করেছিলেন এবং সেই কারণেই ক্ষমা প্রার্থনা। আমি এই বিষয় কিছুই জানতাম না। আমি তাঁকে বলেছিলাম এ বিষয়ে তিনি যেন ক্ষোভ না রাখেন ; যা হয়ে গেছে তা হয়ে গেছে। বলা বাহুল্য, তাঁর এই আচরণে আমি মুগ্ধ ও অভিভূত হয়েছিলাম। এত তীক্ষ্ণ সৌজন্যবোধ কজনের থাকে ?

অনেকেই হয়ত জানেন ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের শিল্পচর্চায় বিশেষ অনুরাগ ছিল। তাঁর আচরণে শুধু তা প্রকাশ পেত না, তাঁর নানা ভাষণেও এ বিষয় তাঁর মন্তব্য পাওয়া যায়। একটি এই প্রসঙ্গে উদ্ধৃত করা যেতে পারে। প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মিলনের পঞ্চদশ অধিবেশনে প্রদত্ত এক ভাষণে তিনি বলেছিলেন : "জগতে নিসর্গজাত বস্তুর পরেই মানুষের হাতের শিল্প রচনাকে ভগবানের সত্তার এবং তাহাতে নিহিত শাশ্বত সৌন্দর্যের অংশস্বরূপ বলা যায়।...সৎ বা উচ্চকোটির শিল্প আমার কাছে আধ্যাত্মিক অনুভূতির আভাস আনয়ন করে।" এতে বোঝা যায় তিনি শিল্পের প্রতি কি গভীর অনুরাগ পোষণ করতেন।

রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয় যখন প্রথম স্থাপিত হয়, তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের যে মূল সমিতি (সিনেটের সম-স্থানীয়) গঠিত হয়, তিনি তার সভ্য ছিলেন। সেই সূত্রে তিনি এই নবীন বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজকর্মে বিশেষ অনুরাগ প্রকাশ করে আমাদের উৎসাহ দিতেন। আমাদের কোন অনুষ্ঠানে তাঁকে নিমন্ত্রণ করলে তিনি আসতেন এবং ছাত্রছাত্রীদের নৃত্য বা অভিনয় দেখে যেতেন।

বেশ মনে পড়ে, একবার এই রকম একটি নৃত্যানুষ্ঠানে তিনি নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে এসেছিলেন। প্রথমেই ছিল ভরতনাট্যম-এর একটি নৃত্য। মনে হল, দেখে তাঁর খুব ভাল লাগে নি। মূল কারণ, এ নৃত্য কেবল দেহভঙ্গির নৃত্য ; তা ভাব বহন করে না। আমি তাঁকে বলেছিলাম ভরত মুনি দু রকম নৃত্যের কথা বলেছেন : একটি 'নৃত্ত', অপরটি 'নৃত্য'। নৃত্ত বলতে বুঝি বিমূর্ত নৃত্য ; অর্থাৎ এখানে নানা অঙ্গভঙ্গির সুষ্ঠু সমাবেশের মধ্য দিয়েই শিল্প গড়ার চেষ্টা হয়। আর নৃত্য হল অভিনয় ; সেখানে অঙ্গভঙ্গির সাহায্যে কাহিনী বলা হয়। তিনি যা দেখলেন তা নৃত্ত শ্রেণীর নৃত্য। বোঝা গেল, তিনি বিমূর্ত নৃত্যের প্রতি বিশেষ আকর্ষণ অনুভব করেন না। তার পরে এই একটা কারণ তিনি বললেন যে এ নৃত্যে মেয়েরা কাছা

দিয়ে কাপড় পরে এবং তা তাঁর কাছে দৃষ্টিকটু লাগে। এটা রুচির কথা। কাজেই এ বিষয়ে কিছু বলবার নাই।

এই প্রসঙ্গেই রবীন্দ্রনাথ প্রবর্তিত নৃত্যরীতির কথা উত্থাপিত হয়েছিল। তিনি তার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেন। তিনি বলেছিলেন, এমন উচ্চমানের নৃত্যরীতি তিনি পৃথিবীর কোথাও দেখেন নি। তাঁর এই মন্তব্যের বিশেষ মূল্য আছে। কারণ প্রথমত, তাঁর মত সমগ্র পৃথিবী ঘুরে সব দেখবার সুযোগ আর কেউ পেয়েছেন বলে মনে হয় না। দ্বিতীয়ত, শিল্পতত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁর প্রচুর অভিজ্ঞতা ছিল। তিনি ঠিকই বলেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ প্রবর্তিত নৃত্যে 'ব্যালে'তে যা পাই বা 'অপেরা'তে যা পাই তার অধিক পাই। এখানে ভাব যেন সুর ও অঙ্গভঙ্গি রূপ দুইটি ডানায় ভর করে এমন মনোরম ভঙ্গি করে উড়ে চলে যে রসিক অভিভূত না হয়ে পারে না। তিনি যে কতবড় শিল্পরসিক ছিলেন, তাঁর এই মন্তব্য হতে তা বোঝা যায়।

সমন্বয়ী জ্ঞান

অমলেন্দু বসু

স্নীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় যে কালে ভাষাতত্ত্বের স্বল্পজ্ঞাত, দুর্গম পথে যাত্রা করেছিলেন তখন ভারতবর্ষের কম বিদ্বানই এই পথ সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল ছিলেন। বস্তুত তুলনাত্মক ভাষাশাস্ত্র তখন শাস্ত্র হিসাবে ছিল নবীন শাস্ত্র, মাত্র উনিশ শতক থেকে ইয়োরোপে এই শাস্ত্রের রীতিমতো চর্চা শুরু হয়েছিল। আমাদের দেশে আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সর্বধাত্রী কল্পনায় এই নবীন শাস্ত্রের প্রয়োজনীয়তা ও মূল্য আদৃত হয়েছিল এবং এদেশে যাঁরা এই নবীন শাস্ত্রের চর্চায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য হলেন স্নীতিকুমার। তিনি যে কালে এই শাস্ত্রের অধ্যয়ন শুরু করেছিলেন তখন পর্যন্ত (বস্তুত পক্ষে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আজ পর্যন্ত) একে বলা হত কমপ্যারেটিভ ফিললজি। এই অধ্যয়নের রীতি ছিল diachronic, অর্থাৎ ভাষার ক্রমবিকাশের কালপর্যায়ী স্তরগুলির ইতিহাস-সমীক্ষা। কোন শব্দ পহ্লবী ভাষা থেকে বৈদিক সংস্কৃতে, সেখান থেকে কালিদাসী সংস্কৃতে, সেখান থেকে প্রাকৃত অপভ্রংশে এবং ক্রমে উত্তর ভারতীয় আধুনিক ভাষাগুলিতে রূপায়িত হল; কী করে একটি পথিক শব্দ লিথুয়ানিয়া-ল্যাটভিয়া-এসটোনিয়ার প্রাচীন বাক্‌বিধি থেকে প্রাচীন নরোয়েজীয় ভাষা থেকে হাই জার্মান, সেখান থেকে ক্রমে ক্রমে ওলড ইংলিশ, সেখান থেকে আধুনিক ইংলিশে রূপায়িত হল—এই মনোমুগ্ধকর ইতিহাস ছিল এই diachronic অধ্যয়নের লক্ষ্য। কিন্তু এই শতাব্দীর প্রথম দিকে যখন কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের জনকয়েক মনীষী মিলে লজিক্যাল পজিটিভিজম নামে এক নূতন চিন্তাপদ্ধতি প্রচার করলেন, যখন এই চিন্তাপদ্ধতির পরিপ্রেক্ষিতে উইটগেনস্টাইন প্রশ্ন তুললেন ভাষার চরিত্র ও কর্ম সম্বন্ধে, যখন এইসব চিন্তায় উদ্বুদ্ধ হয়ে শতাব্দীর তৃতীয় দশকে (যে কালে স্নীতিকুমার বিদেশ থেকে ফিরেছেন) ঐ কেমব্রিজেরই দুই মেধাবী বিদ্বান বই লিখলেন, যে-বইয়ের শিরোনামাতেই তার সন্ধানলক্ষ্য প্রকট হয়েছে—দ্য মীনিং অব মীনিং—তার পর থেকে আজকের চম্‌স্কি অবধি ভাষাতাত্ত্বিকেরা ভাষার ইতিবৃত্তের দিকে তেমন না গিয়ে diachronic আলোচনা কিছু দূরে সরিয়ে, বর্তমান কালের synchronic ভাষাচরিত্র নিয়ে আলোচনায় লিপ্ত হলেন। এই আলোচনায় স্নীতিকুমার কোনো স্বকীয়তার নিদর্শন রাখেন নি, কেন না এই synchronic linguistics-এর

চিন্তা প্রচলিত হবার পূর্বেই তাঁর বহুধাত্রী মনস্বিতা অন্যান্য পথে চলতে শুরু করেছিল। বাঙলা ভাষার অতুলনীয় ইতিবৃত্তকার ছিলেন সুনীতিকুমার, তুলনীয় ইতিবৃত্ত রচিত হয়েছে পৃথিবীর খুব স্বল্পসংখ্যক ভাষা নিয়েই এবং সে জন্যই সুনীতিকুমারের চির-উজ্জ্বল খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা। এ-সম্পর্কে আমার একটি অভিজ্ঞতা আছে। বিশ বছর আগে আমি মাস চারেকের জন্য ইংল্যাণ্ডে গিয়েছিলাম কিছু বক্তৃতা দেওয়ার আহ্বান রক্ষার্থে। সে উপলক্ষ্যে লীডস্ বিশ্ববিদ্যালয়ে কয়েকদিন ছিলাম এবং এক রাত্রে আমার সহপাঠী বন্ধু নর্ম্যান জেফার্সের গৃহে উইলসন নাইট ও অধ্যাপক মিচেলের সঙ্গে কিছু আলোচনা প্রসঙ্গে মিচেল (মিচেল সে সময় অতীব খ্যাতিসম্পন্ন ভাষাতাত্ত্বিক) বলে উঠলেন, I can't understand why Indians should come over to England to learn Linguistics. Their country produced Panini and today Dr. Chatterjee is their countryman. পাণিনি সম্বন্ধে এহেন শ্রদ্ধান্বিত উক্তি আমি পূর্বেও শুনেছিলাম, কিন্তু (কবুল করব) সুনীতিকুমার সম্বন্ধে শোনার সুযোগ ঘটে নি। সেদিন মিচেলের কথা শুনে সুনীতিকুমারের ভক্ত হিসাবে স্বভাবতই আমার গভীর আনন্দ হয়েছিল।

সুনীতি চট্টোপাধ্যায়ের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হলেই আমরা ভাষাতত্ত্বের কথা মনে করি। আমার এই সামান্য প্রবন্ধটির প্রথম স্তবকটিতেও আমি ভাষাতত্ত্বেরই কথা বলেছি। কিন্তু আমার দৃঢ় ধারণা যে সুনীতিকুমারের দুর্বার মেধা ভাষাতত্ত্ব নামক একটি মাত্র বিষয়ের সীমিত গণ্ডিতে আবদ্ধ থাকে নি ; নিজেকে ছড়িয়েছে দিগ্বিদিকে ; ছড়িয়েছে কত অসংখ্য আপাত-অসম্বন্ধ চিন্তায়, তথ্যে, অভিজ্ঞতায় ; এক শতাব্দী থেকে অন্যে, এক মানব-সম্প্রদায় থেকে অন্য সম্প্রদায়ে, এক শিল্প থেকে অন্য শিল্পে, এই দুর্বার মেধা আপনাকে ছড়িয়েছে অনায়াসে উচ্ছল আগ্রহে। বিদ্যার, অভিজ্ঞতার, যুক্তির ও তথ্যের কোনো প্রদেশই সুনীতিকুমারের সদাগ্রাহী মেধায় পরিবর্জিত হয় নি। ইংল্যাণ্ডের রেনেসাঁস যুগের ফ্রানসিস বেকন বলেছিলেন, I have taken all knowledge for my province, এবং প্রাচীন ভারত-কাহিনীর রূপক আমাদের বলেছে যে অগস্ত্য মুনি এক গণ্ডুষে সমুদ্রের জল নিঃশেষে পান করেছিলেন। এই সর্বগ্রাহিতা হচ্ছে রেনেসাঁস প্রকৃতির মৌল গুণ। জ্ঞানের প্রসার হতে হতে অবশ্য এমন এক সময় আসে যখন জ্ঞানবস্তুগুলির মধ্যে তারতম্য করতে হয়, কিন্তু কোনো বস্তুই অপাংক্তেয় হয় না।

আজকের সমাজে ক-জনার আদর্শ এই উক্তিতে উদ্বুদ্ধ—I have taken all

knowledge for my province? বর্তমান যুগ প্রতীচী পাণ্ডিত্যের মাপকাঠিতে হয়েছে Specialisation-এর যুগ, বিশেষীকরণের যুগ [শব্দটি আমি তৈরি করলাম সংস্কৃত রচনায় প্রচলিত 'সাধারণীকরণ' শব্দটির পদাঙ্ক অনুসরণে। শব্দটি অপছন্দ হলে পাঠক মার্জনা করবেন]। আজকাল বলা হয় যে বিদ্যা এত প্রচণ্ড বেগে বাড়ছে, প্রসারিত হচ্ছে, সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর হচ্ছে যে all knowledge তো দূর স্থান, একটি মাত্র জ্ঞান-শাখার, এমন কি সেই একটি মাত্র জ্ঞান-শাখার একাধিক প্রশাখাগুলির হদিশ রাখা কোনো বিদ্বানের পক্ষেই সম্ভব নয়। ফল দাঁড়িয়েছে অনেকটা সেই মধ্যযুগীয় ন্যায়শাস্ত্রোক্ত অন্ধের হস্তিদর্শনের মতো। আরিস্টটল-এর পক্ষে সম্ভব হয়েছিল তদানীন্তন বিদ্যাগুলির সব কয়টিরই আলোচনা করা। আমাদের বেদ গ্রন্থেও কাব্যের সঙ্গে, পরমার্থ চিন্তার সঙ্গে মিশে আছে সে যুগের কৃষি বিদ্যা, চিকিৎসা বিদ্যা, লোকশাসন বিদ্যা, সমাজ-সংগঠন বিদ্যা। ইয়োরোপের ষোল শতকে যে আত্মিক পুনর্জাগরণ হল তার প্রধান কথাই হল সমগ্র বিশ্বেই বিদ্যার সমন্বিত মীড়। আঠারো শতকের ফরাসী পণ্ডিতদের এই জন্যই বলা হয় এনসাইক্লোপিডিসট, বিশ্বকোষধর্মী। সেই বিশ্বকোষধর্ম বাঙলাদেশেও এসেছিল উনিশ শতকের শুরুতে—রামমোহন রায়, অক্ষয় দত্ত, বিদ্যাসাগর প্রমুখ মনস্বী ব্যক্তিদের কর্মে ও জীবনে। বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাস লিখেছিলেন (কয়েক প্রকারের উপন্যাস), বাঙলাদেশের ইকনমিকস নিয়ে লিখেছিলেন, আর্নেস্ট রেনাঁর মতো মানবিক মাপকাঠিতে কৃষ্ণ চরিত্রের ব্যাখ্যা করেছিলেন। উনিশ শতকে বাঙলার মনীষায় ছিল এই সর্বস্পর্শিতা সর্বাস্তিবাদ। কোনো মনীষী একটি বিন্দুতে আপনাকে আবদ্ধ রাখেন নি, বহুদিকে আপনার অদম্য ঔৎসুক্য ও জ্ঞানার্জন শক্তি ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। জ্ঞানের জগতে কোনো প্রাদেশিকতা নেই, গণ্ডি নেই, কোনো স্পর্শকাতর সীমানা-চেতনা নেই, বরং "বিশাল বিশ্ব আমারে ডাকিছে" এহেন সর্বব্যাপী স্পৃহায় জ্ঞানান্বেষীর ব্যক্তিত্ব নিয়ত উদ্বুদ্ধ হয়ে থাকে।

সেই সর্বব্যাপী জ্ঞানস্পৃহায় উদ্বুদ্ধ ছিল সুনীতি চট্টোপাধ্যায়ের ব্যক্তিত্ব। আমার বিনীত বিচারে সুনীতিকুমারের ভাষাশাস্ত্র-পারঙ্গমতার চেয়েও উজ্জ্বলতর শক্তি ছিল তাঁর উদার প্রশস্ত সার্বিক ঔৎসুক্য। আর, কে না জানে যে ঔৎসুক্যেই জ্ঞানের বীজ। সুনীতিকুমার যখন কথা বলতে শুরু করতেন তখন তাঁর কথা কোনো সংকীর্ণ বিষয়ে সীমাবদ্ধ থাকত না। শ্রোতার পক্ষে অপ্রত্যাশিত ও বিস্ময়কর সমন্বয়ী ভঙ্গিতে এক জ্ঞানক্ষেত্র থেকে অন্য জ্ঞানক্ষেত্রে চলে যেত। ইতিহাস, দর্শন, নৃতত্ত্ব, সমাজব্যবস্থা, সাহিত্য, নানাবিধ শিল্প, লৌকিক আচার ও প্রত্যয়, বিভিন্ন

ধর্মব্যবস্থা, শিক্ষাব্যবস্থা, কোনো বিষয়েই তাঁর অনাগ্রহ ছিল না—I have taken all knowledge for my province, বরং আগ্রহ ছিল উদার ও গভীর।

যে সীমাহীন জ্ঞানস্পৃহা ছিল প্রাচীন ভারতের ও প্রাচীন গ্রীসের বৈশিষ্ট্য, যে সীমাহীন জ্ঞানস্পৃহা ষোড়শ শতকী ইয়োরোপীয় মেধার প্রধান গুণ হয়েছিল এবং সেই শতক থেকে উপচে পড়েছিল আঠারো শতকী ফ্রান্স দেশে, যে-সর্বভুক জ্ঞান-স্পৃহা উনিশ শতকী বাঙলাদেশেও এসেছিল বৈশ্বানরের মতো, সেই বহুগ্রাহী জ্ঞানের অজস্র নিদর্শন আমরা পেয়েছি সুনীতিকুমারের 'দ্বীপময় ভারত' গ্রন্থে, তাঁর ইংরেজি প্রবন্ধ গ্রন্থে, এবং (সব চেয়ে বেশি) তাঁর সতেজ বৈঠকী আলাপনে। বর্তমান যুগের বিশেষীকরণের পরিপ্রেক্ষিতে সুনীতিকুমারের সমন্বয়ী জ্ঞানশক্তি মানুষের মেধা সম্বন্ধে আমাদের শ্রদ্ধা ও প্রত্যয় বাড়ায়।

বন্দীর বন্ধু

গোপাল হালদার

দপ্তরখানার হিসাবে আমার প্রথম বারের বন্দী জীবন আরম্ভ হয় ২৯শে এপ্রিল, ১৯৩২-এ, আর শেষ হয় ৭ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৮-এ। তখন ব্রিটিশ সরকারের কাল, তবু কালগণনায় সামান্য একটু ফাঁক আছে, ফাঁকিও আছে। দপ্তরখানা থেকে হুকুমনামা ঐ ঐ তারিখেই বেরিয়ে থাকবে। কিন্তু তার পূর্বে আমাকে থানার হাজতে অকারণে 'বোমার আসামী' নাম করে প্রায় রাত্রি দিন আবদ্ধ রাখা হয়েছিল দিন পাঁচেক, আর শেষে মুক্তির হুকুমনামা পেতে আমার দেরি হয়েছিল আরও দিন চারেক। পুলিশের হিসাবে এগুলো ধর্তব্য নয়। আমি রাজদ্বারে আচার্য সুনীতিকুমারের যে দিকটির পরিচয় লাভ করেছি সে সময়ে, পরে আমার বন্ধু মহাদেবজীও জেলে সুনীতিকুমারের সেই অকপট চরিত্র-সম্পদের প্রকাশ দেখেন —ব্রিটিশ আমলে যা বাধা মানে নি স্বাধীনতার আমলেও তা অক্ষুণ্ণই ছিল। বন্দীর জন্যই সুনীতিকুমারের বন্ধুত্ব। মহাদেবজীর বা আমার রাজনৈতিক মতামতের দূরত্ব তার কিছুমাত্র অন্তরায় হয় নি।

১৯৩০-এর পর্বে আমি ছিলাম অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের নিকট ভাষাতত্ত্বের গবেষণার ছাত্র। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনি প্রথমাবধি (১৯২২) ভারতীয় ভাষাতত্ত্ব ও ধ্বনিবিজ্ঞানের খয়রা অধ্যাপক; সেই অধ্যাপকের গবেষণা-সহকারীরূপে আমি তাঁরই অনুমোদনে গবেষক নিযুক্ত হই ১৯৩০-এর মধ্যভাগে। বলতে বাধ্য এ কর্মে যা তিনি আশা করেছিলেন আমি তখন তা পূরণ করতে পারি নি। সে ত্রুটি সম্পূর্ণই আমার, আমার আবাল্য প্রকৃতির। ত্রিশের সেই দিনগুলিতে একদিকে দেশজোড়া আইন অমান্য আন্দোলন অন্যদিকে স্বাধীনতাকামী বিপ্লবী আন্দোলনের যে জোয়ার নেমে আসে আমার সাধ্য ছিল না তার থেকে দূরে থাকি,—গবেষণা-কর্মই তাই পিছনে পড়ে রইল। সুনীতিবাবু তাতে দুঃখিত হলেও আমাকে নিবৃত্ত করতে চান নি। চান নি বলেই হিজলীর হত্যাকাণ্ডের পরে একদিন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যেতেই আমাকে জোর করে ধরে নিয়ে চললেন কবি সকাশে। বাড়ির সামনে দেখা হতেই বললেন, "আমার সঙ্গে কবির এখনি সাক্ষাৎ স্থির হয়ে আছে। হিজলীর ঘটনায় কবি বিশেষ মর্মাহত— এখনি চলুন, যা তাঁর জানার ইচ্ছা তাঁকে জানাবেন।" কোনো আপত্তি শুনলেন

না সুনীতিবাবু। আমার খদ্দরের ধুতি পাঞ্জাবী দু দিন পরা—পরিচ্ছন্ন নয়। ভাবনা-চিন্তারও অবকাশ নেই। কোনো আপত্তিই টিঁকতে দিলেন না। 'বিচিত্রা ভবনে'র দোতলার দক্ষিণ-পূর্ব প্রকোষ্ঠে কবির সঙ্গে একান্তে বসে দুজনার 'বিশ্ব-ভারতী'র পরিচালনা সম্পর্কিত নির্দিষ্ট আলোচনা হল। শেষ হতেই অধ্যাপক আমাকে আবার দেখিয়ে কবিকে বললেন—"হিজলীর পরে বিদ্রোহী-পন্থা সম্বন্ধে কিছু জানতে চাইলে এঁকে জিজ্ঞাসা করতে পারেন।" তার পরেকার পনেরো মিনিট আমার জীবনের অক্ষয় সম্পদ—তার রূপান্তরিত বাণী-রূপই আমার চোখে মাস কয় পরে বকসা ক্যাম্পে প্রস্ফুটিত হয় কবির 'প্রশ্ন'-এ।

যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু, নিভাইছে তব আলো,
তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছ, তুমি কি বেসেছ ভালো?

হয়তো এ আমার কল্পনা, কিন্তু সে কল্পনার উদ্ভব ও লালনের সুযোগ আমাকে দান করেছিলেন বন্দীর বন্ধু অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।

অনতিকাল পরেই আমার বন্দীদশা আরম্ভ হল; পূর্বেই বলেছি দপ্তরখানার হিসাবে ২৭শে এপ্রিল ১৯৩২ সালে। জেলের বাইরের মানুষ ও পৃথিবীর সঙ্গে আমার যোগাযোগ প্রায় রুদ্ধ হল—খান দুই-তিন নিষ্প্রাণ সংবাদপত্র মাত্র 'Censored and Passed' হয়ে পৌঁছাতে পারত। নিতান্ত আত্মীয়রা পুলিশের 'Censored and Passed' হয়ে আত্মীয় বলে স্বীকার্য হয়, তাদের পক্ষে মাঝে মধ্যে বাঁধা ধরা সময়ে ও নিয়মে আমার সাক্ষাৎলাভ অনুমোদিত হতে পারে। অবশ্য কলকাতার বাইরে বন্দীশালায় প্রেরিত হলে আত্মীয়দেরও সেরূপ সাক্ষাৎ দুঃসাধ্য—প্রায় অসাধ্য হত বলা যায়। আইনত সুনীতিবাবু আমার 'আত্মীয়' পর্যায়ে পড়েন না যদিও আমাদের সমস্ত পরিবারেরই তিনি তখন আপনার, কিন্তু দপ্তরের গণনায় আমার সঙ্গে সাক্ষাতের অনুমোদন লাভের অযোগ্য। তিনি কিন্তু এ গণনা মেনে নিলেন না। আমি তাঁর অধীনে গবেষণা করি; সে কর্মে তাঁর উপদেশ আমার প্রয়োজন—এই যুক্তি দেখিয়ে তিনি নিজেও সাক্ষাতের অনুমতি প্রার্থনা করলেন; আর সে চেষ্টায় কর্তৃপক্ষের নিকট স্বয়ং উপস্থিত হলেন। আমি বুঝতাম ফললাভের আশা কম, কিন্তু তিনি তাতে পরাজয় মানলেন না। প্রথমে আদায় করলেন গবেষণা-কর্মে আমাকে সাহায্য করার জন্য পত্র আদান-প্রদানের অধিকার। সেই সময়েই অনুমতি লাভ করলেন—গবেষণা-কর্মে প্রয়োজনীয় পুস্তকাদি পাঠিয়ে বন্দী অবস্থায় আমাকে গবেষণায় সাহায্য করবার সুযোগ। এই অনুমতি আদায় হতে-না-হতেই অবশ্য প্রচুর বইপত্র আমার জন্য 'Censored

and Passed' হবার জন্য জেল-ফটকে জমা পড়ল, তবে তা আমরা হাতে পৌঁছবার দিন কয়েকের মধ্যেই আমি কলকাতার বাইরে প্রেরিত হলাম—দেখা-সাক্ষাতের সম্বন্ধে 'হাঁ' বা 'না' কোনো উত্তরলাভের প্রয়োজনও তখন ফুরলো। তবে বইগুলি আমার সঙ্গে চলল বক্সা বন্দীশালায়, আর তার পিছনে এসেছিল সুনীতিকুমারের চিঠিপত্র—সে সব বই ও অন্যান্য বই যা পড়া উচিত সে সম্বন্ধে তাঁর পরামর্শ।

বইপত্র ও চিঠিপত্র—ঐ দুই সূত্রে প্রায় প্রথম থেকেই সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় আমার সম্মুখে জেলখানার বাইরের পৃথিবীর পথ উন্মুক্ত করে রাখলেন—সেই রুদ্ধ প্রাঙ্গণের মধ্যে 'Censored and Passed' চিহ্নিত সেই পত্রগুলির মারফত জীবনের অজস্র ছোট বড ঘটনার আলোক-রেখা বিচ্ছুরিত হয়ে পড়ত, ব্রিটিশের বন্দীব্যবস্থা বিধাতার 'আলোক ও আকাশ' ও মানুষের বহমান জীবন-স্রোত কোনো কিছু থেকেই আমাকে তাই বিচ্ছিন্ন রাখতে পারে নি। অভ্যস্ত জীবনযাত্রা থেকে বঞ্চিত হলে বন্দীর মনে স্বাভাবিকভাবেই উৎকণ্ঠা জাগে—আত্মীয়-বন্ধুদের মঙ্গলা-মঙ্গল সম্বন্ধে—'কে কেমন আছে কি জানি।' আমি মুখে না বললেও সুনীতিবাবু চিঠিপত্রে কখনো এ সত্য বিস্মৃত হতেন না—ব্যক্তিগত ও পরিবারগত সে সব কথা চিঠিতে যথেষ্ট থাকত। সেই সঙ্গে আরও বেশি থাকত সুনীতিকুমারের বিপুল পাণ্ডিত্য ও জীবন-দৃষ্টির স্বচ্ছন্দ দান—নানা তথ্য, সংবাদ, মন্তব্য ও আলোচনা। নীড়ের মমতা ও আকাশের স্বপ্নের মধ্যে তাঁর মন কোনো দুস্তর প্রভেদ কখনো মানত না ; তাঁর মৌখিক আলাপনের মতোই তাঁর চিঠিপত্রও ছিল অবারিত এক কৌতুকভরা আনন্দ-উৎসব। যা পড়তে পড়তে মনে হত সেই সুকিয়াস রো-তে তাঁর (তখনকার) গৃহে বসে সেই আনন্দ-ধারায় অবগাহন করছি। আর, কিছু দিনের মতো মনে হত—'Stone walls do not a prison make / Nor iron bars a cage—" যখন বৃহৎ পৃথিবী ও কর্মচঞ্চল মানব-জগতের সঙ্গে আমার সম্পর্ক এখনো অচ্ছেদ্য। আমাকে দেহ-মনে ও রূপে সজীব রাখা ছিল এই চিঠিগুলির প্রধান এক উদ্দেশ্য। সব অসামান্য এই লিপিশিল্প। সার্থক সুনীতি-কুমারকে দেওয়া রবীন্দ্রনাথের নাম—শিল্পবাচস্পতি—বাতায়নের পথেও বিশ্বকে যিনি এনে পৌঁছান গৃহাভ্যন্তরে।

বেশি চিঠি লেখা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না, কিন্তু লিখতে বসলে সময়ের স্বল্পতার কথা মনে ঠাঁই পেত না,—তা স্পষ্ট। একবার রন্ধন-বিদ্যার দুখানা বাঙলা বইএর তুলনা করে তিনি বলেছিলেন—"১নং বই খানার সব যেন অতিরিক্ত রকমের মাত্রা

বাঁধা, 'এক ছটাক ছানা নাও। দু চামচ ঘী' ইত্যাদি। আর দু নম্বর বই থানায় সবই মুক্ত হস্তে: 'দু মন ছানা ল্যাও, দশ সের ঘী'—ইত্যাদি। পড়তেই মন ভরে উঠবে—Here's God's plenty।" হোটেলে খেতে খেতে বলতেন, "generous helping-এর অভাব থাকলে সুখাদ্যও সম্পূর্ণ উপভোগ্য হয় না।" এই generous helping ছিল তাঁর স্বভাবধর্ম—উদার, অকুণ্ঠ। চিঠিপত্রেও তা স্বাভাবিকভাবেই আসত, আমার বিশেষ অবস্থা বিবেচনায় একটু বিশেষ করেই তিনি তার ব্যবস্থা করতেন—যখনি সময় পেতেন।

চিঠিপত্রের সুযোগ সবসময় লভ্য হবে না বুঝেই তিনি নিজ থেকে আর একটা আয়োজনও করেছিলেন। "গবেষণায় আবশ্যক", এই যুক্তিতে তিনি তাঁর নিজের লেখা প্রবন্ধাদির একটি করে off-print বরাবর আমাকে প্রেরণ করতেন, বিশেষ কর্মস্রোতের সম্বন্ধে আমাকে অবহিত রাখতেন। সেই যুক্তিতে প্রথমেই পাঠালেন আমার পাঠের জন্য তাঁর নিজের গ্রন্থাগারের একরাশি বই, সেই সঙ্গে আমারও ঘরের একগাদা বই ও খাতাপত্র। নাম শুনলেই বোঝা যায় কতটা তা ভাষাতত্ত্বের গবেষণার জন্য, কতটা 'সাহিত্যে;'র জন্য—সাহিত্যের মূলগত অর্থে; যে অর্থে—সাহিত্য হচ্ছে জগৎ ও জীবনের সঙ্গে পাঠকের সাহচর্য-সাধন। মানুষের শ্রেষ্ঠ চিন্তা ও ভাবনার মধ্যে সেই বাধ্যতামূলক নিষ্ক্রিয় জীবনাংশটি সরস আনন্দে ও গভীরতায় সঞ্জীবিত থাক্, উজ্জীবিত হোক্, পুলিশের বন্ধনকে ব্যর্থ করে ফুটে উঠুক মুক্তির স্ফূর্তি—এই ছিল তাঁর আসল কামনা। তাঁর নিজের ভাণ্ডার থেকে আমি তখন পেয়েছিলাম—বঙ্গবাসী সংস্করণ রামায়ণ (বাঙলা অনুবাদ সহ), সমগ্র 'মহাভারত' প্রেরণ করা সম্ভব হয় নি, সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয়ের যে কয় খণ্ড প্রকাশিত হয়েছিল আমিও তার গ্রাহক ছিলাম, বাকিটা কিনে কিনে নেব, এই ছিল পরামর্শ), ইংরেজি গদ্য অনুবাদে তাঁর 'ইলিয়াড' ও 'অডিসি' পেয়েছিলাম, আমার নিজের সংগ্রহ ছিল ঈস্কাইলুস ও সফোক্লিসের কিছু নাটক (অনুবাদে), প্লেটোর সক্রেটিসের বিচার ও মৃত্যু, সমগ্র শেকসপীয়র, সানুবাদ কালিদাস, সমগ্র বাইবেল (বিশেষ করে প্রাচীন কথা)। সমগ্র আরব্য উপন্যাস (বার্টনের ইংরেজি অনুবাদে) ও ফিরদৌসি তিনি পড়তে বলেছিলেন, সম্ভব হয় নি, পাঠ্য বিবেচিত হলেও আমার দুর্লভ থেকে গিয়েছিল। এসব চিরায়ত সাহিত্যে আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের ছিল চিরদিনই রুচি—তিনি জগতের শ্রেষ্ঠ পুস্তকের মধ্যে এ সময়েই (১৩৪০, এই উপলক্ষে কি ?) যে তালিকা রচনা করেছিলেন তাতে দেখতে পাই এসব গ্রন্থকে তিনি অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন; আমাকেও পাঠিয়েছিলেন

ওরূপ গ্রন্থের এক তালিকা। বলা প্রয়োজন—শুধু প্রাচীন মহাগ্রন্থেই সে তালিকা নিবদ্ধ ছিল না; তাঁর প্রেরিত গ্রন্থের মধ্যে একালের বইও ছিল। শুধু রবীন্দ্রসাহিত্যও নয় (তখনো 'রচনাবলী' প্রকাশিত হয় নি, ঘরে ছিল ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউসের 'কাব্যগ্রন্থাবলী', জেলে আমার সহায় ছিল 'চয়নিকা', 'সঞ্চয়িতা', 'গল্পগুচ্ছ', কিছু গদ্য রচনা ও তৎকালীন ১৯৩১এর পরে প্রকাশিত, নবপ্রকাশিত উপন্যাস, নাটক ও কবিতার গ্রন্থ। সুনীতিবাবু দিয়েছিলেন—তাঁর প্রিয় একখানা সরস ছোট গল্পের বই—ও হেনরির সমগ্র ছোট-গল্প-সংগ্রহ। স্বচ্ছন্দ অবসর বিনোদনের গ্রন্থে তাঁর বিশেষ রুচি ছিল—অবশ্য সাহিত্যের মাত্রায় যা গ্রাহ্য এমন গল্পের বই-ই গ্রাহ্য, যেমন পরশুরামের গল্প। আর সেসব আমাকেও পড়তে বলেছিলেন—টনিক হিসাবেও ও সবের বিশেষ মূল্য আছে, বিশেষতঃ জেলখানায়। আমার পক্ষে যেমন লিঙ্গুইস্টিক সার্ভে অব ইণ্ডিয়া-র পঞ্চম খণ্ড (প্রাচ্য মণ্ডলের বাঙলা ভাষা প্রভৃতির কথা), 'ও ডি বি এল' (বাঙলা ভাষার উৎপত্তি ও উন্নতির কথা) যেমন হবে 'must', নিত্যসঙ্গী, তেমনি সময়মত লাভ হত সুনীতিবাবুর লিখিত গবেষণা-নিবন্ধের অফ-প্রিণ্ট Roman Script for India, Recourses in New Indo Aryan প্রভৃতি লেখা (আমার নিজের লেখা 'নোয়াখালির উপভাষার ধ্বনিমালা' 'ব্যাকরণ-সার' পুস্তিকা দুটি আমার গ্রেপ্তারের পূর্বেই মুদ্রণার্থে গৃহীত হয়েছিল, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেস থেকে মুদ্রিত হয়ে তা আমার হাতে আসে অনেক পরে, বক্সা বন্দীশালায়)। ভাষাতত্ত্বের বই ছাড়া আরও কিছু বই অনুরূপ গবেষণার জন্য সুনীতিবাবুর উপদেশানুসারে পূর্বে কেনা ছিল।—এভরিম্যান্ সিরিজের রোমান্স কয়খানি French Mediaeval Romances, Arthurian Romances, The Fall of the Nibelungs প্রভৃতি (আমাদের নলদময়ন্তী, উদয়ন-বাসবদত্তা থেকে কালকেতু, শ্রীমন্ত ফুল্লরা প্রভৃতি কাহিনীগুলি পরীক্ষা করা চলে কি?) এখানে এ বইগুলি প্রথম যথার্থ পড়া হল। পড়া হল আরও অনেক বই—পূর্বসঞ্চিত বই বা সদ্য-সংগৃহীত গ্রন্থ—জেলের ভাতা থেকে ক্রীত ও তখনকার ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরি থেকে প্রেরিত। বার্টনের আরব্য রজনী না পেলেও পেয়েছিলাম 'ডাউটি'র বেরোইয়া ডিব্যাটা—ভিন্নরসের বস্তু—তবে আরব-জীবনের। সে সব কথা এখানে আলোচ্য নয়, তবে বলা উচিত যা পড়েছি তা বিস্মৃত হতে আমার দেরি হয় নি। যে পড়া থেকে উপকৃত হবার কথা, মানসিক খোরাক পেয়েছি নিশ্চয়, কিন্তু কার্যত আমি তা ফলপ্রসূ করে তুলতে পারি নি। যখন বুঝলাম মুদ্রণ অসাধ্য বা দুঃসাধ্য সাধনা,

তখন আর ভাষাতত্ত্বের গবেষণায় আমার উৎসাহ রইল না। তাই 'বিক্রমপুরের উপভাষা' পাণ্ডুলিপিতেই সমাধিপ্রাপ্ত, 'পূর্ব বাঙলার উপভাষা সমূহের তুলনামূলক ব্যাকরণ সার'-ও দেশে বিদেশে ঘুরে ঘুরে এখন সে পথেরই যাত্রী। শুনেছিলাম আই-সি-এস কর্তৃপক্ষ স্নীতিকুমারকে সৌজন্য দেখালেও বক্রোক্তি করতেও ছাড়েন নি—আপনি বলছেন হালদার আপনার কাছে গবেষণায় নিযুক্ত ছিলেন, আমাদের রেকর্ড বলে—সে অন্যরকম কাজেই ছিল ব্যস্ত। শুনে আমার ভালো লাগে নি। দেখা হলে বলেছিলাম,—আপনাকে ওরূপ কথা ওরা শোনায়—এ আমার ভালো লাগে না। তিনি মৃদু হেসে বললেন, সে আমি বুঝব—আপনার ভাবতে হবে না। তবু বন্দী দিনগুলি একেবারে বন্ধ্যা দিনরাত্রিতে পরিণত হয় নি—মুক্ত আকাশের আলোকে, মনস্বীদের ভাবনার ছায়ায় ও কৌতুকে রসোপভোগের আনন্দে সে বৎসরগুলি যে পার হয়ে এলাম তা বন্দীশালার ভেতরের বহু সঙ্গীর সেবায় ও সাহচর্যে; বাইরের এরূপ কিছু বন্ধুর নিরবচ্ছিন্ন বন্ধুকৃত্যে—আচার্য স্নীতিকুমারের মত 'বন্দীর বন্ধু' আর কেউ ছিলেন কিনা জানি না, কিন্তু এমন অযাচিত বন্ধুকৃত্য বোধহয় আর কেউ এমন নিরবচ্ছিন্নভাবে করতে পারেন নি, করার সুযোগও আয়ত্ত করতে পারতেন না।

সে সুযোগ আয়ত্ত করেছিলেন স্নীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় নিজের চেষ্টায়—শুধু বই পাঠানো ও চিঠিপত্র লেখাতেই তিনি সন্তুষ্ট থাকলেন না। বৎসরাধিক বক্সা বন্দীশালায় থেকে আমি আলীপুরের প্রেসিডেন্সি জেলে চিকিৎসার্থে দুবার আনীত হই। ১৯৩৩এর আগস্ট মাসে ও ১৯৩৬এর সেপ্টেম্বরে—দুবারই বেশ কিছুদিন ছিলামও। সে সময়ে স্নীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বেশ দৌড়োদৌড়ি করে সংগ্রহ করলেন আমার সঙ্গে সাক্ষাতের অনুমোদন—গবেষণার কাজে সহায়তা চাই। গোয়েন্দা-বিভাগের কর্মচারীর উপস্থিতিতে মাসে এক-আধবার জেলখানার কক্ষে আধঘণ্টা করে সাক্ষাৎ হত—মুখোমুখি দেখা হত, কথা হত, আর সে কথায় থাকত তাঁর গল্প-আলাপের চিরদিনকার ঐশ্বর্য—সাময়িক ও অসাময়িক অজস্র বিষয়ে তাঁর কথা যেন ফুরোত না,—ঘটনার বিবরণ, চরিত্রের রেখাচিত্র, দু-টানে আঁকা রূপরেখায় রূপরেখায় মিনিটে মিনিটে এক চিত্রশালার দ্বার খুলে দিতেন, থরে থরে সাজানো ছবি, নক্‌সা, কার্টুন সামনে দিয়ে আমাদের এগিয়ে নিয়ে চলতেন—সে সাক্ষাতে ভাষাতত্ত্বই থাকত কম। থাকত সাহিত্য, সংস্কৃতি, সঙ্গীত, শিল্পকলা, ইতিহাসের নতুন সূচনা, পুরাতন রচনা, গবেষণার নতুন আকাশ নৃতত্ত্ব-জাতিতত্ত্ব, দেশীয় ও বিদেশীয় পুরাতত্ত্ব, লোকযানের বিচিত্র প্রেরণা, মেক্সিকোর মত মিশ্র জাতির সভ্যতার নব-

চেতনা, আফ্রিকার নিগ্রো শিল্পের সৌন্দর্য ও তাৎপর্য, চীনা দেবদেবীর কাহিনী, আবার সেই সঙ্গেই আমাদের চণ্ডীদাস-সমস্যা, রাষ্ট্রভাষার প্রশ্ন, রোমক লিপির পরিকল্পনা, আরও কত কথা শুনতে পেতাম—বিষয়ের শেষ নেই, তাঁর ঔৎসুক্যের নেই অন্ত, জিজ্ঞাসাময় আলোচনায় নেই বিন্দুমাত্রও ক্লান্তি বা ক্ষান্তি। সেরূপই অপূর্ব আলাপের রীতি ও পদ্ধতি—অনাড়ম্বর চল্‌তি ভাষার মধ্য দিয়ে বাঙলার খাঁটি ইডিয়ম, (বাক্‌ধারা), প্রবাদ অনায়াসে ঠিকরে ঠিকরে পড়ছে প্রতি মুহূর্তে,—কলকাতার প্রান্ত ছোঁয়া ভাগীরথীর ঢেউ-এর চড়ায় ছড়িয়ে পড়া সূর্যের করজাল যেন ঝিলিক দিত মুহূর্তে মুহূর্তে—Pure Bengali Undefiled যা 'হুতোমে' 'আলালেও' সুস্থ হয়ে উঠতে পারে নি, বঙ্কিম-হরপ্রসাদে পরিশ্রুত হয়ে তারই নাতি-সচেতন উদার পরিবেশন। ঘরে-বাইরে দেশে-বিদেশে স্বচ্ছন্দগতি আলাপ-আলোচনায় মনখোলা সানন্দ গল্পে-আড্ডায়, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়কে আমরা সকলে চিরদিন দেখেছি—তিনি এ কালের একজন শ্রেষ্ঠ আলাপ-শিল্পী, Conversationalist, নিঃসন্দেহে জেলখানার পুলিশের পাহারা-দেওয়া পরিধিতে দেখতাম তাঁর অম্লান রূপ, বিষয়ের অজস্রতার মতই বাক্‌রীতিরও অনবদ্যতা, বাগ-ভঙ্গির অব্যাহত অভিনবত্ব—প্রসন্ন মুখ, স্মিত ওষ্ঠদ্বয়ে সর্বক্ষণ কৌতুকের হাস্যরেখা কখনো সহজ রঙ্গে, কখনো ঈর্ষাবিক্ষোভহীন ব্যঙ্গে, কখনো বুদ্ধিশুভ্র wit-এর স্পর্শে, বা দেশীয় বিদেশীয় কোনো উক্তির উদ্ধৃতি, কোনো মনস্বী মহাজনের কাহিনীর ইঙ্গিত দিয়ে, কোনো লোক-প্রবচনের সরস প্রয়োগে তা স্বতঃ-উৎসারিত। আমাদের বন্ধুবান্ধবের কাজ-কর্ম, অশন-বসন, গতিবিধির সংবাদে আমার আগ্রহ থাকত। দূর ও নিকট তাদের সকলের কথাই তিনি জানতেন, তাও তাঁর কৌতুকস্পর্শে সজীব হয়ে উঠত। কোনো জিনিসে তিক্ততা নেই, কারও ওপর malice নেই, কারুর কাজে অনুমোদন না থাকলেও তার প্রতি কোনো বিরাগ নেই, সকলের প্রতি সহৃদয়তা, হয়তো স্নিগ্ধতা, অন্তত সুস্থ সহনশীলতা, আর সব কথায় কৌতুকশুভ্র হাসি—যে হাসি মানুষকে মানুষ হিসাবে গ্রহণ করে, তার সমস্ত ভুলভ্রান্তি আর ভালোমন্দ শুদ্ধ মিলিয়ে বুঝে নেয়, বিচার করে না, স্বীকার করে নেয়, সবটা জানলে সবই মার্জনা করতে হয়, To know all is to forgive all, মানুষ সম্বন্ধে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের স্বভাবগত দৃষ্টি যেন এই শেকসপীয়রীয় কৌতুকবোধে সঞ্জীবিত ও সম্মার্জিত মনে হত। সে কলহের এখন মানুষের ও কত সমসাময়িক ঘটনার কথাই তিনি নিজের থেকে কৌতুক-সরস কথায় জীবন্ত করে তুলতেন—সেই স্বল্প সময়ের মধ্যে : রামকৃষ্ণদেবের শতবার্ষিকীতে

কি কি হয়েছে, প্রেসিডেন্ট হয়ে এসেছিলেন ইয়ংহাসবেণ্ড সেই মধ্যএশিয়ায় অভিযান শেষে, ইম্পিরিয়ালিজম ও স্পিরিচুয়ালিজম্‌-এ ওরা একটা মিল করে নিতে জানে। মিশন থেকে উদ্যোগ হচ্ছে ভারতীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের বিবরণ প্রকাশের—নানা বিশেষজ্ঞ সম্মেলিত রচনার সংগ্রহ (Symposium) কয়েক খণ্ড লাগবে। হলে একটা ভালো কাজ হবে। শরৎচন্দ্রের সম্বর্ধনার প্রথম দিনটি কি করে পণ্ড হয়ে গেল—আমিও জানালাম বকসায়, আমাদের ও সম্পর্কের আয়োজনও আংশিক পণ্ড হয়। বকসার বন্দীরা 'বন্দী মানুষের বন্ধু' বলে শরৎচন্দ্রের জন্য যে অভিনন্দন-পত্র রচনা করে তাঁকে প্রেরণ করে, গোয়েন্দা-বিভাগ তা 'Censored & Passed' করলে না। শরৎচন্দ্র পেলেন না। রবীন্দ্রনাথের সত্তর বৎসরের জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষে প্রেরিত বন্দীদের অভিনন্দন গোয়েন্দার সেই দেউড়ি পার হয়ে কবির হাতে পৌছায়, সেই বন্দনাপত্র ও কবির প্রতিবেদন আশীর্বাদের মতই ছাপা হয় কিন্তু দেশের জীবন থেকে বন্দীদের বিচ্ছিন্ন ও বিস্মৃত করে রাখা কর্তৃপক্ষের উদ্দেশ্য। ওভাবে তা ব্যর্থ হলে পুলিশের ব্যর্থতা প্রমাণিত হয়। তাই শরৎচন্দ্রের বেলা ওরূপ ভুল আর তারা ঘটতে দেয় নি। কিন্তু বড় ফাঁক বন্ধ করলেও ছোট ফাঁক থেকে যেতে পারে সেই পুলিশ প্রাচীরে। Even Homer nods—পাহারাদাররাও সর্বদ্রষ্টা নয়। রবীন্দ্র মৈত্রের (দিবাকর শর্মার) অকাল বিয়োগে শনিবারের চিঠি তাঁর সম্বন্ধে বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করেছে ও তাতে আমার লেখা Censored & Passed মার্কা শোকজ্ঞাপক পত্র বন্ধুরা ছেপে দিয়েছেন, শুনলাম। তাহলে বেরিয়ে গিয়েছে খড়খড়ির পাখির ফাঁক দিয়ে এক আধ ছিটে আলো। আর যাবে না—পাখিটা আরও সাঁটতে হবে; অথবা খড়খড়িটা তুলে দিয়ে ইটে তা গাঁথলেই হবে। অবশ্য ভিতটাই যদি ধসে যায় তাহলে আর উপায় নেই। হাসিতে সহজ কথায় সুনীতিবাবুর সঙ্গে সাক্ষাতে এমন হাজার কথা উঠত—যার একাংশও আমার মনে নেই। হয়তো মনে রাখবার মতো কথা সেসব নয়। বিশেষ পরিস্থিতিতে যে তা মূল্যবান, একজন চোখ-বাঁধা মানুষকে পৃথিবীর আলো বাতাস ও স্বাভাবিক জীবনযাত্রার আভাস সে সব কথা পৌছে দিত—দিত তাকে ছোট বড় ঘটনাময় মানববাসের আস্বাদন। দু চার সপ্তাহের মত তা দিত মনপ্রাণের সজীবতা। আমার স্মৃতি সঞ্চিত করে রাখতে পারে নি, কিন্তু মন তাতে সঞ্জীবিত হয়ে রয়েছে। তাঁর অসামান্য পর্যবেক্ষণ-শক্তিতে ঘটনার ছোট ছোট টুকরাগুলিও চোখে থাকত স্পষ্ট, অথচ মূল অর্থ টার সঙ্গে আবার সংযুক্ত হয়ে অর্থপূর্ণ। অবশ্য সব ঘটনা-বৈচিত্র্য অপেক্ষাও মানুষই ছিল তাঁর আসল বিষয়। আর পরিচিত

অপরিচিত, বন্ধু অন্তরঙ্গ সকলকেই তিনি তাঁর দু এক কথায় আমার চোখের সামনে ফুটিয়ে তুলতেন। বাইরে দেখে এসেছিলাম—'শনিবারের চিঠি' ও 'কল্লোলে'র কলকলহ। জেলেও ছিল সে বিষয়ে কৌতূহল। একবার ওকথা তুলতেই বললেন, এখন বাসি হয়ে আসছে। তরুণরা আর তরুণ থাকতে চায় না। নাম করে বললেন—চাকরি-বাকরি করছে, খেতে পরতে হয়, so, all are settling down into everyday life—শনিবারের চিঠির কথায় বললেন—মোহিতবাবু রবীন্দ্রনাথকেই target করছেন, লক্ষ্যবেধ হচ্ছে কিনা সন্দেহ, সেদিকে দৃষ্টিও নেই, সজনীও স্বস্তিবোধ করছে না, বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথায় বলতেন—বয়স হলে শিশু-স্থালো একটু হাস্যকর, কিন্তু ওর রহস্যমুক্ত দৃষ্টি শিশুর দৃষ্টি—তা অকৃত্রিম, বিয়ে করবেন, কিন্তু কাকে ঠিক করতে গিয়ে পালিয়ে যান। নীরদবাবুর কথায় একদিন বললেন, সার্কুলার রোডের ফ্ল্যাটের বাড়িতে আছেন, কথায় লেখায় তেমনি ক্ষুরধার, happy in domesticity, proud father of two sons। প্রবাসী ও মডার্ন রিভিউতে সজনী নেই। অশোকবাবু বিলাত থেকে ফিরে আর যোগদান করেন নি। সে আড্ডা আর জমে না। কেদারবাবু prince regent—রামানন্দবাবু তেমনি অক্লান্ত কর্মে কাগজ দুটির পুষ্টি সাধন করছেন, সবার উপরে আছে কবি-প্রতিভার ক্রাউন আর গ্লোরির উজ্জ্বল ছটা—কবি দেশেই থাকুন আর বিদেশেই থাকুন, বিশ্বভারতীর জন্য অর্থাহরণে উদ্বিগ্ন হয়ে ছুটছেন—একা একটা বিরাট স্বপ্নকে সার্থক করতে চান, শিল্প স্বপ্ন হলে তাতে বাধত না, লেখা হোক, ছবি হোক, গান হোক, সে সব সৃষ্টি একার কাজ ও একান্তেই সম্পূর্ণ। কিন্তু বিশ্ব-বিদ্যালয় তো তেমন শিল্প নয়, তার সৃষ্টি সম্ভব বহুর সঙ্গমে ও সমন্বয়ে। কবির চেষ্টায় বিশ্ব যেখানে 'একনীড' আমরা তার মধ্যে নিজেদের নিয়মেই খুঁচিয়ে তুলি বিরোধ, বাধাই কলহের কলরব, দলাদলি আর আড়াআড়ি। কবি নেচে গেয়ে অভিনয় করে তার অর্থসংস্থান করছেন—চিন্তার শেষ নেই। কিন্তু সৃষ্টিরও বিরাম নেই। কাগজে দেখছিলাম একজন বুদ্ধিমান সুপণ্ডিত লোক অনেকটা গায়ে পড়েই সুনীতিকুমারকে বক্রোক্তি করেছেন—সুনীতিবাবু সনাতন সমাজকে চেনেন না, ভক্ষ্যাভক্ষ্য মানেন না, বিশেষতঃ ভাষার ক্ষেত্রে তিনি ছুঁৎমার্গী নন। ভদ্রলোকের উষ্মার কারণ কি—আমি জানতে চাইলাম। সুনীতিবাবু হেসে বললেন—তাঁর সঙ্গে তো কোনোদিন কথা হয় নি আমার। তাই বোধহয় তিনি রুষ্ট। কেমন জানেন, রেস্টুরেণ্টে এক টেবলে দুজন ইংরেজ খাচ্ছিলেন। নিকটে অন্য টেবিলে খাচ্ছিলেন একজন আইরিশম্যান। কিছুক্ষণ পরে সেই আইরিশ

ভদ্রলোকটি ইংরেজ দুজনার কাছে উঠে এসে মারমুখো হয়ে দাঁড়ালেন, ক্রুদ্ধস্বরে বললেন।

What do you mean by insulting my country? ইংরেজ দুজন চমকে বললেন—Your country! Which it is?

—Eire!

—Why, we have not mentioned her even.

—That's how you insult her.

আমার তো জানাই নেই—ভদ্রলোকের ভাষা কোন্ জাতের, তার জাত মারলুম কি করে! সবাই হাসলাম। গোয়েন্দা ভদ্রলোকও একবারের মতো মুখ খুলেই হেসে ফেললেন। সাধারণত গম্ভীর মুখেই তিনি বন্দী ও তাদের আত্মীয়-বন্ধুদের সাক্ষাৎকারের ওপর পাহারা দেন, দৃষ্টি সতর্ক রাখতে হয়, কানও খাড়া রাখতে হয়। তবে শিক্ষিত যুবক। সুনীতিবাবুর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎকারের সময়টাও আরম্ভ করতেন গম্ভীর মুখে, তবে একটু সসম্ভ্রমে। এমন দর্শনার্থী আর বড় আসে না। কিন্তু প্রথম দিনেই তাঁর দৃষ্টির স্থির গাম্ভীর্য একটু একটু করে পরিণত হয়ে গেল শ্রোতার আগ্রহে, মজা পাওয়া মানুষের নাতিপ্রচ্ছন্ন প্রফুল্লতায়। আর, দু চারবার এরূপ সাক্ষাতের পরে বুঝতাম—একঘেয়ে সাক্ষাৎকারে পাহারা দিয়ে দিয়ে যে অনিবার্য শ্রান্তি তাঁকে পেয়ে বসত—সুনীতিবাবুর আগমন মাত্রই তা একটু লঘু হয়—ঔৎসুক্য ও উৎফুল্লতার সঞ্চার হত তাঁর মুখে। এসব কথা শুনতে শুনতে তাঁর আগ্রহও ক্রমেই বেড়ে যেত। শেষ দিকে দু এক সময় হাসিও গোপন করতে পারতেন না। একঘেয়ে কাজের মধ্যে এই আধঘণ্টা সাক্ষাতের সময় আমার অপেক্ষা তাঁর পক্ষেও কম টনিকের কাজ করত না। কোথা দিয়ে আধঘণ্টা উড়ে যেত, আমাদের উঠতে হত। সময়টা আর একটু বাড়িয়ে দিলে হয় না। উঠি উঠি করেও উঠতে তাই এক আধ মিনিট দেরি হয়ে যেত। বুঝতাম তা দু দশ মিনিট বাড়িয়ে নিলেও ভূপেনবাবু আপত্তি করতেন না। হয়তো মনে মনে খুশিই হতেন। তা ঠিক হবে না। তিনি জানতেন, আমরাও বুঝতাম অন্য দর্শনার্থীরা ততক্ষণে তাঁদের নির্দিষ্ট সাক্ষাৎ-সময়ে এসে নির্যাতিত আত্মীয়-মুখ দর্শনের আশায় জেলের ফটকে বসে আছেন, দেরি দেখে নিশ্চয় অধীর হয়ে উঠছেন। বিদায় দিতে দিতে তখন আমার নিজের দু-এক কথা হত—গবেষণার এক-আধটা প্রশ্নোত্তর, গবেষণার draft শেষ হচ্ছে, শ্যামাপ্রসাদবাবু তাঁকে জানিয়েছেন—হাতে লেখা থীসিসও এই বিশেষ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষার জন্য অনুমোদন করবে—ভাষাতত্ত্বের লেখা

টাইপ করা বা মুদ্রণ করা তখন দুরূহ। পরে একদিন জানালেন—শ্যামাপ্রসাদবাবু দুঃখ করে জানিয়েছেন তা সম্ভব হল না। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম এদিকে একেবারে নিশ্ছিদ্র ও নিরঙ্কুশ—বিশেষ অবস্থায়ও ব্যতিক্রমের ফাঁক নেই। আমি তাঁকে জানালাম—তা হলে ভাষাতত্ত্বের গবেষণা এখন স্থগিত থাক। বই পড়ি যা পাই, আর লিখি যা পারি যদৃচ্ছা—যথা, পড়ব সাহিত্য, ইতিহাস, প্রাচীন সংস্কৃতি, বর্তমান আন্তর্জাতিক রাজনীতি, সমাজ-বিজ্ঞান, ধনবিজ্ঞান, পাশ্চাত্য অর্থনৈতিক সংবাদ ও পরিকল্পনামূলক অর্থনীতির বিতর্ক, বললাম না যা তখনো পড়ছি—মার্কসবাদী তত্ত্ব আর সামান্যই বললাম যা লিখছি। কিছু প্রবন্ধ নিজের সঙ্গে বোঝাপড়া, আর কিছুবা বাঙালি মধ্যবিত্তের বিকাশ-ধারার ঐতিহাসিক জিজ্ঞাসা। বই প্রভৃতির হদিশ দিতে যান কিন্তু ও বিষয়ে উপকরণ জেলে জুটবে না। আলোচনা তথ্যভিত্তিক হতে পারবে না তথাপি মনে জুটেছে তার রূপরেখা। আর তাই পারি তো কাহিনী-আকারে লিখি তার মানব-ভিত্তিক ঐতিহাসিক রেখাচিত্র। পড়ার কথায় সুনীতিবাবু বললেন, 'শব্দতত্ত্ব নাই বা হল, পড়ুন যত দিকের যত বই পান—পড়ুন, worth reading হলেই হয়। তবে যা স্থায়ী, যা classic, তা হচ্ছে must, চোখ খোলা রাখুন দশ দিকে—বিপুল এ পৃথিবীর কতটুকু জানি, কোনো একটা দিকেই তো পৃথিবী আবদ্ধ নয়—শব্দতত্ত্বেও নিশ্চয়ই নয়, এমন কি, classics-এও নয়, modern কি কম ঐশ্বর্যময়? তা যে সনাতনেরও ফলভাগী, আরও জটিল, বিচিত্র। লেখার কথায় বলতেন, লিখুন—প্রবন্ধ হোক, গল্প হোক, উপন্যাস হোক—যা মন চায়, এবং যাতে মনে হয় আপনার কিছু বলবার আছে। Worth saying হলে তা Worth readingও হবে কারো না কারো।

এ ভাবেই গড়িয়ে গিয়েছিল দিন—প্রেসিডেন্সি জেলে থাকলে সাক্ষাৎকারে ও কথায় আর অন্যত্র (বকসা বন্দীশালায় বা ১৯৩৬-৩৭এ পরে রাজশাহী, অন্তরায়ণ-গৃহে) থাকলে কিম্বা তিনি অন্যত্র (বিলেতে ও বর্মায়) থাকলে, চিঠিপত্রের আলাপনে। ১৯৩৭-এর প্রারম্ভেই (ফজলুল হকের মন্ত্রীত্বলাভে) বুঝলাম এবার আমাদেরও মুক্তির সময় হবে। দেরি ছিল, কিন্তু কর্তৃপক্ষের তখন কড়াকড়ি কম ছিল। আমি তখন প্রেসিডেন্সি জেলে। সুনীতিবাবু বিদেশে ঘুরে এসে আমাকে তাঁর নতুন গৃহ ('সুধর্মা') দেখাবার জন্য আগ্রহশীল হলেন। আমারও আগ্রহের অন্ত নেই। এ বাড়ির কথা তিনি জেলে অনেক সময় বলেছেন। এখন দেখবার অনুমতিও তিনি সংগ্রহ করলেন—ঘণ্টা তিনেকের মত পুলিশের পাহারায় আমি তাঁর গৃহে যাব, আমার গবেষণা ব্যাপারে তিনি একটু দীর্ঘ আলোচনা করতে চান,

গৃহে না হলে সে সব জেলে সম্ভব হচ্ছে না। একদিন (১৯৩৭-এর সেপ্টেম্বর মাসে ?) তাই পুলিশের গাড়ি আমাকে নিয়ে চললো বালিগঞ্জে 'সুধর্মায়'—যে পাড়া আমি পূর্বে এরূপ দেখি নি, যে বাড়ি আমি শুনে শুনে কল্পনায় দেখেছি। পাঁচ বৎসরে পরিবর্তিত নবায়িত সেই পাড়ায়, সম্পূর্ণ নতুন তৈরি সেই বাড়িতে এলাম। জানতাম তাঁর রুচি—একটু ফাঁকা অঙ্গন চাই, বিশেষ করে গাছ পালার শ্যামল স্পর্শ না হলেই নয়। ঘরও হবে প্রশস্ত—প্রাচীরের মধ্যে নিজেকে পুরে রাখাই যথেষ্ট বাঁচা নয়, নিজের চারদিকে অবকাশ না পেলে দেহও স্বচ্ছন্দ হয় না। বাড়ির নাম, তার তোরণ-পরিকল্পনা পূর্বেই জানতাম ; শুধু 'সুধর্মা' নয়, চাটুজ্জে-বাড়িও এই প্রাচীন ভারতীয়, বর্তমান বাঙালির দুই পরিচয় একসঙ্গে এক নামে মিলিত। শঙ্খ চক্র আঁকা ভবন-তোরণে মেঘদূতের যক্ষ যেমন তার বাড়ির কথা বলেছিল। গৃহাভ্যন্তরে প্রাচীরে-প্রাচীরে যা উৎকীর্ণ তার কথাও শুনেছি, কিন্তু বাস্তবে ছিল কল্পনার অতীত। গত পঞ্চাশ বৎসরে অন্তত হাজার কয় লোক সেই বাড়ি দেখেছেন, সে সব লিপি, তার শুদ্ধ অর্থ ও মহৎ তাৎপর্য জানবার অবকাশ পেয়েছেন, এবং অনেকেই আবার দেখে দেখে মনের কোঠায় কিছু সঞ্চয় করে নিয়ে ফিরেছেন। অনেকেই সে গৃহের গ্রন্থাগার, তাঁর সমাদৃত চিত্র মূর্তি ও নানা শিল্পায়ন-ভরা জীবনযাত্রা দেখে বিস্মিত ভঙ্গিতে সেই ধূসর আস্বাদন মনে নিয়ে এসেছেন—ভুলতে পারেন নি গৃহস্বামী অতিথিবৎসল আশ্চর্য মানুষটিকে। এক হিসাবে মানুষটি শেষ অবধি গৃহের এই বস্তু-উপকরণের কথাও সকলকে ভুলিয়ে দেন। কিন্তু তাও সম্পূর্ণ ঠিক নয়। সেই মানুষটিই এই তাঁর শিল্পমালার মধ্য দিয়ে প্রকাশিত—প্রকাশিত তাঁর প্রতিভার বহুমুখী দানে, তাঁর প্রীতি-স্নেহভরা ব্যক্তিগত ও পারিবারিক অনুভূতিতে এবং সকল কালের সকল মানুষের সহিত তাঁর একাত্মতার সাধনায়। তিনি জানতেন—সবখানেই তাঁর জীবনদেবতার প্রকাশ।

সুধর্মায় প্রথম দিনে একবর্ণও ভাষাতত্ত্বের আলোচনা হয় নি—হয়েছে ঐ বিশ্বের মনস্বীদের বাণী সমূহের কথা, আহরিত শিল্প-সম্পদের কথা, শিক্ষিত সংস্কৃতি-বান মানুষের প্রয়োজনীয় আধিভৌতিক আধিমানসিক ও আধ্যাত্মিক পরিবেশের কথা—সমস্ত জাতির শ্রেষ্ঠ ভাবসম্পদেই তার পুষ্টি হওয়া চাই, সেই সঙ্গে চাই সকল মানুষের ও ন্যূনতম গ্রাসাচ্ছাদন ও মানসিক বিকাশের আয়োজন।

এদিন স্থির মনে কৌতুকের অপেক্ষাও শান্ত স্বাভাবিক কণ্ঠে তিনি বলেছিলেন—মানুষের সম্বন্ধে তাঁর শুভানুধ্যানের কথা, সাধারণ মানুষের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধার কথা। For, man is the measure of all things—আর

সৃষ্টিতেই মানুষ মানুষ।

কিছুদিন পরে (বোধহয় ৯ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩৭) আমি কলকাতায় স্বগৃহে অন্তরায়িত হই। গতিবিধি খুবই সীমাবদ্ধ ছিল, বাইরের কারও সহিত সাক্ষাৎ নিষিদ্ধ। বৎসরের শেষদিকে ভারতবিদ্যা-আচার্য ডঃ এফ. ডব্ল্যু. টমাস এসেছিলেন কলকাতায়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁর তিনটি (না, চারটি?) বক্তৃতার আয়োজন করে দ্বারভাঙ্গা হলে। বিষয়—খোটানে প্রাপ্ত প্রাচীন লিপির বৌদ্ধ পুঁথি। সে বক্তৃতা-মালায় সুনীতিবাবু আমার উপস্থিতির অনুকূলে অনুমোদন সংগ্রহ করলেন শাসন-বিভাগের কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে। চারিদিকে খ্যাতনামা অধ্যাপকরা, তারই মধ্যে আমি একমাত্র অকৃতী শ্রোতা। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় রোমক লিপিতে সেই খোটানী পাণ্ডুলিপির সাইক্লোস্টাইল করা কপি যা শ্রোতাদের প্রত্যেকের হাতে দিলেন—আমারও জুটল। এ কাজ কার পরিশ্রম ও কর্মকুশলতায় সম্ভব হচ্ছে, তা কারও বুঝতে দেরি হয় না, সেই বিদ্বজ্জনের আলোচনায় রসগ্রহণে আমারও বাধা হয় নি। কিন্তু আজ ভাবছি—শুধু তা নয়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তো তখনো বিদ্যাদানের ক্ষেত্রে এতটা উদ্যোগ উৎসাহের অধিকারী ছিল, অন্তত পরিপোষক ছিল। কোথায় গেল তার সেই শক্তি, সেই দৃষ্টি, সেই দায়িত্ববোধ? তার অধ্যাপকদের সেই গবেষণা, সেই সংস্কৃতিসাধনা? যে প্রেসে 'ও ডি বি এল'-এর প্রথম সংস্করণ মুদ্রিত হয়েছিল কেমন করে হল সে প্রেসের অধোগতি। প্রকাশন বিভাগেরই বা আজ সেই উদ্যোগ কেন ফুরিয়ে গেল। সেদিন শুধু গুরু-ভাগ্যের কৃতজ্ঞতা নয়, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্যও গৌরব বোধ করেছিলাম, আর অনুভব করেছিলাম নিজের গুরুভাগ্যের সৌভাগ্য। অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের শিষ্যরূপে সার্থকতা আমার দোষেই আমি অর্জন করতে পারি নি, তাঁর স্নেহে ও মহত্ত্বে আমি লাভ করেছি যা জন্ম-জন্মান্তরেও প্রার্থনীয় হতে পারত এমন সম্পদ—গুরুর হিতৈষণা, অগ্রজের স্নেহ, সুহৃদের বন্ধুত্ব। দেশে-বিদেশে সহচর সঙ্গী হিসাবে, ভ্রমণের সাথী হিসাবে, বহু বহু সময়ে কর্মের ও বিশ্রম্ভালাপের সঙ্গী হিসাবে, আমি ক্ষণে ক্ষণে কথায় ও আচরণে জীবন-জিজ্ঞাসার ও জীবন-দর্শনের শ্রোতা ও সাক্ষী হতে পেরেছি। আর সর্বোপরি জেনেছি বহুবার-শ্রুত তাঁর আত্মপরিচয়—

Homi sum, humani nil a me alienum puto.

I am a man, nothing human is alien to me.

এই মহৎবাণীর উপলব্ধিতেই সেই মহৎ প্রতিভা হয়ে উঠেছিলেন বন্দীর বন্ধু!

মনীষী স্মৃতিচারণ

নির্মলচন্দ্র ভট্টাচার্য

১৯১২-১৩ সালের কথা। সুনীতিকুমার সবে মাত্র এম, এ, পাশ করেছেন। তাঁর একটি ইংরেজীতে লেখা প্রবন্ধ প্রকাশিত হলো 'Student' নামক একটা ইংরেজী সাময়িকপত্রে। GRIFFITH নামক একজন শিক্ষাবিদ ছিলেন তার সম্পাদক। পত্রিকার সুন্দর ছবি পরিশোভিত নীল মলাট খানির ছায়া এখনও যেন চোখের সামনে ভাসছে। স্মৃতির পাতাগুলি ক্রমে অস্পষ্ট হয়ে আসছে; তা থেকে উদ্ধার করা পুরোনো কথা জীবন্ত করে তোলা সহজ নয়। আমি তখন পূর্ববঙ্গের একটি অখ্যাত শহরের সরকারী স্কুলে নবম কি দশম শ্রেণীর ছাত্র। স্কুলের Debating Society-র সম্পাদক ছিলাম বলেই বোধ করি ঐ সাময়িক পত্রটি আমার হাতে পড়েছিল। সেই সূত্রেই সুনীতিকুমারের নামের সঙ্গে প্রথম পরিচয় ঘটে।

সুনীতিকুমারের সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎ পরিচয় হয় বোধ করি ১৯২৬ সালে, যখন আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের পোস্ট গ্র্যাজুয়েট বিভাগে শিক্ষকতা শুরু করি। ঐ সালেই সারা বাংলা কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় সমিতি স্থাপিত হলো। যাঁরা সমিতির জন্মলগ্নে উপস্থিত ছিলেন তাঁদের মধ্যে সুনীতিকুমার অন্যতম। সমিতির তৎকালীন যুগ্ম-সম্পাদক ছিলাম বলেই কথাটি এখনও মনে আছে।

তখনকার দিনে বিশ্ববিদ্যালয়ের পোস্ট গ্র্যাজুয়েট বিভাগের শিক্ষকই সকল পোস্ট গ্র্যাজুয়েট কাউন্সিলের সদস্য ছিলেন। তাঁরাই নির্বাচিত করতেন কার্যনির্বাহক সমিতি। খুব কম বয়সেই আমি কার্যনির্বাহক সমিতিতে নির্বাচিত হয়েছিলাম। নির্বাচনে বরাবর অধ্যাপক সুনীতিকুমারের সমর্থন লাভ করেছি। আজ তা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করি।

কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সুনীতিকুমারের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা জন্মে। দীর্ঘকাল তিনি ভারত-চীন মৈত্রী সমিতির সভাপতি ছিলেন আর আমি ছিলাম সমিতির সাধারণ সম্পাদক। এই সূত্রে সুনীতিকুমারের চীন সংস্কৃতি বিষয়ক অগাধ জ্ঞানের পরিচয় পেয়েছি। অনেক সভা করেছি তাঁর বাড়িতে, সেই সব সভায় চীনের প্রতিনিধিরাও মাঝে মাঝে উপস্থিত হতেন। সমিতির পক্ষ থেকে আমরা 'ভারত-চীন' নামক একখানা ত্রৈমাসিক পত্র প্রকাশ করেছি। সমিতির সভাপতি হিসাবে তিনি ছিলেন প্রধান উপদেষ্টা, উৎসাহদাতা ও পৃষ্ঠপোষক।

সুনীতিকুমার দীর্ঘকাল ভারত-রুশ সংস্কৃতি সমিতিরও সভাপতি ছিলেন। আমি এই সমিতির সক্রিয় সদস্য ছিলাম ও কয়েক বছর অন্যতম সহ-সভাপতিরূপে কর্তব্য সম্পাদন করেছি। এই সূত্রেও সুনীতিকুমারের বহুমুখী জ্ঞান ও প্রতিভার পরিচয় পাবার সুযোগ আমার হয়েছিল। শান্তিসংসদ ও এশীয়-আফ্রিকা সংহতি সমিতির সঙ্গেও সুনীতিকুমারের সম্পর্ক ছিল। এই দুটি সংসদেও তাঁর ভূমিকা ছিল প্রগতিপন্থী ও সংস্কৃতিভিত্তিক।

কিন্তু যে প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে আমি সুনীতিকুমারের খুব নিকটত্ব লাভ করার সুযোগ পেয়েছিলাম সেটি হচ্ছে বিধান পরিষদ। সুনীতিকুমার স্নাতকদের জন্য নির্দিষ্ট একটি নির্বাচন কেন্দ্র থেকে বিধান পরিষদে নির্বাচিত হয়ে এলেন ১৯৫২ সালে। তখন থেকে ১৯৬৪ সাল পর্যন্ত তিনি বিধান পরিষদের সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করেছেন। আমি ১৯৫২ সাল থেকে ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত পরিষদের সদস্য ছিলাম। তাই সভাপতি সুনীতিকুমারের সঙ্গে নিকট সাহচর্যের সুযোগ যথেষ্ট হয়েছিল। ১৯৫২ সালে সুনীতিকুমার বিশ্ববিখ্যাত পণ্ডিতরূপে সমাদৃত। তাঁর মত ব্যক্তিকে পরিষদের সভাপতিরূপে পাওয়া পরিষদের অনেক সদস্যই সৌভাগ্য বলে গণ্য করেছেন। তাঁর সৌজন্য, তাঁর ভদ্রতা ও দলনির্বিশেষে সকল সদস্যদের সঙ্গে অমায়িক ব্যবহার সদস্যদের মুগ্ধ করেছিল। আমার প্রতি তাঁর সস্নেহ ব্যবহারের কথা মনে ছাপ রেখে গেছে।

সুনীতিকুমার মজলিসী মানুষ ছিলেন। অমন সুনিপুণ মজলিসী কথা-বার্তা আমি আর কারও কাছে শুনিনি। বিভিন্ন দেশের সংস্কৃতি, অন্য দেশের মানুষের জীবন যাত্রার প্রণালী সম্বন্ধে তাঁর আলোচনা শুধু যে তথ্যসমৃদ্ধ হতো তা নয়। এই সব অলোচনা উপভোগ শিল্পের পর্য্যায়ে উন্নীত হতো।

তাঁর কাছে অল্প সময় থাকলেও কিছু না কিছু নূতন তথ্য, নূতন দৃষ্টিভঙ্গির সন্ধান পাওয়া যেতো। এডমাণ্ড বার্ক সম্বন্ধে একজন ইংরেজ মনীষী বলেছেন যে যদি কেউ আকস্মিক এক পশলা বৃষ্টিকে পাশ কাটাবার জন্য কোন বাড়ির গাড়ি-বারান্দায় অত্যল্প সময়ের জন্য আশ্রয় নেন এবং সেখানে যদি বার্ক-এর সঙ্গে তাঁর প্রথম সাক্ষাৎ ও কথাবার্তা হয় তা'হলেও ঐ ব্যক্তি বুঝতে পারবেন যে বার্ক একজন অসাধারণ মানুষ। আমাদের ভারতীয় মনীষী সুনীতিকুমার সম্বন্ধেও ঐ কথা সত্য। তাঁর চলন-বাচনে একটা মনীষা-দীপ্ত বৈশিষ্ট্য ছিল। দীপ্ত এই বৈশিষ্ট্য মানুষকে কখনও প্রতিহত করেনি। তাঁর বিরাট মানবিকতা সকল মানুষকে কাছে টেনে নিয়েছে।

সুনীতিকুমার রসিক লোক ছিলেন। তাঁর রসিকতা ছিল মানবিকতায় ভরপুর। তাতে কোন জ্বালা ছিল না। তা থেকে একটা স্নিগ্ধ সহানুভূতিময় ভাব প্রকাশ পেতো। তিনি ভোজন-রসিকও ছিলেন কিন্তু ঔদরিক ছিলেন না। বলী-দ্বীপে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পরিভ্রমণের সময় তিনি এক কোটিপতি বলী-দ্বীপবাসীর বাড়িতে কিরূপ নৈষ্ঠিক ভাবে ভারতীয়দের কাছে অখাদ্য দুর্গন্ধময় ডুরিয়ান ফল নির্বিকার চিত্তে ভক্ষণ করলেন তার বর্ণনা যাঁরা শুনছেন তাঁরা তা কখনো ভুলবেন না। মঙ্গোলিয়াতে গিয়ে উলান বাটোরের পথে দুম্বার রোস্ট ও তন্দুরের কিরূপ সদ্ব্যবহার হয়েছিল তার বর্ণনা একাধারে উপভোগ্য ও মনে রাখার মত। এমন সরস বর্ণনা দিতেন যে অজ্ঞাতে শ্রোতার জিহ্বাও সরস হয়ে উঠতো।

বিশ্ববিখ্যাত বহুমুখী পাণ্ডিত্যের সঙ্গে Zest for life বা জীবন তৃষ্ণার মিলন বড় একটা দেখা যায় না। তাই সুনীতিকুমার একক ও অনন্য। সুনীতিকুমারের মধ্যে আমরা পেয়েছিলাম ভারতীয় ও বিশ্বসংস্কৃতির একজন অসাধারণ দিকপালকে। তিনি শেষ বয়স পর্যন্ত অটুট স্বাস্থ্যের অধিকারী ছিলেন। তিনি বলতেন "If you can run, don't keep standing! If you can stand, don't sit down! If you can sit down, don't lie down."

সুনীতিকুমারের গৃহ 'সুধর্মা' ছিল নানা দেশ বিদেশ থেকে সংগৃহীত অপূর্ব শিল্প-দ্রব্যে সমৃদ্ধ।' কয়েকটি ঘরের দেওয়ালে ভারতবর্ষ সমেত নানা দেশের মনীষীদের উপলব্ধ সত্য বাণী খোদিত রয়েছে। পৈত্রিক সুকিয়া রো-এর বাড়ি ছেড়ে যখন নূতন বাড়িতে এলেন তখন একদিন কি একটা কাজে ওঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। তিনি প্রাচীর-লিপিগুলি দেখালেন ও বললেন, পৃথিবীর সমস্ত জাতিই নিজ নিজ চেতনা অনুযায়ী সত্য উপলব্ধি করতে চেষ্টা করেছে। পৃথিবীর কৃষ্টি কোন বিশেষ জাতির দান নয়। বিশ্ব-সভ্যতার মন্দিরে সকল জাতিই নিজ নিজ অর্ঘ্য নিয়ে সমবেত হয়েছে। আর একদিন তিনি তাঁর বংশ-পরিচয় সম্বলিত একখানি পিতলের ফলক দেখালেন। চট্টোপাধ্যায় পরিবারের আদি পুরুষ থেকে আরম্ভ করে তাঁর পুত্র পর্যন্ত বংশলিপি উৎকীর্ণ ছিল ঐ ফলকটিতে। একজন স্থানীয় শিল্পীদ্বারা সুনীতিকুমার ফলকটি প্রস্তুত করিয়েছিলেন।

বই-মেলাতে তাঁকে শেষবারের মত দেখেছি। কারও সাহায্য না নিয়ে সোজা মঞ্চে উঠে গেলেন। অনবদ্য ভঙ্গিতে উদ্বোধন ভাষণ দিলেন। সেই দৃশ্যটি মনে এঁকে রেখেছি। সেই দৃশ্যেই সুনীতিকুমারের সত্যকার পরিচয় বিধৃত রয়েছে।

কাছের মানুষ সুনীতিকুমার

শিশিরকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

১৯২৭ সালে যখন বি. এ. পাশ করলাম, তখন ইংরাজিতে M. A. পড়বার একান্ত ইচ্ছা হলো। তার কারণ আচার্য সুনীতিকুমারের কাছে পডবার সুযোগ পাব বলে। কিন্তু নানান কারণে M. A. পড়ার সুযোগ পেলাম না। মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল—কারণ সুনীতিবাবুর কাছে পডবার ইচ্ছা পুরণ হলো না। তখন Short hand শিখে Stenographer হলাম কিন্তু বহুদিন পরে ভগবান আমার আকাজ্ক্ষা পূর্ণ করলেন।

১৯৫৪ সাল—তখন আমি পাব্‌লিক সারভিস কমিশনের সভাপতির P. A. একদিন শুনলাম বিধান পরিষদের সভাপতি ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের জন্য একজন অভিজ্ঞ Stenographer দরকার। তখন আমার প্রায় ২৬ বৎসর চাকুরী হয়ে গেছে। বহু ইউরোপীয় ও ভারতীয় I. C. S. অফিসারের কাছে কাজ করে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা ও সুনাম অর্জন করেছি। আমার নাম পাঠান হলো। কয়েক দিনের মধ্যে তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য চিঠি এলো। গেলাম বিধান সভায় তাঁর ঘরে ও প্রণাম করে দাঁড়ালাম। তিনি একটু হেসে জিজ্ঞেস করলেন—কতদূর পড়াশুনা করেছেন, কতদিন কাজ করছেন—আরও বললেন, দেখুন, আমার নানান রকম কাজ, খুব খাটতে হবে, পারবেন তা। আমি রাজি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কাজে যোগ দিতে বললেন। যাঁকে এতদিন দূর থেকে গুরুর মত শ্রদ্ধা করতাম, তাঁকে একেবারে কাছে পেয়ে ধন্য হলাম। বিধানসভার সচিব ও অন্যান্য অনেকের কাছে তিনি আমার কাজের প্রশংসা করতেন দেখে আমার মনটা ভরে উঠত—আরও কাজে উৎসাহ পেতাম। এইভাবে কাজ চলতে লাগলো বছরের পর বছর। তাঁর সঙ্গে কার্য উপলক্ষে সারা ভারতবর্ষ বহুবার ঘুরেছি। যখনই তাঁর সঙ্গে বাহিরে গেছি তাঁকে দেখাশুনার ভার স্বভাবতই আমার কর্তব্য বলে মনে করেছি ও অনুগত শিষ্যের মতই তাহা পালন করেছি। তিনি এতে খুবই খুশী হতেন। অনেক জায়গায় বড় বড় হোটেলে বা অতিথিশালায় তিনি চাইতেন আমি তাঁর সঙ্গে এক ঘরেই থাকি। আমিও আনন্দের সঙ্গে থাকতাম—তা হলেই তো গুরুসেবা করার কিছু সুযোগ পেতাম। এক ঘরে তাঁর P. A.-এর সঙ্গে থাকতে তাঁর কোন দ্বিধা ছিল না—অনেকেই তা দেখে একটু আশ্চর্য হতেন। কিন্তু তিনি ছিলেন সংকীর্ণতার

উর্ধ্বে। আবার খাবার টেবিলে তিনি আমাকে ডেকে পাশে বসতে বলতেন। সে সময়েও আমাদের কাজকর্ম সংক্রান্ত নানা বিষয়ে আলোচনা চলতো।

এই প্রসঙ্গে একটা মজার ঘটনার উল্লেখ করছি—একদিন খেতে বসে একটা চপ আমার পাতে তুলে দিয়ে বললেন—আর পারছি না, আপনি খান। তারপর বলেও ফেললেন কিছু মনে করবেন না, এঁটোটা দিলাম। আমি আবেগে আপ্লুত হয়ে বলে ফেললাম—হ্যাঁ স্যার, মনে করলাম এটা আমার পরম সৌভাগ্য।—তিনি একটু হাসলেন। এর পর থেকে তাঁকে অধিক ভোজন থেকে নিরত করবার জন্যই হ্যাংলার মত পাতের দিকে লক্ষ্য করে কিছু না কিছু চাইতাম। আর তিনিও আনন্দের সঙ্গে দিতেন। বিশেষ করে বাইরে গেলে অতি ভোজনের ফলে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়তেন তাই তখনই এই বিশেষ ধরনের কায়দার প্রয়োজন হত।

তাঁর কাছে অনেক দিন থাকার ফলেই তিনি আমার প্রতি এতই স্নেহপরায়ণ হয়েছিলেন যে আমার কোন অসুখ-বিসুখ হলে খুবই চিন্তান্বিত হতেন ও বার বার আমার ছেলেদের টেলিফোন করে খবর নিতেন। একবার আমি প্রায় মাসাবধি শয্যাশায়ী ছিলাম। তিনি হঠাৎ একদিন অনিলবাবুকে সঙ্গে নিয়ে আমার বারাকপুরের বাড়িতে গিয়ে হাজির। তাঁর কাছ থেকে যে কি স্নেহ ও ভালবাসা আমি পেয়েছি তা ভাষায় প্রকাশ করতে পারি না। বোধ হয় পূর্বজন্মে আমি তাঁর আত্মীয়ই ছিলাম, তাই এ জন্মে তাঁর P. A. হয়ে তাঁর সঙ্গে সঙ্গে দীর্ঘ ২৪ বৎসর কাটাবার সুযোগ পেয়েছি। তিনি আমার ছেলে-মেয়েদেরও খুব স্নেহ করতেন। আমার ছেলে ও মেয়ের বিয়েতে এতদূর থেকে আমার বারাকপুরের বাড়িতে গিয়ে খাওয়া-দাওয়া করে আশীর্বাদও করেছিলেন।

তাঁর জনপ্রিয়তার বিষয় সকলে ভালভাবেই জানেন। তাঁর কাছে আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, শিক্ষক, ছাত্রছাত্রী ছাড়াও যে কোন লোক যে কোন বিষয়ে চিঠি লিখত বা এসে হাজির হতো। সকলেই জানতো তাঁর কাছে একেবারে অবারিত-দ্বার—যদিও তিনি রসিকতা করে বলতেন—দেখুন আমি যেন ঢেঁকসেলের ঢেঁকি—সকলেই একটা করে লাথি মেরে যাচ্ছে—তবু কিন্তু তাঁর বিরক্তি নেই। আমরা অনেক সময়ে অনেককে ভাগাবার চেষ্টা করতাম—তিনি জানতে পারলেই বলতেন—না না, আসতে দিন। তার কথা শুনতেন ও সাধ্যমত উপকার করতেন। অবশ্য গত কয়েক বৎসর থেকে তাঁর যে সহজেই ক্লান্তি বোধ হত তা আমরা বুঝতে পারতাম। সেই জন্যই তিনি কোন সভা-সমিতিতে বিশেষ যেতে চাইতেন না। বেশী পেড়াপীড়ি করলে অবশ্য একটু রাগত ভাবেই বলতেন—আর কেন বাবা,

আমায় রেহাই দাও। তবে তাঁকে যে সকলেই খুব ভালবাসতো সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। অধ্যাপক তো অনেক আছেন, তাঁর মত বিদ্বানও আছেন তবে সকলে এত ভালবাসতো কেন এ প্রশ্ন অনেকেই আমাকে করেছেন। তার কারণ তাঁর মধুর ব্যবহার। যে কোন লোক একবার তাঁর কাছে বসলে ও তাঁর কথা শুনলে একেবারে মুগ্ধ হয়ে যেত, কিছুতেই উঠতে চাইতো না। কি আকর্ষণী শক্তি তাঁর ছিল। তাছাড়া তিনি সকলকেই সমান চক্ষে দেখতেন। স্কুলের নীচু ক্লাসের ছাত্র-ছাত্রী থেকে আরম্ভ করে যে কোন লোক যে কোন বিষয়ে তাঁকে চিঠি দিলে তিনি প্রত্যেককে উত্তর দিতে বিরক্ত হতেন না। বহুলোক আমাকে এসে বলতো—একবার তাঁকে দূর থেকে দেখবো—কিছু চাই না। আমি পরদা সরিয়ে আচার্য দেবের অজ্ঞাতেই তাদের দর্শনের ব্যবস্থা করিয়ে দিতাম। তারা দূর থেকে প্রণাম করে চলে যেতো—তাদের অনেককেই, আচার্য দেবের মাধ্যমে, নানান ভাবে কিছু না কিছু উপকার করবার সুযোগ আমিও পেয়েছি এবং করেছি। মৃত্যুর পর যখন মঙ্গলবার সকালে তাঁর মরদেহ নার্সিং হোম থেকে তাঁর বাড়ি আনা হয়েছিল তখন তাঁর বাড়ি লোকে লোকারণ্য। পরিচিত অপরিচিত বহু লোক এসে চোখের জলে তাঁকে বিদায়-সম্ভাষণ দিয়ে গেছেন। হঠাৎ দেখি একটি মহিলা এবং আরো কয়েকজন (যারা পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তু) আমার কাছে এসে কান্নায় ভেঙে পড়লো। আমি তাদের খুব চিনি এবং জানি কি উপকারই না তারা আচার্য দেবের কাছ থেকে পেয়েছে। তাদের কৃতজ্ঞতার অশ্রু দেখে আমিও চোখের জল সম্বরণ করতে পারলাম না। তাঁর গুণমুগ্ধ অগণিত বন্ধুবান্ধব, ও স্নেহধন্য ছাত্রছাত্রী এবং অন্যান্য যারাই তাঁর সংস্রবে এসেছে সকলেই মনে করত নিশ্চয় তিনি তাকেই সব চেয়ে বেশী ভালবাসেন। কি আকর্ষণী শক্তি তাঁর ছিল। তাঁর কাছে ভালবাসা আদায়ের প্রতিযোগিতায় আমিও একজন ছিলাম এবং মনে করি বোধহয় তিনি আমাকেই সবচেয়ে বেশী ভালবাসতেন। আচার্য দেবের স্ত্রীকে আমি এবং অনেকেই মাতৃ সম্বোধন করে—ধন্য হয়েছি। সত্যই তিনি সকলকে মায়ের মতই ভালবাসতেন। সময় সময় তিনি আবার মায়ের মতই বকতেন—তাতে আমার একটুও রাগ হতো না—আমি চুপ করে থাকতাম। মা মধ্যে মধ্যে আচার্যদেবের সঙ্গে টুরে যেতেন। আমি, ধীরেনবাবু বা অনিলবাবু ছাড়া সঙ্গে যেতো জ্ঞান ও রঘুনাথ ঠাকুর। প্রসঙ্গত জ্ঞান প্রায় ৫০ বৎসর ধরে আচার্য দেবকে অক্লান্তভাবে সেবা করে আসছে —কি মিষ্টি ব্যবহার তার—ঠিক যেন রবীন্দ্রনাথের পুরাতন ভৃত্য "কৃষ্ণকান্ত"। রঘুনাথও বহুদিন তাঁদের বাড়িতে আছে—প্রায় আপনার লোকের মত হয়ে গেছে।

স্নান শেষ অবধি আচার্যদেবকে কেওড়াতলা মহাশ্মশানে অনুগমন করে যখন চোখের জলে তাঁকে বিদায় দিচ্ছে সে দৃশ্য দেখে আমিও চোখে জল রাখতে পারিনি।

আচার্য দেবের হৃদয় গরীবের দুঃখে সত্যই বিগলিত হত। যে কেউ এসে দুঃখ কষ্ট জানালে অন্তত দশ বিশ টাকা দিয়েও সাহায্য করতেন। শুধু হাতে কাহাকেও ফিরে যেতে হতো না। একবার এক অপরিচিতা মহিলা চিঠিতে কিছু সাহায্য দেবার অনুরোধ করলেন—কারণ তাঁর স্বামীর T. B. হয়েছে, উপযুক্ত পথ্য দিতে পারছেন না। চিঠি পড়ে তিনি বেশ বিচলিত হলেন—আমাকে দেখালেন। আমি ঠিক বিশ্বাস করতে না পেরে বললাম, স্যার, বোধহয় সবটাই মিথ্যা। তিনি কিন্তু শুনলেন না। আমার হাতে পঞ্চাশটি টাকা দিয়ে বললেন—আপিস থেকে ফেরবার পথে একবার তাদের বাড়িতে (কালীঘাট অঞ্চলে) যেতে পারেন। আর বললেন, গিয়ে যদি দেখেন সত্যি ঘটনা, তাহলে আমার নাম করে ঐ টাকাটি মহিলার হাতে দেবেন। তাঁর নির্দেশ মত গেলাম। ঐ মহিলার স্বামীকে দেখেই বুঝলাম আর বেশী দিন নেই। তখন আচার্য দেবের নাম করে মহিলার হাতে টাকাটি দিলাম। তিনি ভেউ ভেউ করে কেঁদে উঠলেন আব বললেন, সত্যিই তিনি দয়ার সাগর।

আমি নিজে হাতে তাঁর দুঃস্থ বন্ধুবান্ধবের কাছে কত Money Order পাঠিয়েছি তা বলতে পারি না। তিনি বলতেন, দেখুন, বড় কষ্টে পড়েছে যা পারি সাহায্য করি।

আমার প্রতি তাঁর ভালবাসার নিদর্শন স্বরূপ তিনি একটা কিছু স্থায়ী চিহ্ন রেখে যাবার জন্যেই একবার বললেন শিশিরবাবু আমার "মণীষী স্মরণে" বইটি আপনাকে উৎসর্গ করব। আমি বললাম, স্যার, আমি সামান্য লোক, বইটি বরং আপনার কোন বন্ধু-বান্ধবকে দিন। তিনি বললেন, আমার কাছে কেউ ছোট বড় নয়—আমার কাছে আপনার কাজের মূল্য অসীম—আমি আপনাকেই দেবো। এই বলে তিনি লিখলেন :

বণিক সচিব—

শ্রীশিশির কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বি. এ. করকমলেষু

সার্ধ-যুগাধিক-কাল-ব্যাপী অতন্দ্র ও সানন্দ
সাহচর্য ও সহায়তার জন্য কৃতজ্ঞতা ও প্রীতির
নিদর্শন।

শ্রীপঞ্চমী শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

২১শে জানুয়ারী ১৯৭২

বইখানি আমাকে উপহার দেবার সময় নিজে হাতে লিখেও দিলেন—শ্রীযুক্ত শিশির কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রিয়বরেষু কলিকাতা-২৩।

তিনি অমৃতধামে চলে গেলেন—রেখে গেলেন কেবল তাঁর স্মৃতি। তাঁর নাম চিরকাল অমর হয়ে থাকবে।

পশ্চিমবাঙলা বিধান পরিষদের সভাপতি সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

চারুচন্দ্র সান্যাল

'In celebrating the lives of those who have gone before us we renew our own lives.'

১৯৫২ হইতে ১৯৬৮ সন পর্যন্ত আমি পশ্চিমবঙ্গ বিধান-পরিষদের সভ্য ছিলাম। তখন সভাপতি ছিলেন স্বনামধন্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়। এই পরিষদ-গৃহে একখানি ফলকে লিখিত ছিল :

"ন সা সভা যত্র ন সন্তি বৃদ্ধা
বৃদ্ধা ন ত যেন বদন্তি ধর্মম্।
না সৌ ধর্মো যত্র ন সত্য সন্তি
ন তৎ সত্যং যচ্ছলেনাসু বিদ্ধম॥"

যে সভায় বৃদ্ধগণ থাকেন না সে সভাই নহে
যে বৃদ্ধেরা ধর্মের উপদেশ দেন না
তাঁহারা বৃদ্ধের মধ্যে পরিগণিত হন না
যে ধর্মে সত্য নাই সে ধর্ম ধর্মই নহে
যে সত্য ছল বিশিষ্ট সে সত্য সত্যই নহে॥

সেই সময়ে স্নেহাংশু আচার্য, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাঃ মণীন্দ্র চক্রবর্তী, ত্রিপুরারি চক্রবর্তী, হরেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী, শশাঙ্কশেখর সান্যাল, নির্মাল্য বাগচী, প্রমথনাথ বিশী, গোপাল হালদার, অন্নদা চৌধুরী, রবীন্দ্রলাল সিংহ, জানকী ভট্টাচার্য, নির্মল ভট্টাচার্য, নির্মল বসু, রাজকুমার চক্রবর্তী, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়, নরেন্দ্রনাথ দাস, রেজাউল করীম, সত্যপ্রিয় রায়, অনিলা দেবী, বিজনবিহারী ভট্টাচার্য, উপেন্দ্রনাথ বর্মণ, প্রতাপচন্দ্র গুহরায় প্রমুখ দিক্‌পালগণ সভ্য ছিলেন। অনেক নাম স্মৃতিভ্রমের জন্য হয়তো বাদ পড়িয়াছে। এই বৃদ্ধ ও যুবকদল কাষ্ঠফলকে লিখিত অনুশাসনের মর্যাদা কতখানি রাখিতে পারিয়াছিলাম বলিতে পারি না। বঙ্গবিভাগের পূর্বে বিধানপরিষদের সভাপতি ছিলেন বিজয়-প্রসাদ সিংহরায়। লালবাতি জ্বলিলেই বসিয়া পড়িতে হইত। একদিন তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী সহীদ সুরাবর্দী বক্তৃতা দিতেছিলেন। এমন সময়ে লালবাতি জ্বলিয়া

উঠিল। তিনি তখন এক মিনিট সময় প্রার্থনা করিলেন কথাটি শেষ করিতে। বিজয়প্রসাদ তখনই তাঁহাকে বসিতে বলিয়া বলিলেন অবশিষ্ট কথাগুলি কেরানীরাই লিখিয়া দিবেন।

পরিষদ-সভাপতি সুনীতিবাবু গম্ভীর ভাবে পক্ষের ও বিপক্ষের বক্তৃতা শুনিয়া যাইতেন। লালবাতি জ্বলিলেও কথা শেষ করিবার সময় দিতেন। অনেক সময়ে কেহ কেহ কটু কথা বলিতেন, কিন্তু সভাপতির মুখে কোনো ভাবান্তর দেখা যাইত না। একখানি ছোট কাগজে বক্তৃতার নম্বর দিতেন। তখনও শিক্ষকের মনোভাব তাঁহাকে পরিত্যাগ করে নাই। একদিন তাঁহার টেবিলে যাইয়া বক্তাদের নামের পার্শ্বে নম্বর দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, এগুলি কি? তিনি স্মিত হাস্যে বলিলেন বক্তৃতার গুণাগুণের নম্বর, ও, তখনই কাগজখানি পকেটে রাখিলেন।

সভায় অনেক সময়ে বহু গোলমাল হইত, অনেক সময়ে সহের বাহিরে চলিয়া যাইত। কিন্তু তাঁহাকে কখনোই বিচলিত হইতে দেখা যাইত না।

পরিষদ-গৃহের পার্শ্বে তাঁহার বসিবার কক্ষে দেখা যাইত পুস্তক ও পত্রিকার স্তূপ। তখন ডাঃ বিধান রায় ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি সেগুলি রাখিবার জন্য কক্ষটি বহু আলমারি দিয়া সাজাইয়া দিয়াছিলেন। সারা পৃথিবী হইতে পুস্তক ও পত্রিকা আসিত তাঁহার মতামতের জন্য। একদিন জিজ্ঞাসা করিলাম এতগুলি পড়েন কখন। তিনি বলিলেন পাকা রাঁধুনী ডেগের একটি ভাত টিপিয়া বলিতে পারেন সারা ডেগের ভাত সিদ্ধ হইয়াছে কি না। আমিও কয়েক পাতা পড়িয়া বুঝিতে পারি কোনটির মূল্য কতখানি। দুইজন শ্রুতিলেখ ও টাইপিস্ট অনবরত থাকিতেন কর্মব্যস্ত। তাঁহারা বলিতেন কাজ করিয়া এত আনন্দ কখনোই পাই নাই। মাঝে মাঝে দুই-একখানা বই আমাকে পড়িতে দিতেন। কংগ্রেস পক্ষের ও বিপক্ষের বহু সভ্য পরিষদের কার্যশেষে তাঁহার ঘরে ভিড় জমাইতেন ও নানা বিষয়ে আলোচনা করিতেন। সুনীতিবাবু ছিলেন একটি প্রতিষ্ঠান (institution)।

একটু ব্যক্তিগত কথা আসিয়া গেল। পাঠকগণের নিকট ক্ষমা চাহিতেছি। টোটো উপজাতি বিষয়ে বাঙলা ভাষার ছোট একখানি পুস্তিকা লিখিয়া পাণ্ডু-লিপিখানি তাঁহাকে দেই পরিষদের সভাপতি হিসেবে একটি ভূমিকা লিখিয়া দিবার জন্য। তিনি সাত দিন বাদে আসিতে বলিলেন। সাতদিন পরে যাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম কিছু লিখিয়াছেন কি। তিনি বলিলেন লিখি নাই। আমি বলিলাম বইখানি বোধ হয় মোটেই ভালো হয় নাই। তখন গম্ভীর ভাবে বলিলেন

"মহাশয়, যাহা লিখিয়াছেন ইহার মূল্য আপনি এখনও জানেন না, বইখানি ইংরেজি ভাষায় লিখুন।" সঙ্গে সঙ্গে একটি লিস্ট আমাকে দিয়া বলিলেন বইখানিতে এই সব তথ্য সন্নিবেশিত করুন। আরও দুই বৎসর টোটো উপজাতিদের নিকট হইতে ঐ সব তথ্য সংগ্রহ করিয়া ইংরেজি ভাষায় বইখানি সম্পূর্ণ করিয়া তাঁহাকে দিলাম। তিনি সন্তুষ্ট হইলেন ও পরে তাঁহারই চেষ্টায় বইখানি কলিকাতা এসিয়েটিক সোসাইটির জার্ণালে বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশিত হইল। তাঁহারই সাহায্যে ইহার পরে The Rajbansis of North Bengal এবং The Meches and the Totos বই দুখানির প্রকাশনা সম্ভব হইয়াছিল। বিধান পরিষদের সভাপতির কার্যের মধ্যেও এত অ-রাজনৈতিক কার্য করিতে পারিতেন ইহা বিশেষ মানুষ ছাড়া অন্য কাহারও পক্ষে সম্ভব বলিয়া আমার মনে হয় না।

১৯৬৮ সনে বিধান পরিষদ বাতিল হইল। শেষ দিন সভাপতি মহোদয় সভ্যগণকে বিদায় জানাইবার ও তাঁহাদের মধ্যে বিতরণ করিবার জন্য একখানি স্মারকলিপি ছাপাইয়া আনিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয় সেদিন সভাকক্ষে যে তাণ্ডবলীলা ঘটিযা গেল তাহাতে অতি দুঃখিত হৃদয়ে তিনি ছাপা কাগজগুলি হাতে লইয়া তাঁহার কক্ষে ফিরিয়া গেলেন—আর আসেন নাই।

আমার বিশ্বাস সভাপতি হিসেবে সুনীতিবাবু ছিলেন বিধানপরিষদের গৌরব ও আমাদের মতো সকল সভ্যেরও গৌরব।

পরিসদ পরিত্যাগের পরেও তাঁহার সহিত আমার যোগাযোগ ছিল। তাই তাঁহার শেষ পত্রখানি আংশিক উদ্ধৃত করিয়া যবনিকা টানিয়া দিতেছি।

Dated 4th January, 1977

From : Suniti Kumar Chatterji

Dear Dr. Sanyal,

I am now running 87 and I have got cataract in both eyes, I am losing interest in many things in life. When you come to my age you will understand that. So unless there is strict necessity I try to avoid doing any writing or dictate letters as far as possible.

সর্বশেষে বাঙলায় নিজ হাতে লিখিয়াছেন।—

আর কোন দুঃখ কষ্ট নেই।

যত কষ্ট কেবল অন্ন, বস্ত্র আর গৃহের।

মনে হয় সারা ভারতের অবস্থা দেখিয়া এই শেষ কথা লিখিয়া দিয়া গেলেন। এখন আমার বয়স ৮১।

তাঁহার তিরোধানে সারা ভারতের একজন মানবদরদী উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক নিভিয়া গেল।

যে জীবন আলোর অধিক

আজহারউদ্দীন খান্

রবীন্দ্রনাথের যখন মৃত্যু হয় তখন আমি ছিলাম স্কুলের ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র। তখন বুঝতে পারি নি আমাদের সাহিত্য ও সংস্কৃতির জগতে কী অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে গেল, পরে বড় হয়ে বুঝেছি—কিন্তু সেদিনের সেই উষ্ণ শোকার্ত অনুভূতি আমার হয় নি। আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যুতে সেই শূন্যতা অনুভব করে রবীন্দ্রনাথের শূন্যতা বুঝতে পেরেছি। আমাদের সাহিত্যে দুটি মহাপ্রয়াণ ইন্দ্র-পতনের সমতুল্য—১৯৪১ অগাস্টে রবীন্দ্রনাথের প্রয়াণ, আর ১৯৭৭ মে-তে ডঃ চট্টোপাধ্যায়ের অন্তর্ধান। আমাদের সাহিত্য ও সংস্কৃতির শেষ সম্বল—যাঁকে দিকপতি বললে কম বলা হয়—আচার্য সুনীতিকুমারের প্রয়াণ যে-শূন্যতার সৃষ্টি করেছে, তা কোনোদিনই পূরণ হবে না। এই 'অপূরণীয় ক্ষতি' কথাটা বহুবার বহুজনের শোকসভায় উচ্চারিত হয়ে হয়ে তার ধার হারিয়ে ফেলেছে। যে-কোনো-জনের শোকসভায় এ জাতীয় কথা বলা হয়ে থাকে। অনেকেই এটাকে কথার কথা বলে ভাবতে পারেন। কিন্তু সভার মামুলী বাহারী কথা নয়, আবেগের আতিশয্যে বানানো কথা নয়, আন্তরিক ও আক্ষরিক সত্যতার গভীরত্বে যাচাই করে একমাত্র 'অপূরণীয় ক্ষতি' কথাটা সার্থকভাবে ডঃ চট্টোপাধ্যায়ের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যেতে পারে।

ডঃ চট্টোপাধ্যায়ের মতো বিশ্বকোষিক জ্ঞান ও পাণ্ডিত্য আমাদের বাঙলা সাহিত্যে খুব কম লোকেরই ছিল। চলমান বিশ্বকোষের সর্বশেষ প্রতিনিধি চলে গেলেন। এক-এক যুগে এক-এক মনীষীর আবির্ভাব হয় একথা যদি কালিদাস, শেকস্পীয়র, গ্যেটে, রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে প্রযোজ্য হয় তাহলেও নির্দ্বিধায় বলা যেতে পারে সুনীতিকুমারের মতো ব্যক্তি সচরাচর জন্মান না। সৃষ্টিশীল শিল্পী বলতে যা বোঝায় তা হয়তো তিনি ছিলেন না, কিন্তু তাঁর বিপুল সৃষ্টির দিকে তাকালে অবাক হতে হয়। এক জীবনে তিনি ত্রিশটা ভাষা জানতেন—অনর্গল কথা বলতেন, একাধিক বিষয়ে একাধিক ভাষায় প্রবন্ধাদি লিখেছেন। দেশ-বিদেশের ভাষা ও সাহিত্য, শিল্প ও সংস্কৃতি তাঁর নখদর্পণে ছিল—ভাষা ও সংস্কৃতি আলোচনায় তাঁর ক্লান্তি ছিল না। তাঁর আলোচনা আমাদের বোধিকে উদ্দীপ্ত করে, জ্ঞান বৃদ্ধি করে—তা কোনো অংশে সৃষ্টিধর্মী রচনার চাইতে কম নয়।

ভাষাচার্যরূপেই তাঁর পরিচয়। এ পরিচয় দিয়ে সামগ্রিক সুনীতিকুমারকে ধরা যাবে না। ভাষাবিজ্ঞান আলোচনা করতে গিয়ে তিনি নৃতত্ত্ব পুরাতত্ত্ব সমাজবিজ্ঞান ইতিহাস ভূগোল ধর্ম দর্শন সব কিছু খুঁটিয়ে দেখেছেন। তার শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতির বিস্তৃত পরিচয় নিয়েছেন। আজকের ভাষাবিজ্ঞানের চর্চা যা চমস্কি প্রবর্তিত Transformational generative প্রথায় চলছে তার নিরিখে তাঁর ভাষা-চর্চাকে অপ্রয়োজনীয় বলে নব্যপন্থীরা উড়িয়ে দিতে পারেন, কারণ তাঁরা মনে করেন ভাষাবিজ্ঞান চর্চা করতে হলে আজকের দিনে একাধিক ভাষা জানার দরকার নেই, সাহিত্য-সংস্কৃতির ইতিহাস জানার দরকার নেই, ওসব ফালতু কাজ। কিন্তু ভাষার জাত বিচার করতে হলে তার উৎপত্তি বিস্তৃতি না জানলে জ্ঞান সম্পূর্ণ হয় না। চমস্কির প্রবর্তিত ছকে ফেলে দিলে সেটা শুধু একটা জ্যামিতিক আঁকিবুকি ও সংখ্যাতত্ত্বের ভীতিপ্রদ দলিল হয়ে ওঠে। ভাষার সঙ্গে যে একটা জাতির প্রাণ জড়িয়ে থাকে, ভাষার মধ্যেই তার স্পন্দন অনুভব করা যায়—এই বোধটুকু আমরা নব্যপন্থীদের ভাষাবিজ্ঞান আলোচনার মধ্যে পাব না, তা পাওয়া যাবে সুনীতি-কুমারের রচনার মধ্যে—যেজন্যে আজও তাঁর ODBL একটি মহত্তম কীর্তি হয়ে আছে। জর্জ আব্রাহাম গ্রীয়ারসন অষ্টাদশ খণ্ডে Linguistic survey of India-য় ভাষা-বিবর্তনের যে ইতিহাস লিখেছিলেন, যোগ্য উত্তরসাধকরূপে সুনীতিকুমার সেই কাজকে আরো এগিয়ে দিয়েছেন। আচার্য সুনীতিকুমারের পূর্বসূরীরা যেখানে ভারতীয় আর্যভাষার বিবর্তন-আলোচনায় তিনটি স্তর আদি মধ্য ও অন্ত্য বলেই দায়িত্ব শেষ করেছেন, সেখানে তিনি মধ্য-ভারতীয় আর্যভাষার বিবর্তনকে আরও বিস্তৃতাকারে ও গভীরভাবে চুলচেলা বিশ্লেষণ করে চারটি স্তর নির্দেশ করেছেন। এই আলোচনায় তিনি ইতিহাস সমাজবিজ্ঞান নৃতত্ত্বের পরিচয় দিয়ে বিষয়টিকে আরও ব্যাপ্তি দিয়েছেন। তিনি ভাষাবিজ্ঞান লিখতে গিয়ে ভাষার সঙ্গে জাতির পরিচয়ও দিয়েছেন। এরই সঙ্গে দেশ ও জাতির সাহিত্য সংস্কৃতির সন্ধান নিয়েছেন। 'বৈদেশিকী', 'সাংস্কৃতিকী' (১-২), Africanism গ্রন্থে তারই পরিচয় রয়েছে।

বিশ্বপরিক্রমা তিনি বহুবার করেছেন—এমন কোনো জায়গা নেই যেখানে যান নি। আন্তর্জাতিক সম্মেলনাদিতে যেমন যোগদান করেছেন তেমনি ঐসব দেশের মানুষের সঙ্গে মিশে গিয়ে দেশের নাড়ীর অভ্যন্তরে পৌছে সেই দেশকে নিজের দেশের মতো ভালোবেসে ফেলেছেন। তাঁর ভ্রমণকাহিনী 'রবীন্দ্রসঙ্গমে দ্বীপময় ভারত ও শ্যামদেশ' 'পশ্চিমের যাত্রী' 'ইউরোপ ১৯৩৮' 'পথ চলতি' (১-২)

নিছক ভ্রমণকাহিনী নয়—এগুলি একাধারে সাহিত্য ও সংস্কৃতির ইতিহাস। ভারতের সঙ্গে তিনি ঐসব দেশের মানসিক যোগসূত্র আবিষ্কার করেছেন। 'India and Ethiopia' 'Polionia and India',' India and China', 'India and Polynesia', 'Sanskrit and Russian', 'India and the Germanic World', 'India and the Arab World', 'India and France,' 'India and Iran' প্রভৃতি প্রবন্ধ- পুস্তিকা তার প্রমাণ—তিনি ছিলেন ভারত-সংস্কৃতি-মানসের রাষ্ট্রদূত। আন্তর্জাতিক সম্মেলনাদিতে গিয়ে রাজার হালে থাকার সুবিধা ও সুযোগ ছিল। কিন্তু তিনি তা না করে কৃচ্ছ্রসাধন করে পয়সা বাঁচিয়ে ঐসব স্থানের দ্রষ্টব্য জিনিস ও গ্রন্থাদি কিনেছেন। তাঁর বিরাট সংগ্রহশালা ও গ্রন্থাগার দেখার মতো—তাঁর অবর্তমানে এটি যেন নষ্ট না হয় সেদিকে তাঁর অনুরাগীদের খেয়াল রাখার জন্য অনুরোধ জানাই। আর যাই করুন তাঁরা, যেন দয়া করে সরকারের হাতে তুলে না দেন।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের কথা সুবিদিত। তাঁর সঙ্গে তিনি একাধিক-বার ভ্রমণ করেছেন। ভ্রমণের ইতিহাস 'রবীন্দ্রসঙ্গমে দ্বীপময় ভারত ও শ্যামদেশ' গ্রন্থে রয়েছে—সেখানে রবীন্দ্রনাথ বেশি নেই, যবদ্বীপ শ্যামদেশ তৎসংলগ্ন দ্বীপ-পুঞ্জেরই ভাষা সাহিত্য ও সংস্কৃতির ইতিহাস লিপিবদ্ধ হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে 'Rabindranath Tagore', 'World Literature and Tagore' গ্রন্থে এবং 'ব্যাকরণিয়া রবীন্দ্রনাথ', 'বাকপতি রবীন্দ্রনাথ', 'রবীন্দ্রনাথের দেশমর্যাদাবোধ', 'রবীন্দ্রনাথের জীবনদেবতা', 'রবীন্দ্রনাথ ও বাঙলা ভাষা' প্রভৃতি প্রবন্ধে তিনি মননশীল বিশ্লেষণ করেছেন।

ডঃ চট্টোপাধ্যায়ের প্রতিভার সার্বিক মূল্যায়ন করতে হলে আরেকজন সুনীতি-কুমার হতে হবে, এই রকমই ছিল তাঁর বিশাল কর্মকাণ্ড। সাহিত্য-সংস্কৃতির এমন কোনো দিক নেই যেখানে তিনি তাঁর অনুসন্ধিৎসার রথ চালনা করেন নি। তিনি যা দিয়েছেন তার প্রতিদান বাঙালি তাঁকে দেয় নি। এজন্যে তাঁর কোনো ক্ষোভ ছিল না। তিনি আপন আনন্দেই আত্মভোলা সাহিত্যসন্ন্যাসী ছিলেন। সম্মান তিনি খুঁজে বেড়ান নি, সম্মান তাঁকে খুঁজে বেড়িয়েছে। বিদেশে যে সম্মান পেয়েছেন সে তুলনায় দেশের সরকার কিছুই করেন নি বলতে হবে। দেশের সর্বোচ্চ সম্মান ও সর্বোচ্চ পদ তাঁর প্রাপ্য ছিল। তিনি 'পদ্মবিভূষণ'-এ গিয়ে আটকে গেছেন, 'ভারতরত্ন' হন নি। সাহিত্য অকাদেমির সভাপতি হয়েছেন, কিন্তু তাঁকে রাষ্ট্রপতি করা হয় নি। এতে তাঁর কোনো ক্ষতি হয় নি, আমরাই বরং

ছোট হয়ে গিয়েছি। তাঁর জীবদ্দশায় স্বদেশবাসী বাঙালি তাঁর ৭০ কিংবা ৮০ বছরে আচার্যের সম্মানে কোনো Felicitation Volume বের করেন নি। অথচ কতই তো সম্মান-গ্রন্থ বেরিয়ে থাকে! যে বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি সারাজীবন অধ্যাপনা করেছেন সেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবার্ষিকী উৎসবে তাঁকে সম্মানসূচক ডক্টরেট দেওয়া হয় নি। সিণ্ডিকেটের সভায় মতবিরোধ দেখা দিয়েছিল —বাঙালি হিসেবে তাঁর প্রতি আমাদের এই হচ্ছে কৃতজ্ঞতার নিদর্শন। আমাদের লজ্জার হাত থেকে বাঁচিয়েছেন কলকাতার 'জিজ্ঞাসা' প্রকাশনী; 'Suniti Kumar Chatterjee—the Scholar and the Man' তাঁকে জানা ও চেনার পক্ষে একমাত্র গ্রন্থ। ১৯৭০ পর্যন্ত ডঃ চট্টোপাধ্যায় রচিত গ্রন্থ ও প্রবন্ধাদির তালিকা অনিলকুমার কাঞ্জিলাল অত্যন্ত যোগ্যতার সঙ্গে সম্পাদন করেছেন। পরবর্তী ছ-বছরের তালিকা প্রণয়নের কাজ বাকি। এই কাজটি তিনি ছাড়া আর কেই বা সুচারুভাবে সম্পন্ন করতে পারেন?

আগেই বলেছি ডঃ চট্টোপাধ্যায় ছিলেন জীবন্ত বিশ্বকোষ। যে কোনো প্রশ্ন তাঁর কাছে নিয়ে গেলে তিনি অক্লেশে তার সমাধান দিতে পারতেন। পাণ্ডিত্যের বোঝা দিয়ে নয়, প্রকৃত রসবেত্তার মতো সরল সহজ করে এমনভাবে জবাব দিতেন যে প্রশ্নকর্তার সমতলে এসে তিনি যেন তারই মতো জিজ্ঞাসু হয়ে পড়তেন। তাঁর এই গুণটি তাঁর লেখার মধ্যেও পাই—শুকনো পাণ্ডিত্য নিয়ে তাঁর কারবার ছিল না, তিনি লেখার মধ্যে প্রকৃত রসসঞ্চার করেছেন। নীরস কঠিন বিষয়কে সহজ করে বলার মতো ক্ষমতা তাঁর যেমন ছিল তেমনি ছিল লেখার হাত। বৈঠকী আলাপ-আলোচনায় সকলকে নিয়ে আড্ডা দিতে যেমন পারতেন, গ্রন্থসমূহেও সেই ধারা বজায় রাখতে চেষ্টা করতেন। রবীন্দ্রনাথ বলতেন "কথা বলবে সাধারণের মতো লিখবে পণ্ডিতের মতো।" তার মানে এ নয় যে লেখাকে পাণ্ডিত্যের বোঝা দিয়ে বেঁধে ফেলতে হবে। রবীন্দ্রনাথ বরাবর এ জাতীয় পাণ্ডিত্যকে ঘৃণা করেছেন। সুনীতিকুমার পাণ্ডিত্যের দিয়ে পাঠককে চাপা দিতে চান নি। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তাঁর বাঙলা রচনারীতি সম্পর্কে বলেছেন, "আমি তাঁকে নিছক পণ্ডিত বলেই জানতুম। অর্থাৎ আস্ত জিনিসকে টুকরো করা ও টুকরো জিনিসকে জোড়া দেওয়ার কাজেই তিনি হাত পাকিয়েচেন ব'লে আমার বিশ্বাস ছিলো। কিন্তু এবার দেখলুম, বিশ্ব বলতে যে ছবির স্রোতকে বোঝায়, যা ভিড় ক'রে ছোটে এবং এক মুহূর্ত স্থির থাকে না, তাকে তিনি তালভঙ্গ না ক'রে মনের মধ্যে দ্রুত এবং সম্পূর্ণ ধ'রতে পারেন, আর কাগজে-কলমে সেটা দ্রুত এবং সম্পূর্ণ তুলে নিতে

পারেন। এই শক্তির মূলে আছে—বিশ্ব ব্যাপারের প্রতি তাঁর মনের সজীব আগ্রহ। তাঁর নিজের কাছে তুচ্ছ ব'লে কিছুই নেই, তাই তাঁর কলমে তুচ্ছও এমন একটি স্থান পায় যাতে তাকে উপেক্ষা করা যায় না। সাধারণতঃ একথা বলা চলে যে, শব্দতত্ত্বের মধ্যে যারা তলিয়ে' গেচে, শব্দ-চিত্র তাদের এলেকার সম্পূর্ণ বাইরে, কেননা চিত্রটা একেবারে উপরের তলায়। কিন্তু সুনীতির মনে সুগভীর তত্ত্ব ভাসমান চিত্রকে ডুবিয়ে' মারে নি—এই বড়ো অপূর্ব।…অধিকাংশ লোক শিশুকাল থেকেই পরের মতো লেখা লিখতে অভ্যাস ক'রে পরীক্ষায় মার্কা পায় তাদের পক্ষে সকলের চেয়ে কঠিন কাজ হচ্ছে নিজের কথা নিজের ভাষায় লেখা। তোমার এই লেখায় ধীরেন যাকে বলে "মজা" সেইটে পাওয়া যাচ্চে। এ কলের জল নয়, ঝরণার জল।"

ডঃ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমার আলাপ ১৯৫০ সাল থেকে। প্রথমে চিঠি দিয়েই পরিচয়ের সূত্রপাত, পরে দেখা সাক্ষাৎ। আমি সবে তখন কিছু কিছু লেখার চেষ্টা করছি। ইতিহাস আমার প্রিয় বিষয় হওয়ায় আমি প্রথমের দিকে ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিষয়ক কিছু কিছু লেখা লিখতাম। বইপত্র পড়তে গিয়ে আমার মনে কিছু কিছু প্রশ্ন দেখা দিত, সমাধানের জন্য যদুনাথ সরকার, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও রমেশচন্দ্র মজুমদারের শরণাপন্ন হতাম। প্রথমে পত্রাঘাত, পরে তাঁদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ। এভাবেই সুনীতিবাবুর সঙ্গে আমার পত্রালাপ শুরু হয়। চিঠিপত্র মারফৎ যখন সব কথা বুঝতে পারতাম না তখন তাঁর 'সুধর্মা'য় কিংবা জাতীয় গ্রন্থাগারে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করেছি। এভাবে তাঁর সঙ্গে নানা বিষয়ের নানা প্রসঙ্গ নিয়ে পত্রালাপ হয়েছে। তিনি আমার একটি বইয়ের ভূমিকাও লিখে দিয়েছেন—ভূমিকা লেখার আগাম প্রতিশ্রুতি পেয়েছিলাম বলেই বইটি লেখার কাজ তাড়াতাড়ি শেষ করতে পেরেছিলাম। ভূমিকা লেখার বিষয়ে তাঁকে একটি অনুরোধ করেছিলাম যে লেখক সম্পর্কে তিনি যেন কিছু না লেখেন, তাঁর বক্তব্য শহীদুল্লাহ্ সাহেবের ওপরই যেন নিবদ্ধ থাকে। অধিকাংশ বইয়ের ভূমিকায় দেখেছি উদ্দিষ্ট বিষয় বা ব্যক্তির থেকে লেখকই প্রধান হয়ে ওঠেন। তাঁর লিখিত ভূমিকাটি এর ব্যতিক্রম। একটি জায়গায় আমি আপত্তি জানিয়েছিলাম। আমার নামের আগে 'মৌলবী' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে—এটি পরিবর্তন করার কথা বলেছিলাম। তিনি বলেছিলেন, আপনি মুসলমান—'মৌলবী' শব্দে আপত্তি কেন? মধ্যপ্রাচ্য আরব জগতে 'মৌলবী' শব্দটি অত্যন্ত সম্মানের। শব্দটি পরিবর্তন করাতে পারি নি।

তাঁকে দিয়ে আর দুটো কাজ করাতে পারি নি এক আমাকে 'তুমি' বলা আর একটি তাঁকে প্রণাম করার অধিকার পাওয়া। তিনি কারোর প্রণাম নিতেন না—প্রণাম করতে গেলে হাত ধরে ফেলতেন। অনেকবার চেষ্টা করেছি, পারি নি। আমি মুসলমান সেজন্যে আমাকে শাস্ত্রের দোহাই দিতেন। ইসলামে প্রণামের বিধান নেই। মানুষ মস্তক আনত করবে একমাত্র আল্লাহের কাছে, আর কারোর কাছে নয়। একথা কুর আন শরীফের আয়েত উদ্ধৃত করে বাধা দিতেন। কুর আন শরীফের আয়েত অনর্গল মুখস্ত বলে যেতেন, আমি অবাক হয়ে থাকতাম। তিনি বলতেন প্রতিদিন ভোরে বেদ উপনিষদের সঙ্গে সুরু ফাতেহার আবৃত্তি করেন। তাঁর আরবী হাতের লেখা দেখার মতো ছিল—তিনি কয়েকটি চিঠিতে আরবীতে কুর আনের সুরা লিখেছেন। তাঁর মধ্যে শুধু 'মজম' উল-বহরৈন' দুই সমুদ্রের মিলন হয় নি, সপ্তসিন্ধু দশদিগন্তের মিলনে যে সংস্কৃতির জন্ম তারই অন্য নাম সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।

তিনি নেই একথা যেমন সত্য, তার চেয়ে বড়ো সত্য তিনি আছেন। তিনি থাকবেন। ব্যক্তি থাকে না, তার কাজ থাকে। সেই কাজ তাঁকে কালজয়ী করবে। ব্যক্তি প্রণাম তিনি যখন নিতেন না তখন তাঁর কাজকেই প্রণাম জানিয়ে বলি "ধরব তারে ভরব তারে রাখব তারে সাথে।"

সবশেষে তাঁর সঙ্গে আমার যে সূত্র ধরে পরিচয় হয়েছিল তাঁর লেখা সেই প্রথম চিঠির সঙ্গে আরও দুখানি চিঠি যোগ করে আমার ব্যথার পূজা সমাপন করতে চাই। এরই সঙ্গে একটি অনুরোধ রাখতে চাই যে ইংরেজি ও বাঙলা ভাষায় তিনি নানাজনকে প্রচুর চিঠিপত্র লিখেছেন। এই চিঠিগুলি বিস্মৃতির গর্ভে বিলীন হবার আগেই যেন সংগ্রহ করে রাখা হয়।

কাছে থেকে দেখা

অনিলকুমার কাঞ্জিলাল

আমাদের এই নিরক্ষর দুর্ভাগা দেশে যাঁরা বিদ্যালাভের সুযোগ পেয়েছেন তাঁরা ভাগ্যবান্, আর যাঁরা বিদ্যার চর্চায় আত্মনিয়োগ করতে পারেন তাঁরা অসাধারণ। এই অসাধারণদের মধ্যে অধ্যাপক সুনীতিকুমার ছিলেন একজন। মস্ত বড়ো পণ্ডিত —এটা-ই ছিল বড়োদের সমাজে সুনীতিকুমারের বড়ো পরিচয়। কিন্তু তাঁর সম্পর্কে যারা সাধারণ যারা ছোটো, তাদের বলতে শুনেছি : 'কত বড়ো মানুষ!' বিদ্বান্ সুনীতিকুমারকে তারা বুঝতো না, তারা চিনেছিল মানুষ সুনীতিকুমারকে। সুনীতিকুমার বড়ো ছিলেন—বড়োদের কাছেও, ছোটদের কাছেও। কিন্তু ভিন্ন অর্থে, ভিন্ন রূপে।

এক ভদ্রমহিলা, কালীঘাটের কাছে এক গলিতে থাকেন, সুনীতিকুমারকে লিখেছেন : তাঁর স্বামী যক্ষ্মায় অকর্মণ্য, শয্যাশায়ী, সংসারে উপার্জনক্ষম লোক আর নেই, নাবালক সন্তানদের নিয়ে তিনি বিপন্ন, স্বামীর পথ্যও জুটছে না, চিকিৎসা তো দূরের কথা। চিঠিখানা প'ড়ে সুনীতিকুমার খুব অস্বস্তি বোধ করতে থাকেন। তাঁর একান্ত সচিব শ্রীশিশিরকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়কে চিঠিখানি পড়তে দেন। শিশিরবাবু ঠিক বিশ্বাস করতে পারেন না। কিন্তু সুনীতিকুমার তাঁর হাতে পঞ্চাশটি টাকা দিয়ে বলেন : "চিঠিতে ঠিকানা দেওয়া আছে, ঐ ঠিকানায় গিয়ে খোঁজ নিন, যদি বোঝেন মহিলাটি যা লিখেছেন তা সত্যি, তাহ'লে এ টাকা কয়টি তাঁর হাতে দেবেন।" আপিস থেকে ফেরবার পথে শিশিরবাবু ঐ ঠিকানায় গিয়ে খোঁজ নিয়ে জানেন মহিলাটি একবর্ণ মিথ্যা লেখেন নি। তিনি তখন তাঁর হাতে টাকা কয়টি দেন। মহিলাটি প্রথমটায় হতভম্ব হ'য়ে যান, তারপরে কেঁদে ফেলেন : 'ভগবান্ এখনো আছেন।"

আমাদের আপিসে এক জমাদার কাজ করে। বয়সে তরুণ। সে কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারী, অধ্যাপক মশাই তার উপরআলা নন। লোকটির স্ত্রীর টি-বি হয়েছে। তার উপরআলাদের ধ'রে সে কিছু করতে পারে নি। অবশেষে হতাশ হ'য়ে সে এসে অধ্যাপক মশাইকে ধরে। তিনি উদ্যোগী হ'য়ে যাদবপুর হাসপাতালে তার স্ত্রীর চিকিৎসার ব্যবস্থা ক'রে দেন। সে সুস্থ হ'য়ে ঘরে ফিরে আসে। অধ্যাপক মশাইয়ের মৃত্যুর পরের দিন এই সাধারণ লোকটি আমাদের

আপিস-ঘরে এসে সাধারণ মানুষটির উদ্দেশ্যে মনের দুঃখ জানিয়ে বললে : "কত বড়ো মানুষ ছিলেন !"

এই মানুষটির মৃত্যুর দিন চারেক পরে এক দরিদ্র ভদ্রমহিলা আমাদের আপিসে এসে, অধ্যাপক মশাই যে ঘরে ব'সে কাজ করতেন, সন্তর্পণে সেই ঘরে ঢুকে তাঁর টেবিলের পাশে পাথরের মতো নিশ্চল দাঁড়িয়ে রইলেন। ছল ছল চোখে ভাঙা গলায় বললেন : "বাবার দয়ায় এখনো আমরা বেঁচে আছি। এমন মানুষ হয় না। আজ আমরা অনাথ হলাম।"

সুনীতিকুমার যত বড়ো ছিলেন বিদ্যাবত্তায়, তারও চেয়ে বড়ো ছিলেন মনুষ্যত্বে। সাধারণে তাঁর যে পরিচয় পেয়েছে, সে-ই হ'লো তাঁর খাঁটি পরিচয়। পাণ্ডিত্যের খ্যাতি ভঙ্গুর, শেষ পর্যন্ত যদি কিছু টেকে সে হ'লো মনুষ্যত্বের মহিমা।

১৯৭৪ সালের মাঝামাঝি, একদিন বিকালে অধ্যাপক মশাইয়ের সঙ্গে এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে বেরিয়ে কলেজ স্ট্রীটের দিকে আসছি। ওয়েলেসলি স্ট্রীট ইলিয়াট রোডের মোড়ে এসে গাড়ি থামলো। সামনে গোটা দুই রিক্সা, তার সামনে একখানি ট্যাক্সি। একটা ট্রাম বাঁক নিচ্ছে। বাচ্চা কোলে এক ভিখিরিনি, ফুটপাথ থেকে নেমে, গাড়ির জানলার পাশে এসে হাত পেতে দাঁড়াল। অধ্যাপক মশাই তাঁর ফতুয়ার পকেট থেকে কয়েকটি পয়সা বার ক'রে তার হাতে দিলেন। গাড়ি আবার চললো। অধ্যাপক মশাই বললেন : "মানুষ যে-হারে জন্মাচ্ছে তাতে ভিখিরির সংখ্যা বাড়বেই। মানুষ যত জন্মাবে, ভিখিরিও তত বাড়বে।" আমি বললাম : "কিন্তু শিশুটির কী অপরাধ, স্যর ? ও তো স্বেচ্ছায় জন্মে নি।"

"না, ওর কী অপরাধ ?"

"তা হলে ওরও তো আমারই মতো বাঁচবার অধিকার আছে ?"

"আমি জানি, কিন্তু বাঁচবে কী ক'রে ? খাবে কী ? মানুষের জন্ম ঠেকাতে না পারলে, দেখবেন, ভবিষ্যতে খাদ্যের অভাবে মানুষ মানুষকে ধ'রে খাবে।"

"কিন্তু কেবল জন্ম ঠেকাতে পারলেই কি সব সুরাহা হ'য়ে যাবে ? সমাজ-ব্যবস্থাও কি পালটাতে হবে না ?"

"সে রাতারাতি হয় না। ইচ্ছে করলেই তা করা যায় না। মারদাঙ্গা ক'রে সমাজ গড়া যায় না, তাতে সমাজ ধ্বংসই হবে।"

গাড়ি ততক্ষণে ধর্মতলা স্ট্রীটের মোড় পেরিয়ে ওয়েলিংটন স্ট্রীটে পড়েছে। আমি চুপচাপ আছি। অধ্যাপক মশাই যেন নিজেকে শুনিয়েই বললেন : "এক সময়ে ভাবতুম, evolution-এর অন্যথা ঘটবে না। এখন মনে হয়, কখনো কখনো

revolution এড়ানো যায় না।"

তাঁর চোখে ছানি পড়তে শুরু করেছিল অনেক আগে থেকেই। রোজ ওষুধ দেওয়াতে, "উঠ্‌তি ছানি আর প্রসার লাভ করতে পারে নি—চোখের মধ্যেই মিলিয়ে যাচ্ছিল।" কিন্তু কয়েক বছর ধ'রে ওষুধে আর কাজ হচ্ছিল না। ছানি বাড়তেই থাকে। লেখাপড়ার কাজে অসুবিধা হয়, কষ্ট হয়। ১৯৭৫ সালের মাঝামাঝি থেকে চোখের ছানির জন্যে লেখাপড়ার কাজ ইচ্ছামতো করতে পারেন না। একটা মানসিক উদ্বেগে কষ্ট পান। দুনিয়ার হালচাল আর স্বদেশে মানুষের দুর্গতি আর অধঃপতন দেখে তাঁর মানসিক কষ্ট আরও বাড়তে থাকে। এই সময়ে, আপিস থেকে বাড়িতে ফেরবার পথে প্রায়ই তিনি বলতেন: "I feel so tired, কেন বলুন তো? শরীর ঠিক আছে, রোজ ব্যায়ামও করি। বাদল (পুত্র শ্রীসুমনকুমার) আর বৌমা আমাকে দেবতার আদরে রেখেছে। কোনো দিকে একটু ত্রুটি ঘটবার উপায় নেই। তবু, কী জানি কেন, I feel tired."

এই সময়কার তাঁর মানসিক অবস্থার কিছুটা আভাস মেলে তাঁর নিজেরই কথায়:

> "…এখন দৈহিক ততটা না হইলেও, একটা ভীষণ মানসিক অবসাদ আসিতেছে। কি হইতেছে, আরও কি হইবে, এই চিন্তা প্রায়ই মনের মধ্যে জাগে। যাহা হইবার তাহা হইবেই, মানুষ তাহার নিজের ভাগ্যের নিয়ন্তা নহে। আমরা কিছুই জানি না; মনে হয়, এ জীবনে কিছু জানাও আমাদের পক্ষে সম্ভব নহে। এই বিশ্বাস এখন মনে একটা অভূতপূর্ব শান্তি আনিয়া দিতেছে।…সেই বিরাট শান্তি সমক্ষে থাকিলেও, আমি মানুষ, মানুষের অজানা ভবিষ্যৎ আমাকে পীড়া দেয়। চোখের সামনে যাহা দেখিতেছি, তাহাতে আশা বা আনন্দের কিছু পাইতেছি না। মানুষের ভয়াবহ সংখ্যাবৃদ্ধিই মানুষকে পশুর অধম করিয়া তুলিতেছে। আমার দেশের মানুষের, সমগ্র জগতের মানুষের সর্বত্রই ক্রমবর্ধমান নৈতিক অবনতি। স্বার্থ-প্রণোদিত রাজনীতির খেলাতেই সকলে মাতিয়া উঠিয়াছে।" (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ৮৩তম বর্ষগ্রন্থি উপলক্ষে সভাপতির অভিভাষণ দ্রষ্টব্য)।

কিন্তু তবুও তিনি মানুষে বিশ্বাস হারান নি। আশা ছাড়েন নি, সর্বব্যাপী কদর্যতার মধ্যে কোথাও একটু সুন্দরের কল্যাণের লক্ষণ দেখলে তিনি ভরসা পেতেন. মনে তাঁর আনন্দের সাড়া জাগতো।

"তবু আশা ছাড়িতে পারি না। ভীষণ কাঁটাবনের মধ্যেও দুই একটা মিষ্ট ফলও তো দেখতে পাইতেছি। সার সত্য, শাশ্বত বস্তু যদি কিছু থাকে, —ব্যবহারিক, আনুষ্ঠানিক সমস্ত ধর্মের উর্ধ্বে তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিবার চেষ্টাও দেখা যাইতেছে।" (ঐ)

মাঝে-মাঝে অবসাদ এসেছে, কিন্তু অবসাদে তিনি কর্মে নিরস্ত হন নি। মাঝে-মাঝে নৈরাশ্য দেখা দিয়েছে, কিন্তু নৈরাশ্যে তিনি জীবনে নিস্পৃহ হন নি, কাজের উৎসাহ হারান নি। তাঁর আশা ছিল দুর্মর, কাজের উৎসাহ ছিল অদম্য।

এই সময়ে তিনি একান্তভাবে চেয়েছিলেন, তাঁর কথাতেই বলি, 'জাল গুটোতে'। বাইরের দায়-দায়িত্ব ঝামেলা-ঝঞ্ঝাট ঝেড়ে ফেলে দিয়ে একান্তভাবে নিজের কাজে মন দিতে—যে-কাজ তিনি হাতে নিয়েছেন, যে-কাজে হাত দেবেন ব'লে মনস্থ করেছেন। তিনি বিশ্রাম চান নি। চেয়েছিলেন শুধু একটু অবসর, নিজের কাজের অবসর। নানা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন। চেষ্টা করেছিলেন এসব থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে আনতে। কিন্তু পারেন নি।

সুনীতিকুমার বরাবরই রবীন্দ্রানুরাগী, কিন্তু ১৯৭৫ সালের মাঝামাঝি থেকে তাঁকে দেখেছি রবীন্দ্রতন্ময়। গত মার্চ মাসের শেষ পর্যন্ত দেড় বছর আমার নিত্যকার একটি কাজ ছিল তাঁকে রবীন্দ্রনাথের কবিতা প'ড়ে শোনানো। চোখের জন্যে কষ্ট হ'লেও বাড়িতে তিনি নিজেও রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়তেন, আর আপিস থেকে ফিরে সন্ধ্যায় রবীন্দ্র-সঙ্গীত তো প্রায় রোজই শুনতেন।* 'চিত্রা', 'সোনার তরী', 'উৎসর্গ', 'বলাকা', 'নবজাতক', 'পত্রপুট', 'শেষসপ্তক', 'পূরবী', 'বীথিকা', 'রোগশয্যায়', 'জন্মদিনে', 'শেষ লেখা' প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থের তাঁর মনমতো কবিতা তাঁকে প'ড়ে শুনিয়েছি। 'নবজাতক'-এর "কেন" কবিতাটি আমি অন্ততঃ পাঁচবার তাঁকে শুনিয়েছি, তিনি নিজেও বাড়িতে কতবার পড়েছেন।

অনেক কবিতার বিশেষ বিশেষ স্তবক বারবার ক'রে শুনেছেন, নিজেও পড়েছেন। যেমন 'নবজাতক'-এর "কেন" কবিতার—"...নির্ঝর ঝরিছে দেশে দেশে। লক্ষ্যহীন প্রাণস্রোত মৃত্যুর গহ্বরে ঢালে মহী / বাসনার বেদনার অজস্র বুদ্‌বুদপুঞ্জ বহি। / কে তার হিসাব রাখে নিখিল। / নিত্য নিত্য এমন কি / অফুরান আত্মহত্যা মানবসৃষ্টির / নিরন্তর প্রলয়বৃষ্টির / অশ্রান্ত প্লাবনে। / নিরর্থক

---

* দ্রষ্টব্য সুনীতিকুমারের পুত্রবধূ শ্রীমতী ছায়া চট্টোপাধ্যায়ের ২৬ জুনের দৈনিক বসুমতীতে প্রকাশিত "সুনীতিকুমার—পুত্রবধূর বন্দনায়" শীর্ষক লেখাটি।

হরণে ভরণে / মানুষের চিত্ত নিয়ে সারা বেলা / মহাকাল করিতেছে দ্যূতখেলা / বাঁ হাতে দক্ষিণ হাতে যেন,—। কিন্তু কেন।" 'বলাকা'র ১৯-সংখ্যক কবিতার —"আমি যে রেখেছি ভালো এই জগতেরে ; / পাকে পাকে ফেরে ফেরে / আবার জীবন দিয়ে জড়িয়েছি এরে ; /…ভালো বাসিয়াছি এই জগতের আলো / জীবনেরে তাই বাসি ভালো। / তবুও মরিতে হবে এও সত্য জানি। /…এমন একান্ত ক'রে চাওয়া / এও সত্য যত / এমন একান্ত ছেড়ে যাওয়া / সেও সেই মতো।" 'বীথিকা'-র "ধ্যান" কবিতার—"নাই সুখ দুঃখ ভয়, আকাঙ্ক্ষা বিলুপ্ত হ'ল সব—/ আকাশে নিস্তব্ধ এক শান্ত অনুভব। / তোমাতে সমস্ত লীন, তুমি আছ একা।—/ আমি-হীন চিত্ত মাঝে একান্ত তোমারে শুধু দেখা।" 'উৎসর্গ'-এর "মরণ মিলন" কবিতাটির প্রায় সবটাই তিনি মুখস্থ বলে যেতে পারতেন—এটি ছিল তাঁর অন্যতম প্রিয় কবিতা। 'বীথিকা'র "মরণলতা" পড়েন তিনি পরে। এইটি, 'শেষ লেখা'র "রূপনারানের কূলে" আর "প্রথম দিনের সূর্য" কবিতা তিনটির সবটাই তিনি বারবার শুনতে চাইতেন। রবীন্দ্রনাথের সর্বশেষ কবিতা "তোমার সৃষ্টির পথ রেখেছ আকীর্ণ করি" কবিতাটি পুরোটাই তাঁর কণ্ঠস্থ ছিল। আর কত দিন কত বার যে এই কবিতাটি বৈদিক মন্ত্রের মতো আবৃত্তি করেছেন। লিখে রেখে গিয়েছেন—"আমার কাছে এই কবিতাটির মূল্য অপরিসীম, চরম বলতেও পারি।" আমার মুখে 'পত্রপুট'-এর "আজ আমার প্রণতি গ্রহণ করো, পৃথিবী" কবিতাটির নিতান্তই অক্ষম আবৃত্তি শুনে বলেছেন: "বলতে পারেন এমন glorious sublime কবিতা বিশ্বসাহিত্যে আর কয়টি আছে? ভাষার আর কল্পনার কী grandeur! অথর্ববেদের ভূমিসূক্ত পড়েছেন তো। তাকেও হার মানিয়ে দেয়।" কিছুক্ষণ নিজের মনে কী ভাবলেন। তারপর বললেন: "আমি মনে করি, রবীন্দ্রনাথ ভারতের 'শ্রেষ্ঠ ঋষি', 'কবির্মনীষী'। উপনিষদে যা আছে, রবীন্দ্রনাথে তা পাই, কিন্তু রবীন্দ্রনাথে যা পাই তা আর কোথাও নেই।" ১৯৫২ সালের জানুয়ারি কি ফেব্রুয়ারিতে মেক্সিকো শহরে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের মুখেও সুনীতিকুমার অনেকটা এই মর্মের কথাই শুনেছিলেন (দ্রষ্টব্য "মেক্সিকোতে রবীন্দ্র-সাহিত্য", 'মনীষী স্মরণে' জিজ্ঞাসা, পৃঃ ৭৩-৭৯)।

১৯৭৬ সালের প্রথম দিকে রবীন্দ্রনাথের 'জীবনদেবতা' নিয়ে তাঁর পুরোনো ভাবনা নোতুন ক'রে জেগে ওঠে। ধীরে ধীরে এই ভাবনা একটি সংকল্পে পরিণত হয়—তিনি রবীন্দ্রনাথের 'জীবনদেবতা' নিয়ে বাংলাতে একটি পূর্ণাঙ্গ বই লিখবেন। তার জন্যে তৈরী হ'তে থাকেন। ১৯৭৬ সালের গোড়াতেই তিনি

আত্মজীবনী লেখাতেও হাত দেন। কিন্তু তিনি কি নিশ্চিন্তে ভাবনার বা লেখবার অবসর পেয়েছেন? এই সময়েই লোকের উপদ্রব ক্রমশই বাড়তে থাকে। একদিন আপিসে এসে বললেন: "সবাই বুঝতে পেরেছে, লোকটার দিন ঘনিয়ে এসেছে, এখন যত পারো যেভাবে পারো ওর কাছ থেকে আদায় করে নাও।" এমনও হয়েছে, কোনো সজ্জন, সকালে তাঁর বাড়িতে গিয়ে ঘণ্টা দুই তাঁকে জ্বালিয়ে তাঁর কাছ থেকে নিজের দাবি আদায় করে বিদায় নেবার সময়ে করজোড়ে সকাতরে তাঁকে অনুরোধ করেছেন: 'স্যর, আপনি আর বাজে কাজে সময় নষ্ট করবেন না, এখন কেবল নিজের কাজ নিয়েই থাকুন।'

১৯৭৬ সালের অক্টোবরের শেষ কি নভেম্বরের প্রথমে একদিন সকালে তাঁর বাড়িতে গিয়েছি। ঢুকবার সময়েই দেখি, দুজন ভদ্রলোক বেরিয়ে যাচ্ছেন। তেতলায় উঠে, যে ঘরটাতে ব'সে তিনি লেখাপড়া করেন, সেই ঘরে ঢুকে দেখি, তিনি খাটের উপর একটা তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে ব'সে আছেন, সামনে একখানি বই খোলা, বাইরে কৃষ্ণচূড়া গাছের দিকে তাকিয়ে আছেন। জিজ্ঞেস করলাম, "কারা এসেছিলেন?" উনি কাতর কণ্ঠে বললেন: "আর পারছি না। এরা বুঝবে না। ৮৬ বছরের বুড়ো লোকটার জন্যে এদের একটু মায়াও হয় না। না স্যর, আর কার কাছে যাবো, আর কার কাছেই বা পাবো। কোনো কথা শুনবে না, কেবল এক কথা—'আমাদের দাবি মানতে হবে'। বললাম, "দাবি পূরণ করলেন তো?" ম্লান হেসে বললেন, "কী করবো!" বইখানির দিকে আমার চোখ পড়তেই তিনি বললেন, "এই কবিতাটি পড়ছিলুম, শেষ stanza-টা পড়ুন তো।" পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রবীন্দ্র রচনাবলী জন্ম শতবার্ষিক সংস্করণের দ্বিতীয় খণ্ড, কবিতাটি 'খেয়া' কাব্যগ্রন্থের "ভার"। শেষ stanza-টা পড়লাম—

"যেখানে যা-কিছু পেয়েছি কেবলি / সকলি করেছি জমা—/ যে দেখে সে আজ মাগে যে হিসাব, / কেহ নাহি করে ক্ষমা। / এ বোঝা আমার নামাও বন্ধু, / নামাও। / ভোরের বেগেতে ঠেলিয়া চলেছে, / এ যাত্রা মোর থামাও।"

১৯৭৬ সালে খবরের কাগজগুলিতে প্রচারিত 'রামায়ণ' প্রসঙ্গে সুনীতিকুমারের 'বক্তব্য' নিয়ে সমালোচনার নামে তাঁর বিরুদ্ধে যে অপপ্রচার চলেছিল, এখানে সে বিষয়ের অবতারণা করবো না—অন্যত্র কিছু বলেছি, আর 'পরিচয়'-এর বর্তমান সংখ্যায় বন্ধুবর শ্রীশুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায়ও কিছু লিখেছেন। 'রামায়ণ' নিয়ে সুনীতিকুমার নোতুন বা অভিনব কিছুই বলেন নি। তবে, একথা তিনি বিশেষ জোর দিয়েই বলেন যে, রামকথার সাহিত্য লিপিবদ্ধ প্রাচীনতর রূপ

আমরা পাই পালি খুদ্দক নিকায়ের অন্তর্গত জাতকের কয়েকটি গাথাতে—এই গাথাগুলি সংস্কৃত রামায়ণ মহাকাব্য গ'ড়ে উঠবার পূর্বে, খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকে রচিত। 'রামায়ণ'-এর গোটা উপাখ্যানটি হোমার থেকে ধার করা, এ কথা তিনি আদবেই বলেন না; তিনি কেবল বলেন যে, প্রাচীনতর ভারতীয় mythology-তে রাবণের অনুরূপ রূপকল্পনা দেখা যায় না, প্রাচীন গ্রীক সৃষ্টি-পুরাণকথায় কয়েকটি চরিত্রের (চারমাথাওয়ালা Phanes আর শতভুজ Briareus প্রভৃতি কতিপয় আধা-মানুষ দানবের) রূপকল্পনার সঙ্গে রাবণের রূপকল্পনার একটা মিল দেখতে পাওয়া যায়, আর 'রামায়ণ' মহাকাব্য গ'ড়ে উঠবার আগেই গ্রীসের সঙ্গে ভারতের সাংস্কৃতিক যোগাযোগ ঘটেছিল। কিন্তু এ থেকে তিনি কোনো স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন, তা বলেন নি। বলেছিলেন, এ বিষয়ে তাঁর কিছু বক্তব্য আছে, তিনি সেই বক্তব্য বিশদভাবে প্রকাশ করবেন তাঁর বইতে। সে-বই তিনি লিখতেও শুরু করেছিলেন, কিন্তু চোখের ছানির কারণে কিছুটা লিখে ফেলে রাখতে বাধ্য হন। তবে তিনি জেনে গিয়েছেন যে, তাঁরই আগ্রহে আর উৎসাহে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুকুমার সেনের লেখা 'রামকথার প্রাক্-ইতিহাস' বইখানি বেরিয়ে গিয়েছে।

১৯৭৭ সালের প্রথমেই ঠিক হয় তাঁর চোখের ছানি কাটাতে হবে। তিনি লিখছেন: "চোখের ছানি অস্ত্রোপচারের কথা সব সময়েই মনকে আতঙ্কগ্রস্ত ক'রে রেখেছে", "কবে যে ডাক আসবে জানি না, তবে মনে প্রাণে চোখের এই অবস্থায় তার কামনা করছি, এদিকে Indology, Vedic Studies, রবীন্দ্রসাহিত্য, অন্য আলোচনা নিয়ে আনন্দ, ছবি দেখাও চলছে, বৈদিক হিন্দু 'শ্রাদ্ধপদ্ধতি', রবীন্দ্রনাথের 'জীবনদেবতা' নিয়ে বই লেখার কথাও ভাবছি—"। এ তো নাস্তিকতা নৈরাশ্যবাদ নয়, জীবনে বিতৃষ্ণার লক্ষণ নয়।

এর পরে ১৯৭৭-এর ২৩ ফেব্রুয়ারি, সুনীতিকুমার প্যারিসে তাঁর প্রিয় বন্ধু প্রখ্যাত ভারততত্ত্ববিদ্ ড. লুডউইক স্টার্নবাক-কে এক চিঠিতে লেখেন:...I am now running 87 and still I have a perfect health in mind—though not in body, because I am suffering from cataract in both eyes. But I am looking forward to being operated upon soon, and I am consulting the most eminent eye surgeons in Calcutta and India for this. Deo Volente, if everything comes out all right, I can look forward to having another lease of life and work for three or four more years;

and I would certainly love to visit Paris and Europe once again……

১৯৭৭-এর ১৮ এপ্রিল, আমি তখন দিল্লীতে, তাঁরই বইয়ের ছাপার কাজ তদারক করতে গিয়েছি, সুনীতিকুমার আমাকে লেখেনে (এটাই তাঁর নিজের হাতে লেখা শেষ বাংলা চিঠি):

প্রীতিভাজনেষু,

কাজ মোটের উপর এগোচ্ছে, আমি খুব খুশী। আপনার শরীর ভাল থাকলেই হ'ল। যতটা পারেন এগিয়ে যান। চোখের অপারেশন না হওয়া পর্যন্ত বিশেষ উদ্বেগের অশান্তির মধ্যে আছি। একটা কাগজে আমায় লিখে পাঠাবেন, সময়-মত, Contents of Vol. I & Vol. II of Select Papers in English (P. P. S. [P. P. H.]). & Vols. I & II of Select Writings in English (Vikas). অনেক কাজের বায়না আসছে, প্যারিসে, বার্লিনে, ভুজ (কচ্ছ)-এ—চোখ ফিরে পেলে উৎসাহের সঙ্গে লাগতে পারবো। কাজ চালিয়ে যান। ইতি। শ্রীসুনীতি ১৮।৪।১৯৭৭। বাদল আজ সন্ধ্যায় প্লেনে হাইদরাবাদ থেকে আসছে—তার পরে অপারেশনের ব্যবস্থা হবে।

যা কিছু উদ্বেগ অশান্তি কষ্ট, সে কেবল চোখের জন্যে—কাজ করতে না পারার জন্যে "দু চোখের জ্যোতি কমেছে", কাছের জিনিস ঝাপসা হ'য়ে আসছে"—কিন্তু দৃষ্টি দূর ভবিষ্যতে বিসর্পিত · বয়সে বৃদ্ধ, কিন্তু প্রাণশক্তিতে আর কর্মোৎসাহে তেজীয়ান্ তরুণ।

ঠিক এক মাস পরে, ১৮ মে, নার্সিং হোমে বাঁ চোখে অপারেশন হয়। ২৪ মে নার্সিং হোম থেকে সুস্থ শরীরে বাড়ি ফিরে আসেন। ২৬ মে বিকেলে বাড়িতে তাঁর সঙ্গে আমার শেষ সাক্ষাৎ। দুখানি চিঠি ডিক্টেট করেন, শিশিরবাবু শর্ট হ্যাণ্ডে লিখে নেন। আমার সঙ্গে কিছু কাজের কথা হয়। বলেন: "চশমা পাবার অপেক্ষায় আছি। হাতে অনেক কাজ। চশমা পেলে কাজে লাগতে পারবো।" কাজ কাজ কাজ। কাজেই আনন্দ, আনন্দ সাহিত্যে সংগীতে শিল্পে আর মানুষের আসঙ্গে।

কাজের মধ্যেই অকস্মাৎ ডাক এল ২৯ মে দুপুরে। সবাইকে হতচকিত ক'রে চলে গেলেন বিকেলে। ১৯০৪ সালে, "চোদ্দ বছরের ছেলের মনের মধ্যে যে মানসী দেবী সুপ্ত ছিল", "রবীন্দ্রনাথের লেখার সঙ্গে প্রথম সংস্পর্শ লাভে", "সোনার

কাঠির ছোঁয়াচ পেয়ে", সে জেগে উঠেছিল—সেই জাগরণের চেতনায় সেই ছেলে যৌবনে "আকাশভরা সূর্য-তারা, বিশ্বভরা প্রাণ, তাহারই মাঝখানে" খুঁজে পেয়েছিল তার সঠিক "স্থান"। সেই মানসী দেবী ৭৩ বছর পরে উর্বশীর মতো অন্তর্হিত হলো। যে-স্থানে দাঁড়িয়ে সুনীতিকুমার একাদিক্রমে ৭৩ বছর "জীবনরসধারা অহর্নিশি ধ'রে" পান করেছেন, সে স্থানে, ডাক আসতেই, তিনি ছেড়ে দিলেন বিনা দ্বিধায়—যেন প্রস্তুত হ'য়েই ছিলেন। উর্বশীকে ফিরে পাবার জন্যেই কি?

*　　　*　　　*

সুনীতিকুমার চ'লে যাবার পরে বিশেষ একটি সম্প্রদায় থেকে গুঞ্জন উঠেছে—ভাষাতত্ত্বে সুনীতিকুমারের দান সামান্যই, আর তাঁর ভাষা-ভাবনায় মৌলিকতা কিছু ছিল না, তিনি তাঁর গুরুদের অনুসরণ করেছেন মাত্র। এ কথা সত্যি—সুনীতিকুমার তাঁর ভারতীয় পূর্বাচার্য পাণিনি আর প্রগতি শাস্ত্রকারদের শাস্ত্র থেকে আর তাঁর ইউরোপীয় গুরুদের কাছ থেকে শিক্ষালাভ করেছিলেন। সুনীতিকুমার সম্পর্কে ইউরোপীয় আচার্য Jules Bloch বলেছিলেন: "...the motherland of Yaska and of Panini to whom European linguistics owes its birth produces at last a true linguist. অন্যার্থ:—ভাষাতত্ত্বে সুনীতিকুমারের মৌলিক কৃতিত্ব কিছু নেই। এ কথাও সত্যি, সুনীতিকুমার ১৯৬১ সালে International Phonetic Association-এর সভাপতির পদে 'মনোনীত' হন নি—তিনি সভাপতি 'নির্বাচিত হয়েছিলেন ভোটে। কিন্তু সেটা, এই বিশেষ সম্প্রদায়ের দৃষ্টিতে, তাঁর প্রবীণতার প্রমাণ—আধুনিকতার প্রমাণ নয়। এঁদের বিচারে, সুনীতিকুমার ছিলেন প্রকৃতপক্ষে এক আশ্চর্য কথার জাদুকর, তাঁর রমণীয় আলাপচারিতায় তিনি সবাইকে মুগ্ধ ক'রে রেখেছিলেন। আসলে এঁরা সুনীতিকুমারকে বুঝতে ভুল করেন। সুনীতিকুমার শব্দশাস্ত্রের চর্চা করলেও তিনি শব্দশাস্ত্রের কূপমণ্ডুক ছিলেন না। তিনি ছিলেন মুখ্যত মানবিকী বিদ্যার সাধক, আর তাঁর এই সাধনার মূলে ছিল, যেটা রবীন্দ্রনাথ লক্ষ্য করেছিলেন, "বিশ্ব-ব্যাপারের প্রতি তাঁর মনের সজীব আগ্রহ।" তিনি যদি অমানুষিক শব্দশাস্ত্রের তাত্ত্বিক হতেন, তা হ'লে তিনি এমন কি The Origin and Development of the Bengali Language-ও লিখতে পারতেন না—আর 'রবীন্দ্র-সংগমে দ্বীপময় ভারত ও শ্যাম-দেশ', 'গ্রীক ভাস্কর্য' (অপ্রকাশিত), Kirata-Jana-Krti, Africanism, Belts and Aryans, India and Ethiopia, World Literature and Tagore,

Iranianism ইত্যাদি বইয়ের বিষয় তো ভাবতেই পারতেন না।

সুনীতিকুমারকে এঁরা হয়তো বা বোঝেন, কিন্তু তাঁর খ্যাতি সইতে পারেন না—

That I am more I feel, as Vultures feel
They are no birds when eagles are abroad.

Eagle আর নেই। Vulture-রা এখন নিজেদের অন্তত birds ব'লে ভাবতে পারবে। কিন্তু Eagle ?

পড়ুয়া সুনীতিকুমার

অতুল সুর

১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দ। বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকেছি এম-এ পড়বার জন্য। আশুতোষ বিল্‌ডিং-এর দোতলাটা তখনও সম্পূর্ণ তৈরী হয় নি। মাত্র পূব ও দক্ষিণ দিকের খানিকটা তৈরী হয়েছে। উত্তর-পূব দিকের সিঁড়ি দিয়ে উঠলেই সামনে পড়ে নৃতত্ত্ব বিভাগের ঘর। তার পাশের ঘরটাই প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের ঘর। আমি দু বিভাগেরই ছাত্র। সুতরাং এ দু ঘরেই আমার আনা-গোনা। তবে প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতির ঘরটাতেই বেশী সময় কাটাতাম। ও ঘরটাতেই পড়ানো হত প্রাচীন ভারতের চারুকলা। তিনজন অধ্যাপক ছিলেন—ডঃ কালিদাস নাগ, অধ্যাপক জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও ডঃ স্টেলা ক্রামরিশ। ডঃ কালিদাস নাগের বাগ্মিতা, অধ্যাপক জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মূর্তিতত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞানের গভীরতা, ও ডঃ স্টেলা ক্রামরিশের ভাস্কর্যের ছন্দ, জ্যামিতিক ঐক্য ও নান্দনিক সৌন্দর্য সম্বন্ধে ব্যাখ্যা আমাদের বিশেষভাবে মুগ্ধ করত। যখন, পড়ানো হত না, তখন আমরা চার বন্ধুতে মিলে ওখানে গল্প-গুজব করতাম। এই চারজন হচ্ছে দেবপ্রসাদ ঘোষ (পরে আশুতোষ মিউজিয়ামের অধ্যক্ষ), নীহাররঞ্জন রায় (পরে ডবল ডক্টরেট ও বাগেশ্বরী অধ্যাপক), শ্যামাচরণ ভট্টাচার্য (পরে 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র গ্রন্থাগারিক) ও আমি।

আমরা কেউই সুনীতিবাবুর ছাত্র ছিলাম না। তিনি তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক শব্দতত্ত্বের অধ্যাপক। সে যুগে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি. লিট. উপাধির খুব নামডাক ছিল। সুনীতিবাবু এই উপাধির ধারক ছিলেন। সেজন্য আমাদের কাছে তিনি একজন বিশিষ্ট পণ্ডিত লোক বলে গণ্য হতেন। তবে তাঁর লেখার সঙ্গে আমরা বিশেষভাবে পরিচিত ছিলাম না। তখন পর্যন্ত ইংরেজিতে তিনি মাত্র সাতটা প্রবন্ধ প্রকাশ করেছেন। লেখাগুলো বেরিয়েছিল 'ক্যালকাটা রিভিউ,' 'মডার্ন রিভিউ' ও 'ইণ্ডিয়ান হিস্টরিক্যাল কোয়ার্টারলি'তে। সবগুলোই হালকা ধরনের প্রবন্ধ। মাত্র একটা তাঁর নিজ বিষয়ে 'সিরিয়াস' নিবন্ধ ছিল। সেটা বেরিয়েছিল স্কুল অভ ওরিয়েণ্টাল স্টাডিজ-এর 'বুলেটিন'-এ। বোধ হয় প্রবন্ধটার নাম ছিল 'ইণ্ডিয়ান ফনোলজি' বা এই রকম কোন নাম। এর পরের বছর (১৯২৬) যখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তাঁর 'অরিজিন অ্যাণ্ড ডেভালপমেণ্ট

অভ বেঙ্গলি ল্যাঙ্গুয়েজ' বেরুল, তখনই তাঁর সুগভীর পাণ্ডিত্যের সঙ্গে আমরা পরিচিত হলাম।

সুনীতিকুমারকে আমরা দূর থেকেই দেখতাম। তাঁকে দেখলে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধায় আমাদের মাথা নত হয়ে যেত। একদিন তিনি আমাদের ঘরে এলেন এবং কালিদাসবাবুকে বলে কয়েকখানা ভারতীয় শিল্পের বই নিয়ে গেলেন। তারপর এই একই কারণে তিনি প্রায়ই আমাদের ঘরে আসতেন। এই ভাবে আমরা প্রথম তাঁর সান্নিধ্যে আসি।

একদিন আমাদের বন্ধুমহলে আলোচনা হল, সুনীতিবাবু তো শব্দতত্ত্বের লোক, শিল্পকলার বই নিয়ে গিয়ে কি করেন? আমরা লক্ষ্য করলাম যে তিনি বিশেষ করে মালয়, সুমাত্রা, জাভা, বলি ও শ্যাম প্রভৃতি দেশে ভারতীয় শিল্পকলার যে বিস্তার লাভ ঘটেছিল, সেই সম্পর্কিত বইগুলোই নিয়ে যান। কারণটা আমরা বুঝতে পারলাম যখন পরের বছরে (১৯২৭) তিনি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ওই সব দেশ ভ্রমণে গেলেন। এর আগের বার (১৯২৫) রবীন্দ্রনাথ যখন চীন ও প্রাচ্যদেশ সমূহে গিয়েছিলেন, তখন ডঃ কালিদাস নাগই তাঁর সঙ্গে গিয়েছিলেন। দীর্ঘদিন বাইরে থাকলে ছাত্রদের অসুবিধা হবে বলে, এবার কালিদাসবাবু আর গেলেন না।

সুনীতিবাবু বিদেশ থেকে ফিরে এসেছেন। আমি তখন প্রত্যহ নিয়মিত ভাবে ইম্‌পিরিয়াল লাইব্রেরীর রিডিং রুমে পড়াশোনা করতে যাই। দেখি সেখানেও সুনীতিবাবু যান। রিডিং রুমের অধ্যক্ষ সুরেন কুমার মহাশয় তাঁর জন্য রিডিং রুমের দক্ষিণ দিকে একখানা ঘর নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন। সুনীতিবাবু সেই ঘরেই পড়াশোনা করতেন। এ সব দেখে আমার বদ্ধমূল ধারণা হয়ে গিয়েছিল যে সুনীতিবাবু একজন ভীষণ পড়ুয়া লোক।

Sir Max Pemberton তখন বিলাতের একজন মস্ত বড় লেখক। তাঁর তত্ত্বাবধানেই আমি 'জর্নালিজম্' অধ্যয়ন করেছিলাম। তিনি আমায় প্রথম যে পাঠ দিয়েছিলেন, তার প্রথম বাক্যই ছিল—Journalists are not born, but made.' সুনীতিবাবুর পাণ্ডিত্য ও পড়ার নেশা দেখে আমার অনুরূপ ধারণা হয়েছিল যে—Scholars are not born, but made. সুনীতিবাবুর পড়ুয়া জীবনের দিকে তাকালে, সেটাই মনে হয়। তাঁর পড়ুয়া জীবন শুরু হয়েছিল পাঁচ বছর বয়সে তাঁদের সুকিয়া স্ট্রীটের বাড়ির কাছে এক পাঠশালায়, আর শেষ হয়েছিল তাঁর বাসভবন 'সুধর্মা'য়। ওই পাঠশালাতেই সুনীতিকুমারের

বড় দাদা পড়তেন। সুনীতিকুমার বায়না ধরলেন তিনিও তাঁর দাদার সঙ্গে পাঠশালায় যাবেন। বাড়ির ঝি তাঁকে পাঠশালায় নিয়ে গিয়ে বলল—"গুরুমশাই, এই ছেলেটিকে ভর্তি করে নিন, এর দাদার সঙ্গে রোজ সকালে আসবে, মাইনে সিধে দেওয়া হবে।" সুনীতিকুমারের প্রথম দিনের পাঠশালার অভিজ্ঞতা খুবই ভয়ার্ত। তাঁর ভাষাতেই আমি বলছি—'গুরুমশাই ব্রাহ্মণ, আধাবয়সী, মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি গোঁফ, মাথায় টিকি। আমায় দেখে একবার বেশ ভাল করে তাকালেন, তাতে আমার বড্ড ভয় হল। বললেন, বেশ এইবার থেকে রোজ দাদার সঙ্গে পাঠশালায় আসবি, দাদার পাশে বসবি, আর মন দিয়ে পড়বি, লিখবি। আর যদি পড়তে অমনোযোগী হস্, তা হলে এই যে বেত দেখছিস্, এই বেত দিয়ে তোর এক জায়গায় হাড়, এক জায়গায় তোর মাস করবো। সুনীতিকুমারের সুকৃতি যে পাঠশালায় কোন দিন তাঁকে গুরুমশাইয়ের বেত খেতে হয় নি। তার মানে, কোন দিন তিনি পাঠে অমনোযোগী ছিলেন না।

পাঠশালার পাঠ শেষ করে সুনীতিকুমার কিছুকাল ক্যালকাটা অ্যাকাডেমী নামে আমহার্স্ট স্ট্রীটের এক স্কুলে পড়েছিলেন। তারপর কলকাতায় প্লেগের প্রকোপ হওয়ায় এক বছর শিবপুরে মামার বাড়ি গিয়ে থাকেন। এই এক বছর তাঁর পড়ুয়া জীবনে এক ষতি পতন ঘটে। এক বছর পর আবার যখন কলকাতায় ফিরে এলেন, তখন তাঁর ঠাকুমা মাথায় হাত দিয়ে বসলেন। সুনীতিকুমারের বাবা তখন এক সওদাগরী আপিসে কেরানীর চাকুরি করেন। মাইনে মাত্র ৪৫৲ টাকা। সংসারে দশ-বারো জন খাবার লোক। এই আয়ে কলকাতায় এত বড় সংসার চালানোই দায়, আবার বেতন দিয়ে স্কুলে ছেলেদের লেখাপড়া করাবেন কি করে? আছে মতিলাল শীলের ফ্রি স্কুল, যেখানে বিনা পয়সায় লেখা পড়া করা যায়। ঠনঠনিয়ার 'বিখ্যাত সুবর্ণবণিক বংশ' দত্তদের প্রিয়লাল দত্ত ছিলেন সুনীতিকুমারের বাবার বন্ধু। 'তাঁদের সুপারিশে ও মতিলাল শীলের বাড়ির কর্তাদের অনুগ্রহে' সুনীতিকুমাররা চার ভাই মতিলাল শীলের স্কুলে স্থান পেলেন। খুব মর্মস্পর্শী ভাষায় সুনীতিকুমার বলেছেন—"মতিলাল শীলের কথা মনে হলে, শ্রদ্ধায় ভক্তিতে মাথা সহজেই নত হয়ে যায়, তাঁর চরণে আমাদের কোটি কোটি প্রণাম আপনা থেকেই নিবেদিত হয়, নিজেদের পক্ষ থেকে আর আমাদের মতো সহস্র সহস্র গরীব ছাত্রদের পক্ষ থেকে। এই ইস্কুলের উপর ছায়ার মতো থেকে এর উচ্চ আদর্শকে জীইয়ে রেখেছিল মতিলাল শীলের অশরীরী আত্মা আর আদর্শ তো বটেই, তার সঙ্গে সঙ্গে নাম করতে হয় ইস্কুলের শিক্ষকদের।" এখান থেকেই

সুনীতিকুমার বিশ্ববিদ্যালয়ের সব পরীক্ষার্থীদের মধ্যে ষষ্ঠ স্থান অধিকার করেও কুড়ি টাকার প্রথম শ্রেণীর বৃত্তি পেয়ে ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে এনট্রান্স পরীক্ষায় পাশ করেন।

সুনীতিকুমারের স্কুলে পাঠ্যাবস্থাতাই কলেজ স্ট্রীট YMCA-এর Boys' Branch খোলা হয়। এটা সুনীতিকুমারের স্কুলে যাবার পথেই পড়তো। স্কুলের ছুটির পর সুনীতিকুমার দু-তিন ঘণ্টা এখানেই কাটাতেন ব্যায়াম চর্চায় ও পাঠাগারে পড়াশোনায়। ওঁর বাবা থার্ড ক্লাস পর্যন্ত পড়েছিলেন, কিন্তু পড়াশোনায় ছিল ভীষণ ঝোঁক। আপিস থেকে বাড়ি ফেরবার পথে কলেজ স্ট্রীটের ফুটপাথের ওপর ঢেলে বিক্রি করার গাদা থেকে দু-চার পয়সা দামে ভাল ভাল বই কিনে আনতেন। সবই ইংরেজি বই। বাড়িতে হেমচন্দ্র সুরের একখানা English—Bengali Dictionary ছিল। এটা দেখে তিনি ছেলেদের ইংরেজি শব্দের মানে বলে দিতেন। এই ভাবে সুনীতিকুমার বাবার কেনা প্রচুর ইংরেজি বই পড়ে ফেলেছিলেন। এ ছাড়া সুনীতিকুমারের ঠাকুরদারও একটা বইয়ের সংগ্রহ ছিল। তার মধ্যে ছিল শ্রীমদ্‌ভাগবত, কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারত, সেকস্‌পীয়ারের নাটক সমূহ, আরেবিয়ান নাইটস্, Goldsmith-এর গদ্য রচনা সমূহ ইত্যাদি। সবই সুনীতিকুমার পড়েছিলেন। এ ছাড়া, তিনি পড়ে ফেলেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দের সমস্ত বই।

সুনীতিকুমার যখন স্কুলের ছাত্র, তখন শান্তিনিকেতন থেকে গোরা নামে একটি ছেলে ভর্তি হয় তাঁদের স্কুলে। ক্লাশে সদ্য শান্তিনিকেতন থেকে আগত রবীন্দ্রভক্ত নতুন ছাত্রটিকে পেয়ে গিরিজাবাবু নামে স্কুলের এক শিক্ষক রবীন্দ্র-রচনার বিদ্রূপ আরম্ভ করলেন। একসঙ্গে স্কুল থেকে বাড়ি ফেরবার পথে গোরা ভদ্রভাবে সুনীতিকুমারের কাছে অনুযোগ করত—'তোমরা তো কেউ আমাদের গুরুদেবের কবিতা পড়ো নি, পড়ো না—তোমাকে বলছি পড়ে দেখ, নিশ্চয়ই ভালো লাগবে—একবার পড়লে আর ছাড়তে পারবে না।' সুনীতিকুমারের কবিতা পড়ার অভ্যাস ছিল না, কিন্তু গোরার কথা মনে হল যেন তার চ্যালেঞ্জ। সুনীতিকুমার বললেন—'বেশ পড়বো, তবে তুমি আমায় রবিবাবুর বই দিয়ো, আর ভাল কবিতা বেছে দিয়ো।' সেই শুরু হল সুনীতিকুমারের রবীন্দ্রকাননে প্রবেশ। সুনীতিকুমার বলেছেন—'যে দুজনের লেখার সঙ্গে সংস্পর্শ উত্তরকালে আমার আভ্যন্তর জীবন, চিন্তা, রভসানন্দ প্রভৃতির বিকাশে স্পর্শমণির কাজ করেছে—সে দুজন হচ্ছেন বিবেকানন্দ আর রবীন্দ্রনাথ।' গোরার অনুরোধে

সুনীতিকুমারের রবীন্দ্রনাথের কবিতার সঙ্গে পরিচয় ঘটল ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে, ওঁর যখন ১৩ বছর বয়স। ওই বছরেই সুনীতিকুমারের জীবনে আরও একটা বড় ঘটনা ঘটল। সেটা হচ্ছে অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে সংযোগ। সুনীতিকুমার বলেছেন—"কলকাতার গভর্নমেণ্ট আর্ট স্কুলের ছবির গ্যালারিতে, একদিন বিকালে এক সঙ্গে মধ্যযুগের ভারতের মোগল, রাজস্থানী, কাংড়ী চিত্রকলার প্রথম দর্শন, আর অবনীন্দ্রনাথের কয়খানি ছবির সঙ্গে প্রথম পরিচয়—'বুদ্ধ ও সুজাতা', 'সিদ্ধদ্বন্দ্ব', 'গ্রীষ্ম', 'বসন্ত', 'অভিসারিকা', 'দীবালী', 'জ্যোৎস্নারাতে খোলা ছাতে গানবাজনার জলসা'—আর তা ছাড়া fresco বা ভিত্তিচিত্র 'কচ ও দেবযানী' আর 'রাধাকৃষ্ণ'। 'এই সব ছবি চোখের ভিতর দিয়ে আমার আভ্যন্তর শিল্প-চেতনাকে, আর সঙ্গে সঙ্গে আত্মদিদৃক্ষাকে নতুন ভাবে জাগিয়ে তুলল, আত্ম-সমীক্ষার পথ যেন অনেকটা এগিয়ে দিল।'

কবিতা ও চিত্রকলার সঙ্গে পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে আরও এক ঘটনা ঘটল। সেটা হচ্ছে সুনীতিকুমারের মার্গসঙ্গীতের রসানুভূতি। এটা ঘটল ওঁর মামার বাড়িতে। সেখানে নিয়মিতভাবে বসত মার্গসঙ্গীতের আসর।

সাহিত্য, সঙ্গীত ও চিত্রকলার রসানুভূতি নিয়ে সুনীতিকুমার প্রবেশ করলেন বিরাট বইয়ের জগতে—যখন এনট্রান্স পরীক্ষার পর তিনি জেনারেল এসেমব্লীজ ইনস্টিটিউশনে (স্কটিশ চার্চেস কলেজ) আই-এ ও প্রেসিডেন্সী কলেজে বি-এ পড়তে গেলেন। এই দুই কলেজের গ্রন্থাগারই খুব সুসমৃদ্ধ। সুনীতিকুমার এই বিদ্যায়তন দুটিতে সুবর্ণ সুযোগ পেলেন তাঁর অধীত বিদ্যার পরিধি বাড়াতে। ইংরেজিতে অনার্স নিয়ে বি-এ পাশ করলেন ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে ও এম-এ পাশ করলেন ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে। দুই পরীক্ষাতেই প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করলেন। তারপর সরকার পরিচালিত বৈদিক সংস্কৃত পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হলেন।

সরকারী বৃত্তি নিয়ে দু বছরের জন্য গেলেন বিলাতে। সেখানেই রচনা করলেন তাঁর ডি-লিট-এর থিসিস্—"Indo-Aryan Linguistics: Origin and Development of the Bengali Language"। বইখানা লিখতে গিয়ে School of Oriental Studies-এর বিরাট লাইব্রেরী তছনছ করে ফেললেন। পাণ্ডিত্য প্রদর্শনের জন্য O-D-B-L-এ একটা দীর্ঘ Bibliography দিতে পারতেন, কিন্তু দিলেন না। অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে ভূমিকায় লিখলেন যে বইখানি রচনায় তাঁর মূলধন ছিল মাত্র দুখানি বই—জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের বাঙ্গলা

অভিধান ও বসন্তরঞ্জন বিদ্বদ্বল্লভের শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'দেবী চৌধুরানী'তে বলেছেন—'যে বিদ্যা জাহির করে না, সেই যথার্থ পণ্ডিত।' আমার মনে হয় সুনীতিবাবু সেই আদর্শেরই অনুগামী ছিলেন।

উত্তরকালে তিনি ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত হয়েছিলেন—এশিয়াটিক সোসাইটি, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, জাতীয় গ্রন্থাগার, সাহিত্য আকাদেমী প্রভৃতি সংস্থার সঙ্গে। অসাধারণ সুযোগ ও সুবিধা পেয়েছিলেন তাঁর পড়ুয়া মনের খোরাক যোগাড় করবার। তাঁর অধীত বিদ্যার পরিধি যে কত বিস্তৃত ছিল, তা বোঝা যায় তাঁর নানা বিষয়ে রচিত পুস্তক, নিবন্ধ, পুস্তক-সমালোচনা ও বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানে প্রদত্ত ভাষণসমূহ পাঠ করলে।

শেষ জীবনে অধিকাংশ সময়ই তিনি নিমগ্ন হয়ে থাকতেন তাঁর নিজ বাস-ভবন 'সুধর্মা'য় গঠিত তাঁর নিজ পাঠাগারে। তাঁর সংগৃহীত বই ছিল সংখ্যাতীত ও বিচিত্র বিষয় সম্পর্কিত। সেই পীঠস্থানেই তাঁর পড়ুয়া জীবনের অবসান ঘটে ১৯৭৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৯ মে তারিখে।

সুনীতিকুমারের ধর্মচিন্তা

সুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

পরিণত বয়সে সর্ববিষয়ে কৃতিত্ব অর্জন করে সংস্কৃতিবান একটি প্রধান প্রাণপুরুষ পরলোক প্রয়াণ করেছেন, এ নিয়ে শোক করবার বিশেষ অবসর নেই কারণ আচার্য সুনীতিকুমার আমাদের দেশের ইতিহাসে একটি যুগান্তকারী নাম। এই প্রজ্ঞা-সমৃদ্ধ খাস মজলিসী মানুষটি চিরকালই সংস্কৃতির উপর তলার বাসিন্দা। কারুর প্রশস্তি পত্রের জন্য তিনি অপেক্ষা করেননি বাল্যকাল থেকেই—সব বিষয়েই অগ্রসর—এম. এ.-তে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট—তাও 'বি' গ্রুপে। মানসিক ভোজে তাঁর বিলাস (সাধারণ ভোজেও তাঁর কখনও অনীহা দেখি নি), আর হজম করবার শক্তি অদ্ভুত। মেক্সিকো থেকে যবদ্বীপ, আরমেনিয়ার কাব্যকথা থেকে গ্রীক সাহিত্য, ইগোর গাথা (Slovo O Pulku I goreve) থেকে নিগ্রো আর্ট, সারা পৃথিবীর সাংস্কৃতিক মহলে তাঁর আনাগোনা; অথচ তিনি নিছক ভাষাতত্ত্ববিৎ, যাঁর O. D. B. L. (Origin and Development of Bengali Language) অক্সফোর্ডে সম্মানিত হয়ে ইউরোপীয় সুধীদের কাছে শুধু সুপরিচিত নয়, নানা বিষয়ে "Authority" বলে শ্রুতি এনে দিয়েছিল; শুধু Grierson, Tucci, Sylvan Levi নয়, বহু দেশের বহু পণ্ডিত মানুষের কাছে নয়, তাই সারা বিশ্ব থেকে তাঁর আমন্ত্রণ আসতো—কোথায় মেক্সিকো কোথায় হাওয়াই—চলেছেন সুনীতিকুমার ভারত-কৃষ্টির রাজদূত হয়ে। বোধ হয় রবীন্দ্রনাথের পর এত সম্মান বিদেশে আর কোন বাঙালীই পান নি; অবশ্য বিজ্ঞানে জগদীশচন্দ্র বসু, মেঘনাদ সাহা বা সি. ভি. রমন (তিনি বাঙালীরই আবিষ্কার) প্রভৃতি কেউ কেউ।

রবীন্দ্রনাথের কথা দিয়েই আরম্ভ করি, এসব কথা সবারই জানা—এবং অনেকেই উদ্ধৃতি দিয়েছেন, আমিও দিয়েছি অন্যত্র—তবে কবির কথা বার বার বললেও ফুরোয় না, হারায় না তার প্রাণ-তোষিণী শক্তি, তার হ্লাদিনী মহিমা। প্রায় পঞ্চাশ বছর আগের কথা তরুণ সুনীতিকুমার কবির সহযাত্রী হয়ে চলেছেন ভারতীয় মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জে—অর্থাৎ তখনকার দিনের যবদ্বীপে, বালিতে। ভারতের কবি ভারতের সীমানা পেরিয়ে সদলবলে চলেছেন সাগরপারে যেখানে ভারতের মহিমা আপন অঙ্গনসীমা ছাড়িয়ে থমকে দাঁড়িয়েছে নারিকেল কুঞ্জের

মাঝে। শুধু ভাষায় ভাষায় গাঁট পড়েনি, প্রাণের সঙ্গে প্রাণও তুলেছিল।

বিষ্ণু আমায় কইল কানে বললে দশ ভুজা
অজানা ঐ সিন্ধুতীরে নেব আমার পূজা।

সেখানে রাজার মেয়ের নাম রাখা হয় কুসুম-বর্ধিনী, অর্জুনের সহধর্মিণী হন শ্রীকান্তি, ক্লীব বৃহন্নলার নাম হয় কেন-বর্দি। রামায়ণের কবি আর বেদব্যাসের ভাষা নূতন বাসা পেল সেই সমুদ্রতীরে। বুদ্ধের ত্রিশরণ মন্ত্রও পৌঁছেছিল, পালি জাতকের গল্পও—একদা দোঁহে পড়েছি সেই মোহমোচন বাণী, মহাযোগীর চরণ স্মরি যুগল করি পাণি। কবির ভাষা ধার করে কল্পনা করতে পারি—আলো-ঝলমলানো কল-কল্লোলিত দিগন্ত, আকাশ-সরস্বতী নীল পদ্মের দোলায় দাঁড়িয়ে, সমুদ্রের তরঙ্গে তরঙ্গে মৃদুমধ্যধ্বনি দত্ত তালে মৃদঙ্গ বাজছে। সব কিছু যেন আলোতে তৈরী, বাণীতে গড়া, বিশ্বরাগিণীতে ঝংকৃত—অসাধ্যের সাধনা চলেছে জীর্ণ যুগান্তরের ভগ্নাংশ বিকীর্ণ দুর্গম পথে—তারি মধ্যে কবি চিঠি লিখছেন—আমাদের দলের মধ্যে আছেন সুনীতি। আমি তাঁকে নিছক পণ্ডিত বলেই জানতুম—অর্থাৎ আস্ত জিনিসকে টুকরো করা ও টুকরো জিনিসকে জোড়া দেওয়ার কাজেই তিনি হাত পাকিয়েছেন বলে আমার বিশ্বাস ছিল। কিন্তু এবার দেখলুম বিশ্ব বলতে যে ছবির স্রোতকে বোঝায়, যা ভিড় করে ছোটে এবং এক মুহূর্ত স্থির থাকে না তাকে তিনি তালভঙ্গ না করে মনের মধ্যে দ্রুত এবং সম্পূর্ণ তুলে নিতে পারেন। এই শক্তির মূলে আছে বিশ্বব্যাপারের প্রতি তাঁর মনের সজীব আগ্রহ। তাঁর নিজের কাছে তুচ্ছ বলে কিছুই নেই, তাই তাঁর কলমে তুচ্ছও এমন একটি স্থান পায় যাতে তাকে উপেক্ষা করা যায় না। সাধারণতঃ একথা বলা চলে যে শব্দতত্ত্বের মধ্যে যারা তলিয়ে গেছে, শব্দচিত্র তাদের এলেকার সম্পূর্ণ বাইরে, কেননা চিত্রটা একেবারে উপরের তলায়।

কিন্তু সুনীতির মনে সুগভীর তত্ত্ব ভাসমান চিত্রকে ডুবিয়ে মারে নি এই বড়ো অপূর্ব। সুনীতির নিরন্তর চিঠিগুলি (দ্বীপময় ভারত বইখানি) তোমরা যথা সময়ে পড়বে, পড়লে দেখবে এগুলো বাদশাই চিঠি। এতে চিঠির ইম্পিরিয়ালিজম, বর্ণনাসাম্রাজ্য, সর্বগ্রাহী, ছোট বড় কিছুই তার থেকে বাদ পড়েনি। সুনীতিকে উপাধি দেওয়া উচিত, লিপি বাচস্পতি কিম্বা লিপি চক্রবর্তী।

কবি আর একদিন লিখলেন—সুনীতির যেমন দর্শন-শক্তি তেমনি ধারণা-শক্তি। যতো বড় তার আগ্রহ ততো বড়ই তার সংগ্রহ। যা কিছু চোখে পড়ে সমস্তই তার মনে জমা হয়। কণামাত্র নষ্ট হয় না। নষ্ট হয় না দুদিক থেকেই,

রক্ষণে ও দানে। সুনীতিবাবুর সম্বন্ধে কবির এই যে কথা—তন্নষ্টং যন্ন দীয়তে—এর হাতে হাতে প্রমাণ পেলাম নিজেই কয়েক বছর পরে। তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্যের ও দাক্ষিণ্যের রত্নসমুদ্র হতে কিছু কিছু লাভ আমাদেরও হয়েছে—আজ তা সশ্রদ্ধ চিত্তে স্বীকার করি। যখনি গেছি (এবং কলকাতায় থাকা কালে প্রায়ই যেতুম) তখনি কিছু নূতন সঞ্চয় নিয়ে ফিরেছি—তা সে আচার্য পুরাণগিরির ইতিহাসই হোক, তিব্বতের লামা-কাহিনীই হোক, তামিলনাদের সঙ্ঘম সাহিত্যই হোক বা তিরু কুরলের শ্রীবচনই হোক বা তোল কোপীয়ের ব্যাকরণই হোক বা চেন-তামিদের বিবর্তনই হোক। ব্রহ্মদেশ-শ্যাম-কাম্বোজ, ইন্দোচীন, ইন্দোএশিয়ার ভাষার দেশের, জাতির কত নতুন খবর তিনি আমাদের শোনাতেন তা লিখে রাখতে পারলে তিনটে থিসিসের মাল মশলা জোগাড় হয়ে যেত। শুধু কি এশিয়ার আফ্রিকার কথা, কোথায় নর্ডিক জাতি বাল্টিক সমুদ্র, সেখানকার ইতিবৃত্ত ও কাহিনী তাঁর মুখে মুখে, রাশিয়ার ও স্লাভনিক জাতিদের কতো কাহিনীই তিনি জানতেন। আমি যখন অসমীয়া ভাষা ও সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করছি তখন তিনিই নির্ধারণ করে দিলেন বাংলার সঙ্গে অসমীয়ার কি সম্পর্ক, অর্ধমাগধী থেকে কাদের উৎপত্তি, উলটভাষী ব্রজবুলি এলো কোথা থেকে—সাংস্কৃতিক কোন প্রশ্ন উঠলেই—চলো সুনীতিবাবুর কাছে—অবাধ দ্বার, অসীম সহিষ্ণুতা, ধৈর্য। যখন তিনি ন্যাশন্যাল প্রফেসর, বসেন পুরনো বেলভিডিয়ারের রাজাসনের এক কোণে, তখনও কত প্রশ্ন করেছি, আলোচনা করেছি, জেনেছি, শিখেছি। একেই বলে গুরু। একদিন হয়তো তাঁর সঙ্গে আলোচনা হল গুর্জরী টোড়ী-কোথা থেকে এসেছে, রাণী নিন্নি মৃগনয়নী মহিলাটি কে ছিলেন, রামানুজের প্রিয় শিষ্য ধনুদাস না কুরেশ, কোথায় কাব্য মীমাংসায় একটি গল্প আছে যে শিশুনাগ তাঁর অন্তঃপুরে ট, ঠ, ড, ঢ, ণ, শ, ষ, এবং ক্ষ-র ব্যবহার নিষিদ্ধ করে দিয়েছিলেন, রাজা কুবিন্দও পুরুষ সংযোগাক্ষর। স্থ ও সংগ্রহ নষ্ট করে অর্থ কারণ তার আশ্রয় গ্রহণ করাই কি ভাষার সরলীকরণ? এদিকে যেমন এসব তর্ক আলোচনা শুনছি তেমনি ওদিকে শিল্পের সমালোচনাও—অলীর ভঙ্গী কাকে বলে—অনেকেই জানেন না যে সুনীতি-কুমার ভালো শিল্পীও ছিলেন—এ সম্বন্ধে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তাঁর আঁকা ছবি সম্বন্ধে গগনেন্দ্রনাথকে চিঠি দিয়েছিলেন। আসলে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে যে কথা বলা হয় সুনীতিকুমার সম্বন্ধেও সে কথা প্রয়োগ করা যায়…আমাদের প্রাচীন বিদ্যাভূমি মানবধর্ম স্বরূপ মহৎ বেদকে আবিষ্কার করতে চেষ্টা করছে যার প্রয়োজন বর্তমানে অত্যন্ত গভীর ও অনতিক্রমণীয় হয়েছে। দ্বীপময় ভারতে যখন তিনি গিছলেন

তখন সেখানে 'শ্রাদ্ধ' রূপ এক অনুষ্ঠানে যোগ দেন যার নাম "মেমুকুর" ব্রাহ্মণ 'পদণ্ড' হিসাবে খালি গায়ে। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তাঁর সাথী।

সুনীতিবাবু সম্বন্ধে লিখতে গেলেই অবতরণিকা দীর্ঘ হতে বাধ্য, কিন্তু আমার কাছে প্রশ্ন তোলা হয়েছিল যে আমি তো তাঁর সঙ্গে অনেকদিন নানা বিষয়ে আলাপ-আলোচনার সুযোগ পেয়েছি, তাঁর পরলোকতত্ত্ব বা মৃত্যুর পরে জীবনের সম্বন্ধে কি ধারণা ছিল? অনেকে বলেন, তিনি ছিলেন agnostic atheist বা সংশয়বাদী। তবে তিনি বাহ্যিক আচারে আচরণে লৌকিক প্রথার কোন অনাদর করেন নি, শাস্ত্রীয় আচার অভ্যাসকে অতিক্রম করেন নি, কিন্তু অন্তরের গভীরে তিনি নিজের মনে এই রহস্যের যে সমাধান করেছেন সেটি যেমন যুক্তি-সঙ্গত, তেমনি বিচারসহ.ও কোন মতের প্রতিই সেটি উপেক্ষা প্রদর্শন নয়। তাঁর নিজের লিখিত সেই কথাগুলিই তুলে দিচ্ছি। তাঁর প্রিয়তমা পত্নী কমলাদেবীর মৃত্যুর পর তিনি In Memoriam Kamala Devi বলে একটি পুস্তিকা প্রচার করেন ১৯৬৫ সালে—সেই থেকে একটি উদ্ধৃতি দিচ্ছি—

Our sorrow and my sorrow has a universal character and as she was, she has now passed into Infinity and has become a part of the Great Reality that we feel exists behind life (একে ভগবান বলুন আর নাই বলুন তাতে কিছু যায় আসে না), a Reality to which we all belong. Somehow I sense that she has become universal without ceasing to be personal for me with the memory of all her cares and anxieties and her joys and sorrows for me and in me particularly, and of the great understanding that was between us as man and wife which nothing would desire. (পৃঃ ১৯) মম স্মরণায় পত্ন্যুঃ প্রীতি-শ্রদ্ধা নিবেদনম্। তাহলে—

তত্র কো মোহ কো শোক :

একত্বম্ অনুপশ্যতে।

আমাকে কথা প্রসঙ্গে একদিন তিনি বলেছিলেন যে হিন্দুদের শ্রাদ্ধ কথাটি তাঁর খুব ভাল লাগে কারণ শ্রদ্ধার সহিত বিদেহীকে স্মরণের দিনই হচ্ছে শ্রাদ্ধের দিন এবং সেদিন বার বার আমরা মন্ত্র উচ্চারণ করি।

মধুবাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ
মাধ্বীর্নঃ সন্তোষধীঃ
মধুনক্তম উতোষসো মধুমৎ পার্থিবং রজঃ
মধু দৌস্তু নঃ পিতা
মধুমান্নো বনস্পতি র্মধু মা অস্তু সূর্যঃ
মাধ্বী গাবো ভবন্তু নঃ (বৃহদারণ্যক ৬।৩।৬)

সবই মধু সবই মধু আকাশ মধু বাতাস মধু অন্তরীক্ষ মধু—যিনি ছিলেন তিনি নেই আবার তিনি আছেন। যাকে 'শশ্মানালোদদ্ধোহসি পরিত্যক্তোহসি' সেই বান্ধবকে ডেকে আমরা বললুম—না তুমি আছ আমার প্রেমে প্রীতিতে ধ্যানে মননে শ্রদ্ধায়—তাই সবই মধু। গান্ধীজী বলতেন—ভালবাসার আগুনে সর্বাপেক্ষা কঠিন জিনিসও গলে যায়। যদি না গলে বুঝতে হবে, সে আগুনের জোর কম। ওঁ মধুঃ।

সুনীতিকুমারের রামায়ণ-চিন্তা

দীনেশচন্দ্র সরকার

১৯৭৫ সালের শেষ দিকে দিল্লীতে ভারতীয় সাহিত্য আকাদমি কর্তৃক রামায়ণ সম্বন্ধীয় একটি আন্তর্জাতিক বিতর্ক সভা আহূত হয়েছিল। আকাদমির সভাপতি-রূপে সুনীতিকুমার ঐ সভায় নেতৃত্ব করেন এবং সেখানে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। বিতর্ক সভাটির বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, এশিয়ার যে সব দেশে প্রাচীনকালে ভারতীয় সংস্কৃতির এবং রামায়ণ-কাহিনীর প্রবেশ ঘটেছিল, ওতে ভারতীয় পণ্ডিতগণের সঙ্গে সেই সব দেশের প্রতিনিধিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। ঐ সভাতে আমাকে প্রাকৃত এবং সংস্কৃত লেখসাহিত্যে রামায়ণের উল্লেখ ও প্রভাব সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠের জন্য আমন্ত্রণ করা হয়েছিল।

দিল্লীর বিতর্ক সভার সূত্রে সুনীতিকুমার যে রামায়ণের সমস্যার প্রতি আকৃষ্ট হলেন, তাঁর কলকাতা ফেরার পরেও তার জের চলল। ১৯৭৬ সালের গোড়ার দিকে তিনি এশিয়াটিক সোসাইটীতে রামায়ণ সম্পর্কে একটি বক্তৃতা দেন এবং মাঝে মাঝে এ বিষয়ে তাঁর মতামত সম্বন্ধে সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিভিন্ন ব্যক্তির সমালোচনার কোন কোন মন্তব্যের জবাব দিতে থাকেন। তারপর সাহিত্য আকাদমির কলকাতা শাখার উদ্যোগে জাতীয় পাঠাগারে এক আলোচনা সভার অনুষ্ঠান হল। সেখানে সুনীতিকুমারের সঙ্গে আলোচনার জন্য সুকুমার সেন এবং নীহাররঞ্জন রায়ের সহিত আমাকেও আহ্বান করা হয়েছিল। এইভাবে সুনীতি-কুমারের রামায়ণ-চিন্তার সঙ্গে আমার প্রত্যক্ষ সংযোগ ঘটে। এ বিষয়ে সংবাদপত্রে চিঠি লেখা ছাড়া আমি ইংরাজী ও বাংলায় পাঁচটি প্রবন্ধ লিখেছিলাম। তার মধ্যে চারটি প্রকাশিত হয়েছে। এর একটি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় ছাপা হয়। ঐ পরিষদের সভাপতি ছিলেন সুনীতিকুমার। একথা বলার কারণ এই যে সুনীতিকুমারের রামায়ণ সম্বন্ধীয় সিদ্ধান্তগুলির মধ্যে আমি মাত্র একটির সমর্থক এবং অন্যগুলির বিরুদ্ধবাদী। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি কোনদিন কোনভাবে মনঃক্ষুন্নতা প্রদর্শন করেন নি। তার কারণ, তাঁর প্রতি আমার গভীর শ্রদ্ধার কথা তিনি জানতেন। আমার তর্কাতর্কির উদ্দেশ্য যে কেবল মাত্র আমি যা সত্য বলে বিশ্বাস করি তার প্রতিষ্ঠা, সে বিষয়ে তাঁর কোন সন্দেহ ছিল না। সুনীতিকুমার আমার মতামতের কোন জবাব দেন নি। বোধহয়, পরে কোন গ্রন্থমধ্যে জবাব দেবেন

বলে স্থির করেছিলেন।

সুনীতিকুমার রামায়ণ সম্বন্ধে যে সকল মতামত প্রকাশ করেছিলেন, তার মধ্যে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তগুলিকে প্রধান বলা যায়। প্রথমতঃ, তাঁর মতে রামচরিত এবং রামায়ণ-কাহিনী কাল্পনিক। দ্বিতীয়তঃ, তিনি মনে করতেন যে, বাল্মীকির রামকথার চেয়ে পালি ভাষায় রচিত 'দশরথ জাতকে'র কাহিনী প্রাচীনতর কালের সাক্ষী। তৃতীয়তঃ, তিনি বাল্মীকির রামায়ণের উপর প্রাচীন গ্রীক কবি হোমরের কাব্যের প্রভাব দেখতে পেয়েছিলেন।

এর মধ্যে প্রথম সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে আমার পূর্ণ সমর্থন আছে। আসলে কোন উচ্চশ্রেণীর পণ্ডিতই রামকে ঐতিহাসিক ব্যক্তি বলে মেনে নেন নি। এবিষয়ে আমি যে দু-একটি প্রমাণের উল্লেখ করেছি, তা সংক্ষেপে এইরূপ। রামায়ণের বাল্মীকি রচিত অংশকে অর্থাৎ অযোধ্যাকাণ্ড থেকে লঙ্কাকাণ্ড পর্যন্ত অংশটিকে পণ্ডিতেরা খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীর রচনা বলে স্থির করেছেন। কিন্তু রামায়ণ-কাহিনীর পরিবেশ এর চেয়ে অনেক প্রাচীন। এই কাহিনীতে যমুনার দক্ষিণ কূল থেকে ভারতের দক্ষিণ সীমা পর্যন্ত বিস্তৃত বিজন অরণ্যের মধ্যে কেবলমাত্র কিষ্কিন্ধার বানর রাজ্যের উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে অর্থাৎ মৌর্য যুগে দক্ষিণ ভারতে বিদর্ভ, অশ্মক, চোল, পাণ্ড্য প্রভৃতি জনপদের এবং মাহিষ্মতী, প্রতিষ্ঠান, মথুরা (দক্ষিণ মথুরা) প্রভৃতি নগরীর অস্তিত্বের প্রমাণ আছে। সুতরাং রাম ঐতিহাসিক ব্যক্তি হলে তিনি বাল্মীকির আমলের অর্থাৎ খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীর বহুকাল পূর্বে আবির্ভূত হয়েছিলেন। রাম যদি বাল্মীকির সমসাময়িক না হন, তবে বাল্মীকি রচিত জনৈক সুপ্রাচীন আদর্শ নরপতির কাহিনীতে কল্পনার প্রভাব না থাকা অসম্ভব বলে মনে হয়। আবার রেলগাড়ী প্রচলনের পূর্ববর্তী কালে, এমনকি খ্রীষ্টীয় ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে পর্যন্ত দূরবর্তী তীর্থস্থানের যাত্রীদের মৃত্যুর হার লক্ষ্য করলে মনে হয় যে, রামায়ণ বর্ণিত প্রাগৈতিহাসিক ভ্রমণ ব্যবস্থায় রাম, লক্ষ্মণ ও সীতার পক্ষে অযোধ্যা থেকে শ্রীলঙ্কা পর্যন্ত গিয়ে আবার অযোধ্যায় ফিরে আসা নিতান্তই অবাস্তব কল্পনা। প্রাচীন কালেই যাঁরা রামায়ণ কাহিনীতে নানা প্রক্ষেপের অবতারণা করেছিলেন, তাঁরাও সেটা বুঝতে পেরেছিলেন বলে বোধ হয়। কারণ তাঁরা সীতাকে জনস্থান থেকে শ্রীলঙ্কাতে নিয়ে যাওয়া এবং রাম প্রভৃতির শ্রীলঙ্কা থেকে অযোধ্যায় ফিরে আসার ব্যাপারে পুষ্পক নামক বিমানের কল্পনা করেছেন। এই বিমান বস্তুটি আধুনিক এবং বিংশ শতাব্দীর পূর্বের পক্ষে অবশ্যই কাল্পনিক।

দ্বিতীয় সিদ্ধান্তটির সম্পর্কে আমি বলেছিলাম যে, বহুদিন পূর্বে জার্মান পণ্ডিত বেবর তাঁর Eleber das Ramayana-তে একথা বলেছিলেন ; কিন্তু পরবর্তী কালে পণ্ডিতেরা মতটিকে অসম্ভব বলে পরিত্যাগ করেছেন। তাঁরা বলেন যে, জাতকের গাথা অর্থাৎ শ্লোক অংশই কেবল খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় বা দ্বিতীয় শতাব্দীর 'খুদ্দক-নিকায়ে'র অন্তর্গত। কিন্তু জাতকের গল্পাংশ পরবর্তী কালের রচনা। গল্পগুলির অধিকাংশ শ্রীলঙ্কার বৌদ্ধ ভিক্ষুরা খ্রীষ্টীয় পঞ্চম-ষষ্ঠ শতাব্দীতে রচনা করেছিলেন। আমি দেখেছি যে, 'জয়দ্দিস জাতক' এবং অশ্বঘোষের 'বুদ্ধচরিত' (খ্রীষ্টীয় প্রথম-দ্বিতীয় শতাব্দী) প্রভৃতি বৌদ্ধ গ্রন্থে বাল্মীকির কাহিনীর উল্লেখ আছে, কিন্তু 'দশরথজাতক' কাহিনী সম্পর্কিত কোন জ্ঞানের পরিচয় নেই। তাছাড়া, জাতকটির গল্পাংশ যে গাথাংশের বহু পরবর্তী, তার প্রমাণ আছে। গল্পের লেখক বিদেশী (সিংহল-দেশীয়) বলে একটি গাথার অর্থ বুঝতে পারেন নি। আবার তিনি বাল্মীকি রামায়ণের পরবর্তী কালীন প্রক্ষিপ্ত অংশের দ্বারাও প্রভাবিত হয়েছেন। আর একটি কথা এই যে, বৌদ্ধ ও জৈন লেখককেরা ব্রাহ্মণ্য সাহিত্যের কাহিনী-গুলিকে বিকৃত করে আনন্দ পেতেন। এর বহু প্রমাণ আছে। বাল্মীকি শ্রীলঙ্কার অধিবাসীদের রাক্ষস বলেছেন বলে, শ্রীলঙ্কাদেশীয় বৌদ্ধ ভিক্ষুরা তাঁর রামকাহিনীর বিকৃতরূপ প্রচারে উৎসাহ দেখিয়েছেন।

তৃতীয় সিদ্ধান্তটি সম্বন্ধে আমি বলেছিলাম যে, ওটিও বেবরের মত। কিন্তু য়াকোটি নামক অপর একজন জার্মান পণ্ডিত তাঁর Das Ramayana সংজ্ঞক গ্রন্থে সিদ্ধান্তটির অসারতা স্পষ্টভাবে প্রমাণ করেন এবং তখন থেকে পণ্ডিতেরা সকলেই য়াকোটির সমর্থক। সুতরাং সিদ্ধান্তটি পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে হলে য়াকোটির যুক্তি-সমূহের খণ্ডন অত্যাবশ্যক। আমি আরও বলেছিলাম যে, বাল্মীকির গ্রন্থ পূর্বভারতে রচিত ; কিন্তু এই অঞ্চলের সঙ্গে গ্রীকদের সম্পর্ক খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীর পরবর্তী।

সুনীতিকুমার এই সকল সমালোচনার কি জবাব দিতেন, হঠাৎ তাঁর মৃত্যু ঘটায় তা জানা আর আমাদের পক্ষে সম্ভব হ'ল না। রামায়ণের সমস্যা সম্পর্কে তাঁর একখানি গ্রন্থ প্রণয়নের ইচ্ছা ছিল। সেই ইচ্ছা বোধ হয় তিনি পূর্ণ করে যেতে পারেন নি। এটা আমাদের পক্ষে অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়।

একটি বিষণ্ণ স্মৃতি

নিশীথরঞ্জন রায়

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগে অধ্যাপনার দায়িত্ব নিয়ে যখন যোগ দিই তার কিছুদিন আগে সুনীতিকুমার ভারতীয় ভাষাতত্ত্বের অধ্যাপকের পদ থেকে অবসর নিয়েছেন। কিন্তু তখনও প্রায় নিয়মিত ভাবে তিনি আসতেন তাঁর পূর্বতন কর্মস্থলে। প্রথিতযশা ভাষাবিজ্ঞানী, গবেষক, গ্রন্থকার, প্রাচ্যবিদ্যার তাত্ত্বিক হিসাবে তাঁর খ্যাতি বিশ্ববিদ্যালয়ের গণ্ডি পেরিয়ে সারা দেশে, দেশ অতিক্রম করে সমগ্র বিশ্বের বিদ্বজ্জন সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত। যতোদিন তাঁকে দেখিনি ততোদিন মনে হয়েছে তিনি দূরের মানুষ, পরম পণ্ডিত, একই সঙ্গে অশেষ শ্রদ্ধা আর অপরিসীম কুতূহলের পাত্র। জ্ঞান বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁর অবাধ, স্বচ্ছন্দ গতি ; পাণ্ডিত্যের গভীরতা ছাড়াও দেশী বিদেশী সাহিত্য, পুরাকীর্তি, দর্শন, ইতিহাস, নৃতত্ত্ব সম্পর্কে তাঁর গভীর অনুসন্ধিৎসা আর অনুসন্ধিৎসা-সঞ্জাত তাঁর জ্ঞানের ব্যাপ্তি ও পরিধি আমাদের কাছে করে তুলেছিল একাধারে গর্ব ও শ্রদ্ধার পাত্র। বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁকে কাছ থেকে দেখার সুযোগ পেলাম। সেখানে তাঁর মধ্যে প্রত্যক্ষ করলাম আর একটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র সত্তা—সদালাপী, হাস্যরসিক, পরিহাসপ্রিয়, বৈঠকী মেজাজের মানুষ। সকলকেই কাছে টেনে নেবার এক আশ্চর্য মোহিনী শক্তি, সহজ, আটপৌরে, ঘরোয়া সংলাপের মাধ্যমে বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে তাঁর অনায়াস বিচরণ সুনীতিকুমারের সান্নিধ্যকে করে তুলতো এক অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণের বিষয়। আলোচনার বিষয়বস্তু যাই হোক না কেন তার মধ্যে তিনি শ্রোতাদের মনের কাছে পৌঁছে দিতেন বহু না-জানা তথ্য, অনেক নতুন ভাবনার খোরাক।

তারপর একদিন বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে এসেছি নতুন কর্মক্ষেত্রে। এখানে নানা বৃত্তিধারী লোকদের নিত্য আনাগোনা। একদিন সুনীতিকুমার নিয়ে এলেন শাড়ী-পরিহিতা এক বিদেশিনী মহিলাকে। পরিচয় করিয়ে দিয়ে সুনীতিকুমার বললেন—এঁর নাম ডক্টর এলিকিলাসকারিদিস জান্নাস্‌। গ্রীস এঁর জন্মভূমি। ভারতবর্ষের সংস্কৃতি সম্পর্কে গভীর আগ্রহ নিয়ে এদেশে এসেছেন। তাঁর গবেষণার ফল হিসাবে সম্প্রতি প্রকাশিত করেছেন খজুরাহোর ভাস্কর্য নিয়ে দুই খণ্ডের অলঙ্করণ-শোভিত, গবেষণাসমৃদ্ধ রচনা। সুনীতিকুমার জানালেন ভদ্রমহিলার আগমনের

উদ্দেশ্য। এথেন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের রেক্টরের অফিস-কামরায় তিনি দেখে এসেছেন এক তৈলচিত্র। চিত্রটি দিমিত্রিঅস্ গালানস্-এর। ১৮-শতকে যে সব বিদেশী মনীষী ভারততত্ত্ব অনুশীলনে আত্মনিয়োগ করেছিলেন গালানস (১৭৬০-১৮৩৩) তাঁদের অন্যতম। মহিলাটি এই পণ্ডিত প্রবরের মূল তৈলচিত্র থেকে একটি বড মাপের আলোকচিত্র প্রস্তুতির ব্যবস্থা করে এসেছেন। তৈলচিত্রটি আঁকা হয়েছিল বারাণসীতে সম্ভবতঃ কোন ভারতীয় শিল্পী এর চিত্রকর। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল-এর প্রদর্শনশালায় যাতে এটি রক্ষিত হয়—ডক্টর জান্নাস—এসেছেন সেই অনুরোধ নিয়ে। আলোচনা প্রসঙ্গে আচার্য জানালেন সম্প্রতি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায় গালানস সম্পর্কে তিনি একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত করেছেন। কথা প্রসঙ্গে জানতে চাইলেন পত্রিকাটি আমার সংগ্রহশালায় রয়েছে কিনা। আমি নেতি-বাচক জবাব দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বললেন—আমি কালই পরিষদ থেকে পাঠিয়ে দেবো। পরদিনই পত্রিকাটি এবং সভাপতি হিসাবে সুনীতিকুমারের ভাষণ (১৩৮১ সাল) আমার কাছে পৌঁছে গেল।

আমাদের মিউজিয়ম এবং সংগ্রহশালাগুলোর সমস্যা নিয়েও আলোচনা হলো। বিদেশী প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে তুলনা করতে গিয়ে আমাদের দৈন্যের কথা বললেন—এমন কি ভারত-সরকারের অর্থে পরিচালিত দূতাবাস এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান-গুলোর কর্মতৎপরতার অভাব সম্পর্কে অনেক অভিযোগ করলেন। লণ্ডন ভারতীয় দূতাবাসের গ্রন্থাগারে বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন বসু এবং তাঁর লেখা বাংলা বই সম্পর্কে অজ্ঞতা ও নির্লিপ্ততা দেখে বিস্মিত হয়েছিলেন—অনেক পীড়াপীড়ির পর তাঁর হাতে তুলে দেওয়া হলো সত্যেন দত্তর 'কুহু ও কেকা' কাব্যগ্রন্থটি। বিশ্ব-ভারতী সম্পর্কেও সেখানকার কোন কোন মহলের অজ্ঞতার কথা তিনি সেদিন ক্ষোভের সঙ্গে ব্যক্ত করেছিলেন। বিদেশিনী মহিলা আলোক চিত্রটি নিয়ে আর একদিন আসবেন জানিয়ে বিদায় নিলেন।

দিন সাতেক পরেই আবার সুনীতিকুমার সঙ্গে করে নিয়ে এলেন সেই মহিলাকে। এবার তাঁর সঙ্গে প্রতিশ্রুত আলোকচিত্রটি। ডক্টর জান্নাস বল্লেন ভারতগতপ্রাণ এই পণ্ডিত প্রবরের আলোকচিত্রটি যেদিন প্রদর্শশালায় গৃহীত হবে সেদিন সুনীতিকুমার তাঁর সম্বন্ধে ভাষণ দেবেন। কথাপ্রসঙ্গে জানালেন সুনীতি-কুমারের কাছে তাঁর অপরিসীম ঋণের কথা। তাঁর একান্ত ইচ্ছা চিত্রটির উদ্ঘাটন উৎসবে পৌরোহিত্য করবেন সুনীতিকুমার। ডক্টর জান্নাস জানালেন তিনি কিছুদিন কলকাতার বাইরে যাচ্ছেন—ফিরে এসেই ঐ সম্পর্কে দিনস্থির করা যাবে।

তারপর দীর্ঘ দিন কেটে গেল। সুনীতিকুমার জানতে চাইলেন ভদ্রমহিলার কাছ থেকে কোন খবর এসেছে কিনা। বল্লেন—আমিও চিঠি দিয়েছি, কোন খবর পাই নি। মহিলা সম্পর্কে তিনি রীতিমতো উদ্বিগ্ন বলে মনে হলো। সুনীতিকুমার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন যে-দিনটিতে উদ্‌ঘাটন-উৎসব অনুষ্ঠিত হবে সেদিন যেন কলকাতার জ্ঞানীগুণী লোকদের আমন্ত্রণ জানানো হয়—যেন বিদেশী দূতাবাসের প্রতিনিধিরা উপস্থিত থাকেন। তাঁর এই আগ্রহের মূলে ছিল সাধারণ ভারতীয়দের কাছে স্বল্পখ্যাত, এমন কি অজ্ঞাতনামা, গ্রীসদেশের এই বিশিষ্ট ভারততত্ত্ব-বিশারদের পরিচয় তুলে ধরা। ইংরেজ, জার্মান, রুশ ভারততাত্ত্বিকদের কথা আমরা মোটামুটি জানি। কিন্তু গ্রীস দেশ থেকে আগত এই মানুষটি যিনি জীবনের শেষ চল্লিশ বৎসর একটানা কাটিয়েছিলেন প্রাচ্যবিদ্যার অন্যতম পীঠস্থান বারাণসীতে। যিনি ভগবদ্‌গীতার এবং ভারতীয় নীতিশাস্ত্র এবং ভারতীয় ইতিহাস পুরাণ বিষয়ক কতকগুলি সংস্কৃত গ্রন্থ গ্রীক ভাষায় অনূদিত করেছিলেন তাঁর সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান কতটুকু? সুনীতিকুমারের ভাষায়।

"সম্প্রতি আমাদের কেহ কেহ এইরূপ একজন বিস্মৃত-প্রায় ইউরোপীয় পণ্ডিতের কথা জানিতে পারিতেছি; এবং ইহার সম্পর্কে কিঞ্চিৎ অনুসন্ধান করিবার আগ্রহ লইয়া সম্প্রতি এই বৎসর, ইংরেজী ১৯৭৪ সালের এপ্রিল মাসে, ইউরোপে গ্রীসের আথেনাই (আথেন্স) নগরে একটু অন্বেষণ করিবার সুযোগ আমার হইয়াছিল। কিন্তু দেখিলাম, তাঁহার সম্বন্ধে নূতন করিয়া অনেক কিছু কাজ করিবার থাকিলেও, একজন আমেরিকান পণ্ডিত Catholic University of America কাথলিক ইউনিভার্সিটি অফ আমেরিকার Siegfried A. Schulz সীগফ্রেড এ শুল্‌ৎস্‌ ইংরেজী ভাষায় দুইটি মূল্যবান প্রবন্ধ লিখিয়া গিয়াছেন (Journal of the Department of Indology, Banaras Hindu University, 1965-66, No. 9, pt. II এবং Journal of the American Oriental Society, 1969, pp. 339-356, এই দুটি পত্রিকায় মুদ্রিত হইয়াছে।) তাহাতে মুখ্য কথাগুলি প্রায় সবই বলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু আরও কতকগুলি কথা একটু গভীরভাবে আমাদের জ্ঞানগোচরের অপেক্ষায় রহিয়াছে। এই সব কথার সম্বন্ধেও শুল্‌ৎস্‌ তাঁহার যুক্তি এবং অনুমানও আমাদের সমক্ষে উপস্থাপিত করিয়াছেন। এই পণ্ডিত ব্যক্তি হইতেছেন গ্রীস-দেশ হইতে ভারতে—প্রথমে বঙ্গদেশে—আগত এক বিরাট বিদ্বান ও মনীষী। ইহার নাম ছিল দিমিত্রিঅস্‌ গালানস (জীবৎকাল খ্রীষ্টীয় ১৭৬০-১৮৩৩)। আথেনাই নগরীতে ইহার জন্ম। মাতৃভাষা গ্রীকের ব্যাকরণ

এবং সাহিত্য খুব গভীরভাবে স্বদেশে অধ্যয়ন করেন, গ্রীক ভাষায় একজন মূর্ধণ্য পণ্ডিত হন, পরে ১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দে ২৬ কি ২৭ বৎসর বয়সে তিনি ভারতবর্ষে আসেন —ভারতে উপনিবিষ্ট তাঁহার স্বদেশবাসী কতকগুলি গ্রীক বণিকের সন্তানদের গ্রীক-ভাষা পড়াইবার জন্য। ইনি প্রথমে ঢাকাতে আসিয়া উপনিবিষ্ট হন। পরে কলিকাতায় আসেন এবং কলিকাতার গ্রীক ছেলেমেয়েদের জন্য স্থাপিত ইস্কুলে গ্রীক ভাষা পড়াইতেন। ইহার এক বিশেষ মিত্র ও সহায় হন ঢাকা ও কলিকাতার Bonfield Lane-এর গ্রীক বণিক কনস্তানীঅস পান্দাজি। গালানস বাঙ্গলা-দেশেই বাঙ্গালা, ফারসী এবং হিন্দুস্থানীও শেখেন। পরে ১৭৯৩ সালে তিনি কলিকাতা ত্যাগ করিয়া কাশীতে উপস্থিত হন, এবং একাদিক্রমে চল্লিশ বৎসর কাশীতেই কাটাইয়া সেখানেই ১৮৩৩ সালে দেহ রক্ষা করেন। কাশীতে ইনি সংস্কৃত ভাষার মোহে পড়িয়া যান। এবং সেইখানে গভীরতর ভাবে সংস্কৃত শিক্ষা করেন। তিনি ভারতীয় পণ্ডিতের মত বেশভূষা করিয়া মাথায় পাগড়ী পরিয়া থাকিতেন।…তাঁহার অনূদিত হস্তলিখিত গ্রীক পুস্তক এবং কিছু কিছু সংস্কৃত পুথিও তিনি স্বদেশে আথেনাই নগরীর নবপ্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়ে দান করিয়া যান। আথেনাই-য়ের জাতীয় গ্রন্থশালায় হস্তলিখিত গ্রন্থগুলির মধ্যে ইহার অনূদিত ও উপহৃত হস্তলিখিত পুস্তকগুলি ২০ খণ্ডে এখনও সযত্নে রক্ষিত হইয়া আছে।"

অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় সুনীতিকুমারের আশা পুরণ হয় নি। সভার আয়োজন সম্পূর্ণ করার আগেই তিনি লোকান্তরিত হলেন। গালানস্-এর আলোক-চিত্রটি স্মৃতিসৌধের প্রদর্শশালায় অনাড়ম্বর স্থান লাভ করেছে। কিন্তু সেই সঙ্গে আজ মনের দুয়ারে একটি বিষণ্ণ স্মৃতি উঁকি দেয়—বিদ্বজ্জনসভার পক্ষ থেকে বিদেশী এই ভারতবিদ্যাবিদ্-এর প্রতি প্রকাশ্য ঋণ স্বীকারের সুযোগ আচার্য সুনীতি-কুমারকে দিতে পারি নি। এ দুঃসহ অনুভূতি বারবার মনকে ভারাক্রান্ত করে তোলে।

জয়তু সুনীতিকুমার

সুধীরকুমার মিত্র

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের মহাপ্রয়াণে শ্রদ্ধেয় সজনীকান্ত দাস "বৃহদারণ্য বনস্পতির মৃত্যু দেখেছ কেউ? অভ্রংলিহ বনস্পতির মৃত্যু?" বলে যা লিখেছিলেন, আজ সুনীতিকুমারের পরলোকগমনে সেই কথাটির পুনরুক্তি করে বলা যায় যে কেবল ভারতবর্ষ নয়, সারা পৃথিবীর বুধমণ্ডলে, তাঁর তিরোধানকে বলা যায় এক ইন্দ্রপতন। জাতীয় অধ্যাপক ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ভারতের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বিশ্বের দরবারে তুলে ধরার মহান দায়িত্ব গ্রহণ করে সুদীর্ঘকাল দেশের যে সেবা করে গেছেন তা বিশ্বজনস্বীকৃত। তিনি ছিলেন বাংলার তথা ভারতের গর্ব ও গৌরব। যে কয়জন পণ্ডিত স্বদেশের গণ্ডী ছাড়িয়ে সারা বিশ্বে সুনাম ও প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিলেন, তিনি ছিলেন তাঁদের মধ্যে একজন।

প্রকৃত 'পণ্ডিত' বলতে যা বুঝায় সুনীতিকুমারকে সেই অর্থে বলা যায় পণ্ডিত। আজকাল পণ্ডিত শব্দের অর্থ-বিপর্যয় হয়েছে। শাস্ত্রে উজ্জ্বল বুদ্ধির নাম পাণ্ডা, তা যাঁদের আছে তাঁরাই হচ্ছেন প্রকৃত পণ্ডিত। ভক্তি বিনোদ ঠাকুরের ভাষায় "The word Paudit means intellect bright with the divine knowledge. Only those who have got this bright intellect are called Panda or learned." এই অর্থে সাম্প্রতিক কালে সুনীতিকুমারই ছিলেন যথার্থ পণ্ডিত। বহু ভাষাবিদ এই বিশ্বপথিক মহাপণ্ডিতের তিরোধানে গত শতকের সঙ্গে বর্তমানের যোগ-স্বরূপ সেতুটি চিরতরে ছিন্ন হয়ে গেল। এটাই গভীর দুঃখের কথা, তাই তাঁর মৃত্যুকে বলা যায় রবীন্দ্রনাথের মতন "বৃহদারণ্য বনস্পতির মৃত্যু" অথবা বিশ্বজ্ঞানমার্গের এক মহান পথিকের পথপরিক্রমার পরিসমাপ্তি।

ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধে ভারতবর্ষে সার্থক চর্চা, অনুশীলন ও গবেষণার পথিকৃত ও উদ্বোধক ছিলেন সুনীতিকুমার। বিশ শতকের শুরু থেকে তিনিই সংস্কৃতির এই বিশেষ দিকটির দিকে সর্বপ্রথম সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এবং বিভিন্ন ভাষার বৈজ্ঞানিক ভিত্তি, পৃথিবীর অন্যান্য ভাষাগোষ্ঠীর মধ্যে সাদৃশ্য ও গরমিল, তাদের গঠন, রীতি, বিন্যাস, পারম্পর্য, আনুপূর্বিকতা সম্বন্ধে বিশ্লেষণ সুনীতিকুমারের ছিল অন্যতম প্রধান কীর্তি। তিনি ছিলেন আর্যভাষা গোষ্ঠীর একান্ত অনুরাগী। আর্যরা

একটা জাতিগোষ্ঠী নয়, একটি ভাষাগোষ্ঠী, এটাই সুনীতিকুমারের পৃথিবীর দেশকাল বন্দিত বিদগ্ধ বিশ শতকের পণ্ডিত মণ্ডলীর মত তাঁরও ছিল দৃঢ় অভিমত। এই ভাষাগোষ্ঠীর শ্রেষ্ঠ কীর্তি হচ্ছে, রামায়ণ মহাভারত ও ইলিয়াড ওডিসি। প্রাচীন সংস্কৃতের মত প্রাচীন গ্রীকভাষার প্রতি তাঁর আগ্রহ ছিল অপরিসীম। তাঁর মতে পুরাতত্ত্ব চর্চা করলে গ্রীকের সঙ্গে সংস্কৃতের কেবল ভাষাগত নয়, ভাবগত যে সাদৃশ্য আছে, তা বোঝা যায় এবং এই দুটি প্রাচীনতম ভাষায় রচিত কাহিনীগুলো কে যে কার কাছ থেকে নিয়েছে তা যুগযুগান্ত পরে আজ সঠিক বলা কেবল শক্ত নয়, এক প্রকার অসম্ভব। রামায়ণের ঐতিহাসিকতা নিয়ে তাঁর শেষ জীবনে যে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছিল সে বিষয়ে তাঁর মত যে, পরবর্তী কালের সিদ্ধান্তকে পূর্ববর্তী কালের ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তকে সত্যে পরিণত করা যায় না। এ বিষয়ে ২০শে জানুয়ারী ১৯৭৬ 'পুরাণ দীপালি' নামক একটি পুস্তকের ভূমিকায় যা তিনি বলেছেন, সেই অপ্রকাশিত লেখা থেকে রামায়ণ-মহাভারত সম্বন্ধে সুনীতি-কুমারের কি শ্রদ্ধা ছিল, তা বোঝা যাবে।

তিনি লিখেছেন : "আমাদের নিজেদের মানসিক উন্নয়নের জন্য এবং তাহাদের নান্দনিক ও আধ্যাত্মিক উৎকর্ষের জন্য আমাদের রামায়ণ মহাভারত পুরাণাবলী ও অন্য সংস্কৃত সাহিত্য ও তদনুরূপ মধ্যকালীন ধর্মীয় ঐতিহাসিক ও অন্যবৈধ গ্রন্থ-সমূহের উপযোগিতা ও মর্যাদা অপরিসীম।"

সুনীতিকুমারের সঙ্গে ১৯৪১ সাল থেকে আমার প্রথম পরিচয়, কিন্তু সে পরিচয় হয় তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করার জন্য। তিনি তাঁর 'বাংলা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা' নামক পুস্তকে (পৃ. ৬-৮, ১৪৩) যা লিখেছেন, এ কথা অনেক বাঙ্গালীর কাছে—আর অবাঙ্গালীর কাছেও নতুন ঠেকবে যে সমগ্র ভারতে তাবৎ ভাষার মধ্যে বাঙলাই হচ্ছে সব চেয়ে বেশী সংখ্যক লোকের মাতৃভাষা। মাতৃভাষা হিসেবে ভারতে আর কোন ভাষা এত বিস্তৃত নয়। বাঙালা ভাষার চেয়ে অনেক অধিক সংখ্যক লোক হিন্দী ব্যবহার করে বটে, কিন্তু সেটা পোষাকী ভাষা হিসেবে।

কিন্তু ১৯৩৯ সালে বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ প্রমুখ ভারতের নেতৃবৃন্দ যখন হিন্দী ভাষাকে রাষ্ট্র ভাষা করার জন্য আন্দোলন শুরু করেন, তখন সুনীতিবাবু হিন্দী ভাষার পক্ষে তাঁর মত দেন। অবশ্য তিনি বলেন যে, রাষ্ট্রভাষা রোমান অক্ষরে লেখা হবে, এবং যতদিন তা না হয় ততদিন হবে দেবনাগরী অক্ষরে। সেই সময় বাঙলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার জন্য প্রতিষ্ঠিত হয় কলকাতায় "বঙ্গভাষা সংস্কৃতি সম্মেলন" এবং এর কর্ণধার ছিলেন রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, প্রফুল্লকুমার সরকার ও

হীরেন্দ্রনাথ দত্ত। সভাপতি ও সম্পাদক ছিলেন বিমল চন্দ্র সিংহ ও এই দীন লেখক। ১৯৪১ সালের ৩, ৪ মে কলকাতায় সম্মেলনের প্রথম সাধারণ অধিবেশনে প্রফুল্লকুমার সরকারের প্রস্তাবে ও সুধীরকুমার মিত্রের সমর্থনে মানভূম, সিংভূম, ধলভূম প্রভৃতি বঙ্গভাষাভাষী স্থানগুলি বাংলার সঙ্গে যুক্ত করা ও বাঙলা ভাষাই যে ভারতের রাষ্ট্রভাষা হবার একমাত্র উপযুক্ত ভাষা সে বিষয়ে সর্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাব গৃহীত হয়। ওতে অবাঙ্গালীগণ বিশেষ ক্ষুণ্ন হন।

অতঃপর পৌষমাসে ১৯তম প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের (বর্তমান নাম নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন) কাশী অধিবেশনে (২৭-২৯ ডিসেম্বর ১৯৪১) সাহিত্য শাখায় (সভাপতি ছিলেন অতুলচন্দ্র গুপ্ত) "ভারতের রাষ্ট্রভাষা" নামে আমি একটি প্রবন্ধ পাঠ করি, তাতে হিন্দীপ্রেমী কিছু বাঙ্গালী আমার উপর অসন্তুষ্ট হলেও বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি আমাদের সমর্থন করেন, তার মধ্যে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় একজন। উহা আবার ইংরাজীতে "বিহার হেরাল্ড" ও এলাহাবাদের "পায়োনিয়র" পত্রে ২০ এপ্রিল ১৯৪৩ সালে প্রকাশিত হয় ও অবাঙ্গালীদের উহা তখন বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। পরে ভারতের রাষ্ট্রভাষা ও India's National Language পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়, এই সব কারণে সুনীতিবাবুর সঙ্গে আমার মতের অমিল থাকায় তাঁর সঙ্গে আমি ১৯৪৯ সালের আগে দেখা করিনি। মধ্যে 'রবিবাসরে' একবার তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। তখন তিনি হেসে আমায় বলেছিলেন, 'বাংলা হবে না—বাঙ্গালীরাই বাংলার বিরুদ্ধে।'

শিশির পাবলিশিং হাউস কর্তৃক ১৯৪৮ সালে আমার 'হুগলী জেলার ইতিহাস' প্রকাশিত হবার পর শিশিরকুমার মিত্র ঐ বইটি সুনীতিবাবুকে উপহার দেন। বইটি পড়ে তিনি শিশিরবাবুকে লেখেন যে, আমি যেন সুনীতিবাবুর সঙ্গে একবার দেখা করি। কিন্তু সঙ্কোচের জন্য তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আমার কিছু দেরি হয়ে যায়। শিশিরবাবুর তাগিদে ১৯৫০ সালে আমি তাঁর বাড়ি যাই। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় তিনি 'ভাষা' সম্বন্ধে কোন কথাই সেদিন উত্থাপন করলেন না, বরং আমাকে এট বইটার জন্য প্রশংসা করে যে ভাবে তিনি উৎসাহিত করলেন, তাতে লজ্জিত হলেও আমি তাঁর ঔদার্যে সেদিন মুগ্ধ না হয়ে পারি নি। কথা প্রসঙ্গে তিনি সেদিন বলেছিলেন, "হুগলীর কাছে আমার ঋণ অপরিসীম, কারণ গরলগাছায় বহু বছর আমি ছিলুম এবং সেখান থেকেই আমি মানুষ হই।" তাঁর সম্বন্ধে আমার পুস্তকে যা লেখা ছিল, তার অংশ বিশেষ প্রসঙ্গত এখানে উল্লেখনীয় :

Dr. Chatterjee has, curiously enough, found it expedient

to set up an imaginary language, complete with its own script and grammar as his own nominee for the race, and no doubt hopes that it will flower into a living language. While it is not yet too late, but the ground on which he demands the claim of Bengalee would be interesting to know. (India's National Language, p. 22, 1943)

সুনীতিবাবুর সঙ্গে তারপর 'রবিবাসরে' বহুবার আলাপের সুযোগ এবং তাঁর জ্ঞানগর্ভ ভাষণ শোনার সৌভাগ্য হয়েছে। একবার 'বাংলা উচ্চারণ' সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন যে কোন বাংলা অভিধানে কোন কথার উচ্চারণ কি রকম হবে, সে বিষয়ের কোন উল্লেখ নেই। এ বিষয়ের উল্লেখ আছে একমাত্র জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের অভিধানে, এবং তাও এখন দুষ্প্রাপ্য। রবিবাসরের বার্ষিক সংখ্যায় তাঁর অঙ্কিত বিড়ালের একটি চিত্র ১৩৭৯ সালে প্রকাশিত হয়েছিল। আমার হুগলী জেলার ইতিহাস ও বঙ্গসমাজ গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৯৬২ সালে। এটি পেয়ে যে তিনি কি রকম সুখী হয়েছিলেন তা তাঁর বিভিন্ন চিঠিতে লেখা রয়েছে। বঙ্গসমাজের বিবর্তনের কোন প্রামাণ্য ইতিহাস বঙ্গভাষায় ইতিপূর্বে লেখা হয়নি বলে তিনি আমার এই গ্রন্থের সামাজিক ইতিহাসকে এত উচ্চে স্থান দেন যে 'হুগলী জেলার দেব দেউলে'র ভূমিকায় (২ নভেম্বর ১৯৭১) পর্যন্ত তিনি লিখে দিলেন "বইখানি আমি দেখিয়া বিশেষ আনন্দিত হইয়াছি—ইহা হইতে আমি অনেক অজ্ঞাতপূর্ব তথ্য জানিতে পারিয়াছি।"

পূর্বোক্ত বইটির দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৯৬৩ সালে ও তৃতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৯৬৮ সালে। তাঁর মূল্যবান উপদেশ সমূহ এই দুটি খণ্ড প্রকাশে আমায় যে কি পরিমাণে সাহায্য করেছিল তা বলে শেষ করা যাবে না। দেব দেউলের ভূমিকা যেদিন তিনি লিখে দেন, সেদিন ছিল রাস-পূর্ণিমা, ১৫ কার্তিক ১৩৭৮, তাঁর জন্মদিন; সেদিন তাঁর আনন্দময় মূর্তি আজও আমার চোখের সামনে যেন ভাসছে। সেদিন তিনি ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকারের কয়েকটি মূল্যবান কথা বলেন ও আমায় 'বাঙ্গালীর পোষাক' সম্বন্ধে লিখতে বলেন; তিনি বহু পূর্বে এ বিষয়ে একটি ছোট প্রবন্ধ লিখেছিলেন। কিন্তু নানান কাজের চাপে সেটি আর তাঁর শেষ হয়নি। আমি তাঁর কথা সেদিন শিরোধার্য করেছিলাম। কিন্তু উপাদান সংগ্রহ করতে এখনও পারিনি বলে আজও তা লেখা হয়নি।

সুনীতিবাবুর জন্মদিনে যে শিশু-সুলভ ভাবটি তাঁর সেদিন দেখেছিলাম, সে

রকম আর কোনদিন দেখিনি। তিন ঘণ্টার বেশি সময় তিনি বিভিন্ন পুস্তক থেকে যে কত সব নিদর্শন খুলে খুলে দেখালেন, তা বলতে গেলে প্রবন্ধের কলেবর আরো বেড়ে যাবে। কেবল উল্লেখ করছি যদুনাথের কথা। সুনীতিবাবু যা বললেন তা হচ্ছে মৌলিক গবেষণাকে সজীব রাখতে হলে কর্মীদের চাই 'চিত্তশুদ্ধি'। স্বদেশী লোকের সস্তা বাহবা পাবার লোভ সম্বরণ করতে হবে। হোগলকুড়িয়া বিশ্ববিত্থালয় আমাকে ডক্টর উপাধি দেবেন অথবা ছকু খানসামা লেনের সাহিত্য-সভা আমাকে পুরস্কৃত করবেন—এরূপ আকাঙ্ক্ষা প্রকৃত গবেষকের কখনও আদর্শ হতে পারে না। যদুনাথের উক্তিটি আমি দেবদেউলে উদ্ধৃত করেছি।

হুগলী জেলা সমিতি, আরামবাগ রামমোহন স্মৃতি মন্দিরে ১৩৮২ সালে ১২ পৌষ আমায় একটি সভায় সম্বর্ধনা জানায়। শ্রদ্ধেয় প্রফুল্লচন্দ্র সেন মহাশয় ছিলেন এর উত্থোগী ও সভাপতি। সুনীতিবাবু সেদিন এক পত্রে "বাংলাদেশের স্বকীয় সংস্কৃতি ও ইতিহাসের চর্চা যিনিই করিবেন হুগলী জেলার ইতিহাস ও বঙ্গসমাজ তাঁহার পক্ষে অপরিহার্য হইবে" প্রভৃতি লিখে তিনি আমার দীর্ঘ জীবন ও কল্যাণ কামনা করেন। 'সঠিক বাংলা' বলতে কি বোঝায় তা লেখার ও শেখানোর মতন লোক বর্তমানে সুনীতিবাবুর তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গে একরকম শেষ হয়ে গেল। খাঁটি বাঙ্গালী, ভারতীয় ও বিশ্বপথিক বলতে যা বোঝায় তা সুনীতিবাবু তাঁর জীবনে দেখিয়ে গেছেন। তিনি ছিলেন আমাদের আলোকস্তম্ভ-স্বরূপ। তাঁর মত দরদী উদারহৃদয় জ্ঞানতপস্বী বিশ্বপথিকের মৃত্যু নেই—তাঁরা চিরজীবী। জয়তু সুনীতিকুমার॥ রবীন্দ্রনাথের ভাষায়:

মৃত্যু একটা প্রকাণ্ড কালো কঠিন কষ্টিপাথরের মতো। ইহারই গায়ে কষিয়া সংসারের সমস্ত খাঁটি সোনার পরীক্ষা হইয়া থাকে।

সাহিত্য অকাদেমি ও সুনীতিকুমার

জরাসন্ধ

১৯৭৩ সালের মাঝ-জানুয়ারী। সাহিত্য অকাদেমির (Sahitya Akademi) দিল্লী অফিস থেকে একটা চিঠি এল। সেক্রেটারী জানাচ্ছেন, আমাকে পাঁচ বছরের জন্যে সাধারণ পরিষদের (General Council) সদস্য 'নির্বাচিত' করা হয়েছে। কোথায় কবে কি ভাবে এ নির্বাচন হল, সবটাই আমার অজ্ঞাত। অকাদেমির কার্যকলাপ, সদস্যদের করণীয় ইত্যাদি সম্পর্কেও আমার জ্ঞান খুব অস্পষ্ট। বিশেষ করে যেটা বিস্ময় ও ভীতির কারণ—আমার নির্বাচন এলাকার ঘরে লেখা আছে, To represent the Bengali language. উপযুক্ত ব্যক্তিই বটে!

দ্বিধায় পড়লাম। কুনো মানুষ, সভা-সমিতি-সম্মিলন ইত্যাদির নাম শুনলেই হাত-পা গুটিয়ে আসে। তার উপরে আবার হিল্লী দিল্লী করে বেড়ানো। কী দরকার? 'রিগ্রেট' জানিয়ে দেওয়াই ভাল। আবার ভাবলাম, বিভিন্ন রাজ্য থেকে জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিরা আসবেন। শিক্ষা-সংস্কৃতি-সাহিত্য ক্ষেত্রে যাঁরা বিশিষ্ট তাঁদের দেখা যাবে, আলাপ-সালাপ হবে। হঠাৎ মনে পড়ল, ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তো সাহিত্য অকাদেমির সভাপতি। তাঁর উপদেশ নিই না কেন?

কথাটা জানাতেই টেলিফোনের ওপার থেকে উল্লাসধ্বনি—সেই বলিষ্ঠ কণ্ঠ —"এ তো অতি সুখবর। Congratulations. এই তো ফেব্রুয়ারীতেই মিটিং। আসুন, দেখা হবে।"

সবিনয়ে জানালাম, দু-চারখানা উপন্যাস লিখেছি এই মাত্র। সাহিত্য সম্বন্ধে তেমন কোন জ্ঞান—

আমার বক্তব্য শেষ হবার আগেই হেসে উঠলেন, ওখানে সাহিত্য-টাহিত্য কিছু হয় না। স্রেফ বক্তৃতা। মিনি পার্লামেণ্ট বলতে পারেন। অনেক মজাদার ঘটনাও ঘটে মাঝে মাঝে। গেলেই দেখতে পাবেন।

[বয়ঃকনিষ্ঠ স্নেহভাজন আত্মীয়দেরও সুনীতিকুমার 'আপনি' সম্বোধন করতেন এবং কখনো কাউকে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতে দিতেন না। সে চেষ্টা কেউ করলে তার দু বাহু ধরে টেনে তুলতেন।]

মজার ঘটনার স্বাদ প্রথম অধিবেশনের শুরুতেই পাওয়া গেল।

১৯৬৯ সালে জাকির হোসেন সাহেবের মৃত্যুর পর ডক্টর চ্যাটার্জী সাহিত্য অকাদেমির ভাইস্-প্রেসিডেণ্ট থেকে প্রেসিডেণ্ট পদে উন্নীত হন। ১৯৭৩-এর কাউন্সিলেও তিনি সভাপতি। কার্যসূচী শুরু হবার আগেই একজন আপত্তি তুললেন। তাঁর বক্তব্য—'যেহেতু এটা নব-গঠিত কাউন্সিল, এখানে আমরা নতুন প্রেসিডেণ্ট নির্বাচন করবো। সেটা আমাদের সংবিধান-গত অধিকার। ডক্টর চ্যাটার্জীর সম্পর্কে ব্যক্তিগত ভাবে আমার কোন আপত্তি নেই। তিনি প্রসিদ্ধ ভাষাবিদ, সুপণ্ডিত এবং বহুসম্মানিত ব্যক্তি। আমার আপত্তি নীতিগত। বিগত কাউন্সিল তাদের মনোনীত ব্যক্তিকে আমাদের উপর চাপিয়ে দিতে পারেন না।' অতএব আমাদের প্রথম কাজ সভাপতি নির্বাচন।

আরেকজন এ প্রস্তাবে সমর্থন জানালেন।

সঙ্গে সঙ্গে অন্য দিক থেকে প্রতিবাদ উঠল। একটা কড়া মন্তব্য শোনা গেল —This is sheer waste of time. এ পক্ষও ছাড়বার পাত্র নয়। বিতর্কের ঝড় উঠল, এবং তার বেগ ক্রমশঃ বেড়ে চলল।

যাঁকে উদ্দেশ করে এই উত্তাপ তাঁকে এটা কিছুমাত্র স্পর্শ করেছে বলে মনে হল না। নির্বিকার হাসিমুখে বসে বসে যেন পুরোটাই উপভোগ করতে লাগলেন। তারপর তেমনি হাসতে হাসতে উঠে চলে গেলেন।

এবার ভাইস-প্রেসিডেণ্ট অধ্যাপক কে. আর. শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার বলতে উঠলেন। বুঝিয়ে দিলেন, প্রেসিডেণ্টের পদ শূন্য হলে ভাইস-প্রেসিডেণ্ট সেটিস্ট পূর্ণ করে থাকেন—সাহিত্য অকাদেমিতে এই রীতিই চলে এসেছে বরাবর। এটাই এখানকার ট্র্যাডিশন। এ ক্ষেত্রে তারই পুনরাবৃত্তি ঘটেছে মাত্র। বর্তমান কাউন্সিলের অধিকার হরণের কোন প্রশ্ন ওঠে না।

অতএব তাঁর প্রস্তাব—প্রেসিডেণ্টকে সসম্মানে ডেকে এনে দীর্ঘ কার্যসূচী শুরু করা হোক।

এর পরে আর কোন আপত্তির সুর শোনা গেল না। আমার মত অনেকেই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। সেক্রেটারী গিয়ে প্রেসিডেণ্টকে নিয়ে এলেন। সারা সভা হর্ষধ্বনি দিয়ে তাঁকে সংবর্ধনা জানাল।

পরে ওঁকে একান্তে পেয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, আপনি উঠে গেলেন কেন? ওঁদের আপত্তি তো আপনাকে নিয়ে নয়।

—আমার চেয়ারটা নিয়ে। কাজেই মামলা না মেটা পর্যন্ত সেটা খালি করে দিলাম। জুড়ে বসে থাকাতে কেউ কেউ অসুবিধা বোধ করছিলেন। আপনারাও

বোধ হয় ঠিক স্বস্তি পাচ্ছিলেন না।

সাহিত্য অকাদেমির জেনারেল কউন্সিলকে ডক্টর চ্যাটার্জী বলেছিলেন মিনি পার্লামেণ্ট। কিন্তু ম্যাক্সি পার্লামেণ্ট অর্থাৎ লোকসভার সঙ্গে একটা বড় পার্থক্য তিনি কড়াভাবে রক্ষা করে চলতেন। বক্তাদের ইংরেজি ছাড়া আর কোন ভাষা ব্যবহার করা চলবে না। বলতেন, ওখানে সঙ্গে সঙ্গে অনুবাদের ব্যবস্থা আছে, এখানে তা নেই। একবার একজন উত্তর-ভারতীয় সদস্য তাঁর মাতৃভাষায় বক্তৃতা দিতে শুরু করতেই থামিয়ে দিয়ে মন্তব্য করেছিলেন, সবাই যদি আপনার পথ ধরেন এটা একটা Tower of Babel হয়ে দাঁড়াবে।

সাহিত্য অকাদেমির প্রধান লক্ষ্য ছোট বড় সমস্ত ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশ এবং তাদের মধ্যে পারস্পরিক সংযোগের পথ করে দেওয়া। ভাষাচার্য সুনীতিকুমারের দান এখানে অতুলনীয়।

অকাদেমির তালিকায় যেসব ভাষা স্থান পেয়েছে গোড়াতে তার সংখ্যা ছিল পনর, ভারতীয় সংবিধান যাদের স্বীকৃতি দিয়েছে। আজ সেটা বাইশে এসে দাঁড়িয়েছে। এই সাতটি ভাষা হল—ইংরেজি মৈথিলী ডোগরি মণিপুরী রাজস্থানী নেপালী ও কংকনী। এই সাত আঞ্চলিক ভাষা যে 'National' Sahitya Akademi-র পর্ণপুটে আশ্রয় পেয়েছে তার মূলে সংশ্লিষ্ট সদস্যদের প্রয়াস অবশ্যই রয়েছে। কিন্তু একজন বহুভাষাবিদ্ বহু সাহিত্যে ব্যুৎপন্ন সহৃদয় নিরপেক্ষ প্রেসিডেণ্টের জ্ঞান ও আনুকূল্য ছাড়া সে প্রয়াস সফল হত না। অন্ততঃ শেষের কটি ভাষা সম্বন্ধে একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে।

কোন ভাষাকে অকাদেমির অনুমোদন পেতে হলে তার কয়েকটি মাপকাঠি বা ক্রাইটেরিয়া আছে—সেটি স্বতন্ত্র বা স্বাধীন ভাষা না কোন উপভাষা, তার একটা ধারাবাহিক ঐতিহ্য বা ইতিবৃত্ত আছে কিনা, যথেষ্ট সংখ্যক লোক তাকে সাহিত্য ও সংস্কৃতির বাহন হিসাবে ব্যবহার করে কিনা, সংশ্লিষ্ট রাজ্য বা বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে তার স্থান কি রকম। সকলের উপরে বিবেচ্য সেই ভাষায় লিখিত সাহিত্যের মান বৈচিত্র্য ইত্যাদি। অকাদেমির সাধারণ সংসদের উপর বিচারের ভার। সদস্য সংখ্যা আশীর কিছু উপরে, সারা ভারত থেকে নির্বাচিত। স্ব স্ব ক্ষেত্রে তাঁরা যতই কৃতী ব্যক্তি হোন না কেন, বিভিন্ন ভাষা সম্পর্কে উপরোক্ত ক্রাইটেরিয়া বিচার করার মত কৃতিত্ব আছে কজনের? প্রায় সকলেরই জ্ঞান ও অধিকার মাতৃভাষা, ইংরেজি এবং হয়তো আর দু-একটি প্রধান ভাষার মধ্যেই সীমিত। সুতরাং শেষ নির্ভর ঐ

একজন—প্রেসিডেন্ট। তিনি তাঁর বিশাল জ্ঞানভাণ্ডার খুলে ধরলেন। সামান্য সামান্য ভাষার সম্বন্ধে কি বিপুল তথ্য, তাদের সাহিত্য সম্বন্ধে কি বিস্তীর্ণ অধ্যয়ন! সদস্যেরা তার থেকে সহজেই সিদ্ধান্তে আসতে পারতেন।

সুনীতিকুমারের সঙ্গে আমার সম্পর্ক অনেক দিনের। কিন্তু দেখাশুনো হত কদাচিৎ। মজলিশী মানুষ, গল্প করার সুযোগ পেলে মেতে উঠতেন, বিশেষ করে শ্রোতা যদি মনোমত হত। কাজ পড়ে থাকত। কত ধরনের মূল্যবান কাজ। সে ক্ষতি আমাদের সকলের, সারা জাতির। তাই ইচ্ছা করেই তাঁর লোভনীয় সান্নিধ্যের লোভ ত্যাগ করতে হত। তাছাড়া দীর্ঘকাল কলকাতার বাইরে বাইরে ঘুরেছি। সুযোগও তেমন পাইনি। সুযোগ এল যখন স্থায়ী ভাবে এখানে এসে বসলাম এবং তার পরে সাহিত্য অকাডেমির সভ্যপদ জুটে গেল।

দিল্লীতে ডক্টর চ্যাটার্জী বঙ্গভবনে উঠতেন। আমাকেও সেই পরামর্শ দিয়েছিলেন। যে দুটো দিন থাকতেন অতবড় বাড়িটায় সাড়া পড়ে যেত। খাবার টেবিলে, লাউঞ্জে, সামনেকার বারান্দায় ভিড় উপচে পড়ত তাঁকে ঘিরে। উনি বলছেন, আর সব শ্রোতা।

আমি তাঁর সঙ্গেই এক গাড়িতেই যেতাম রবীন্দ্রভবনে (অকাদেমির সদর অফিস) এবং সভাশেষে ঘুরতাম যেখানে যেখানে উনি নিয়ে যেতেন। না, কোনো বড় বড় জায়গায় নয়। গোলমার্কেটের কোনো চেনা গুজরাটী দোকানে, কোনো শিখ-গুরুদ্বারে, কোনো দক্ষিণ-ভারতীয় রেস্তোরাঁয়। যেখানে যান তাদের ভাষায় আলাপ। কে বলবে সে দেশের লোক নন তিনি। তারা সঙ্গে সঙ্গে অন্তরঙ্গ হয়ে উঠত। উনিও জমে যেতেন।

বঙ্গভবনে একবার এক ঘরেই আমাদের দুজনের থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল। প্রথমটা আমার একটু বাধো বাধো ঠেকছিল। কিন্তু রাত দশটা নাগাদ খাওয়া-দাওয়া সেরে পাশের খাটে শুয়ে উনি যখন ওঁর গল্পের থলি খুলে ধরলেন, মুহূর্ত মধ্যে সব সঙ্কোচ উবে গেল। সে গল্পের না আছে বিষয়ের শেষ, না আছে বৈচিত্র্যের অন্ত। দেশ-দেশান্তরের কত বর্ণাঢ্য অভিজ্ঞতা, যেমন তথ্যবহুল, তেমনি রসপুষ্ট।

ঐ একটা জিনিস তাঁর মধ্যে বরাবর দেখেছি—পাণ্ডিত্যের সঙ্গে সরসতার সমন্বয়, সংসারে যা অতি দুর্লভ। পণ্ডিতেরা সাধারণতঃ গুরুভাষী। সুনীতিকুমার সে বিষয়ে বিরল ব্যতিক্রম। ঋষিতুল্য প্রজ্ঞার অধিকারী হয়েও তিনি সাধারণ বাঙালী-সুলভ আড্ডা জমাতে অদ্বিতীয় ছিলেন।

সেরাত্রে তাঁর বিস্তীর্ণ বিদেশভ্রমণের কাহিনী যখন শুনছিলাম, তার ভিতর থেকে তাঁর চরিত্রের একটা বিশেষ দিকের পরিচয় পেলাম, যার আভাস একটু আগে দিয়েছি। যারা সামান্য মানুষ, তাঁর মত মহাজ্ঞানী ব্যক্তির কাছে আরো সামান্য, তাঁদের সঙ্গে মিশবার এবং মিশে আনন্দ পাবার তাঁর একটা আশ্চর্য ক্ষমতা ও প্রবণতা ছিল।

এশিয়া, ইউরোপ ও আমেরিকার বহু দেশে তিনি ভ্রমণ করেছেন। বড় বড় সভা-সম্মেলনে যোগ দিয়েছেন, নানা বিষয়ে ভাষণ দিয়েছেন। সেসব দেশের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সঙ্গে আনাগোনা, বড বড প্রতিষ্ঠানে সেমিনার, আলোচনা, বড বড পার্টি, খানাপিনা, সাংবাদিকদের সঙ্গে সাক্ষাৎকার—এগুলোই ছিল তাঁর নির্ধারিত কর্মসূচী। সেটাই প্রত্যাশিত। সেখানে কোন ত্রুটি হয়নি। কিন্তু এত সব ব্যস্ততার মধ্যেও যখনই একটু ফাঁক পেয়েছেন, বেরিয়ে পড়েছেন, মিশে গেছেন সাধারণ মানুষের মধ্যে। কোনো একটা সস্তা দামের কাফেতে গিয়ে ঢুকেছেন, দরিদ্র শ্রেণীর লোকেরা যেখানে বসে খায়, হৈ-হল্লা করে। তাদের সঙ্গে এক টেবিলে বসে সেইসব খাবার খেয়েছেন, কথা বলতে চেষ্টা করেছেন, যতটা সম্ভব তাদের ভাষায়, তাদের রসিকতায় যোগ দিয়েছেন, সুখ-দুঃখের কথা শুনেছেন।

সেসব গল্প শোনাতে গিয়ে বলছিলেন, কোনো দেশকে জানতে হলে বড় বড় অর্থাৎ উপর স্তরের লোকের সঙ্গে মিশলেই চলবে না। (তাদের চেহারা প্রায় সব দেশেই এক।) যেতে হবে নিচের তলায়, সাধারণ লোকের মধ্যে, তাদের রীতিনীতি, রুচি, আচার-আচরণ জানতে হবে, তাদের খাদ্যাখাদ্য খেয়ে দেখতে হবে, তাদের জীবনযাত্রা ও চিন্তাধারার সঙ্গে যতটা পারা যায় চেনা-পরিচয় করতে হবে।

অর্থাৎ সকলের উপরে ঐ মানব-প্রীতি, মানুষের প্রতি আকর্ষণ, দেশের ও বিদেশের বহু জ্ঞানান্বেষণের মধ্যেও সেটাই ছিল তাঁর জীবন-দর্শন।

আমার তো মনে হয়, ছোট বড় নানা ভাষা শিখবার তাঁর যে প্রবল আগ্রহ ও বিপুল পরিশ্রম—তার মূলেও ছিল ঐ মানুষকে জানার আকাঙ্ক্ষা। পরিচয়ের প্রধান ও প্রথম সূত্রই তো ভাষা।

রাত বেড়ে যাচ্ছিল। মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা করছেন, 'ঘুমুচ্ছেন ?' আমি বলছি, 'না।' মনে মনে হাসছি, এমন একটি দুর্লভ রাত ঘুমিয়ে নষ্ট করবো, অত বোকা আমি নই। তার পরেই ভাবছি, না, ওঁকে এবার থামতে বলি। কাল অনেক কাজ। কিন্তু বলা হল না।

এক সময় উনিই হঠাৎ ঘড়ি দেখে বলে উঠলেন, থাক, ভোর হয়ে গেছে। পাঁচটা বাজে। এবার আমি উঠি। আপনি একটু ঘুমিয়ে নিন।

স্মরণীয় ক্ষণ জীবনে অনেক এসেছে। কতক ভুলে গেছি, কতক ভুলে যাবো। কিন্তু বঙ্গভবনের ঐ রাতটি কোনো দিন ভোলবার নয়।

শিক্ষক সুনীতিকুমার

জ্যোৎস্নানাথ মল্লিক

আমি তাঁর ছাত্র। ১৯২৮-৩০ সনে ইংরাজী ফিললজি ক্লাসে তাঁর কাছে পড়বার সৌভাগ্য হয়। পরিপূর্ণ জীবনযাত্রার জন্য প্রস্তুতির পথে এই ধরনের ঋষিদের নিকটই পুরাকালে শিক্ষা নিতে হতো। সার্থক শিক্ষক ছিলেন—তাই তাঁর কাছে গেলে জ্ঞানের জ্যোতিতে তড়িৎস্পর্শের অনুভূতি আসতো। শুধু যে Romance of words-ই ক্লাসে চমৎকৃত করত তা নয়—অবলীলাক্রমে আমাদের বিশ্বের দেশ-বিদেশের ভাষা ও সংস্কৃতির পরিবেশে নিয়ে যেতেন। ভাষার শ্রেণী-বিভাগে এই শুনলাম কোন রেড্ ইণ্ডিয়ান ভাষায় নমুনা Achichilla-kachikon—একটি শব্দে একটি বাক্যের প্রকাশ—where the men weep because the water is red; এই শুনি জাপানী Ta jin ও jin ta-র প্রভেদ great man আর man is great; এই শুনি শব্দের রমন্যাস—বক্সী কি করে এলো ভিক্ষু থেকে; কি করে বৌদ্ধ ভিক্ষুরা ভারতের বাইরে চলে গেলো জ্ঞানের আলো ছড়াতে; কি করে মুসলমান দেশে বিদ্বান লোকরা ভিক্ষু থেকে নেওয়া বক্স হলো, কি করে মুসলমান আক্রমণের পর ভারতের লোকরা, হিন্দু ও মুসলমান, বিদ্যার জন্য বক্সী খেতাব পেলো, মুসলমান রাজত্বের সময়।

আবার কোন সাম্প্রদায়িক অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে অনুপ্রাণিত করতেন পরমুহূর্তে, we must put up a stiff fight। তাঁর ছাত্রবাৎসল্যে বহু বৎসর ধরে ছাত্রসমাজ পুষ্ট হয়। অজ্ঞানতার অপরাধ অমার্জনীয় ছিল। একদিন ক্লাসে ঢুকেই জিজ্ঞাসা করলেন চৈতন্যদেবের জন্মদিন। বলতে না পারায় ক্লাস নিলেন না, লাইব্রেরীতে গিয়ে চৈতন্যদেবের জীবনী পড়তে বললেন। মহত্তম একজন বাঙ্গালী মহাপুরুষের জন্মতারিখ না জানা বাঙ্গালীর পক্ষে লজ্জার কথা। এখনও কোন জিনিসে এরূপ অজ্ঞতা দেখলে নিজেই লজ্জিত হয়ে পড়ি, তাঁর তিরস্কার স্মরণ করে। ভাল ছেলের সামান্য ভুলও ক্ষমা করতেন না। এম. এ. পরীক্ষার heroic poetry-র উপর প্রবন্ধে একজন কয়েক স্থানে chadwick-এর জায়গায় খাতায় chadwig লিখে ফেলে; এজন্য নম্বর বলার সময়, কাকে কি নম্বর দিয়েছেন বলে, তাকে বললেন, "আপনাকে ৫৯ দিয়েছি—ফার্স্ট ক্লাস নম্বর ইচ্ছে করে দিইনি—এ ভুল অমার্জনীয়।" জ্ঞানে অযথাযথতার ক্ষমা নেই।

তাঁর উত্তর কলকাতার বাড়িতে গিয়েছি। তাঁর ব্যায়ামের কথা ও গামলা উত্তোলনের কথা শুনেছি। দক্ষিণ কলকাতায় বাড়ি হলো। আমরা যেতাম। তাঁর বাড়ি দেখতে জোড়ে জোড়ে অনেকে এসে কি রকম বিব্রত হয়েছেন ও করেছেন, তা হাসতে হাসতে বর্ণনা করলেন। কেউ Drawing Room দেখতে চাইলে কি করে চাদর ঢাকা চৌকি ও তাকিয়া দেখিয়েছেন, কেউ Dining Room দেখতে চাইলে কি করে সিঁড়ির কাছের জায়গা ও পিঁড়িগুলো দেখিয়েছেন তার হাস্যোজ্জ্বল বর্ণনা দিলেন।

মনে প্রাণে আচারে ব্যবহারে বেশভূষায় তিনি হিন্দু বাঙালী ছিলেন। হিন্দুস্থান পার্কে বাড়ি হলো, নাম "সুধর্মা", দেবসভার নাম। বাইরের বসবার ঘরের দেওয়ালে বেদ উপনিষদ ও অন্য সব ধর্মগ্রন্থ থেকে নেওয়া উদ্ধৃতি খোদাই করে বসানো। বাড়ির দরজার উপরে গণেশের মূর্তি। দেখিয়ে বললেন, কোথাকার জানেন? দাঁইহাটের। আপনাদের বর্ধমান জেলার, গণেশের এরকম মূর্তি আর কোথাও পাবেন না। শিল্পটি অনাদরে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

কত বই দেখাতেন। কত ছবির সংগ্রহ। কত পুতুল ও শিল্প-সংগ্রহ। একদিন একটা ব্রোঞ্জের মূর্তি দেখালেন। ছেলে কোলে মা বসে থাকলে যে রকম পিঠ বাঁকানো মূর্তি, সেই রকম। কিন্তু ছেলেও নেই, কোলও নেই। অপূর্ব পিঠের বাঁকানো ঢং। বললেন, পুরীতে মাটি নিয়ে খেলার ছলে ঠাকুরবাড়ির কোন বধূ এটি গড়েন। তিনিও আর দুজন শিল্পরসিক বন্ধু যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁরা এইটি এত পছন্দ করলেন যে তখুনি তার তিনটি ব্রোঞ্জের প্রতিমূর্তি করা ঠিক হলো। একটি এল তাঁর বাড়িতে। কি করে দুষ্প্রাপ্য বই যোগাড় করেছেন তারও ইতিহাস শুনতাম। টাকা নেই বলে আরও কত কি সংগ্রহ করতে পারছেন না বলতেন।

একদিন আমরা বসে। শ্রীশ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এলেন। শিশির ভাদুড়ীর তখন অ্যামেরিকা যাওয়ার আয়োজন চলছে। শিশিরকুমারের গৌরবে তিনি বাংলা দেশকে গৌরব বোধ করতে বললেন। কি Letter head শিশিরকুমারের হবে তারই জন্য শ্রীশবাবুর আগমন। সুনীতিকুমার ঠিক করে দিলেন। আঁকতে পারতেন সুন্দর—আনন্দও পেতেন। আমরা আশ্চর্য হলাম—বললেন, চোখ খারাপ না হলে আমি তো Art school-এই চলে যেতাম। সদাই আনন্দ, সদাই উৎসাহ। কোন জিনিস মনে স্থান পেলে তার সমাধান না হওয়া পর্যন্ত শান্তি পেতেন না। রামমোহন ফাউণ্ডেশন নিয়ে কাগজে যা সব স্কীম্ প্রচারিত হচ্ছিলো,

তাতে তিনি খুশী ছিলেন না। কিছু লিখতে বললেন আমাকে। পাঠাতে বললেন নানা জায়গায়। কিছুদিন পরে এক বিবাহবাড়িতে দেখা হওয়া মাত্রই জিজ্ঞাসা করলেন লেখা হয়েছে কিনা—শীঘ্রই লিখে ফেলে সব পাঠিয়ে দিতে বললেন। পরে হয়েছে শুনে তবে খুশী।

বহু ভাষা তিনি জানতেন। সব দেশের সংস্কৃতির প্রতি তিনি ছিলেন শ্রদ্ধাবান। World Literature and Tagore বই-এ তাঁর জ্ঞানের উদারতা ও বিভিন্ন সংস্কৃতির ঐক্য ও মূল সুরের সঙ্গে পরিচয় উদ্ঘাটিত হয়েছে। তিনি রামমোহনের মতই Universal man.

স্বাধীনতার পর তিনি একবার Cairo যান। তিনি বিভিন্ন দেশের সংস্কৃতির সঙ্গে সে দেশের আহারকেও যুক্ত করে দেখতেন। তাই বিশ্ববিদ্যালয়ে আলোচনার পর ঐ দেশের এক অধ্যাপককে সঙ্গে নিয়ে ঐ দেশের এক পুরাতন পল্লীর দোকানে মাংস-রান্না আস্বাদ করতে বেরিয়ে পড়লেন। কায়রোয় তখন সাধারণ লোক ভারতীয়কে দেখতে পারে না। পাকিস্থানী প্রীতিই প্রবল। ভারতীয় শুনলে গায়ে থুতু দেওয়ার অবস্থা। ভারতীয় দূতাবাসের কর্মচারীরা বেশীর ভাগ অক্ষম ও তাদের কয়েকজন সম্বন্ধে বিশ্বস্ততা সন্দেহজনক। তদানীন্তন কেন্দ্রীয় সরকারকে জানাবেন বললেন। কিন্তু মাংসের আস্বাদ না করে ফিরে আসা যায় না। খানিক দূরে গাড়ি রেখে পুরাতন শহরের গলিতে ঢুকতে হলো। পথে ধরলো তাঁকে একজন, ভারতীয় না পাকিস্থানী এই প্রশ্ন। আচার্য কোরাণ থেকে পরিষ্কার ভাবে একটি বয়াৎ আউড়ে আদাব করে ছাড়া পেলেন। তাঁর সম্বন্ধে পথচারীর সন্দেহ দূর হলো। সঙ্গী হেসে তাঁকে মাংস খাওয়াতে নিয়ে গেলেন।

তাঁর সঙ্গে ভোজ-বাড়িতে আহারও একটা স্মরণীয় অভিজ্ঞতা। তাঁর আহার ও আস্বাদনের প্রাচুর্যে ও আনন্দে, তার সঙ্গে বিভিন্ন দেশে তাঁর খাদ্য আস্বাদনের অভিজ্ঞতার বর্ণনায়, তাঁর বলিষ্ঠ সৌম্য দেহ উজ্জ্বল হয়ে উঠতো ও জীবনের রস-বোধ চতুর্দিকে ছড়িয়ে দিতো। ডাঃ ভবতোষ দত্তের বাড়িতে একটি ঘরোয়া ভোজে তাঁর রেঙ্গুনে এক বর্মীর বাড়িতে নাপ্পি খাওয়ার বর্ণনা শুনি। যখন ভাত আর দুর্গন্ধময় নাপ্পি পাতে পড়লো, তখন মুহূর্তের জন্য স্থির হলেন এবং নিজেকে—ব্রাহ্মণ-তনয়কে—যোগ স্মরণ করে নাসা কিয়ৎকালের জন্য রুদ্ধ করতে বললেন এবং শেষ পর্যন্ত তৃপ্তি সহকারে ভোজ্যবস্তু সবটুকুই গ্রহণ করলেন। গল্প করতে করতে তাঁর এক ডজন ইলিশখণ্ড ও তার সমানই মুরগীর মাংস অতি সহজভাবে গ্রহণ করা হয়ে গেল।

তিনি খেতে ভালবাসতেন, খাদ্যরসিক ছিলেন। রাজা রামমোহন সম্বন্ধে বলতে গিয়ে এক সভায় বললেন, "তাঁকে শ্রদ্ধা করি, কিন্তু যেদিন শুনলাম তিনি একটি গোটা পাঁঠা একাই ভোজন করতে পারতেন, সেদিন থেকে তাঁর প্রতি আমার শ্রদ্ধা আরও বেড়ে গেলো।" গোপাল হালদার মহাশয় তাঁকে ঠিকই বলেছেন gourmet ও gourmand, অতিভোজী ও ভোজন-বিলাসী।

তাঁর কাছ থেকে একদিন ফোন পেলাম এক স্কুলে পুরস্কার বিতরণ করতে হবে। বললাম, স্যার, আমি তো যাই না। বললেন, এই স্কুলে যেতেই হবে আমাকে, কারণ Seal's Free Primary School না থাকলে তাঁর লেখাপড়াই হতো না। আমি কৃতার্থ হয়ে সেখানে গেলাম ও তাঁকে প্রণাম করে ও সেই স্কুলের প্রতিষ্ঠাতাদের সম্মান ও শ্রদ্ধা জানিয়ে, তাঁর আশীর্বাদ নিয়ে ফিরলাম।

ভারতের ঐতিহ্য তাঁর মনে প্রাণে। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর বিশ্বজনীনতা-বোধ এই ভারতীয় ঐতিহ্যেরই উৎস থেকে প্রবাহিত। গিয়েছেন লণ্ডনে। Grierson সাহেব তাঁর গুরুস্থানীয়। অভিবাদন করলেন। কথায় কথায় তিনি বললেন, কোন ভারতীয় একটা কাগজ ফেলতে হলে কাগজ ফেলার ঝুড়ির কাছে গিয়ে তবে ফেলে, একজন ইংরেজ ছেলে ছুঁড়ে বা লাথি মেরে ফেলে দেবে। ভারতীয় অভিবাদনও বড় graceful—সৌষ্ঠবমণ্ডিত। তিনি অনুরোধ করলেন, "সুনীতি, তোমাদের দেশে গুরুকে যেমন ভাবে প্রণাম করে, তেমনি ভাবে আমাকে প্রণাম করো।" নীচু হয়ে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম হলো এবং ভারতীয় ভঙ্গীতে আশীর্বাদ মিললো।

খুব স্পষ্টবক্তা ছিলেন। অনেক সময় একটা গ্রাম্যতাও কথায় ফুটে উঠতো। আমি তখন আই. এ. পড়ি। বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরিয়ান, বাবার আবাল্য বন্ধু, বসন্তবিহারী চন্দ্রের ঘরে বাবার সঙ্গে বসে আছি। ডঃ সুনীতিকুমার ক্ষিপ্রগতিতে ঘরে ঢুকে বাবাকে দেখে বললেন, "মল্লিক মশায়, Political খ্যামটাওয়ালীদের খবর দেখছেন?" কোন নেতৃস্থানীয়া সম্বন্ধে এই উক্তি। কলকাতায় ও ভারতের অন্যান্য জায়গায় বিদ্যার আদর কমে যাচ্ছে—অধ্যাপকের পদ রাখা যাচ্ছে না—স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে এটা তাঁকে ব্যথিত করে। বিদ্বানের সমাদর কমে যাচ্ছে ভাবলেন। বললেন, "নেহেরু, তার Culture সম্পর্কে শ্রদ্ধা হবে কি করে? নহরের ধারে বাস ছিল বলে যার পদবী নেহেরু, তার কাছে এসবের কি মূল্য থাকবে? ভাবতে পারেন, Canal-এর ধারে থাকে বলে Canalru উপাধি!" শিশুসুলভ আনন্দ—শিশুসুলভ রোষ। সরকার যখন তাঁর মর্যাদা বুঝলো, যখন

জাতীয় অধ্যাপক হলেন, তখনও মন্ত্রী-বিশেষের জ্ঞান-বুদ্ধিতে আস্থা না থাকায় 'মূর্খ' বলতে কোন দ্বিধা করতেন না। আগেকার দিনের মুনি ঋষি কি রাজমন্ত্রীর মত, 'ভরতর্ষভ' বলে সম্বোধন করে 'বালিশ' কি 'পাপিষ্ঠ' বলার মত সহজ ছিল তাঁর প্রকাশ্য তিরস্কার! কোন অসূয়া ছিল না।

একবার অ্যামেরিকা থেকে চারজন বিশিষ্ট অধ্যাপক এসে হাজির, পনের দিনের মধ্যে ভারতে ইংরাজী ভাষা শিক্ষা নিয়ে রিপোর্ট দেওয়ার জন্য। সেদেশের কোন এক সংস্থা জরুরী বলে তাদের পাঠিয়েছিল। স্থানীয় ব্রিটিশ কাউন্সিল কলকাতায় কয়েকজন শিক্ষাবিদের সঙ্গে দিল্লীর অনুরোধে তাদের যোগাযোগের ব্যবস্থা করেছেন। অধ্যাপক সুনীতিকুমারের পাশে একজন বসে কথা বলছিলেন। ব্রিটিশ কাউন্সিল এখানে যে চেষ্টা করছে, মাধ্যমিক বোর্ড যে প্রচেষ্টা করছে, কি ধরনের ইংরাজী এখানে পড়ানো হয়, ভারতে ইংরাজী শিক্ষার উদ্দেশ্য কি, এসব তাঁরা জানেন না। কিন্তু কয়েক দিনেই রিপোর্ট দিতে হবে। অনেক জায়গায় ঘুরতে হবে। বললাম, স্যার, এঁরা কিছু জানেন বলে তো মনে হলো না। অমনি মন্তব্য করলেন, "মূর্খ হে মূর্খ, চলো ভাল খাবার আছে, খেয়ে আসা যাক।"

ছাত্রাবস্থার শেষে যখন বিবাহের ঠিক হলো, তখন তাঁর একখানি আশীর্বাদী বাবার নিকটে পৌঁছালো।

লিখেছেন "কায়মনোবাক্যে ঈশ্বর সমীপে বর বধূর দীর্ঘায়ু এবং শান্তিময়, সুখময় ও পরহিতে উৎসর্গীকৃত জীবন কামনা করিতেছি।

ত্রীণি অমৃত পদানি সু-অনুষ্ঠিতানি
নয়ন্তি স্বর্গং দমঃ। ত্যাগঃ। অপ্রমাদঃ।

দম ত্যাগ ও অপ্রমাদ, এই তিনটি অমৃত পদের সম্যক পালন দ্বারা ইঁহাদের দাম্পত্য-জীবন ইহজীবনেই ইহাদিগকে স্বর্লোকের আভাস প্রদান করুক। দেবতা সমীপে আন্তরিক প্রার্থনা নিবেদন করিতেছি—

কল্যাণং দাম্পত্যোর্বিদধতু
বিশ্বে দেবাসঃ।

যাঁর স্নেহ এতদিন পেয়ে এসেছি তাঁর মহাপ্রয়াণে তাঁকে বার বার প্রণাম জানিয়ে তাঁর জ্যোতির্ময় মূর্তি স্মরণ করি।

মানুষ সুনীতিকুমার

আশুতোষ ভট্টাচার্য

মাত্র ২১।২২ বছর বয়সে আচার্য সুনীতিকুমারের সামনে বি. এ. অনার্স পরীক্ষার সময় যখন মৌখিক পরীক্ষা (viva voce) দিবার জন্য প্রথম উপস্থিত হলাম, তখন তিনি আমাকে প্রথম দর্শনেই বললেন, বসুন।

আমি চমকে উঠলাম, ভুল শুনছি না তো, ভুল ছাড়া কি আর হতে পারে? সুতরাং দাঁড়িয়েই রইলাম, বসলাম না' তিনি আবার বললেন, বসুন। এবারও কি ভুল শুনলাম? তাঁর মুখের দিকে বোবার মত তাকিয়ে রইলাম। আমার অধ্যাপক ডক্টর সুশীলকুমার দে-ও সেখানে উপস্থিত ছিলেন, আমার এ রকম অবস্থা দেখে তিনি শান্তভাবে বললেন, বোস। উনি তোমায় বসতে বলছেন।

আমি অত্যন্ত সঙ্কুচিত হয়ে দুজনের সামনে চেয়ারটায় বসে তাঁদের কাছ থেকে প্রশ্ন শোনবার জন্য উৎকণ্ঠিত হয়ে রইলাম। 'বসুন' কথাটি মগজের আনাচে-কানাচে ধাক্কা খেয়ে ফিরতে লাগল।

আচার্য সুনীতিকুমারের সঙ্গে সেই আমার প্রথম দেখা। তাঁর বাংলা ভাষার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ সম্পর্কে দু'খণ্ড সুবৃহৎ বই ইতিপূর্বেই প্রকাশিত হয়েছিল সত্য, কিন্তু আমাদের আমলে সেই বই পাঠ্য ছিল না, পরে এম. এ-তে ছিল। সেই জন্য তাঁর পাণ্ডিত্যের কোনো পরিচয় তখনও জানতাম না। তবে তাঁর একটি পরিচয় তখন সকলের কাছে খুব আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছিল। তিনি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে যে যাভা ও বালীদ্বীপ ভ্রমণে গিয়েছিলেন, তার অত্যন্ত সরস বর্ণনা তখন প্রতি মাসে 'প্রবাসী' পত্রিকায় প্রকাশিত হতো। আমি তাঁর সেই ভ্রমণ-বৃত্তান্তের নিয়মিত পাঠক ছিলাম। তার মধ্যেও তাঁর অনেক পাণ্ডিত্যের পরিচয় থাকলেও পাণ্ডিত্যের অংশটুকু তখনও আমাদের গ্রহণ করবার মত ক্ষমতা হয়নি (এখনও হয়নি)। তবে তার মধ্যে তাঁর যেসব খুঁটিনাটি বর্ণনা ও সরস হাস্যকৌতুকের স্পর্শ থাকতো, তা আমাকে সহজেই আকর্ষণ করতো। তাঁর বর্ণনার গুণে যাভা ও বালীদ্বীপকে এক স্বপ্নরাজ্য বলে মনে হতো। রবীন্দ্রনাথের 'সাগরিকা' কবিতাটি সে দেশের এই স্বপ্নময়তার ভাবটি আমার মনে আগেই ফুটিয়ে তুলেছিল। তাই তাঁকে তখনও পণ্ডিত বলে জানিনি, একজন সুরসিক সাহিত্যিক বলেই জানতাম।

তাই তাঁর সামনে পরীক্ষা দিতে বসে এই কথাই আমার মনে হতে লাগল, তিনি

হয়ত আমার সঙ্গে রসিকতাই করলেন। নিশ্চয়ই আমার পরীক্ষা খারাপ হয়েছে বলে আমাকে ব্যঙ্গ ক'রেই ঐ রকম সম্বোধন করলেন। কারণ, প্রাচীন কাল থেকেই আমাদের দেশে শিক্ষা-ব্যবস্থায় যে ঐতিহ্য গড়ে উঠেছে, তার ফলে শিক্ষাগুরু আমাদের কাছে পিতৃতুল্য। শিক্ষাগুরুকে কায়িক সেবা করে, তাঁর বাক্য পালন করে, তাঁর মুখের কথা শুনে একজন মানুষ যত জ্ঞান লাভ করেছে, পুঁথি পড়ে তত জ্ঞান লাভ করেনি। সেইজন্য পিতৃঋণের মত গুরুঋণও আমাদের ঋণ। বিচিত্র গুরুঋণের গুরুত্ব যে কত, তা রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'ঋণশোধ' নাটকটিতে সুন্দর করে বুঝিয়ে দিয়েছেন। পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা-ব্যবস্থায় কিন্তু তার ব্যতিক্রম দেখা যায়। সেখানে শিক্ষাগুরু বন্ধুর স্থান অধিকার করে থাকেন। তাঁর সঙ্গে ছাত্রের চিরদিনই বন্ধুর মতই ব্যবহার করবার রীতি। আচার্য সুনীতিকুমার ভারতের মাটিতে জন্মগ্রহণ করেও এবং ভারতীয় সংস্কৃতির প্রচারক হওয়া সত্ত্বেও তাঁর জীবনে ভারতীয় শিক্ষকদের জীবনাচরণের সাধারণ ধারাটি অনুসরণ করে চলেননি। তার ফলে তাঁর ছাত্র মাত্রই ছিল তাঁর বন্ধু; ভারতীয় ঐতিহ্যে গুরুর যে পদধূলি শিষ্যের শিরোধার্য, তাও তাঁর ছাত্রদের কাছে ছিল অপ্রাপ্য।

এ কথা সকলেই জানেন, আচার্য সুনীতিকুমার আজীবন তাঁর কোনো ছাত্রকেই তুমি কিংবা তুই বলে সম্বোধন করতেন না, সর্বদাই এবং সর্বত্রই আপনি বলে সম্বোধন করতেন। অথচ তিনি তাঁর ছাত্রদের যত অন্তরঙ্গ হতে পারতেন অনেকেই তা পারতেন না।

তিনি কোনো ছাত্র কিংবা কোনো ব্যক্তিকেই তাঁর পদধূলি নিতে কিংবা পাদস্পর্শ করতে দিতেন না, এই বিষয়ে অনেক সময় তাঁকে অনেকের সঙ্গে প্রায় মল্লযুদ্ধ করতে হয়েছে দেখতে পেয়েছি। অনেক নাছোড়বান্দা ব্যক্তি তাঁর পা ছুঁয়ে তাঁকে প্রণাম করতে কৃতসঙ্কল্প, তিনিও তাঁর সর্বশক্তি প্রয়োগ করে তাতে বাধা দিয়ে চলেছেন; তিনি শক্তিশালী ব্যক্তি ছিলেন, তাই শেষ পর্যন্ত সকলেই তাঁর কাছে শক্তিতে পরাজিত হতেন, কিন্তু ভক্তিতে নয়। ভারতীয় শিক্ষক-জীবনের ঐতিহ্যের বিরোধিতা করে তিনি তাঁর এই আচরণ যে কি ভাবে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত নিষ্ঠা এবং সতর্কতার সঙ্গে পালন করে গেছেন তা শিক্ষক হিসাবে আমাদের ভাবতেও বিস্ময় বোধ হয়। অথচ আমাদের দেশের শিক্ষক-সমাজে তাঁর দ্বিতীয় কোনো দৃষ্টান্ত নেই। তিনি কাউকেই অনুকরণ করেননি। সমাজ-জীবনের সংস্কারকেও তিনি তাঁর নিজের জ্ঞান বুদ্ধি ও বিশ্বাস মত নিজের জীবনে গ্রহণ করতেন, সেই জন্য সমাজে অনেক বিষয়ে বিশেষতঃ সামাজিক আচার-আচরণের

অনেক ক্ষেত্রেই তিনি একক এবং নিঃসঙ্গ ছিলেন। তা নিঃসন্দেহে একটি মহত্ত্বের ও মানসিক বলিষ্ঠতার লক্ষণ।

কেবলমাত্র তাঁর নিজস্ব ছাত্র-সমাজেই নয়, সর্বত্রই তিনি তাঁর এই সমদর্শিতার ভাব অক্ষুণ্ণ রাখতেন, তার ফলেই তিনি একজন বিশ্বখ্যাত পণ্ডিত হওয়া সত্ত্বেও সর্বস্তরের মানুষের সঙ্গে সহজভাবে মিশতে পারতেন। আমাদের দেশের পণ্ডিত-সমাজ তার আত্মাভিমানের মধ্যে বিচ্ছিন্ন হয়ে বাস করে, সাধারণ মানুষের সঙ্গে সহজভাবে মিশতে পারে না। কিন্তু পাশ্চাত্ত্য সমাজের মৌলিক গঠনই তার বিরোধী। সুনীতিকুমার এই বিষয়ে পাশ্চাত্ত্য সমাজ-জীবনের আদর্শটাই অনুসরণ করেছেন; তাই তিনি আমাদের সামনে বিস্ময়কর হয়ে উঠেছেন।

বন্ধু সুনীতিকুমার

কালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত

আমাদের গর্বের এবং গৌরবের পরিচয় যে আচার্য সুনীতিকুমার আমাদের অশেষ শ্রদ্ধাস্পদ অগ্রজপ্রতিম বন্ধু ছিলেন। যদিও বয়সের পার্থক্য বেশী ছিল না—এবং উভয়েই কলিকাতার একই পল্লীতে দীর্ঘকাল বাস করি, তবু তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠতা হয় এবং তাঁহার সান্নিধ্য লাভ করি—বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে, বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনে, রবিবাসরে এবং নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ীর সন্নিধানে। শিশিরকুমারও আমার অগ্রজপ্রতিম বন্ধু ছিলেন এবং আমি তাঁহার ও তাঁহার পরিবারবর্গের চিকিৎসা করিতাম, সৌহার্দ্য সূত্রেই। বেথুন রো-তে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ও শিশির-কুমার ১৯৩১ খৃ:-তে একই বাড়িতে থাকিতেন। প্রভাতকুমার দোতালায়, শিশির-কুমার তার উপরের ফ্ল্যাটে। প্রভাতকুমারের জ্যেষ্ঠ পুত্র ডা: অরুণকুমার আমার মেডিকেল কলেজের সহপাঠী ও ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। আমরা উভয়েই ১৯১৮ খৃ:-তে কলিকাতা মেডিকেল কলেজ হইতে এম. বি. পাশ করি। প্রভাতকুমার বয়সে আমার পিতৃপ্রতিম ছিলেন, সুতরাং তাঁহার সহিত কখনও মিশিবার সৌভাগ্য ঘটে নাই। কিন্তু তিনি কৌতুক-প্রিয় ও হাস্যরসিক ছিলেন। কোন এক সভায় সুনীতিকুমার শিশিরকুমার ও প্রভাতকুমার প্রভৃতি ছিলেন। এমন সময়ে কোনও এক স্থূলাঙ্গিনী মহিলার আগমন-নির্গমনের পর তাঁহার প্রসঙ্গে প্রভাতকুমারের 'সিঁদুর কৌটা'র ততোধিক স্থূলাঙ্গিনী এক নায়িকার খেদোক্তি "শরীলে আর পদাথ নেই" উল্লেখ করে খুব হাসাহাসি হয়। সে আসরে আমাদের সুধাদাও—(সুধাংশুভূষণ মুখোপাধ্যায়—শিশিরদার অভিন্ন-হৃদয় বন্ধু—যাঁহাকে প্রেমেন্দ্র মিত্র তাঁহার 'প্রথমা' গ্রন্থখানি উৎসর্গ করেন) ছিলেন। প্রসঙ্গটি উত্থাপন করেন সুনীতিকুমার। এই আসরে সুনীতিকুমার 'রত্নদীপ' গ্রন্থখানিকেই তাঁহার শ্রেষ্ঠ উপন্যাস বলেন। তাঁহার (প্রভাতকুমারের) জানোয়ার চন্দ্রশর্মা ছদ্মনামে রচিত,—"সূক্ষ্মলোম পরিণয়" নামে বানর মহারাজা মহিষ রাজা ও মেষ মহিষ ছাগ শৃগাল গর্দভ প্রভৃতি পুরুষ পশু ও গাঢ়লোমা শ্বেতলোমা প্রভৃতি নারী পশুদের লইয়া লেখা একটি পঞ্চাঙ্ক প্রহসন বা নক্সা বিষয়েও আলোচনা হয়। এটি তখনও মুদ্রিত হয় নাই, এটি সম্বন্ধে ও বিবাহের যৌতুক ও যোটক-বিচার সম্বন্ধে এই সভায় সমালোচনা হয়। এই প্রসঙ্গেই জানিতে পারি যে, প্রভাতকুমার প্রথমে কবিতা লিখিতেন। সে সময়

"কুন্তলীন" বাৎসরিক পুরস্কারের বিষয় ছিল —"পূজায় চিঠি"। তাহাতে স্ত্রী যেন প্রবাসী স্বামীকে বাড়ি আসিতে ও এইচ. বোসের এক শিশি "কুন্তলীন" আনিতে অনুরোধ করিতেছে।

প্রভাতকুমার প্রতিযোগিতায় শ্রীরাধামণি দেবী এই ছদ্মনাম ব্যবহার করেন এবং সে বৎসরের প্রথম পুরস্কার লাভ করেন। পরে "কুন্তলীন"-পক্ষ তাহা জানিতে পারেন, ও ঘোষণা করেন যে প্রতিযোগিতায় কেহ ছদ্মনাম ব্যবহার করিলে পুরস্কার পাইবেন না। প্রভাতকুমার বয়সে সকলের বড় হইলেও সেই কৌতুকপ্রিয় রসিক পুরুষকে লইয়া ঐ দিন সুনীতিকুমার ও শিশিরকুমার নানাবিধ হাস্য-কৌতুকের অবতারণা করিয়াছিলেন। অল্প দিন পরেই, সম্ভবতঃ ১৯৩২ খৃঃ এপ্রিলে প্রভাতকুমারের মৃত্যু হয়। আমি তখন থাকিতাম হেদুয়ার দক্ষিণ-পূর্ব কোণে ১২৪/৪ মানিকতলা স্ট্রীটে।

ইহার পরে আসি ১৯৩৫ খৃঃ সুনীতিকুমারের ইউরোপ ভ্রমণ প্রসঙ্গে। তাঁহার এই ভ্রমণ-কাহিনী 'পশ্চিমের যাত্রী' নামে ঐ বৎসরই প্রকাশিত হয়। প্রথমে প্রবন্ধাকারে এই ভ্রমণ-কাহিনী প্রবাসী ও ভারতবর্ষে প্রকাশিত হয় এবং বিশেষ সমাদর লাভ করে।

ইহার অনেক দিন পরে প্রখ্যাত শিল্পী-চিত্রকর বন্ধুবর শ্রীভূনাথ মুখোপাধ্যায়ের —বৌবাজারে ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন হলে অনুষ্ঠিত চিত্র-প্রদর্শনীতে তাঁহার সহিত দেখা হয় ও তাঁহার ভিয়েনা-ভ্রমণ ও সিগ্‌মুণ্ড্ ফ্রয়েডের সহিত সাক্ষাৎকারের বিষয়ে আলোচনা হয়। প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক ফ্রয়েড্ সাহেবের সহিত আলাপের জন্য তিনি কলিকাতার Psycho Analytical Society-র সভাপতি ডঃ গিরীন্দ্রশেখর বসুর নিকট একটি পরিচয়পত্র লইয়া যান।

ফ্রয়েড নার্ভ-বিশেষজ্ঞ ডাক্তার (neurologist) ছিলেন। তিনি হিপনোটিজ্‌ম্ সম্বন্ধে শিক্ষা গ্রহণ করে হিস্টিরিয়া সম্বন্ধে গবেষণা করেন। মনোরোগীদের মন বিশ্লেষণ করে তাঁর ধারণা হয় যে শিশুর মনেও যৌনবোধ থাকে এবং মাতা-পিতার প্রতি আকর্ষণে তাহার প্রভাব প্রতিফলিত হয়।

অবদমিত ও অপরিতৃপ্ত যৌন-কামনা অনেক সময় মনোরোগ উৎপন্ন করে। তিনি সেজন্য মনঃসমীক্ষণ বা Psycho-analysis পদ্ধতি মানসিক রোগের চিকিৎসায় প্রবর্তন করেন। ১৯৩৩ খৃঃ নাৎসী জার্মানী তাঁহার গ্রন্থগুলি নিষিদ্ধ করেন। সুনীতিকুমার যখন যান তখন তিনি অশীতিপর বৃদ্ধ, অসুস্থ এবং দুর্বল। টেলিফোন ধরেন না, সাধারণতঃ দেখাও করেন না। মনে হয়, সুনীতিকুমারের সহিত

সাক্ষাৎকারের কিছু দিন পরে, অষ্ট্রিয়া নাৎসী-অধিকারভুক্ত হলে, তিনি ইংলণ্ডে চলিয়া যান এবং সেখানেই ক্যানসার রোগে তাঁহার মৃত্যু হয়। ফ্রয়েডের আবিষ্কৃত যৌনভাব (libido) যে মানবশিশুর এবং জীব-মাত্রের মধ্যে বীজাকারে থাকে এবং অবচেতন স্তরে থাকিয়া আত্মপ্রকাশ করে,—ইহা যে ভারতবর্ষের বহু শতাব্দী পূর্বের পরিচিত তত্ত্ব তাহা তিনি 'ব্রহ্মসংহিতা'র নিম্নলিখিত শ্লোকটি ইংরাজী অনুবাদ সহ তাঁহাকে ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া দেন। এবং বলেন যে স্মরতা—libido বা sexual urge,—আদিপুরুষ পুরুষোত্তমের বা গোবিন্দের বা শ্রীকৃষ্ণেরই লীলা। শ্লোকটি এই :—

আনন্দ চিন্ময় রসাত্ম তয়া মনঃ স্থ
যঃ প্রাণিনাং প্রতিফলন্ স্মরতামুপেত্য।
লীলায়িতেন ভুবনানি জয়ত্যজস্রং
গোবিন্দমাদি পুরুষং তমহং ভজামি ॥

অর্থাৎ আনন্দ চিন্ময় রসের আত্মা স্বরূপে যিনি স্মরতা বা কামভাব আশ্রয় করিয়া সকল প্রাণীর চিত্তে আপনাকে প্রতিফলিত করিয়া স্বীয় লীলায় সকল ভুবন বিজয়ী হইয়া আছেন—সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।

তিনি এ বিষয়ে জগতের সার নিত্য ও অক্ষয় বস্তু বা পরমার্থ তত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁহার শেষ সিদ্ধান্ত কি তাহা স্পষ্ট করিয়া সোজা কথায় জিজ্ঞাসা করেন। ফ্রয়েড বলেন, তিনি কোন নিত্য বা অক্ষয় বস্তুর সন্ধান বা মনুষ্য-জীবনের সহিত তাহার কোনও যোগের সন্ধান তিনি পান নাই। ফ্রয়েড স্বীকার করেন যে দেহান্তের পর কি থাকে সে বিষয়ে তাঁহার কোন জ্ঞান নাই। তাঁহার দৃষ্টিতে তিনি সম্পূর্ণ অন্ধকার দেখেন। সুনীতিকুমার উপনিষদের ঋষিবাক্য এবং শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস প্রভৃতি অপরোক্ষ-দর্শী জ্ঞানী ভক্তদের কথা উল্লেখ করিয়া বলেন যে, তাঁরা উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন :—

শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ
আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ।
বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্
আদিত্য বর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ ॥

অর্থাৎ নিখিল মানবকে ডেকে তাঁরা বলছেন যে মানব মাত্রেই অমৃতের সন্তান,—এবং জীবনের পরপারে যে দিব্য ধাম এবং তমসার পরপারে যে মহান্ পরমপুরুষ—তাহা তাঁহারা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। উত্তরে ফ্রয়েড নিজের অজ্ঞান

এবং অবিশ্বাসের কথাই পুনরায় উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, জীবনটা যেন একজন ব্যারিস্টারের চোখে একটি bad case—অর্থাৎ নিশ্চিত হারিবার মত খারাপ মামলা। জিতবার কোন আশা নেই, পরাজয় নিশ্চিত, কিন্তু তবুও প্রাণপণে শেষ পর্যন্ত লড়ে যেতে হবে। এ কথা শুনে সুনীতিকুমার তাঁকে কর্মযোগীর আখ্যা দেন, —গীতার ভাষায়, "কর্মণ্যেবাধিকার স্তে মা ফলেষু কদাচন"; এবং বলেন তাঁহার এই নিষ্কাম কর্ম এবং তাহার সঙ্গে তাঁহার অনস্তিত্ব বা অন্ধকার-বাদকে মিলাতে তিনি অক্ষম। এর মধ্যে কোথাও একটা যোগসূত্র আছে তা হয়তো তিনি স্বীকার করছেন না। সুনীতিকুমার গীতার

যতঃ প্রবৃত্তি ভূতানাং যেন সর্বমিদং ততম্।

স্বকর্মণা তমভ্যর্চ্য সিদ্ধিং বিন্দন্তি মানবাঃ॥ শ্লোকটি ব্যাখ্যা করেন।

ফ্রয়েড হাসিতে থাকেন। তাঁহার ডাক্তার তাঁহাকে দেখিতে আসার সময় হওয়ায় এইখানেই প্রসঙ্গের শেষ হয়। বলিতে ভুলিয়াছি—সুনীতিকুমার এ বিষয়ে আইনস্টাইনের কথাও বলিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথের ৭০ বৎসর পূর্ণ হলে Golden Book of Tagore-এর জন্য আইনস্টাইন যা লিখেছেন তাতে তিনিও একজন mystic বলে বোধ হয়। একজন বিশ্বনিয়ন্তা বা এক বিশ্বনিয়ন্ত্রী শক্তি জ্যোতিষ্ক গ্রহ নক্ষত্র চন্দ্র সূর্য ও প্রাণি-জগতের নিয়ন্তৃরূপে রয়েছেন—এইরূপ 'Cosmic-religious consciousness' তিনি উপলব্ধি করেন। ইহা কোন বিশেষ ধর্মের কথা নয়, জগতের সৃষ্টি স্থিতি লয়, আবর্তন বিবর্তন ও পরিবর্তন এই শক্তির দ্বারাই সাধিত হয়ে থাকে। ফ্রয়েড এ বিষয়েও ঘাড় নাড়িয়া নিজের অপ্রতীতি এবং অপ্রত্যয় প্রকাশ করেন।

অতঃপর সুনীতিকুমার ফ্রয়েডের সংশয়বাদ বা নাস্তিক্য afrosticism বা atheism সম্বন্ধে একটি হাঙ্গেরীয় কবিতার ইংরাজী অনুবাদ স্মরণ করে বলেন,—

I believe in nothing
If I die—I shall be nothing—
Even as before I was born
Upon this sun-lit earth.***
Be my good mother,—O eternal darkness!

আমি তাঁহার 'পশ্চিমের যাত্রী' থেকে এই প্রসঙ্গটি সম্পূর্ণভাবে তাঁকে শোনাই এবং শ্লোকগুলিও যথাযথ আবৃত্তি করি, তাতে তিনি আমাকে অত্যন্ত প্রীতি ও

সৌহার্দ্যের সহিত আলিঙ্গন করেন—ঐ দিন শ্রীযুক্ত ভূনাথ মুখোপাধ্যায়ের চিত্র-প্রদর্শনীতে। সুনীতিকুমার চিত্র শিল্প ভাস্কর্য প্রভৃতি ললিত কলার একজন সূক্ষ্ম দৃষ্টিমান বিচারক ছিলেন। প্রদর্শনীর চিত্রগুলি তিনি বিশ্লেষণ পূর্বক ব্যাখ্যা করিয়া শিল্পীকে অভিনন্দন করেন এবং আমাদেরও শিল্পদৃষ্টিকে নূতন আলোকে উদ্ভাসিত করেন।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে তিনি সভাপতি থাকা কালে আমি সহ-সভাপতি ও পত্রিকার সম্পাদক ছিলাম। সম্পাদক ডঃ মদনমোহন কুমার, কেন্দ্রীয় সরকারের পরিদর্শক এবং স্বর্গত রমেশচন্দ্র দত্তের পৌত্র মিঃ আর. সি. দত্ত, I. C. S.-কে সাহিত্য-সাধক চরিতমালা—রমেশ চন্দ্রের জীবনীসহ উপহার প্রদান করেন। পরিষদের উন্নতি ও ক্ষয়-ক্ষতি নিবারণের জন্য আমাদের প্রদত্ত, দশ লক্ষ টাকার প্ল্যান যাহা সম্পাদকের বিপুল পরিশ্রমে রচিত হয়—তাহা আচার্য সুনীতিকুমার পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে মিঃ দত্তকে বুঝাইয়া দেন। এই সভায় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্র-নাথ মুখোপাধ্যায়ও ছিলেন। এ বিষয়ে এইরূপ কয়েকটি সভা-ই আচার্য সুনীতি-কুমারের গৃহে অনুষ্ঠিত হয়।

ইহার ফলে,—মিঃ দত্তের অনুকূল মন্তব্যের ফলে ঐ প্ল্যান কেন্দ্রীয় সরকার অনু-মোদন করেন। তদনুযায়ী তাঁহাদের প্রেরিত অর্থ-সাহায্যে আজ বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ রক্ষা পাইয়াছে এবং তৈজস বৃদ্ধি ও নানা নির্মাণ কার্যের দ্বারা ধীরে ধীরে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে।

'রবিবাসরে সুনীতিকুমার' প্রসঙ্গে রবিবাসরের সম্পাদক শ্রীসন্তোষকুমার দে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন সুতরাং সে বিষয়ে আমি আর পুনরুক্তি করিব না। তাঁহার নিজ হস্তে অঙ্কিত 'বিড়াল'টি আমাদের বাসরের বিবরণ-গ্রন্থে চিরদিন তাঁহার শিল্প-প্রীতির পরিচয় বহন করিবে। তাঁহার জন্ম হয় ২৬. ১১. ১৮৯০ তারিখে এবং মৃত্যু হয় ২৯. ৫. ১৯৭৭ তারিখে—এই দীর্ঘ-জীবন তিনি একান্ত নিষ্ঠার সহিত বিভিন্ন ভাষায় পাণ্ডিত্য অর্জন করিয়া বাংলা ভাষাকে ভাষাতত্ত্বের বৈজ্ঞানিক পাঠ্যক্রমে ও গবেষণার পথে পরিচালিত করিয়াছেন। তুলনামূলক ভাষানুশীলন বা Comparative philology-তে ভাষা তত্ত্বেরও ধ্বনিতত্ত্ব-ব্যাকরণে তাঁহার দান অপরিসীম এবং অবিস্মরণীয়। তিনি নিজেই বলিয়াছেন যে—Religion (ধর্মতত্ত্ব) Anthropology (নৃতত্ত্ব) Sociology (সমাজতত্ত্ব) প্রভৃতি তাঁহার বিশেষ গবেষণার বিষয় ছিল না, "The subject he has professed all his life has been linguistics, and Art has been his great passion in life." তাঁহার সুবিখ্যাত

'O.D.B.L. (Origin & development of the Bengali Language) গ্রন্থখানি ভাষাতত্ত্ববিদ্‌গণের পথের আলো বলিয়া গণ্য হইবে। তিনি পৃথিবীর প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য উভয় ভূখণ্ডের সকল মহাদেশে ভারতের ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতিভূ হিসাবে পর্যটন করেন।

তাঁহার লেখা অসংখ্য গ্রন্থ ও প্রবন্ধের মধ্যে তাঁহার "রবীন্দ্র সঙ্গমে দ্বীপময় ভারত ও শ্যামদেশ"—তাঁহার শিল্প, সংস্কৃতি, ভাষা ও ঐতিহ্যের প্রতি সূক্ষ্ম বিশ্লেষণী দৃষ্টির পরিচয় ও কবিগুরুর চিন্তা ও চারিত্রিক পরিচয়ের নিদান হইয়া থাকিবে।

১৯৭৪ খৃঃ আমার সুফী সাধিকা তাপসী রাবেয়া গ্রন্থখানি তাঁহাকে উপহার দিই। গ্রন্থখানিতে 'সুফী দীন' বা সুফী ধর্মের ও পার্শী ধর্মের আবেস্তা গ্রন্থের কিছু কিছু উল্লেখ ও উদ্ধৃতি আছে। তিনি গ্রন্থখানি পড়িয়া আমাকে টেলিফোনে অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন, এবং সেই প্রসঙ্গে জানিতে পারি যে তিনি প্রখ্যাত অধ্যাপক তারাপুরওয়ালার নিকট আবেস্তা গ্রন্থের মূল তত্ত্বের ও ভাষাতত্ত্বের পাঠ গ্রহণ করেন। তিনি বলেন, বৈদিক যুগ হইতে, আমাদের দেশে বহু ব্রহ্মবাদিনী মহিলা থাকিলেও—ইসলাম ধর্মে, এক মাত্র ক্রীতদাসী রাবেয়া অতি কৃচ্ছ্রসাধনায় তাপসীরূপে সিদ্ধি ও খ্যাতি লাভ করেন।

আমি তাঁহার সম্বন্ধে আমার ব্যক্তিগত জীবনের স্মৃতিচারণ মাত্র করিলাম। এখন শেষ কথা স্মরণ করিয়া প্রবন্ধ শেষ করি।

বিগত ১৫ জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৪, আমরা প্রাক্তন মন্ত্রী ও রবিবাসরের সদস্য শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনাথ মজুমদারের গৃহে রবিবাসরের সভা সমাপন করিয়া নিউ-আলিপুর হইতে ফিরিতেছি, সঙ্গে সম্পাদক শ্রীসন্তোষকুমার ও কয়েকজন সদস্য আছেন। আমাদের গাড়ি যখন আচার্যের ভবন সুধর্মার সম্মুখে তখন সকলেই দেখিয়া বিস্ময়াভিভূত বা বিস্ময়াহত হইলাম অজ্ঞাত অশুভের আশঙ্কায়। বাড়িটি সম্পূর্ণ অন্ধকার। একবার মনে হইল, হয়তো সকলে কোথাও বেড়াইতে গিয়া থাকিবেন। তখন কে জানিত যে সেই দিনই আচার্যের দেহাবসান হইয়াছে। তাঁহার আনন্দোজ্জ্বল মুখচ্ছবি আর আমরা দেখিতে পাইব না, সাহিত্যাকাশের উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্ক সেদিন চিরতরে অস্তমিত হইয়াছেন।

বাঙ্গালা ব্যাকরণ ও সুনীতিকুমার

মনোজিৎ বসু

১৩০৮ বঙ্গাব্দে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় লিখেছিলেন: "বাঙ্গালা ভাষায় কিছু কম আড়াই শত বাঙ্গালা ব্যাকরণ লিখিত হইয়াছে। গত দশ বৎসরের মধ্যেই ইহাদের অধিকাংশ প্রাদুর্ভূত হইয়া বঙ্গীয় বালকগণের মস্তিষ্ক বিকৃত ও তাহাদের অভিভাবকগণের পয়সা অপহরণ করিতেছে।...সমস্ত বাঙ্গালা ব্যাকরণগুলিই দুই শ্রেণীর লোক কর্তৃক দুই প্যাটেণ্টে প্রস্তুত হইতেছে; একটি মুগ্ধবোধ প্যাটেণ্ট—গ্রন্থকার পণ্ডিতগণ, আর একটি হাইলি প্যাটেণ্ট—গ্রন্থকার মাস্টারগণ।...বাঙ্গালাটা যে একটি স্বতন্ত্র ভাষা, উহা পালি, মাগধী, অর্দ্ধ মাগধী, সংস্কৃত, পার্সি, ইংরেজী প্রভৃতি নানা ভাষার সংমিশ্রণে উৎপন্ন হইয়াছে, গ্রন্থকারগণ সেকথা একবারও ভাবেন না।"

এই একই আক্ষেপের সুর ছিল রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর কণ্ঠে। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার ওই সংখ্যাতেই তিনি লিখেছিলেন: "এখন যাহাকে বাঙ্গালা ব্যাকরণ বলা হয়, উহা বাঙ্গালা ব্যাকরণ নহে। বাঙ্গালা ভাষা সংস্কৃতের নিকট যাহা পাইয়াছে, সংস্কৃতের নিকট যে অংশ ঋণস্বরূপ গ্রহণ করিয়াছে, সেই অংশের ব্যাকরণ। উহা সংস্কৃত ব্যাকরণ, বাঙ্গালা ব্যাকরণ নহে। বাঙ্গালার যে অংশ সংস্কৃত হইতে ধার করা নহে, যে অংশ খাঁটি বাঙ্গালা, সে অংশের ব্যাকরণ নাই।"

এর প্রধান কারণ প্রকৃত বাঙ্গালা (বা বাংলা) ব্যাকরণ রচনার জন্য এই ভাষার উৎপত্তি ও বিবর্তন সম্পর্কে যে সুস্পষ্ট জ্ঞান থাকা প্রয়োজন তখনও পর্যন্ত তা ছিল না। তখনকার পণ্ডিতসমাজে ভাষাতত্ত্ব বা শব্দতত্ত্ব সম্পর্কে কষ্টসাধ্য অনুসন্ধানের আগ্রহও ছিল কম। অবশ্য বাঙ্গালা ব্যাকরণ রচনা করতে গিয়ে কেউ কেউ যে ভাষাতাত্ত্বিক আলোচনা একেবারে করেন নি তাও নয়; কিন্তু সেসব আলোচনা যেমন পূর্ণাঙ্গ নয়, তেমনি বিজ্ঞানসম্মতও ছিল না।

এ-কথা ভাবলে অবাক্ হতে হয় যে, বাঙ্গালা ও অন্যান্য ভারতীয় ভাষার ব্যাকরণ রচনার সূত্রপাত হয়েছিল ভারতে আগত ইউরোপীয়দের হাতেই। বাঙ্গালা ভাষার প্রথম ব্যাকরণ গ্রন্থ লিখেছিলেন পোর্তুগীস্ পাদ্রী মানুএল দা আস্সুম্পসাঁও। বইটির নাম—'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ'। বইটি একাধারে বাঙ্গালার প্রথম ব্যাকরণ ও প্রথম গদ্য-গ্রন্থ। পোর্তুগালের রাজধানী-শহর

লিস্‌বন থেকে ১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দে এই বইখানি রোমান হরফে পোর্তুগীস্ ভাষার মাধ্যমে মুদ্রিত হয়ে আত্মপ্রকাশ করে। তারপর ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে হুগলী থেকে প্রকাশিত হয় ইংরেজ রাজকর্মচারী নাথানিএল ব্রাসি হ্যালহেড কর্তৃক রচিত—'Grammar of the Bengal Language'। বইখানি ইংরেজী ভাষায় লিখিত তৎকালীন বাঙ্গালা সাধুভাষার একখানি ব্যাকরণ। বইখানিতে সর্বপ্রথম কিছু কিছু বাঙ্গালা হরফও ব্যবহৃত হয়েছিল। তাছাড়া হ্যালহেড তাঁর এই বাঙ্গালা ব্যাকরণে বাঙ্গালা পাঠের নিদর্শনস্বরূপ কাশীরাম দাসের 'মহাভারত' থেকেও অংশ-বিশেষ ছাপিয়ে দিয়েছিলেন। অর্ধশতাব্দী অতিক্রান্ত হবার পর যে বাঙ্গালী সর্বপ্রথম তাঁর মাতৃভাষা সম্পর্কিত 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ' লিখলেন তিনি আর কেউ নন,—বাঙ্গালা গদ্য সাহিত্যের জনক রাজা রামমোহন রায়। বইখানি প্রথমে ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজীতে প্রকাশিত হয়, পরে তাঁর মৃত্যুর পর ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে, বাঙ্গালায়। এই শতকের প্রথম ভাগে প্রকাশিত চিন্তামণি গাঙ্গুলীর লেখা বইখানি যে সে-যুগের তথাকথিত বাঙ্গালা ব্যাকরণের ক্ষেত্রে বহুলাংশে অগ্রগতির সূচনা করেছিল ভাষাচার্য সুনীতিকুমার স্বয়ং তা স্বীকার করেছেন। তাছাড়া বাঙ্গালা ব্যাকরণ রচনার ক্ষেত্রে ১৩০৫ বঙ্গাব্দে (১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে) প্রকাশিত নকুলেশ্বর বিদ্যাভূষণের ক্ষুদ্র ব্যাকরণ এবং ১৩০৭ বঙ্গাব্দে (১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে) প্রকাশিত হৃষীকেশ শাস্ত্রীর ব্যাকরণ গ্রন্থ-খানিও যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য, তিনি তাও বলেছেন। কিন্তু রামমোহনের 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ'-এর ভিত্তি যেমন বিজ্ঞানসম্মত ছিল না, অপরাপর ব্যাকরণ রচয়িতাদের ব্যাকরণগুলিও তেমনি পূর্ণাঙ্গ হয়ে উঠতে পারেনি। রামমোহনের যুগ ছিল বাঙ্গালা ভাষার সংগঠনের যুগ, আর অন্যান্যদের কাছে তখনও পর্যন্ত ভাষার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ, শব্দের উচ্চারণ-রীতি, ধ্বনিতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়গুলি মুখ্য হয়ে দেখা দেয়নি।

'ব্যাকরণ' শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত বি—আ—কৃ+অনট্ অর্থ হল—সম্যক্‌রূপে বিশ্লেষণ। কাজেই 'বাঙ্গালা ব্যাকরণ' হবে এমন একখানি গ্রন্থ, যাতে বাঙ্গালা ভাষার সর্বাঙ্গীণ আলোচনা থাকা প্রয়োজন। পূর্ণাঙ্গ ব্যাকরণের মধ্যে থাকা উচিত ধ্বনিবিজ্ঞান (Phonetics), ধ্বনিতত্ত্ব (Phonology), ভাষার রূপতত্ত্ব (Morphology), বাক্যরীতি (Syntax), শব্দার্থতত্ত্ব (Semantics) প্রভৃতি বিষয়ের সম্যক্ আলোচনা। এই জাতীয় ব্যাকরণকে বলা হয় বর্ণনাত্মক ব্যাকরণ (Descriptive Grammar)। উত্তমরূপে ভাষা শিক্ষার পক্ষে এই জাতীয় ব্যাকরণ অপরিহার্য। কেননা, এই জাতীয় ব্যাকরণ-গ্রন্থ পাঠ করেই আমরা

জানতে পারি ভাষার বিভিন্ন ধ্বনির উৎপত্তিস্থল, উচ্চারণবিধি, ধ্বনি-পরিবর্তন, শব্দ ও পদ কিভাবে গঠিত হয়, বাক্যগঠনের রীতি তথা বিশ্লেষণের মাধ্যমে বাক্যের একটি অংশের সঙ্গে তার ভিন্ন ভিন্ন অংশের কী যোগাযোগ, একই পদ কিভাবে প্রয়োগ-পরিবেশে ভিন্নার্থ প্রকাশ করে, কিভাবে বিভিন্ন শব্দের অর্থের উন্নতি, অবনতি, প্রসার, সংকোচ প্রভৃতি রূপান্তর ঘটে,—এই সব কথা। বর্ণনাত্মক ব্যাকরণের মাধ্যমেই আমরা জানতে পারি বর্ণে বর্ণে মিলনজনিত সন্ধির নিয়মকানুন, পদের প্রকারভেদ ও পদ প্রয়োগের বৈশিষ্ট্য, বিভিন্ন শব্দের লিঙ্গ, বচন ও পুরুষের পরিচয়, কোন্ কারকে কোন্ বিভক্তি হয়, সেই সব বিভক্তি-সূচনাকারী চিহ্নগুলি কী কী এবং একই বিভক্তি-চিহ্নের প্রয়োগে কিভাবে বিভিন্ন কারক সূচিত হতে পারে ইত্যাদি আরও অনেক বিষয়। যেমন প্রত্যয়, উপসর্গ, অনুসর্গ, সমাস, শব্দসম্ভার, শব্দ-বৈচিত্র্য, বাচ্য-বৈচিত্র্য, বিশিষ্ট বাগ্‌ধারা, প্রবাদ-প্রবচনমূলক বাক্য ও বাক্যাংশ, বাক্‌সংহতি, অলংকার, ছন্দ ইত্যাদি। বর্ণনাত্মক ব্যাকরণ ছাড়া আরও তিন শ্রেণীর ব্যাকরণ আছে—ঐতিহাসিক ব্যাকরণ (Historical Grammar), তুলনামূলক ব্যাকরণ (Comparative Grammar) ও দার্শনিক বিচারমূলক ব্যাকরণ (Philosophical & Psychological Grammar)। ভাষাচার্য সুনীতিকুমারের ভাষায়: "বর্ণনাত্মক ব্যাকরণ অর্থাৎ সাধারণভাবে ব্যাকরণ বলিলে আমরা যাহা বুঝিয়া থাকি, তাহা হইতেছে ভাষাশিল্পের পদ্ধতি বা সাধন (Art of Language) অথবা শব্দানুশাসন (Regulations of a language); ঐতিহাসিক ও তুলনামূলক ব্যাকরণ হইতেছে 'ভাষা-বিজ্ঞান' (Science of Language); দার্শনিক বিচারমূলক ব্যাকরণ হইতেছে ভাষা-বিষয়ক দর্শন (Philosophy and Psychology of Language)।"

বাঙ্গালা ভাষার যথার্থ ব্যাকরণের অভাব সম্পর্কে একদা হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী প্রমুখ মনীষিগণ, এমন কি বাঙ্গালা ভাষাতত্ত্বের অগ্রণী পথিকৃৎ রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত যে-আক্ষেপ করেছিলেন,—সে-আক্ষেপ নিঃসন্দেহে দূরীভূত হল ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে, যখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত হল একত্রিশ বছরের তরুণ শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্. এ., ডি-লিট.-এর সুগভীর জ্ঞান ও গবেষণা-লব্ধ সৃষ্টি—"The Origin and Development of the Bengali Language" (সংক্ষেপে 'O. D. B. L.') নামক সুবৃহৎ গ্রন্থখানি। বাঙ্গালা ভাষাতত্ত্বের ইতিহাসে এই বই নতুন এক যুগের প্রবর্তন করল। এ-কথা বলা বাহুল্য যে,

সুনীতিকুমারের এই বইখানি স্কুল-কলেজের ভাষা-শিক্ষার্থীদের কাছে সহজপাঠ্য 'ব্যাকরণ'-গ্রন্থ বলে স্বীকৃতি লাভ করবে না,—কিন্তু তাদের উপযোগী খাঁটি বাঙ্গালা ভাষার ব্যাকরণ রচয়িতাদের কাছে উজ্জ্বল আলোকবর্তিকা হিসাবে চিরকাল সমাদৃত হবে। বস্তুত ভাষাচার্য সুনীতিকুমার নিজেই পরবর্তীকালে 'ভাষাপ্রবেশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ' নামে যে ব্যাকরণ গ্রন্থ রচনা করে প্রকাশ করেন (১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে) তার ভিত্তিও তাঁর ওই "O. D. B. L."। শুধু তাঁরই নয়,—আরও অনেকের।

এই অমূল্য গ্রন্থ প্রকাশিত হবার পূর্বে (১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত) বাঙ্গালা ভাষাতত্ত্ব তথা বাঙ্গালা শব্দতত্ত্ব নিয়ে যে-সব বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য-প্রেমিক বাঙ্গালী বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় ও অন্যত্র প্রবন্ধ ও বক্তৃতাদির মাধ্যমে আলোচনা করেন কিংবা গ্রন্থাদি প্রকাশ করেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন—রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস, নগেন্দ্রনাথ বসু, যোগেশচন্দ্র রায় (বিদ্যানিধি) প্রমুখ আরও কয়েকজন। বাঙ্গালা ভাষাতত্ত্ব ও শব্দতত্ত্ব সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের আগ্রহ ছিল অপরিসীম। এ-বিষয়ে তাঁর অনুশীলনের ফল দুটি তুলনাহীন সাহিত্যরসাশ্রিত গ্রন্থ—'বাংলাভাষা-পরিচয়' ও 'বাংলা শব্দতত্ত্ব'। সুনীতিকুমার তাঁর 'O. D. B. L.' গ্রন্থের ভূমিকায় এ-কথা সুস্পষ্টভাবেই বলেছেন যে, রবীন্দ্রনাথই প্রথম বাঙ্গালী যিনি তাঁর বৈজ্ঞানিক অন্তদৃষ্টি নিয়ে ভাষাসমস্যার প্রতি আঘাত হেনেছেন। আর রবীন্দ্রনাথও সুনীতিকুমারের অগাধ পাণ্ডিত্য এবং ভাষাবিষয়ে বিজ্ঞানসম্মত অপূর্ব গবেষণায় মুগ্ধ হয়ে তাঁকে 'ভাষাচার্য' বিশেষণে বিভূষিত করে তাঁর 'বাংলাভাষা-পরিচয়' গ্রন্থখানি উৎসর্গ করেন।

খাঁটি বাঙ্গালা ব্যাকরণ রচনার ক্ষেত্রে ভাষাচার্য সুনীতিকুমারের 'O. D.B. L.' গ্রন্থখানি যে একখানি আকর গ্রন্থ হিসাবে পরিণত হয়েছে, তার প্রধান কারণ হল বাঙ্গালা ভাষার উৎস ও ক্রমবিকাশ সম্পর্কে অনুসন্ধান করতে গিয়ে তিনি যে প্রণালী অনুসরণ করেছেন তা ইউরোপীয় ভাষাতাত্ত্বিক পণ্ডিতদের অনুসৃত প্রণালীর মতোই বিজ্ঞানসম্মত। Beams ইংরেজীতে বাঙ্গালা ব্যাকরণ সম্পর্কে যে বইখানি লিখেছিলেন, তা পড়ে বাঙ্গালা ভাষার বিভিন্ন শব্দের উচ্চারণ সম্পর্কে Beams-এর আলোচনা রবীন্দ্রনাথের আদৌ মনঃপূত হয়নি। কারণ Beams ছিলেন বিদেশী এবং স্বাভাবিক কারণেই বাঙ্গালা শব্দের সঠিক উচ্চারণ সম্পর্কে তিনি যথেষ্ট ওয়াকিবহাল ছিলেন না। কিন্তু সুনীতিকুমার বাঙ্গালী, কাজেই উচ্চারণ সম্বন্ধে তিনি ভ্রম-

শূন্য। অথচ বঙ্গের তাবৎ জেলাসমূহের কথ্যভাষার শব্দাবলীর সঠিক উচ্চারণ তিনি বেশ ভালভাবেই আয়ত্ত করেছিলেন। সর্বোপরি, সুনীতিকুমার তাঁর 'O. D. B. L.' গ্রন্থে বর্ণনাত্মক ব্যাকরণের ক্ষেত্রে অত্যাবশ্যক বিষয়সমূহের যে-রকম বিস্তৃত আলোচনা করেছেন সেরূপ আলোচনা তাঁর আগে দেশী বা বিদেশী আর কোন ভাষা-তাত্ত্বিকই করেননি।

সুনীতিকুমার ধ্বনিতত্ত্ব তথা উচ্চারণতত্ত্বকে ভাষাতত্ত্বের একটি প্রধান ও অত্যাবশ্যক বিভাগ বলে গণ্য করেছেন। আমরা যখন স্কুলের ছাত্র তখনকার বাঙ্গালা ব্যাকরণে এই বিভাগের আদৌ দর্শন পাইনি। পরম সৌভাগ্য এই যে, এম. এ. পড়বার সময় সুনীতিবাবুকে আমরা ভাষাতত্ত্ব পড়াবার গুরু হিসাবে পর পর দুটি বছর পেয়েছিলাম। তখনই বুঝতে পেয়েছিলাম ভাষাশিক্ষায় ধ্বনিতত্ত্বের গুরুত্ব কতখানি এবং ভাষাতত্ত্ব আদৌ নীরস নয়, বরং কৌতূহলোদ্দীপক। বাংলা বর্ণমালায় 'অ্যা' বলে কোন বর্ণ নেই, অথচ উচ্চারণের ক্ষেত্রে 'অ্যা' ধ্বনি আছে। 'এ' একটি বর্ণ হলেও তার দু' রকমের উচ্চারণ—অর্থাৎ, 'এ' বর্ণে দুটি ধ্বনি উচ্চারিত হয়। যেমন, মূল ধ্বনি 'এ' (দেশ, মেঘ, একদা প্রভৃতি শব্দে) ; আর, 'অ্যা' ধ্বনি (এক = অ্যাক, দেখা = দ্যাখা, খেলা = খ্যালা প্রভৃতি)। পূর্ববঙ্গীয় উচ্চারণে এই 'অ্যা' ধ্বনিরই প্রাবল্য। যেমন 'দেশ' সেখানে 'দ্যাশ', 'মেঘ' সেখানে 'ম্যাঘ'! সুনীতিবাবু এই 'অ্যা' ধ্বনিকে বলেছেন 'বাঁকা এ'। 'অ' স্বরবর্ণেরও দু'রকমের উচ্চারণ বা ধ্বনি রয়েছে। যেমন, সাধারণ উচ্চারণ মেলে 'জল', 'কথা', 'চলা' প্রভৃতি শব্দের আদি বর্ণে; কিন্তু 'অ'-কারের 'ও'-ধ্বনিও আছে। যেমন, 'অতি', 'অতুল', 'বস্তু', 'চলুক' প্রভৃতি শব্দের আদিতে সুনীতি-কুমার এ-বিষয়ে একটা নিয়ম স্থির করতে প্রয়াসী হয়ে বলেছেন যে, "সাধারণতঃ, পরবর্তী অক্ষরে 'ই' ('ঈ') বা 'উ' ('ঊ') ধ্বনি থাকিলে অথবা 'য-ফলা' কিংবা 'জ্ঞ' বা 'ক্ষ' থাকিলে পূর্ববর্তী অ-কারের উচ্চারণ ও-কারের মত হয়; যেমন— 'অতি' (= ওতি), 'বস্তু' (= বোস্তু), 'চলুক' (= চোলুক) ; 'সত্য' (= শোত্তো) ; 'যজ্ঞ' (= জোগ্‌গোঁ), 'লক্ষণ' (= লোক্‌খন্) ; ইত্যাদি। (ব্যক্তির নাম 'লক্ষ্মণ'-এর আদ্য অ-কারের উচ্চারণ ও-কারের মত হয় না।)" কিন্তু নিজেই আবার সরস একটা দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে বোঝাতে চেয়েছেন যে, নিয়মেরও ব্যতিক্রম আছে। যথা—"**অস্থির** অঙ্গারে **অস্থির** স্ফুলিঙ্গ"! প্রথম অস্থির (অর্থাৎ হাড়ের) 'অ' 'ও'-কারবৎ উচ্চারিত হলেও পরের অস্থির (অর্থাৎ চঞ্চল)-এর 'অ'-এর উচ্চারণ 'অ'-কারবৎ। বাঙ্গালা ভাষায় 'ঋ'-বর্ণটির

উচ্চারণ 'রি' (অর্থাৎ, ব্যঞ্জনবর্ণ 'র'-এর সঙ্গে সংযুক্ত 'ই'-ধ্বনি)। কাজেই সুনীতিবাবুর মতে বাঙ্গালা ব্যাকরণের ক্ষেত্রে এটিকে স্বরধ্বনি বলা চলে না। "বাঙ্গালাতে 'ঋ' সাধারণতঃ সংস্কৃত শব্দের বানানেই মিলে; যেমন—'ঋষি, ঋগ্‌বেদ্‌, পিতৃব্য, স্বীকৃতি, ভ্রাতৃস্নেহ' ইত্যাদি। খাঁটি বাঙ্গালাতে 'ঋ' স্বর-ধ্বনি নেই, সুতরাং বাঙ্গালা শব্দের বানানে (এবং বিদেশী শব্দের বানানে 'ঋ' না লেখাই উচিত। 'খ্রীষ্ট, খ্রীষ্টান, ব্রিটিশ, ব্রিটেন'—এইরূপ বানান লেখাই সংগত।" অপ্রয়োজনবোধেই বাঙ্গালা ব্যাকরণে আজকাল আর ঌ-বর্ণটি নেই। ঌ-কার ছিল বৈদিক ভাষার স্বরধ্বনি। প্রাকৃতে বা প্রাচীন বাঙ্গালাতেও এই বর্ণটির কোন প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়নি। সুনীতিবাবু বৈদিকযুগে ঌ-কারের উচ্চারণ কি রকম ছিল তা বোঝাতে গিয়ে বলেছেন—little-এর আদ্য li-তে যে 'ল্‌', তা ব্যঞ্জনধ্বনি, কিন্তু অন্ত্য tle-এর 'ল' স্বরধ্বনি। 'লিট্‌ঌ' লিখলেই ঌ-কারের উচ্চারণ বোঝানো সম্ভব। ধ্বনিতত্ত্ব প্রসঙ্গে সুনীতিকুমার বাঙ্গালা যৌগিক স্বরধ্বনি বা Dipthong-এর বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। Dipthong-এর পারিভাষিক শব্দ তিনিই করেছেন 'সন্ধ্যক্ষর' বা 'সন্ধি স্বর'। তিনি তাঁর 'মধ্য বাঙ্গালা ব্যাকরণে' (১৯৭৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত) এই প্রসঙ্গে লিখেছেন, "বাঙ্গালাতে দুইটি ভিন্ন স্বর-ধ্বনির সমবায়ে সন্ধি-স্বর বা সন্ধ্যক্ষরের উদ্ভব হয়; তন্মধ্যে মাত্র দুইটির জন্য বিশেষ বর্ণ বাঙ্গালা বর্ণমালায় মিলে, 'ঐ' (= ওই), 'ঔ' (= ওউ)। অবশিষ্ট সন্ধ্যক্ষরের জন্য পৃথক বর্ণ নেই—এগুলির অন্তর্গত মৌলিক বর্ণগুলিকে একক, অথবা য়-কারের সহিত যুক্ত করিয়া, পাশাপাশি লিখিয়া প্রকাশ করা হয়; যেমন 'ইএ, ইয়ে' (দিয়ে, নিয়ে); 'ইআ, ইয়া' (দিয়া); 'ইও, ইয়ো' (দিও, দিয়ো)…… ইত্যাদি।" তিনটি বা চারটি বা পাঁচটি স্বরধ্বনিও যে পাশাপাশি বসে সন্ধ্যক্ষরের সৃষ্টি করতে পারে তার উল্লেখও তিনি করেছেন। যেমন আইএ = আইয়ে (খাইয়ে), ওইএ = ওইয়ে (বলিয়ে = বোলিয়ে); আওআই = আওয়াই (খাওয়াই); আওআইও = আওয়াইও (খাওয়াইও) প্রভৃতি। মনে পড়ে, ধ্বনিতত্ত্ব নিয়ে ক্লাসে আলোচনা করতে গিয়ে ভাষাচার্য এক-একদিন অনাবিল কৌতুকরসের কতই না অবতারণা করতেন। যেমন খাস কলকাত্তাইয়াদের উচ্চারণে 'অল্পপ্রাণ'-ধ্বনির এবং বাঙ্গালদের উচ্চারণে 'মহাপ্রাণ'-ধ্বনির প্রবণতা। বলতেন—কলকাত্তাই-য়াদের 'মাথাব্যথা' হয় না, হয় 'মাতাব্যাতা', বাঙ্গালরা 'কতকগুলি' আম না কিনে 'কথকগুলা' আম কেনেন! পশ্চিমবঙ্গের লোকেরা চন্দ্রবিন্দুর বিশেষ ভক্ত, তার ফলে তাঁদের উচ্চারণে 'বাকী' হয় 'বাঁকি', আর পূর্ববঙ্গীয়দের কাছে চন্দ্র-

বিন্দুর তেমন আদর নেই বলে তাঁরা পুকুরে 'হাঁস' না ছেড়ে 'হাস' ছাড়েন, 'বাঁশি' না বাজিয়ে 'বাশি' বাজান! হাওড়া অঞ্চলের বা কলকাতার খাস বাসিন্দাদের মুখে 'নাউ (< লাউ), নেবু (< লেবু), নুচি (< লুচি), নেপ (< লেপ)' যেমন শোনা যায়, তেমনি পূর্ববঙ্গের অঞ্চলবিশেষে শোনা যায় 'মাছের ঝুল' (< মাছের ঝোল), 'মোলা খেতে চুর' (মুলা খেতে চোর)! বাঙ্গালা ভাষায় ধ্বনি পরিবর্তনের বিস্তৃত আলোচনাও সুনীতিকুমারের একটি বিশেষত্ব বলে গণ্য হয়ে থাকে। এই পর্যায়ে স্বরসঙ্গতি, অপিনিহিতি, অভিশ্রুতি, অপশ্রুতি প্রভৃতি নামকরণও তাঁর।

ভাষাচার্য সুনীতিকুমারের 'O. D. B. L.' গ্রন্থে তাঁর জ্ঞানের গভীরতা ও মৌলিকতা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বনামধন্য অধ্যাপক শ্রীরবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত 'কথাসাহিত্য' পত্রিকার ১৩শ বর্ষের ৮-ম সংখ্যায় লিখেছিলেন: "প্রথমতঃ সুনীতিকুমার উচ্চারণ-তত্ত্বকে ভাষাতত্ত্বের একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় বিভাগ বলিয়া দেখাইয়াছেন। ভারতে আর্যভাষার বিবর্তনের ইতিহাসের তিনটি পর্যায় সুনীতিকুমারের পূর্বেই মোটামুটি নির্দিষ্ট হইয়াছিল। এই তিন পর্যায়ের শেষ পর্যায়—অর্থাৎ New Indo Aryanকে সুনীতিকুমার ৪টি পর্যায়ে ভাগ করিলেন। দ্বিতীয়তঃ সুনীতিকুমার বাংলাভাষার ইতিহাস মূল আর্যভাষার পরিপ্রেক্ষিতে রচনা করিয়াছেন বলিয়া আর্যভাষার বিবর্তনের এমন কতকগুলি সাধারণ নিয়ম নির্দিষ্ট করিয়াছেন যাহা অন্যান্য ভারতীয় আর্যভাষার ইতিহাসে প্রযুক্ত হইতে পারে। তৃতীয়তঃ বাংলা ভাষার তৎভব, তৎসম ও দেশী শব্দের হিসাব সুনীতিকুমারের পূর্বে এমন ব্যাপকভাবে কেহ দেন নাই। চতুর্থতঃ আর্যভাষায় কোল প্রভৃতি অনার্যভাষার প্রভাব সম্বন্ধে সুনীতিকুমার যত কথা বলিয়াছেন, তত আর কেহ বলেন নাই।" দাশগুপ্ত মহাশয়ের আর একটি উক্তিও এই প্রসঙ্গে যুক্ত করলে অসংগত হবে না যে, "সুনীতিকুমার তাঁহার বহুমুখী শাস্ত্র-চর্চার দ্বারা দেখাইয়াছেন, ভাষাতত্ত্বের সার্থক অনুশীলনের জন্য বহু তত্ত্বের সংবাদ রাখিতে হয়। সুনীতিকুমারের ন্যায় সমগ্র মানবসভ্যতা সম্বন্ধে যাঁহার কৌতূহল নাই, তিনি ভাষার ইতিহাস বুঝিবেন না।"

যেমন দেখেছি

চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

সুনীতিবাবুর সঙ্গে আলাপ ছিল আগে থেকেই। মাঝে মাঝে বইয়ের সন্ধানে আসতেন। লাইব্রেরিতে বসে পড়তে দেখিনি বললেই চলে। প্রয়োজনীয় বই বাড়ি নিয়ে যেতেন। পরিচয় ঘনিষ্ঠ হল ১৯৫৭ সাল থেকে, যখন পর পর কয়েক দিন তাঁর বাড়ি যেতে হয়েছিল "ফুলমণি ও করুণার" পরিচিতি লিখে আনবার জন্য। তিনি বলে যেতেন, আমি লিখতাম। অনেক কম সময়েই লেখা শেষ হতে পারত, কিন্তু প্রতিটি প্রসঙ্গ আলোচনা করে বুঝিয়ে দিতেন তিনি। তাছাড়া প্রসঙ্গান্তরে চলে যেতেন প্রায়ই। উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে কত কথাই না তখন শুনেছি তাঁর কাছে থেকে!

পশ্চিমবঙ্গ বিধান পরিষদ থেকে বিদায় নেবার পর জাতীয় গ্রন্থাগারে তিনি ঘন ঘন আসতেন। ১৯৬৪ সালে ভারত সরকার তাঁকে মানবিকী বিদ্যার জাতীয় অধ্যাপক নিযুক্ত করেন। তাঁর আপিস হল জাতীয় গ্রন্থাগারের প্রাঙ্গণে। সুতরাং তখন থেকে তাঁকে ঘনিষ্ঠভাবে দেখবার সুযোগ পেয়েছি। দেখেছি প্রতিদিন কত বিচিত্র বিষয়ের বই তিনি চেয়ে পাঠাতেন। বয়স যখন প্রায় আশী তখন সুনীতিবাবু প্রাচীন জাপানী ভাষা শিখতে আরম্ভ করলেন। কারণ জাপানের পুরনো ধর্মের মর্ম-কথা না হলে ভালো করে বোঝা যাবে না। কোথায় কি নতুন ভালো বই বেরুলো তার খবর শুনতে ভালোবাসতেন। কোনো বই পছন্দ হলে বলতেন তাঁর নিজের জন্য এক কপি সংগ্রহ করে দিতে।

জাতীয় অধ্যাপকের আপিসে জিজ্ঞাসুর ভীড় লেগেই থাকত। তাছাড়া নানা জিজ্ঞাসা নিয়ে আসত বহু চিঠি। সুনীতিবাবু ধৈর্যের সঙ্গে সব জিজ্ঞাসার যথাসাধ্য উত্তর দিতেন, গবেষণার সঙ্গে সম্পর্ক না থাকলেও। মনে আছে, সন্তান-শোকাতুর এক ব্যক্তি সান্ত্বনা পাবার উপায় কি তা জানতে চেয়েছিলেন—সুনীতিবাবু গভীর সহানুভূতির সঙ্গে তার উত্তর দিয়েছিলেন।

হাতের কাছে বইপত্রের অভাবে কোনো জিজ্ঞাসার উত্তর দিতে না পারলে প্রশ্ন-কর্তাকে লাইব্রেরিতে পাঠিয়ে দিতেন। অনেকবার দেখেছি, তিনি অসঙ্কোচে স্বীকার করেছেন, এটা আমার জানা নেই। কোনো কথা, তা সে যত তুচ্ছই হোক,

জানা না থাকলে তাঁর বলতে বাধত না, আমি জানতাম না; আপনার কাছে শিখলাম।

এটা শুধুই মৌখিক বিনয় ছিল না। পাণ্ডিত্যের অভিমান তাঁর মধ্যে বিন্দুমাত্র দেখিনি। আমাদের পড়াশুনোর পরিধি কতটুকু সে কথা বিচার না করে সমকক্ষ শ্রোতা হিসেবে কত বিচিত্র বিষয় নিয়ে আলোচনা করতেন।

একবার তাঁকে বলেছিলাম, আপনি এত ভাষা কি করে শিখলেন, এত বই পড়ে কি করে মনে রাখেন তা লিখুন, আমরা উপকৃত হব। উনি বললেন, বিশ্বাস করুন, এই পৈতে ছুঁয়ে বলছি, আপনারা যা ভাবেন আমি তা নই। কিছুই জানি না। ছাত্রজীবনে কি ভাবে যে কয়েকটা সূত্র খুঁজে পেয়েছিলাম যার ফলে কয়েকটা ভাষা মোটামুটি বুঝতে পারি। কারণ, সব ভাষার মূল সূত্রের মধ্যে একটা ঐক্য আছে।

একবার ইণ্ডিয়া আপিস (এখন কমনওয়েলথ রিলেশানস্) লাইব্রেরির লাইব্রেরিয়ান সাটন জাতীয় গ্রন্থাগার দেখতে এসে আমার সঙ্গে কথা বলছিলেন। সুনীতিবাবু তখন এলেন একটা বইয়ের খোঁজে; আলাপ করিয়ে দিলাম সাটনের সঙ্গে। স্পষ্টই বোঝা গেল সাটন ওঁর নাম শোনেননি। পরে ওঁর কাছে যখন এই নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলাম তখন উনি শান্ত কণ্ঠে বললেন, আমি এমন কি করেছি যাতে বিদেশীরাও আমার নাম জানবে? এ দেশেরই ক'জনের কাছে আমি পরিচিত? এ থেকেই বুঝবেন আমি এমন কিছু করিনি যার জন্য আমার 'খ্যাতি' হবে। আনন্দ পাই, তাই পড়াশুনো করি। নাম হলো কিনা সে কথা ভাবিনি। আপনারা ভালোবাসেন তাই ভাবেন কি একটা কেষ্ট-বিষ্টু হয়ে গেছি!

জাতীয় গ্রন্থাগার যাতে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয়, একটি প্রকৃত গবেষণা-কেন্দ্র হয়ে ওঠে তার জন্য যতটুকু তাঁর পক্ষে করা সম্ভব তা করতে তিনি কুণ্ঠিত ছিলেন না। অর্থাৎ, গ্রন্থাগারের সঙ্গে সরকারীভাবে যুক্ত না থেকেও সরকারের নিকট উন্নতিমূলক নানা প্রস্তাব রেখেছিলেন। তিনি আক্ষেপ করতেন রাষ্ট্রপতি কত উপলক্ষ্যে কলকাতা আসেন, কিন্তু এই সংস্কৃতি-কেন্দ্রটি দেখে যাবার সময় তাঁদের হয় না। অথচ আজকাল এমনই অবস্থা যে এঁদের মতো কারো দৃষ্টি না পড়লে কোনো প্রতিষ্ঠানেরই দ্রুত বড় হওয়া সম্ভব নয়। তিনি নিজেই রাধাকৃষ্ণাণের সঙ্গে কথা বলে জাতীয় গ্রন্থাগার পরিদর্শনের দিনক্ষণ সব স্থির করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত অবশ্য বিশেষ কারণে রাষ্ট্রপতি আসতে পারেননি।

একদিন সুনীতিবাবুর আপিসে বসে এক ভদ্রলোক বলছিলেন, জাতীয় গ্রন্থা-

শুধু দেশের কথা জানলে তো একালে চলে না। পৃথিবীর সব দেশের কথা না জানলে নিজেদেরও যথার্থরূপে চেনা যায় না। এর জন্য যে সব বই দরকার তাদের সংগ্রহ করতে হবে।

জাতীয় গ্রন্থাগারের একজন অফিসার ছিলেন সুনীতিবাবুর স্নেহভাজন। তাঁকে অন্যায়ভাবে অন্যত্র বদলি করায় তিনি বেদনা পান। একদিন সেই অফিসারের কাঁধে হাত রেখে ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললেন, জানেন, এই সব অবিচার দেখে আর বাঁচতে ইচ্ছা করে না।

বদলি করেই দিল্লীর কর্তারা শান্ত হননি। সুনীতিবাবু কার কাছ থেকে শুনতে পেলেন ঐ অফিসারের বিরুদ্ধে কিছু অমূলক অভিযোগ উত্থাপন করে তাঁকে শাস্তি দেবার আয়োজন চলছে। সুনীতিবাবু তাঁর পরিচিত একজন উচ্চপদস্থ অফিসারকে প্রকৃত ব্যাপার জানিয়ে লিখলেন, সত্যিকারের বিচার হোক, কোনো অন্যায় যেন না হয়। বেশ কিছুদিন পরে হঠাৎ দুপুরবেলা সুনীতিবাবু জাতীয় গ্রন্থাগারের সেই অফিসারের বাড়ি এসে উপস্থিত। পকেট থেকে একটি চিঠি বের করে বললেন, নিন, পড়ুন।

তাঁর পরিচিত ভদ্রলোক লিখেছেন, সব অভিযোগ মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে, সরকারী চিঠি কিছুদিন পরে যাবে।

অফিসার ভদ্রলোক তো অভিভূত। বললেন, আমাকে ডেকে পাঠালে নিজে গিয়ে দেখা করতাম। আপনি কষ্ট করে কেন এলেন?

উনি বললেন, কি আর কষ্ট। আপনি কি দুশ্চিন্তার মধ্যে ছিলেন তা কি জানি না!

পাণ্ডিত্যের সঙ্গে হৃদয়বত্তার এমন সুন্দর মিলন দুর্লভ।

সুনীতিকুমারের সংস্কৃত-নিষ্ঠা ও সংস্কৃত-চর্চা

শ্রীগৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জীবনের আঠার বৎসর বয়স পর্যন্ত স্মৃতিকথা তিনি লিখে গিয়েছেন এবং তা প্রকাশিত হয়েছে (দ্রষ্টব্য—জীবনকথা, জিজ্ঞাসা, কলিকাতা ১৯৭৯)। এই স্মৃতিকথায় তাঁর পিতামহ ঈশ্বরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন যে ইংরাজী, ফার্সী ছাড়া তিনি সংস্কৃতও জানতেন। সুনীতিকুমার লিখেছেন যে শৈশবে তিনি ঠাকুর্দার কাছ থেকে বহু সংস্কৃত নীতি-শ্লোক মুখে মুখে শিখেছিলেন। ঠাকুর্দা ও ঠাকুরমা শিশুকালেই তাঁকে এবং তাঁর অন্যান্য ভাইদের ব্রাহ্মণ-সন্তানোচিত সদাচারে অভ্যস্ত করেছিলেন। সুনীতিকুমারের পিতা সংস্কৃত কলেজ স্কুলের ছাত্র ছিলেন। অল্প বয়সেই হাওড়া-শিবপুরে মামার বাড়িতে সুনীতিকুমারের উপনয়ন সংস্কার হয়। সুনীতিকুমার সন্ধ্যা-আহ্নিকের মন্ত্রগুলিও মুখস্থ করেন। শিশু সুনীতিকুমার এই মন্ত্রগুলির অর্থ ঠিক বুঝতে পারতেন না, তবে গায়ত্রীর মানে মোটামুটি আয়ত্ত করেছিলেন—এবং গায়ত্রীর প্রতি এই বয়সেই তাঁর শ্রদ্ধা জন্মেছিল।

সুনীতিকুমার বারো বৎসর বয়সে স্বামী বিবেকানন্দের রচনার সঙ্গে পরিচিত হন। এ সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন—"বিবেকানন্দের From Colombo to Almora, তাঁর ইংরেজিতে শিকাগোর বক্তৃতা, তাঁর বাঙলা 'পরিব্রাজক', তাঁর 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য', তাঁর 'বর্তমান ভারত' আর তাঁর অন্য সহজবোধ্য লেখা পড়তে লাগলুম। যেন এক সত্যদ্রষ্টা ঋষির উপদেশ আমাব কাছে এসে পৌছল। ধীরে ধীরে সগুণ আর নির্গুণ ঈশ্বর সম্বন্ধে একটা বিচার মনের মধ্যে স্থান করে নিলে। বেদান্ত অনুসারে প্রচলিত হিন্দুধর্মের ব্যাখ্যা পেয়ে তৃপ্ত হলুম, হিন্দুধর্মের বৈজ্ঞানিক যৌক্তিকতা এসে মনকে দখল করলে।"

বালক সুনীতিকুমার কৈশোরে যখন উত্তীর্ণ হলেন তখন তিনি স্বামী বিবেকানন্দের মতানুযায়ী বেদান্তে বিশ্বাসী। এই সময়ে শঙ্করানন্দ স্বামী নামে এক সন্ন্যাসী বাঙালী-হিন্দু ছাত্রদের নিয়ে কলকাতায় উপনিষদের 'ক্লাস' নিতে শুরু করেন। সুনীতিকুমার এই ক্লাসে যোগ দিয়ে ঈশ, কেন, প্রশ্ন আর দু-একটা ছোট উপনিষৎ পড়ে নেন, আর ঘরে বসে কঠোপনিষদ পড়ে ফেলেন। সুনীতিকুমার তাঁর এই সময়কার স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে লিখেছেন, "এইভাবে আমি ১৬।১৭

সু—৯

বৎসর বয়সে স্বামী বিবেকানন্দের মতানুযায়ী বেদান্ত-বিশ্বাসী,…উপনিষদের শিক্ষার আধারে যার মন গড়ে উঠেছে এমন এক বুদ্ধি-বিচার-নিষ্ঠ গায়ত্রীমন্ত্র-পাঠী কিশোরে বা তরুণে পরিণত হলুম (বিশেষ করে পৈতে হয়ে যাওয়ার কিছু পর থেকেই—শ্যামাচরণ কবিরত্ন মহাশয়ের সন্ধ্যা-শিক্ষার বই ভালো করে পড়বার পরে)। (জীবনকথা, পৃ. ৮)

১৮৯৯ (খ্রীঃ)-এ সুনীতিকুমার মোতী শীলের স্কুলে (শীলস্ ফ্রী কলেজ) ভর্তি হন এবং ১৯০৭-এ এনট্রান্স পরীক্ষায় পরীক্ষার্থীদের মধ্যে ষষ্ঠ স্থান অধিকার করে উত্তীর্ণ হন। তাঁর স্কুলের সংস্কৃত-শিক্ষক ছিলেন স্কুলের হেড্-পণ্ডিত প্রসন্ন-কুমার বিদ্যারত্ন মহাশয়। সুনীতিকুমার তাঁর এই হেড-পণ্ডিত মহাশয় সম্বন্ধে একটি হৃদয়গ্রাহী রচনা প্রকাশ করেছিলেন (কথাসাহিত্য, কার্তিক ১৩৬৪)।

প্রবেশিকা পরীক্ষায় সুনীতিকুমারের এই সাফল্য থেকে অনুমান করা যায় যে তিনি সংস্কৃত পরীক্ষাতেও বেশ কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন। অন্যথায় পরীক্ষার্থীদের মধ্যে ষষ্ঠ স্থান অধিকার করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হত না।

কৈশোর কালে বাড়িতে বসে যিনি স্বাধীন ভাবে কঠোপনিষদ পড়ে ফেলে-ছিলেন তাঁর সংস্কৃত শিক্ষার ভিত্তি ও অনুরাগ কত দূর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সেটা অনায়াসে অনুমেয়।

১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে সুনীতিকুমার ইংরেজীতে প্রথম শ্রেণীর অনার্স সহ প্রথম স্থান অধিকার করে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি.এ. ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ইংরেজীর এম.এ. পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেন। এই পরীক্ষায় তাঁর বিশেষ অধীতব্য বিষয় ছিল প্রাচীন ও মধ্যযুগের ইংরেজী এবং প্রাচীন জার্মান ও ভাষাতত্ত্ব।

এম.এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর সুনীতিকুমার বিদ্যাসাগর কলেজে ইংরেজীর অধ্যাপক-পদে যোগদান করেন। কিছুদিন পর তিনি এই সঙ্গে কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে ইংরেজীর সহকারী অধ্যাপকের কাজও করতে থাকেন। ১৯১৯ পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা-কালেই তিনি প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ ও জুবিলী গবেষণা বৃত্তি লাভ করেন। প্রথমোক্ত বৃত্তি যা গবেষণার জন্য প্রদত্ত হয় তার বিষয়বস্তু ছিল বাংলা ভাষার তুলনামূলক ব্যাকরণ ও ধ্বনিতত্ত্ব। দ্বিতীয়টির বিষয়বস্তু ছিল বাঙ্গালা উপভাষার তুলনামূলক ব্যাকরণ। এই দুটি গবেষণাতেই সুনীতিকুমারের সংস্কৃত ব্যাকরণের সঙ্গে নিবিড় পরিচয়ের প্রমাণ পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ যৌবনকালেই তিনি পাণিনি চর্চায় অভ্যস্ত হয়েছিলেন।

১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে সুনীতিকুমার বঙ্গীয় সংস্কৃত পরিষদ গৃহীত 'বৈদিক সংস্কৃত' বিষয়ের মধ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। মধ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার সংবাদটি আমাদের জানা আছে, তবে আগু পরীক্ষা কখন দিয়েছিলেন জানা যায় না, নিশ্চয়ই দিয়েছিলেন। ভাষাতাত্ত্বিক হিসেবে সুনীতিকুমারের বিশ্বব্যাপী খ্যাতির অন্তরালে তাঁর যৌবনকালের সনিষ্ঠ সংস্কৃত-চর্চার ইতিহাস অনেকটা নীরবই থেকে গিয়েছে। তবু এই অনুচ্চারিত সাধনার সংবাদ তাঁর জীবনব্যাপী সাহিত্য-কীর্তির মধ্যেই পাওয়া যায়। O. D. B. L. গ্রন্থে সুনীতিকুমার ভারতীয় ভাষার মোটামুটি তিনটি স্তর বা কাল-বিভাগ চিহ্নিত করেছেন। এর প্রথম স্তরটি তিনি 'প্রাচীন আর্য ভারতীয়' (Old Indo Aryan) রূপে নির্দিষ্ট করেছেন, এর কালসীমা ধরা হয়েছে খ্রী: পূ: ১৫০০ থেকে খ্রী: পূ: ৫৫৭-৪৪ পর্যন্ত। খ্রী: পূ: পঞ্চম শতাব্দীতে পাণিনি তাঁর অষ্টাধ্যায়ী রচনা করে 'প্রাচীন আর্য ভারতীয় ভাষা'কে ব্যাকরণ-বিধি-বদ্ধ করেন। সুনীতিকুমার প্রাচীন আর্য ভাষা-স্তর প্রসঙ্গে পাণিনীয় ধ্বনিতত্ত্ব বিষয়ে যে আলোকপাত করেছেন তা তাঁর পাণিনীয় ব্যাকরণের সঙ্গে নিবিড় পরিচয়ের সাক্ষ্য বহন করে। O. D. B. L. গ্রন্থের প্রথম দুটি পৃষ্ঠায় মঙ্গলাচরণের (Benediction) প্রথমে এই উপনিষদ-বাণী রোমান হরফে উদ্ধৃত হয়েছে 'আবিরাবির্ম এধি'। আরও আছে দুটি সংস্কৃত শ্লোক। একটিতে ঋষি ও পূর্বজদের প্রণাম জ্ঞাপন করা হয়েছে—"ইদম্ নমঃ ঋষভয়ঃ পূর্বজেভিয়ঃ পূর্বেভ্যঃ পথিকৃদ্ভিয়ঃ।"

অপরটি হল— "উত ত্ব পশ্যন্ ন দদর্শ বাচম্
উত ত্ব শৃণ্বন্ ন শৃণোতি এনম্।
উত তস্মৈ তন্বম্ বি সস্রে
জায়েব পত্যে উষেতি সুবাসাঃ॥"

এটি অবশ্য বৈদিক শ্লোক।

১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই এপ্রিল গয়া-নিবাসী বিষ্ণুশঙ্কর মুখোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা কমলাদেবীর (১৯০০-১৯৬৪) সঙ্গে সুনীতিকুমারের বিবাহ হয়। এই বিবাহে সুনীতিকুমার তাঁর বন্ধুবর্গের নিকট মন্দাক্রান্তা ছন্দে রচিত এই আমন্ত্রণ-লিপি প্রেরণ করেছিলেন—

"স্বস্তি স্বীয়ে পরিণয়বিধাবুৎসবং সংবিধাতুং
সম্পূর্ণাঙ্গং সকল সুহৃদাম্ স্বাগতৈ প্রেম ধাম্নাম্।
প্রীতি স্নিগ্ধাম্ প্রমুদিতমনা যচ্ছতীমাং লিপিং তে
জায়াং নামানুরূপ কমলাম্ আপ্তুকামঃ সুনীতিঃ॥"

কবি কালিদাসের 'মেঘদূত' সুনীতিকুমারের অতি প্রিয় পাঠ্য ছিল। বিদেশ-ভ্রমণের সময় একটি স্বল্প আয়তনের ছাপা 'মেঘদূত' তাঁর সঙ্গী থাকত, যখন তখন তিনি এটি পড়ে আনন্দ পেতেন। শ্রীমদ্ভাগবতগীতাও তাঁর প্রিয় পাঠ্য ছিল—অন্যান্য সংস্কৃত কাব্যও তিনি যত্ন করে পড়েছিলেন। সংস্কৃত কাব্য পাঠের সঙ্গে সঙ্গে তিনি সংস্কৃত কাব্যে অনুষ্ঠিত নানা ছন্দও আয়ত্ত করেছিলেন, এই সব বিভিন্ন ছন্দে শ্লোক রচনায়ও তিনি নিজে দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। এমনি প্রায় তিনশতটি শ্লোক বিবিধ ছন্দে তিনি রচনা করেন। তাঁর Indo-Aryan and Hindi (1942, 1960, 1969) গ্রন্থের মঙ্গলাচরণ (ভূমিকার পরিবর্তে) ১১টি স্বরচিত শ্লোক যুক্ত। (ছন্দ—মন্দাক্রান্তা—১১, শার্দূল বিক্রীড়িত—২, শিখরিণী—১, স্রগ্‌ধারা—১, বসন্ত-তিলক—১, অনুষ্টুভ—৪, মালিনী—১) তাঁর রচিত নিম্নলিখিত শ্লোক-গুলির কথাও উল্লেখযোগ্য—(ক) ঋষি-পঞ্চমী শ্লোক-পঞ্চদশী (ভাণ্ডারকর ওরিয়েণ্টাল রিসার্চ ইন্সটিটিউট্ প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে অনুষ্টুভ ছন্দে রচিত ১৫টি শ্লোক)।

(খ) জোরহাটে আসাম সাহিত্যসভার নবনির্মিত ভবনের উদ্বোধন উপলক্ষ্যে অনুষ্টুভ ছন্দে রচিত ২টি (গ) আচার্য সুকুমার সেনের সম্মানে লিখিত শার্দূল-বিক্রীড়িত ছন্দে ১টি, জানুয়ারী ১৯৬৬ (ঘ) শ্রীপ্রমথনাথ বিশীর সম্মানে রচিত ৩টি, (১টি শিখরিণী, ২টি অনুষ্টুভ), জুলাই ১৩৬৬ (ঙ) জর্জিয়ার কবি শোথা রুশ্‌থা-ভেলির ৮০০তম জন্ম উপলক্ষ্যে বিলীসিতে অনুষ্ঠিত উৎসবের জন্য উক্ত কবির প্রশস্তি-সূচক ১৬টি শ্লোক, সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ১৯৬৬ (চ) গুরুগোবিন্দ সিং-এর ত্রিশততম জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে অনুষ্টুভ ছন্দে রচিত ১৬টি শ্লোক (ছ) মণিপুরবাসী পণ্ডিতরাজ অতোনবাপু শর্মার উদ্দেশ্যে অনুষ্টুভ ছন্দে রচিত ১০টি শ্লোক (জ) জর্জিয়া-(রুশ দেশ)-বাসী পণ্ডিত ডঃ গিওরগিয়স্ আথ্‌ভ্‌লেডিয়ানির ৮০তম জন্ম উৎসব উপলক্ষ্যে ১৮টি শ্লোক (২টি মন্দাক্রান্তা, ১৬টি অনুষ্টুভ) (ঝ) লাটভিয়া বাসী জনৈক রুশ পণ্ডিতের সম্বর্ধনায় রচিত ১০টি শ্লোক (একটি মন্দাক্রান্তা, ১টি শার্দূলবিক্রীড়িত, ৮টি অনুষ্টুভ) (ঞ) স্বরচিত Bolts and Aryan গ্রন্থের একাদশ অধ্যায়ের পরিশিষ্টে ১২টি শ্লোক অনুষ্টুভ ছন্দে—'ভটিকী বেদ সংহিতা' আখ্যায় (ট) পৌত্রের উদ্দেশ্যে আশীর্বাণী স্বরূপ দুটি অনুষ্টুভ ছন্দে রচিত (ঠ) কলিকাতার বড়-বাজার পল্লীর হনুমান মন্দিরে ২৯ জন মধ্যযুগীয় কবির চিত্র প্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে অনুষ্টুভ ছন্দে রচিত ১২টি (ড) মাদ্রাজে 'শঙ্কর ও সম্মত' সম্মেলন উপলক্ষ্যে রচিত ১৬টি, অনুষ্টুভ ছন্দে রচিত, ১৯৬৯ (ণ) নেপাল-বাসী পণ্ডিত কৃষ্ণ প্রসাদ শর্মা রচিত সংস্কৃত

কৃষ্ণলীলামৃত কাব্যের ভূমিকা স্বরূপ রচিত দশটি, অনুষ্টুভ ছন্দে রচিত (ত) গুরু নানকের উদ্দেশ্যে সাহিত্য একাডেমি প্রকাশিত স্মারক গ্রন্থের জন্য লিখিত ২০টি, অনুষ্টুভ ছন্দে রচিত (থ) 'World Literature and Tagore' গ্রন্থের জন্য রচিত ৫টি মঙ্গলাচরণ শ্লোক। এর মধ্যে একটি উদ্ধৃত করা হল :—

বিশ্ব কবি নমস্কারঃ

নমঃ তস্মৈ নমঃ কবিভ্যো মনীষিভ্যশ্চ।

॥ একম্ সদ্ বিপ্রা বহুধা বদন্তি ॥

সচ্চিদানন্দ রূপায়   প্রজ্ঞানায় রসাত্মনে।
জগৎস্ তন্ময়োধাত্রে   পরস্মৈ ব্রহ্মণে নমঃ ॥১॥
যোগিনাম ধ্যান গম্যায়   জীবনদেবতাত্মনে।
সবের্ষাম্ আবির্ভূতায়   বিশ্বম্ভরায় বৈ নমঃ ॥২॥
নির্গুণম সগুণং চৈব   তারণমোহ সাগরে।
বিশ্বেশম্ শরণং স্থাণু   যৎ তস্মৈ মহশে নমঃ ॥৩॥
ঋতম্ সত্যম্ স্তবস্তি এতৎ   কবয়ো যন্মনীষিণঃ।
সান্তন চ ঘোরমেবেপি   তদ আভির্ত্তু নো দৃশে ॥৪॥
শিল্পে নৃত্যে' থ সঙ্গীতে   কাব্যে চ স্বকৃতের্নৃণম্।
প্রকাশস্তে রুচো যস্য   ভূয়স্তস্মৈ নমোনমঃ ॥৫॥
রবেঃ কবের্বচম শিবম্   তনোতু নো মুদম্ শুভম্।
মনোবিনোদম্ অদ্ভুতম্   বিভ্রতু ভূত-ভারতী ॥৬॥

সংস্কৃত ভাষায় লিখিত সুনীতিকুমারের কিছু প্রবন্ধও সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হয়।

পণ্ডিত ক্ষিতীশ প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত ও পরিচালিত সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত 'মঞ্জুষা' পত্রিকায় সুনীতিকুমার রচিত নিম্নলিখিত সংস্কৃত রচনাগুলি প্রকাশিত হয়েছিল :—

(১) সংস্কৃত—দিগ্‌বিজয়ঃ (৪থ, ১০ম সং, ১৯৫০), (২) সংস্কৃত সাহিত্যম্ (১২থ, ১ম সং, ১৯৫৭), (৩) তুলনাত্মক ভাষা বিজ্ঞানস্য প্রাদুর্ভাবঃ (১২থ, ১২ সং, ১৯৫৮), (৪) ভারতীয় সংস্কৃতেরুদ্‌গমঃ (১৩থ, ১৪ সং, ১৯৫৮), (৫) ভারতেতর দেশেষু (৬) সংস্কৃত ভাষায়াঃ প্রভাব (১৩থ, ২য় সং, ১৯৫৮), (৭) পাশ্চাত্যদেশেষাচার্য মনীষিণঃ (১৪থ, ২য় সং, ১৯৫৯)।

কাশী গভর্নমেণ্ট সংস্কৃত কলেজ, কাশী বিদ্যাপীঠ ও বিহার সংস্কৃত সমিতির

সমাবর্তন উৎসবের পুরোহিত রূপে সুনীতিকুমারের দীক্ষান্ত ভাষণগুলি সংস্কৃত ভাষায় প্রদত্ত হয়েছিল (যথাক্রমে, ডিসেম্বর ১৯৫৬, ফেব্রুয়ারী ১৯৫৮ ও এপ্রিল ১৯৫৮)।

সুনীতিকুমার রচিত অসংখ্য নিবন্ধাবলীর মধ্যে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যাশ্রয়ী নিম্নলিখিত রচনাগুলির উল্লেখ করা যেতে পারে :—

ইংরাজী—(1) Indianism and Indian Synthesis—Kamala Lectures, (1947), Cal. Univ. 1962 ; (2) Phonetics in the study of Classical Languages in the East—University of Bangalore, 1967. (3) World Literature and Tagore—Visva Bharati, 1971 ; (4) Some Linguistic Technical Terms and their rendering into Sanskrit—Proc. of 6th. A. I.O.C. Patna, 1930 ; (5) The Pronunciation of Sanskrit—K. B. Pathak Comm. Vol., BORI, Poona, 1934 ; (6) Purana Legends and the Prakrit Tradition, Buu of School of Ort. Studies, Vol. VIII, London, 1937 ; (7) Sanskrit in Perso-Arabic Script, Indian Linguist, 1939 ; (8) Sanskrit and the languages of India—Visva-Bharati Qrly. 1952 ; (9) Sanskrit and World Academy, Hindustan Standard, Nov. 16, 1952 ; (10) The Pronunci-tion of Sanskrit—Le Maitre Phonetique, Jan-June, 1952 ; (11) Sanskrit and Russian, The Statesman, Nov. 29, 1955 ; (12) Indianism and Sanskrit—Annals of Bhandarkar Ort. Res. Inst. 1957 ; (13) The Pronuciation of Sanskrit—Indian Linguist, Vol. 21, 1960.

বাংলা—

(ক) পুরাণ ও হিন্দু সংস্কৃতি (ভারতবর্ষ, পৌষ ১৩৩৯) ; হিন্দু সভ্যতার পত্তন (উদয়ন, বৈশাখ ১৩৪০) ; ভারতীয় সংস্কৃতি ও সংস্কৃত ভাষা (পাঞ্চজন্য, শারদীয় ১৩৪০) ; ধর্ম শিক্ষা (উদ্বোধন, আশ্বিন ১৩৪৩) ; সদুক্তি কর্ণামৃত ও বাঙ্গালা কাব্য সাহিত্যের পটভূমিকা (বিশ্বভারতী পত্রিকা, প্রাঃ-আঃ ১৩৫০) ; এশিয়া খণ্ডে সংস্কৃত ভাষার প্রভাব ও প্রসার (আঃ বাঃ পত্রিকা, শারদীয়া ১৩৫০) ; ভারতের সাহিত্য সম্পদ (শিক্ষক, ফাল্গুন ১৩৬১ ; অলবিরুণী ও সংস্কৃত (বিশ্ব-

ভারতী পত্রিকা, কাঃ-পৌষ ১৩৬২); মাণিক্যবাচকের একটি স্তোত্র (উদ্বোধন, আশ্বিন ১৩৪৪); যো দেবনামান্যখিলানি ধত্তে (উদ্বোধন, আশ্বিন ১৩৬০)।

সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যাশ্রিত বহু গ্রন্থের সুনীতিকুমার কৃত সমালোচনা ইংরাজী, বাংলা ও হিন্দী পত্রসমূহে প্রকাশিত হয়। এই শ্রেণীর বহু গ্রন্থের ভূমিকা বা পরিচায়িকা সুনীতিকুমার কর্তৃক লিখিত হয়। এই প্রসঙ্গে পণ্ডিত দুর্গামোহন ভট্টাচার্য সম্পাদিত অথর্ববেদান্তর্গত নবাবিষ্কৃত পৈপ্পলাদ সংহিতার নাম উল্লেখ-যোগ্য (সংস্কৃত কলেজ, কলিকাতা, ১৯৭০)।

১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দের শেষ ভাগে সংস্কৃত ভাষার অধ্যয়ন অধ্যাপনা ও সংস্কৃতচর্চার উন্নতির জন্য বিশিষ্ট সংস্কৃতবিদ্‌দের নিয়ে ভারত সরকার একটি কমিশন নিয়োগ করেন। সাতজন সদস্য নিয়ে গঠিত এই কমিশনের সভাপতি (Chairman) নিযুক্ত হন সুনীতিকুমার। এই কমিশনের সর্ববাদীসম্মত প্রতিবেদন ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় (Report of the Sanskrit Commission, 1956-57, Govt. of India, 1958)। এই প্রতিবেদনে মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত সর্বভারতে সংস্কৃত ভাষাকে আবশ্যিক রাখার পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল। সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি দেশের শিক্ষিত সমাজের উপেক্ষার মনোভাবের প্রতি কমিশন সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। সংস্কৃত শিক্ষার প্রসার ও উন্নতি, তজ্জন্য একটি কেন্দ্রীয় সংস্থা (বোর্ড) ও পরামর্শ সমিতি গঠন, সংস্কৃত পাণ্ডুলিপি সংরক্ষণ, অপ্রকাশিত সংস্কৃত গ্রন্থ মুদ্রণ ও প্রচার, প্রাচীন ধারায় শিক্ষিত সংস্কৃত পণ্ডিতদের বৃত্তি ও উপাধি দান, সংস্কৃত চর্চার জন্য বিশেষ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন, আকশবাণী প্রভৃতি সরকারী প্রচার মাধ্যমে সংস্কৃত ভাষার ব্যবহার, আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের উন্নত পঠন-পাঠন প্রচলন, সরকারী পরিভাষা প্রণয়নে সংস্কৃত ভাষার বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্ত বিদ্যামূলক শব্দ চয়ন ও প্রচলন প্রভৃতি বিষয়গুলির প্রতি এই প্রতিবেদনে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। সরকারী প্রশাসনে যাঁরা নিযুক্ত, বিশেষভাবে বিদেশ-মন্ত্রকের যে সব কর্মচারী ভারতের বাইরে দেশের প্রতিনিধিত্ব করেন, তাঁদের সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে সাধারণ শিক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ নিতান্ত আবশ্যক—প্রতিবেদনে এই মতও প্রকাশ করা হয়।

সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য ভারতের অমূল্য সম্পদ। ভারতবাসীর সযত্নলালিত ধ্যানধারণাগুলির উৎস—সংস্কৃত সাহিত্য। ভারত-চেতনা সঞ্চারের মূলে রহিয়াছে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য। সংস্কৃতচর্চার অপহ্নব ঘটলে—দেশবাসীর মানসিক অবনতি ও জাতীয়তা-বোধের ক্রমবিলুপ্তির আশঙ্কা থেকে যাবে—কমিশনের

প্রতিবেদনে এই মতগুলি বিশেষ ভাবে প্রতিফলিত হয়েছিল। সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যচর্চা এযাবৎকাল ভারতের অখণ্ডতা অক্ষুণ্ণ রেখেছে এবং এই সংস্কৃতের মাধ্যমেই অতীতে ভারতবর্ষ বহু দেশে নিজের মহিমা প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছে— এ কথাও প্রতিবেদনে স্পষ্ট করে তুলে ধরা হয়েছিল। এখানে বলা প্রয়োজন যে ভারত সরকার এই প্রতিবেদনের বহু পরামর্শই গ্রহণ করেছিলেন।

গত পঞ্চাশ দশকে পশ্চিমবঙ্গে মাধ্যমিক শিক্ষা সংস্কারের সময় মাধ্যমিকে সংস্কৃত শিক্ষার অপরিহার্যতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। ঠিক এর কিছুকাল পূর্বেই সংস্কৃত কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছিল। মাধ্যমিক স্তর থেকে সংস্কৃত শিক্ষা বর্জন ও তৎস্থানে হিন্দী গ্রহণেরও একটি প্রস্তাব উঠেছিল। সুনীতিকুমার এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে সংবাদপত্রের মারফৎ তীব্র প্রতিবাদ করেন, এটি পরে পুস্তিকাকারেও প্রকাশিত হয়েছিল। (Hindi vs Sanskrit : Conflict of languages in Secondary Education, Calcutta, 1959)

পশ্চিমবঙ্গে মাধ্যমিক শিক্ষাসংস্কার পরিকল্পনাটি এই সময়ে আলোচনাধীন ছিল। এই সময়ে অনেকে সংস্কৃত শিক্ষাকে আবশ্যিক রাখার বিরোধিতা করেন। সুনীতিকুমার সংবাদপত্রে প্রবন্ধ লিখে এর প্রতিবাদ করেন। এই প্রতিবাদ পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। এই প্রসঙ্গে সুনীতিকুমার লিখেছিলেন: 'The unanimous document (Sanskrit Commission Report) has given the sole case for Sanskrit as the very basis of the cultural as well as political unity of India, which may be harmed and even destroyed if Sanskrit gradually is forced out of the scene. The value of Sanskrit as an essential subject of the study has been clearly brought out (in the Commission's report)."

সংস্কৃত শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা কি এ সম্পর্কে তিনি আরও লিখেছিলেন— "(Sanskrit education) affords a (i) mental disciplne of high order (ii) the foundation of an intimate knowledge of our national culture and of the things with which India served humanity (iii) an access to a great literature which has moulded the mind of India and has influenced the outside world also (iv) (it serves as) feeder of modern Indian languages. সৌভাগ্যের বিষয় তখন সংস্কৃত শিক্ষাকে বাতিল করা সম্ভব হয়নি।

সুনীতিকুমারের মৃত্যুর পর সংস্কৃত-বিরোধীগণ সম্প্রতি এ বিষয়ে সফলকাম হয়েছেন।

পুনে ভাণ্ডারকর ওরিয়েন্টাল ইন্সটিটিউটে রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকরের স্মৃতি অনুষ্ঠানে 'Indianism and Sanskrit' বিষয়ে ভাষণ দান প্রসঙ্গে (আগস্ট ২৯, ১৯৫৭) সুনীতিকুমার এই মত প্রকাশ করেন যে সংস্কৃতের সঙ্গে ভারতীয়তার সম্বন্ধ অচ্ছেদ্য (Sanskrit is rightly recognised as the greatest possession of India···This Indianism is the atmosphere in which we in India brealthe and live and Sanskrit is valuable for us because in Sanskrit is enshrined the great thoughts and great narratives which bring out this Indianism. The value of Sanskrit in Indian life goes hand in hand with the value of Indianism···)।

১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে মার্চ রোম বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে সুনীতিকুমারকে সম্মানসূচক 'ডক্টর অফ্ লেটর্স' উপাধি দান করা হয়। এই উপলক্ষ্যে তাঁর ধন্যবাদ-মূলক ভাষণটি ইংরাজী, ইতালিয়ান, গ্রীক্, লাতিন ও সংস্কৃত ভাষায় প্রদত্ত হয়েছিল। সংস্কৃত ভাষণান্তটি ছিল এইরূপ :—'মহতীম্ এতাম্ সম্বর্ধনাম্ শিরোভূষণং কৃত্বাহম্ আত্মানং কৃতার্থং মন্যে।'

১৯৭২ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে ভারত সরকারের উদ্যোগে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সংস্কৃত সম্মেলনের কয়েকটি অধিবেশনে সুনীতিকুমার সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। এই সংস্কৃত সম্মেলনে সুনীতিকুমারের মূল ভাষণ ছিল আধুনিক ভারতীয় ভাষার উপর সংস্কৃত ভাষার প্রভাব বিষয়ে।

১৯৭৫ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে সুনীতিকুমার ইতালী দেশের টুরিন নগরে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক সংস্কৃত কংগ্রেসের অধিবেশনে (2nd International Congress of Orientalists) আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। তাঁর ভাষণের বিষয় ছিল সংস্কৃতের দিগ্বিজয়।

১৯৭৫ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে সুনীতিকুমার নব-নালন্দা মহাবিহার (Nalanda Uuiv.) কর্তৃক 'বিদ্যাবারিধি' উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন।

১৯৭৬ খ্রীষ্টাব্দে দরভাঙ্গাস্থিত মৈথিলী বিশ্ববিদ্যাপীঠ সুনীতিকুমারকে মহা-মহোপাধ্যায় উপাধিতে অলঙ্কৃত করেন। বলা বাহুল্য যে, শেষোক্ত দুটি উপাধি তিনি তাঁর সংস্কৃতচর্চার স্বীকৃতি স্বরূপই লাভ করেছিলেন।

বিশ্ব-বিশ্রুত পণ্ডিত সুনীতিকুমার নিজের ব্যক্তিগত বা পারিবারিক জীবনেও সংস্কৃত-প্রাণ ছিলেন।

১৯৬৪ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই ডিসেম্বর তাঁর স্ত্রী-বিয়োগ হয়। তাঁর পুত্রকন্যাদের নামে প্রেরিত শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণ-পত্রটির শিরোভাগে এই বৈদিক শ্লোকটি উদ্ধৃত ছিল—"অগ্নে নয় সুপথা রায়ে অস্মান।" পত্রের শেষে ছিল ঈশোপনিষদের শ্লোক—"তত্র কো মোহঃ, কঃ শোক—একত্বম্ অনুপশ্যতঃ।" শ্রাদ্ধ উপলক্ষ্যে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের নিকট প্রেরিত নিমন্ত্রণ-পত্রটির ভাষাও ছিল সংস্কৃত। স্ত্রীর স্মরণে সুনীতিকুমার একটি স্মারক পুস্তিকা প্রকাশ করেন। এর আখ্যা-পত্রটি ছিল দুই ভাষায়, ইংরাজী ও সংস্কৃতে—'In memoriam/Kamala Devi/1900-1964/A husband's offering of love and respect ; সংস্মরণায় পত্ন্যাঃ প্রীতি শ্রদ্ধা নিবেদনম্।' এই পুস্তিকায় সুনীতিকুমার সংস্কৃত শাস্ত্রগ্রন্থ থেকে বহু সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধৃত করেছেন। এই পুস্তিকায় তিনি লিখেছেন কতকটা লজ্জার সঙ্গে যে ধর্ম-দর্শন সম্বন্ধে তাঁর বিশেষ কোন ধারণা নেই—তবে উপনিষদ্ বেদান্ত তাঁর মনকে সর্বাপেক্ষা অধিকভাবে প্রভাবিত করে থাকে। তিনি আরও লিখেছেন যে পঞ্চাশ বৎসরের অধিককালের যে দাম্পত্য-বন্ধন তাঁর স্ত্রীর মৃত্যুতে ছিন্ন হয়েছে, সেই বেদনায় তিনি ঈশোপনিষদের শ্লোক থেকে সান্ত্বনা ও শান্তি লাভ করছেন—"তত্র কো মোহঃ, কঃ শোকঃ, একত্বম্ অনুপশ্যতঃ (What delusion and what sorrow can be there, if one see the oneness of all)।"

সুনীতিকুমারের স্ত্রীর শ্রাদ্ধদিনে তাঁর শয়নকক্ষে দুই বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত দ্বারা উপনিষদ ও গীতা পাঠের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। পৃথকভাবে বৈষ্ণব-পদকীর্তনের ব্যবস্থাও অবশ্য ছিল। চতুষ্পাঠী পরিচালনা করেন বেছে বেছে এমন পঞ্চাশ জন সংস্কৃত অধ্যাপককে শ্রাদ্ধ উপলক্ষ্যে বিনীত নিমন্ত্রণ করে বস্ত্র কলসাদি প্রচুর উপঢৌকন বা 'বিদায়' দেওয়ার ব্যবস্থাও করা হয়েছিল।

বিশ্বপর্যটক সুনীতিকুমার অবশ্য আমাদের দেশের একটি প্রাচীন প্রথাই এক্ষেত্রে অনুসরণ করেছিলেন।

কবি জয়দেবের "গীতগোবিন্দম্" বিশ্বসাহিত্য-নিষ্নাত সুনীতিকুমারের প্রিয় পাঠ্য ছিল। এই গ্রন্থটির অধিকাংশ শ্লোক তাঁর কণ্ঠস্থ ছিল। কোন আলোচনা প্রসঙ্গে আলাপচারিতায় তাঁকে "গীতগোবিন্দম্"-এর শ্লোক আবৃত্তি করতে শোনা যেত। শেষ জীবনে তিনি তাঁর এই প্রিয় কবির বিষয়ে ইংরাজীতে একটি মনোজ্ঞ গ্রন্থ রচনা করেন—এই গ্রন্থের বিষয়সূচির প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করলে সংস্কৃত ভাষা

তথা জয়দেব বিষয়ে সুনীতিকুমারের অভিনিবিষ্ট অধ্যয়নের পরিচয় পাওয়া যাবে। (ক) জয়দেব—প্রাচীন ধারার শেষ ও আধুনিক ধারার প্রথম কবি (খ) জয়দেব—জীবনী ও কাহিনী (গ) জয়দেবের জন্মস্থান (ঘ) গীতগোবিন্দ ব্যতীত জয়দেবের অন্যান্য আলোচনা (ঙ) জয়দেব—লৌকিক প্রেমের কবি অথবা রাধাকৃষ্ণ-ভক্ত বৈষ্ণব সন্ত বিষয়ক প্রসঙ্গ (চ) সদুক্তি কর্ণামৃতে উদ্ধৃত ২৬টি জয়দেব কৃত শ্লোক ও জয়দেবের কাব্যের বিভিন্ন বৈচিত্র্য (ছ) সর্বভারতে ও বহির্ভারতে জয়দেবের প্রভাব ও জনপ্রিয়তা (জ) গীতগোবিন্দের ভাষার আলোচনা—মধ্য-ইন্দো-এরিয় অথবা আদি নব ইন্দো এরিয় কি না (ঝ) শিখ আদি গ্রন্থে জয়দেবের নামে প্রচলিত দুটি পদ (ঞ) মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে পদাবলী ও অঙ্গল কাব্য (ট) ভক্ত কবি জয়দেব—ভক্ত মালার উল্লেখ (ঠ) গীতগোবিন্দ—১২ সর্গ ২৪টি গীতি ও ৩৮৬ শ্লোক ও নামের ব্যাখ্যা (ড) গীতগোবিন্দে পার্থিব ও স্বর্গীয় প্রেম (ঢ) জয়দেব—প্রাচীন ধর্মীয় এবং আধুনিক বিচারমূলক দৃষ্টিতে পর্যালোচন (ণ) গীতগোবিন্দ ও মধ্যযুগীয় চিত্রকলা (ত) গীতগোবিন্দের দুইটি গীতি ও তাহার ইংরাজী অনুবাদ (থ) রাধাকৃষ্ণ পূজা ও হিন্দু মূর্তিশিল্প (দ) গীতগোবিন্দের সঙ্গীতাংশের ছন্দ ও সুর (Jayadeva—Suniti Kumar Chatterjee, Sahitya Academy, 1973)

১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে নোয়াখালীর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় বহু হিন্দু কুমারী ধর্ষিতা বা অপহৃতা হয়েছিল। এই শ্রেণীর কিছু সংখ্যক বালিকাকে উদ্ধার করে কলকাতায় আনা হয়। দেবল সংহিতায় বলপূর্বক অপহৃতা বা বালিকাদের বিবাহ বা পুনর্বিবাহ শাস্ত্রসম্মত বলে বিধান আছে জেনে পরলোকগত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে এই দুর্ভাগা বালিকাদের বিবাহের ব্যবস্থা করা হয়। এই প্রকার বিবাহে পুরোহিতের অসদ্ভাব ঘটেছিল। যাতে পুরোহিতের অভাব না ঘটে তার জন্য ব্রাহ্মণ-সন্তান সুনীতিকুমার এই ধরনের কয়েকটি বিবাহে নিজেই পুরোহিতের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। পুরোহিতের কাজ করতে এই বিশ্ববন্দিত পণ্ডিত গৌরব বোধ করতেন। বিদেশে প্রবাসী হিন্দু বাঙ্গালী পরিবারের একাধিক বিবাহে সুনীতিকুমার পৌরোহিত্য করেছিলেন—তাঁর মুখ থেকেই এ কথা শোনা যেত।

পৌরোহিত্যের অভিজ্ঞতা থেকে সুনীতিকুমার হিন্দু উপনয়ন ও বিবাহ পদ্ধতির কিছু সংস্কার প্রয়োজন মনে করেন। এই কাজে হাত দিয়ে মৃত্যুর কিছু-কাল পূর্বে এ বিষয়ে তিনি একটি পুস্তক রচনা করেন—(A shortened Arya

Hindu Vedic Wedding and Initian Ritual, Calcutta, July 1976)

এই পুস্তিকাটির প্রথমার্ধ "সংক্ষিপ্ত আর্য হিন্দু বৈদিক বিবাহ পদ্ধতি" তিনি স্ত্রী কমলা দেবীর নামে উৎসর্গ করেন। এই উৎসর্গ-পত্রে কমলা দেবীর সংস্কৃত বিশেষণ-গুলি লক্ষণীয়—সৎপত্নী, সন্মাতা, সৎস্নুষা, সৎশ্বশ্রূ, সহধর্মিণী, সাধ্বী, সন্নারী, সুমঙ্গলী, সুপুরন্ধ্রী ও ভাগ্যবতী।

বিবাহ পদ্ধতিটি এই ভাবে গ্রথিত—(১) শুভারম্ভ (ওঁ তৎ সৎ, ওঁ নমমো ব্রহ্মণে, নম সাবিত্র্যৈ। নমো বিষ্ণবে, নমঃ শ্রিয়ৈ। নমঃ শিবায়, নমঃ উমায়ৈ॥ ইত্যাদি (২) পুরোহিত—অভ্যাগত সংলাপ (৩) কন্যাকর্তৃ দ্বারা বর স্বাগতম (৪) কন্যায়াঃ পিত্রা / সম্প্রদাতা বর বরণম্—(বিষ্ণুর্ওঁ ইত্যাদি) (৫) স্ত্রী-আচার (সুনীতিকুমার লিখেছেন এটি অবৈদিক তবে আর্যাবর্তে প্রচলিত (৬) বিবাহ পদ্ধতি (ক) কন্যা সম্প্রদান, পাণি গ্রহণ, কাম স্তুতি, (খ) পাণি গ্রহণ (গ) অশ্মারোহণ (ঘ) কুশণ্ডিকা (ঙ) সপ্তপদী (চ) আশীর্বচন, প্রার্থনা (জ) সমাপ্তি (ঝ) সৌভাগ্য লক্ষণ প্রদান, মঙ্গলসূত্র দান, সিন্দুর দান, কঙ্কণ দান।

আলোচ্য গ্রন্থটির দ্বিতীয়ার্ধে আছে—সংক্ষিপ্ত আর্য হিন্দু বৈদিক উপনয়ন পদ্ধতি। এই অংশটি কবি-সার্বভৌম রবীন্দ্রনাথের নামে নিম্নলিখিত ভাবে উৎসর্গী-কৃত হয়েছে—

পুণ্য স্মৃতি প্রণতি

॥ শ্রীরবীন্দ্র নারাশংসী বিরুদ্ ত্রিংশৎ।

॥ বসু মনাঃ ॥ ঋষি মনাঃ ॥ সত্য দৃক্ ॥ ঋতম্ভর ॥ বর্ষবিদ্ ॥ ধিয়া বসু ॥

॥ সনৎকুমারঃ। ধেনামেধাঃ ॥ চিত্রকেতু ॥ আর্য সুপ্রাজ্ঞ ॥ কবি-মনীষী ॥

॥ জীবন দৈবত ॥ প্রিয়দর্শী ॥ হুতবন ॥ শ্রুতবহ ॥ ব্রহ্মণ্যদেব। শিক্ষানর ॥

॥ ঋভু-রাধ ॥ তত্ত্ব দেশিক ॥ তুভিক্রতু ॥ পুরুক্রতু ॥ সুশ্রবাঃ ॥ ভূরিশ্রবাঃ।

॥ পরিশ্রবাঃ। শ্বেত শ্রবাঃ ॥ প্রিয়-মানব ॥ সঙ্গীত নায়কঃ ॥ দৃষদ্-বিষম ॥

॥ পুষ্প সুষমঃ ॥ রুচি বজ্রঃ ॥ রবি-ইন্দ্রঃ ॥

॥ তৎ পাদানুধ্যাত—সদাপ্রণত—সুনীতিকুমার ॥

রবীন্দ্রনাথের প্রতি প্রযুক্ত এই ত্রিশটি বিশেষণ বৈদিক সাহিত্য হতে গৃহীত হয়েছে। সুনীতিকুমার এই বিশেষণগুলি ইংরাজীতে ব্যাখ্যা করেছেন। অবশ্য, প্রাচীন গ্রীক, ল্যাটিন প্রভৃতি ভাষার অনুরূপ অর্থবাচক শব্দগুলির সঙ্গে এর সাদৃশ্য দেখিয়েছেন।

এই সূত্রে তিনি রবীন্দ্রনাথের গায়ত্রীর উৎকৃত ইংরাজী অনুবাদ ও উপনয়ন অংশের ভূমিকায় সন্নিবিষ্ট করেছেন। মুণ্ডন, আচার্য-মানবক উপদেশ, যজ্ঞোপবীত দান, সন্ধ্যাবন্দনা, প্রাণায়াম, আচমন, সূর্যোপস্থান, রুদ্রোপস্থান, স্বাধ্যায়, সমাবর্তন এই কয়টি অনুচ্ছেদে বৈদিক মন্ত্রগুলির ইংরাজী ব্যাখ্যা এই পুস্তিকাটিতে সন্নিবিষ্ট হয়েছে। আধুনিক কালে সংস্কৃতের সঙ্গে শিক্ষিত হিন্দুসমাজের পরিচয় অধিক নয়, কিন্তু বর্তমানেও হিন্দুর ক্রিয়াকর্ম বিশেষতঃ উপনয়ন ও বিবাহ প্রভৃতি সংস্কৃতের মাধ্যমেই হয়ে থাকে। সুনীতিকুমারের শেষ জীবনে রচিত এই পুস্তকটি সংস্কৃত-অনভিজ্ঞ অথচ ইংরাজীতে ব্যুৎপন্ন সাধারণ হিন্দুর সম্মুখে বিবাহ ও উপনয়ন সংক্রান্ত বৈদিক মন্ত্র ও এদের গভীর তাৎপর্য উদ্‌ঘাটিত করে দিয়েছে। জাতীয় অধ্যাপকের পদ থেকে অবসর গ্রহণ করার পর সুনীতিকুমার সংস্কৃত শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠে মনোনিবেশ করেছিলেন। দৃষ্টিশক্তি হ্রাসের জন্য এ বিষয়ে যথেষ্ট মনোযোগ দেওয়া সম্ভব হয়নি, এজন্য তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করতেন। চক্ষু অস্ত্রোপচারের পর পড়বেন বলে তিনি ম্যাক্সমূলারের সম্পাদিত Sacred Books of the East Series-এর কিছু গ্রন্থ যা তাঁর সংগ্রহে ছিল না বা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না তা দিল্লী থেকে কিনে আনিয়েছিলেন। সেগুলি পড়ে ওঠার সময় তিনি পাননি কারণ সফল অস্ত্রোপচারের কয়েকদিনের মধ্যেই অপ্রত্যাশিত ও আকস্মিক ভাবে হৃদ্‌রোগে তিনি পরলোকগমন করেন।

ধুরন্ধর ভাষাতত্ত্ব ও ধ্বনিতত্ত্ববিদ্ রূপে সুনীতিকুমার বিশ্বের বিদ্বৎসমাজে পরিচিত ছিলেন। কিন্তু এ ছাড়াও, বহু বিষয়ে তাঁর অপরিসীম পাণ্ডিত্য ছিল। বর্তমান যুগের অন্যতম সংস্কৃতজ্ঞ সর্বোপরি সংস্কৃতপ্রেমিক রূপেও তিনি চিরস্মরণীয়।

ভাষাচার্য সুনীতিকুমার ও আধুনিক ভারতীয় ভাষাবিজ্ঞান

শ্রীনীলমাধব সেন

১

সংস্কৃত ব্যাকরণ-সাহিত্যে 'ত্রিমুনি' একটি বহুপ্রচলিত ও সুবিদিত শব্দ। মানব-মনীষার এক অপূর্ব নিদর্শন সংস্কৃত ব্যাকরণ অষ্টাধ্যায়ীর রচয়িতা ভগবান পাণিনি, বার্তিককার কাত্যায়ন এবং মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি—এই তিনজনকে ত্রিমুনি বলে শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করা হয়েছে। চতুর্থ মুনির মর্যাদা কাউকে দেওয়া হয়নি। কিন্তু বাগ্‌দেবী স্বয়ং বরণ করে যাঁর কাছে নিজের বহু রহস্য উদ্‌ঘাটন করেছেন, শব্দ-ব্রহ্মের সাধনায় সিদ্ধকাম হয়ে এ যুগে যিনি ব্রহ্মর্ষিত্ব অর্জন করেছেন সেই ভাষাচার্য সুনীতিকুমারকে ভারতীয় ভাষাবিজ্ঞান শাস্ত্রের চতুর্থ মুনির সম্মান নিঃসন্দেহে দেওয়া যেতে পারে।

২

প্রধানত বেদের নির্ভুল আবৃত্তি, অধ্যাপন ও সংরক্ষণের জন্য সুপ্রাচীন কালেই—আজ থেকে আড়াই হাজার বছরেরও বেশী আগে—ভাষা-বিজ্ঞানের বহু শাখার, ব্যাকরণ, ধ্বনিবিজ্ঞান, নিরুক্তি প্রভৃতির উদ্ভব হয়েছিল আমাদের দেশে। এই বিষয়-গুলি নিয়ে রচিত গ্রন্থগুলি সবই বর্ণনাত্মক। ভাষার বিশ্লেষণে এবং উচ্চারণ বা ধ্বনি-বিজ্ঞানের সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণে প্রাচীন ক্রান্তদর্শী ঋষিদের পারদর্শিতা এ যুগেও আমাদের বিস্ময় ও শ্রদ্ধা উদ্রেক করে। কিন্তু তুলনাত্মক ঐতিহাসিক ভাষাশাস্ত্রের উদ্ভব হয়েছে বহু পরবর্তীকালে—মাত্র উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে—য়ুরোপ খণ্ডে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের আবিষ্কারের পর। এই নবীন শাস্ত্রের প্রবর্তকদের অগ্রণী ছিলেন ইরাসমুস রাস্ক, ফ্রানৎস বপ ও য়াকব গ্রিম। দ্বিতীয় স্তরে সর্বাধিক বিখ্যাত নাম শ্লাইশর-এর। শাস্ত্রটির কর্মপ্রণালীকে সুদৃঢ় বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে উন্নীত করেন তৃতীয় স্তরের নব্যবৈয়াকরণ (Junggrammatiker) হের্মান অস্তফ, কার্ল ব্রুগ্‌মান ও হের্মান পাউল। তুলনাত্মক ঐতিহাসিক ভাষাশাস্ত্রে প্রায় বর্তমান কাল পর্যন্ত প্রধানত এঁদের উদ্ভাবিত প্রণালীই অনুসৃত হয়ে এসেছে। কিন্তু এই সমস্ত ভাষাতাত্ত্বিক পণ্ডিতগণ প্রাচীন ভারত-য়ুরোপীয় (Indo-European) ভাষা-গুলিরই চর্চা করেছিলেন, কোন আধুনিক ভারতীয় ভাষার নয়।

নব্য ভারতীয় আর্যভাষাগুলির তুলনাত্মক আলোচনার প্রবর্তন করেন বেঙ্গল সিবিল সার্বিসের অন্যতম আধিকারিক জন বীম্‌স্। ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি Outlines of Indian Philology নামে একটি পুস্তিকা রচনা করে এক নবযুগের সূচনা করেন। তাঁর সুবিশাল তিন খণ্ডে সম্পূর্ণ Comparative Grammar of the Aryan Languages of India গ্রন্থটির ১ম খণ্ড প্রকাশিত হয় মাত্র পাঁচ বছর বাদে, ২য় খণ্ডটি ১৮৭৫ ও শেষ খণ্ডটি ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে। উনবিংশ শতাব্দীর এক অদ্বিতীয় ভারতীয় মনীষী ও সমাজ-সংস্কারক রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকর তাঁর সুবিখ্যাত Wilson Philological Lectures প্রদান করেন ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে। ঠিক একশ' বছর আগে রচিত হলেও এই বক্তৃতামালার যথেষ্ট গুরুত্ব এখনো রয়েছে। বিশ বছর আগে সুনীতিকুমার তাঁর এক ভাষণে ভাণ্ডারকরের উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানিয়ে বলেন, যদিও তিনি কখনো ভাণ্ডারকরের সাক্ষাৎ লাভ করেননি তবু নিজেকে তাঁর ভাব-শিষ্য বা শিষ্যকল্প মনে করেন। 'বক্তৃতামালা'য় অনুসৃত প্রণালীর উপযোগিতার কথাও বিশেষভাবে উল্লেখ করেন। উনবিংশ শতকের শেষ পাদে প্রকাশিত অন্যান্য উল্লেখনীয় গ্রন্থ হল আর্নেস্ট্ ট্রুম্প্-এর Grammar of the Sindhi Language (১৮৭২), জন প্লাট্‌স্-এর Grammar of the Hindusthani or Urdu Language (১৮৭৪), জর্জ আব্রাহাম গ্রীয়র্সন-এর প্রবন্ধ On the Phonology of the Modern Indo-Aryan Vernaculars এবং সর্বোপরি এ. রুডল্‌ফ্ হ্যোর্নলে-র Comparative Grammar of the Gaudian Languages with a Special Reference to Eastern Hindi (১৮৮০)। গ্রীয়র্সন-এর সম্পাদিত ও আংশিক ভাবে লিখিত বিশ্ববিশ্রুত Linguistic Survey of India-র প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে।

নব্য ভারতীয় আর্য ভাষার ঐতিহাসিক আলোচনায় আধুনিক যুগের সূচনা করেন প্রখ্যাত ফরাসী ভাষাতাত্ত্বিক, সুনীতিকুমারের অন্যতম শিক্ষাগুরু জুল ব্লক, এই শতকের প্রথম দশকে।

নব্য বৈয়াকরণদের প্রণালী অনুসরণ করে তাঁর সুবিখ্যাত La Formation de la Langue Marathe রচিত হয় ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে, যদিও গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৯১৯ সালে। এল্. পি. তেস্‌সিতোরি-র মূল্যবান Notes on the Grammar of Old Western Rajasthani প্রকাশিত হয় Indian Antiquary পত্রিকার পৃষ্ঠায় ১৯১৪-১৬ সালে। প্রখ্যাতনামা রাল্‌ফ্ লিলি টার্নর

(পরে স্যার) আসরে নামেন ১৯১৬ সালে। বাংলা ভাষার গতিপ্রকৃতি ও অন্যান্য কিছু কিছু সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (পরে মহামহোপাধ্যায়), আচার্য যোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধি, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, বসন্তরঞ্জন রায় এবং স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। ভারতীয় ভাষাতত্ত্বের ক্ষেত্রে সুনীতিকুমারের শুভ আবির্ভাবের আগে আধুনিক ভারতীয় ভাষাতত্ত্বের এই হল মোটামুটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

৩

ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যে এম. এ. পরীক্ষার জন্য তরুণ সুনীতিকুমারের বিশেষ বিষয় ছিল প্রাচীন ও মধ্য ইংরেজী এবং জার্মানিক (গথিক) ভাষাতত্ত্ব। ভাষা-বিজ্ঞানের মূলতত্ত্বেও কিছু কিছু পাঠ গ্রহণ করেন ঐ সময়। তুলনাত্মক ভাষাতত্ত্বে প্রগত শিক্ষার উদ্দেশে বিদেশ গমনের আগেই ঐতিহাসিক ও তুলনামূলক বাংলা ব্যাকরণের কিছু চর্চা শুরু করেন এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জুবিলি গবেষণা পুরস্কার ও প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি লাভ করেন। এর কিছুকাল পরেই ১৯১৯ সালে এক সরকারী বৃত্তি পেয়ে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের নব-প্রতিষ্ঠিত স্কুল অব ওরিএণ্টাল স্টাডিজ (বর্তমান নাম স্কুল অব ওরিএণ্টাল এণ্ড আফ্রিকান স্টাডিজ)-এ গবেষক ছাত্ররূপে প্রবেশ করেন। প্রায় ৩ বছর ওখানে ভাষাতত্ত্বের বিভিন্ন বিষয়ে (ধ্বনি-বিজ্ঞান, ভারত-য়ুরোপীয় ও তুলনাত্মক ভাষাতত্ত্ব, সংস্কৃত, প্রাকৃত, প্রাচীন ইংরাজী, প্রাচীন আইরিশ, গ্রীক, লাতিন, প্রাচীন পারসী, ইত্যাদি) লাওনেল ডেবিড বার্নেট, এফ. ডব্ল্যু. টমাস, ডানিএল জোন্‌স্‌, স্যার ই. ডেনিসন রস, রবিন ফ্লাওআর, প্রমুখ মহারথীদের কাছে পাঠ গ্রহণ করে বাংলা ভাষার উদ্ভব ও ক্রম-বিকাশ নিয়ে গবেষণা-নিবন্ধের জন্য লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি. লিট্. উপাধি লাভ করেন। এর পর প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের আঁতোআন মেইএ, জুল ব্লক, জঁা পশি-লুস্কি, পল পেলিও প্রভৃতির কাছে ভারতীয় আর্য ভাষা, স্লাবিক, অস্ট্রো-এশিয়াটিক ও ভোট-চীনীয় ভাষাতত্ত্ব, প্রাচীন খোতানীয় ও সুগ্‌দ ভাষা ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষা লাভ করে দেশে ফিরে আসেন এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় ভাষাশাস্ত্র ও ধ্বনি-বিজ্ঞানের খয়রা অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন। এর পর থেকেই অব্যাহত গতিতে শুরু হয় ভাষাতত্ত্ব, সাহিত্য, শিল্প, সংস্কৃতি, পুরাতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব প্রভৃতি মানবিকী বিদ্যার নানা শাখায় তাঁর পঞ্চান্ন বৎসর ব্যাপী সুদীর্ঘ, একনিষ্ঠ সাধনা ও জয়যাত্রা।

৪

ভাষাচার্য সুনীতিকুমারের ভাষাতত্ত্ব ও আনুষঙ্গিক বিষয় নিয়ে লেখা বৈজ্ঞানিক রচনাবলীকে আমরা চারটি প্রধান শ্রেণীতে ভাগ করতে পারি : (১) আর্যভাষা

নিয়ে লেখা গ্রন্থ ও প্রবন্ধ, (২) আর্যেতর ভাষা সম্বন্ধে রচনাবলী, (৩) ভাষার পশ্চাৎপটে অবস্থিত ঘটনাবলীর গভীরতর বোধের জন্য জাতি-সংস্কৃতি-সাহিত্য নিয়ে ভাষাতত্ত্ব, পুরাতত্ত্ব ও নৃতত্ত্বের সমন্বয়ে লেখা গ্রন্থ ও প্রবন্ধ এবং (৪) ভারতের ভাষা ও লিপির সমস্যা সম্পর্কিত রচনাবলী। এখানে অবশ্যই মনে রাখতে হবে, প্রায়ই অনেক গ্রন্থে বা অন্যান্য রচনায় একই সঙ্গে ২।৩টি শ্রেণীর এক অচ্ছেদ্য যোগাযোগ রয়েছে, অর্থাৎ তাঁর লেখাগুলি কোন জলনিরোধ প্রকোষ্ঠে গণ্ডিবদ্ধ নয়। বিশুদ্ধ ভাষাতত্ত্ব-বিষয়ক লেখাগুলিকে আবার উচ্চারণ ও ধ্বনিবিজ্ঞান, রূপপ্রক্রিয়া (morphology), নিরুক্তি (etymology) প্রভৃতি উপশ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে। এক কথায় বলা যায়, ভারতীয় ভাষাবিজ্ঞানের প্রায় এমন কোন দিক নেই যা সুনীতিকুমারের আলোকসম্পাতে উজ্জ্বল না হয়েছে।

লণ্ডনে প্রগত অধ্যয়ন শেষ করার আগেই তিনি বাংলা ও অন্যান্য কয়েকটি ভারতীয় ভাষার উচ্চারণ ও ধ্বনিবিজ্ঞান বিষয়ে একটি প্রবন্ধ লেখেন। সর্বজনীন ধ্বনিমূলক লিপিমালায় (International Phonetic Alphabet বা I P A) বাংলার উচ্চারণ দেখিয়ে পাঠ্যাংশ সম্বলিত বিখ্যাত পুস্তিকা Bengali Phonetic Reader প্রকাশিত হয় ১৯২৮ সালে। অবশ্য এই বইটিতে সাধু কথ্য বাংলার ধ্বনিমগুলির তিনি যে তালিকা দিয়েছেন এখন তার কিছু পারবর্তন করা সম্ভব। তখন ধ্বনিমগুলিকে পরিচ্ছেদ্য (segmental) ও অধিপরিচ্ছেদ্য (suprasegmental) এই দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হত না বলে সুনীতিকুমার বাংলার প্রত্যেকটি আনুনাসিক স্বরধ্বনিমকে আলাদা করে তালিকাভুক্ত করেছেন। বর্তমান প্রণালীতে nasalization বা আনুনাসিকতাকে একটি ধ্বনিম স্বীকার করে নিলেই এই আলাদা তালিকার দরকার হয় না। পক্ষান্তরে তিনি মহাপ্রাণ ধ্বনিমগুলিকে একক ধ্বনিম (unit phoneme) না বলে দুটি ধ্বনিমের পাশাপাশি (sequence of 2 phonemes) বলে গণ্য করেছেন (অর্থাৎ, খ্ = ক্হ্ ; ঘ্ = গ্হ্ ইত্যাদি)। কিন্তু আজকাল ভারতীয় আর্যভাষার মহাপ্রাণ ধ্বনিমগুলিকে সাধারণত একক ধ্বনিম বলেই স্বীকার করা হয়।

কয়েকটি নব্যভারতীয় আর্যভাষায় এবং পূর্ববঙ্গের নানা উপভাষায় /হ/ এবং ঘোষবৎ মহাপ্রাণ ধ্বনিমগুলির (/ভ ধ ঝ ঢ ঘ/) উচ্চারণ নিয়ে সুনীতিকুমার বাংলায় ও ইংরাজীতে কয়েকটি মূল্যবান প্রবন্ধ লিখেছেন (Recursives in New Indo-Aryan, Glottal Spirants and the Glottal Stop in the Aspirates in New Indo-Aryan, মহাপ্রাণ বর্ণ)। পূর্ববঙ্গীয়

উপভাষাগুলিতে ঐ ধ্বনিমগুলির উচ্চারণ নিয়ে তখন থেকেই কিছু কিছু বিতর্কেরও সৃষ্টি হয়েছিল। নোয়াখালির ও চট্টগ্রামের উপভাষার আলোচনায় যথাক্রমে শ্রীগোপাল হালদার ও ডঃ কৃষ্ণপদ গোস্বামী সুনীতিকুমারের মত সমর্থন করেছিলেন। ডঃ পরমানন্দ বহুল এই মতের বিরোধিতা করেন। সম্প্রতি ৬/৭ বছর আগে ডঃ নোরিহিকো উচিদা তাঁর Der Bengali Dialekt von Chittagong বইটিতে দেখিয়েছেন যে চট্টগ্রামের উপভাষায় কোন অন্তঃস্ফোটক (implosive) বা কণ্ঠবিবরীয় স্পর্শ (glottal stop) নেই, বরঞ্চ তিনটি তান (Akzent, অর্থাৎ tone) রয়েছে। মাত্র কয়েক মাস আগে আমার অন্যতম ছাত্র ডঃ হুমায়ুন কবীর দেখিয়েছেন যে সন্দীপের উপভাষাতেও অন্তঃস্ফোটক ইত্যাদি নেই, দুটি তান রয়েছে। কিন্তু পূর্ববঙ্গের কোন কোন উপভাষায় অন্তঃস্ফোটক বা কণ্ঠবিবরীয় স্পর্শ ধ্বনিমের অস্তিত্ব অসম্ভব নয়। আচার্যদেব নিজে আমাকে বলেছিলেন পরলোকগত আচার্য হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী, সুরেন্দ্রনাথ সেন প্রমুখ ফরিদপুর-বরিশাল অঞ্চলের অনেকের উচ্চারণেই তিনি এ ধরনের ধ্বনি শুনতে পেয়েছেন। আমি নিজেও লক্ষ্য করেছি শ্রীহট্টের উপভাষায় শব্দের আদিস্থিত /হ/ ধ্বনিমের পরিবর্তে কণ্ঠবিবরীয় স্পর্শ ধ্বনিম [ʔ] উচ্চারিত হয়। এ বিষয়ে আরো আঞ্চলিক অনুসন্ধান দরকার মনে করি।

ভারতীয় আর্যভাষাগুলির ধ্বনিপরিবর্তনের যথাযথ ইতিহাস জানতে হলে বিভিন্ন সময়ে সংস্কৃতের উচ্চারণ-পদ্ধতি জানা খুবই দরকার। সেই উদ্দেশ্যে নানা ধরনের সাক্ষ্য-প্রমাণের উপর নির্ভর করে তিনটি মূল্যবান প্রবন্ধ লিখেছেন বিভিন্ন সময়ে। ঐতিহাসিক ভাষাতত্ত্বে ধ্বনিপরিবর্তনের বিভিন্ন স্তরগুলি পরিষ্কারভাবে দেখাবার জন্য ধ্বনিবিজ্ঞানের ও সর্বজনীন ধ্বনিমূলক লিপিমালার গুরুত্ব একাধিক লেখায় আলোচনা করেছেন।

সুনীতিকুমারের শ্রেষ্ঠ কীর্তি নিঃসন্দেহে তাঁর বিশ্ববিশ্রুত Origin and Development of the Bengali Language (ODBL)। ১৯২৬ খ্রীস্টাব্দে দুই খণ্ডে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এই গ্রন্থটি প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই দেশ-বিদেশে বিপুল সমাদর পায়, ভাষাশাস্ত্রের ক্ষেত্রে ভারতীয় মনীষা তার লুপ্ত গৌরব পুনরুদ্ধার করে। প্রত্যক্ষভাবেই এই বইটি থেকে অনুপ্রেরণা পেয়ে ও একে আদর্শ রেখে এবং অনেক ক্ষেত্রে সুনীতিকুমারের ব্যক্তিগত পরামর্শ ও উপদেশ লাভ করে বহু তরুণ গবেষক বিভিন্ন ভারতীয় আর্যভাষার ঐতিহাসিক ব্যাকরণ রচনা করেন। এ ধরনের বইগুলির মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য

হল টি. এন্. দবে-এর A study of the Gujrati Language in the 16th Century V. S., বাবুরাম সকসেনার The Evolution of Awadhi, বাণীকান্ত কাকতির Assamese, Its Formation and Development, সুমিত্র মঙ্গেশ কত্রে-র The Formation of Konkani, সুভদ্র ঝার The Evolution of the Maithili Language, উদয়নারায়ণ তিবারীর The Origin and Development of the Bhojpuri Language, পরেশচন্দ্র মজুমদারের A Historical Phonology of Oriya, হরিপ্রিয়া মিশ্রের Historical Oriya Morphology, ইত্যাদি।

ODBL প্রকাশিত হবার মাত্র দু বছর বাদে ঐতিহাসিক ভাষাশাস্ত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ নবীন প্রণালীর সূচনা হয়। প্রতিভাধর সুইস ভাষাবিজ্ঞানী ফের্দিনাঁ দ সোস্যুর এককালিক ও ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞান দুটির প্রণালীতে যে বিরোধ বা বিসংবাদ কল্পনা করেছিলেন তা পরিহারের জন্য Circle Linguistique de Prague বা প্রাগ ভাষাবিজ্ঞান চক্রের তিনজন ভাষাবিজ্ঞানী এক নতুন ধরনের দ্বিকালিক বা কালানুক্রমিক ধ্বনিতত্ত্ব (Diachronic Phonology) প্রবর্তন করেন। এঁদের মতে একই প্রণালী অবলম্বনে কালের অক্ষরেখায় আগু-পিছু যাতায়াত করে এককালিক ও দ্বিকালিক ধ্বনিতত্ত্বের আলোচনা করা যেতে পারে। যে-সমস্ত পরিবর্তন অর্থবহ হয়ে একটি ভাষিক পদ্ধতিতে (Linguistic System) পরিণত হয় দ্বিকালিক ধ্বনিতত্ত্বে কেবলমাত্র তাদেরই গ্রহণ করা হবে, অন্যগুলি নয়। স্বভাবতই সুনীতিকুমার তাঁর ODBL বইটিতে এই প্রণালী অবলম্বন করতে পারেননি। কিন্তু বইটির ধ্বনিতত্ত্ব অধ্যায়ে বাংলাভাষার বিভিন্ন স্তরে বা কালে ধ্বনিপরিবর্তনের এত খুঁটিনাটি আলোচনা তিনি করেছেন যে যে-কোন বুদ্ধিমান পাঠক সামান্য চেষ্টায়ই বিভিন্ন সময়ে বাংলা ভাষার ধ্বনিম-পদ্ধতি কি রকম ছিল তা অনুমান করে নিতে পারবেন। আধুনিকতম Transformational Generative Grammar বা রূপান্তরশীল সংজনক ব্যাকরণের প্রণালী অবলম্বনেও কেউ কেউ ধ্বনিপরিবর্তনের কিছু কিছু সমস্যা সমাধানে ব্রতী হয়েছেন। কিন্তু এখন অনেক আধুনিক তরুণ ভাষাবিজ্ঞানীরাও এই প্রণালীর উপযোগিতায় সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। সুনীতিকুমারও ODBL-এর নতুন মুদ্রণের ৩য় খণ্ডে এবং দুটি অভিভাষণে তাঁর বক্তব্য জানিয়েছেন। সে যা-ই হোক, বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে ভাষাশাস্ত্রেও অনেক নতুন প্রণালী নিশ্চয়ই উদ্ভাবিত হবে; কিন্তু প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা অর্থাৎ বৈদিক-লৌকিক সংস্কৃতভাষার আলোচনায়

বাক্কেরনাগেল ও দেব্রুনর-এর Altindische Grammatik-এর যে স্থান, শুধু বাংলার নয়, নব্য ভারতীয় আর্যভাষার আলোচনার জন্যও ODBL চিরকাল অনুরূপ আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকবে কোন সন্দেহ নেই।

ODBL-এর পর সুনীতিকুমারের যে বইগুলি বিশেষ জনপ্রিয় হয়েছে Indo-Aryan and Hindi Languages and Literatures of Modern India তাদের অন্যতম। প্রথমোক্ত বইটিতে ভারত-য়ুরোপীয়, ভারত-ইরানীয় এবং দ্রাবিড়-নিষাদ-কিরাত পটভূমিকায় প্রাচীন, মধ্য ও নব্য ভারতীয় আর্যভাষাগুলির ক্রমবিকাশের নাতিদীর্ঘ পরিচয় দিয়ে হিন্দী-উর্দু-হিন্দুস্থানীর উদ্ভব ও অন্যান্য সমস্যা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। বইটি জুল ব্লক-এর L' Indo-Aryen du Veda aux Temps Modernes বইটির পরিপূরক ও তার পাশাপাশি যথাযোগ্য সমাদর পেয়েছে। দ্বিতীয় বইটিতে নব্য ভারতীয় আর্য, দ্রাবিড়, নিষাদ (অষ্ট্রিক), কিরাত (চীন-ভোটীয় বা ভোট-ব্রহ্মীয়), বুরুশাস্কি প্রভৃতি ভাষার সংক্ষিপ্ত ও সর্বজনবোধ্য পরিচয় সহ ন'টি আধুনিক আর্য ভাষায় ও চারটি আধুনিক দ্রাবিড় ভাষায় রচিত সাহিত্যের তথ্যপূর্ণ মনোজ্ঞ বিবরণ দিয়েছেন। প্রত্যেকটি ভারতীয় ভাষায় বইটির অনুবাদ খুবই বাঞ্ছনীয়।

ভারতের সঙ্গে ভারতের বাইরের অন্যান্য কয়েকটি আর্য ও আর্যেতর জাতির প্রাগৈতিহাসিক বা প্রাচীন কাল থেকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত ভাষিক সাংস্কৃতিক সম্বন্ধ এবং জীবনদর্শনের মূল ঐক্য নিয়ে কয়েকটি পুস্তিকা ও প্রবন্ধ লিখেছেন। তাদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখনীয় হল India and China : Ancient Contacts, Hindus and Turks from Prehistoric Times, India and the Germanic World, India and the Arabic World, India and Ethiopia, Iranianism, Balts and Aryans, ইত্যাদি। (প্রসঙ্গত এখানে সুনীতিকুমারেরই যোগাযোগে ও অনুপ্রেরণায় পরলোকগত অধ্যাপক মাইল্‌স্ দিলন-এর Celts and Aryans বইটির কথাও বলা যেতে পারে।)

আফ্রিকার কয়েকটি উপজাতির জীবনযাত্রা, ধর্মবিশ্বাস, শিল্প-সংস্কৃতি নিয়ে লেখা Africanism : the African Personality বইটি 'অন্ধতমসাবৃত' মহাদেশের শাশ্বত আত্মা ও সংস্কৃতির প্রতি ভারতীয় মনীষার এক অপূর্ব শ্রদ্ধানিবেদন। সহজেই বইটি কবিগুরুর 'আফ্রিকা' কবিতাটির কথা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়।

দেশ-বিদেশের প্রাচীন সাহিত্য-সংস্কৃতি নিয়ে লেখা প্রবন্ধগুলি 'বৈদেশিকী',

'সাংস্কৃতিকী,' 'ভারত-সংস্কৃতি' প্রভৃতি গ্রন্থে অনেক আগেই সংকলিত হয়েছে। ইংরেজীতে লেখা A World Classic : The Arabian Nights, "The Word about Igor's Folk", Armenian Hero Legends and the Epic of David Susan, Veda-Samhita Baltica, Purana Apocrypha : A "Manipura-Purana", এবং এশিয়ার নানা অঞ্চলে, বিশেষ করে দক্ষিণ-পূর্ব ও মধ্য এশিয়ায়, সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য এবং ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রভাব সম্বন্ধে লেখা নানা প্রবন্ধের কথা স্মরণ করা যেতে পারে।

ভারত উপমহাদেশ একটি বিশাল ভাষা-ক্ষেত্র (linguistic area)। স্মরণাতীত প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকেই চারটি পরস্পর-সম্বন্ধহীন ভাষা-পরিবারের বিভিন্ন ভাষাভাষী মানবগোষ্ঠী এদেশে বসবাস করতে থাকে এবং কালক্রমে পরস্পরের নিকটবর্তী হয়ে একে অন্যকে প্রভাবিত করতে ও তাদের দ্বারা প্রভাবিত হতে থাকে। ODBL-এর ভূমিকাতেই সুনীতিকুমার ভারতীয় আর্য-ভাষাগুলির ক্রমবিকাশে এবং একই আদর্শে অনুপ্রাণিত, একই সংস্কৃতিতে সমৃদ্ধ এবং একই জীবনাদর্শে উদ্বুদ্ধ এক সুসংহত ভারতীয় মহাজাতির গড়নে প্রাগ্-আর্য-দ্রাবিড়-নিষাদ-কিরাত জাতিগুলির প্রভাবের কথা আলোচনা করেছিলেন। উদার মানবিক দৃষ্টিভঙ্গীর এবং কঠোর বৈজ্ঞানিক নিষ্ঠার সমন্বয়ে এই বিষয় নিয়ে পরবর্তীকালে তিনি এত পুস্তিকা ও প্রবন্ধ লিখেছেন যে মনে হয় এই সত্যটি প্রচার করা তিনি জীবনের এক সুমহান্ ব্রত বলে গ্রহণ করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে আমরা তাঁর আহমেদাবাদে অখিল ভারতীয় প্রাচ্যবিদ্যা সম্মেলনে প্রদত্ত সভাপতির ভাষণ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত কমলা বক্তৃতামালা (Indianism and the Indian Synthesis), The Vedic Age বইটির অধ্যায় Race-Movements and Prehistoric Culture, Religious and Cultural Integration of India, Hindu Culture and Greater India, India and Polynesia : Austric Bases of Indian Civilisation, The Foundations of Civilisation in India, The Study of Kol, বাংলায় ও ইংরাজীতে লেখা আরো কয়েকটি প্রবন্ধ এবং Kirata-jana-kriti, Dravidian, The Place of Assam in the History and Civilisation of India, The People, Language and Culture of Orissa প্রভৃতি পুস্তিকার কথা উল্লেখ করতে পারি।

দ্রাবিড় জাতি ও ভাষা সম্বন্ধে সুনীতিকুমার যতটা আলোচনা করেছেন একমাত্র

পরলোকগত সুধীভূষণ ভট্টাচার্য ছাড়া আর কোন আর্যাবর্তের বা উত্তর-ভারতের পণ্ডিত ততটা করেননি। নৃতাত্ত্বিক, পুরাতাত্ত্বিক ও দু-একটি ভাষাতাত্ত্বিক সাক্ষ্য থেকে তিনি আরো কয়েকজন পণ্ডিতের সঙ্গে একমত হয়ে বলেন, আদি দ্রাবিড়গণ খুব সম্ভব ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল থেকে ভারতে এসেছিলেন এবং তাঁরা এটিও-ক্রীটানদের সগোত্র। পরে তিনি অবশ্য বলেছেন, সমস্যাটির সমাধান এখনো হয়নি। সম্প্রতি প্রখ্যাত দ্রাবিড়তত্ত্ববিৎ কামিল জেলেবিল বলেছেন আদি দ্রাবিড়গণ আনুমানিক খ্রীস্টপূর্ব চার হাজার বছর আগে উত্তর-পূর্ব ইরানের পার্বত্য অঞ্চলে ছিল (তার আগে তারা কোথায় ছিল সে বিষয়ে তিনি নীরব) এবং খ্রীস্ট-পূর্ব সাড়ে তিন হাজার বছর আগে থেকে ভারত উপমহাদেশে প্রবেশ করতে থাকে। অন্যান্য কয়েকজন ভাষাতাত্ত্বিক মনে করেন আফ্রিকার কয়েকটি ভাষার সঙ্গে দ্রাবিড় ভাষার আনুবংশিক সম্বন্ধ (genetic relationship) থাকা খুবই সম্ভবপর। আফ্রিকা থেকে যে কিছু কিছু আদিমজাতি লক্ষাধিক বছরেরও আগেই ভারতের নানা অঞ্চলে এসেছিল, তার অনেক পুরাতাত্ত্বিক প্রমাণ এখন পাওয়া গেছে, কিন্তু তাদের সঙ্গে দ্রাবিড়দের কোন নিকট সম্বন্ধ না থাকাই সম্ভব।

সংস্কৃত ও অন্যান্য ভারতীয় আর্যভাষায় সুপ্রাচীন কাল থেকেই আর্যেতর ভাষার অসংখ্য শব্দের অস্তিত্ব রয়েছে এমন কি প্রাচীনতম ঋগ্‌বেদেও এ ধরনের কিছু কিছু শব্দ পাওয়া যায়। প্রাকৃত ভাষার বৈয়াকরণেরা এ ধরনের শব্দগুলিকে 'দেশী' নামে অভিহিত করেছেন। আধুনিক কালে উনবিংশ শতকে কিটেল ও গুণ্টর্ট এবং পরে সিলর্ভ্যা লেবি, প্‌শিলুস্কি, জুল ব্লক প্রভৃতি এ নিয়ে অনেক গবেষণা করেন। সুনীতিকুমারও এই একই বিষয়ে আলোচনা করে দেখিয়েছেন যে কপাল, কপোল, কানি (= কাপড়ের টুকরো, ছেঁড়া কাপড়), গঙ্গা, গণ্ডক, চাউল, চিড়িয়া, ছাঁচ (ছাঁচ-তলা) জংঘা, ঝাড, ঝোপ, পণ (=৮০), পিণাক, বাখারী, বাদুর, ভেক, মসার / মুসার, নারিকেল, শার্দূল সিন্দূর প্রভৃতি বহু শব্দ আর্যভাষায় আগন্তুক শব্দ। অঙ্গার, কবিন্, তণ্ডুল, পুষ্প, পূজা প্রভৃতি শব্দকেও তিনি আগন্তুক মনে করেছিলেন, কিন্তু এ বিষয়ে এখন ভিন্নমত পোষণ করা হয়। সংস্কৃত ভাষায় ইরানীয় এবং তুরস্ক শব্দ নিয়েও তিনি প্রবন্ধ লিখেছেন। ভারতীয় আর্যভাষায় আগন্তুক শব্দ নিয়ে এখনো অনেক গবেষণা চলছে। টি. বারো, কাইপার, প্রমোদ চন্দ্র ভট্টাচার্য, শ্রীরমণাচার্য, বর্তমান প্রবন্ধ-লেখক প্রভৃতি অনেকেই এ নিয়ে আলোচনা করছেন।

নানা ভাষার ও নানা লিপির সমস্যায় জর্জরিত আমাদের দেশ। দেশের প্রগতি

ও ঐক্যের পথে এ যে একটা প্রবল অন্তরায় কোন সন্দেহ নেই। সমস্যাটি প্রথম থেকেই সুনীতিকুমারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বৈজ্ঞানিকের নির্মোহ, নির্লিপ্ত মন নিয়ে তিনি তার সমাধানের চেষ্টাও করেন। সারা ভারতে একটিমাত্র লিপির জন্য তিনি রোমক লিপির আধারে ভারত-রোমক লিপির পরিকল্পনা দেন কয়েকটি প্রবন্ধে। ভাষার বেলায় তিনি সর্ব-ভারতীয় ক্ষেত্রে বিভিন্ন পরিবেশে বা উপলক্ষে তিনটি ভাষার উপযোগিতা স্বীকার করেন : সমাবর্তন, বিদেশে আমাদের রাষ্ট্রদূতের পরিচয়পত্র প্রদান প্রভৃতি আনুষ্ঠানিক ও কিছু কিছু রাজকীয় কাজে সংস্কৃত ; উচ্চ শিক্ষা (বিশেষ করে বিজ্ঞান, কারিগরি ইত্যাদি), বহির্জগতের সঙ্গে ভাবের আদান-প্রদান প্রভৃতির জন্য ইংরাজী এবং আমাদের দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের জনসাধারণের পারস্পরিক আটপৌরে কাজের জন্য সরল হিন্দী বা হিন্দুস্থানী। দীর্ঘকাল চিন্তা-ভাবনার পর তিনি যে-সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন তার একটি পরিণত রূপ পাই বোম্বেতে প্রদত্ত মহাত্মা গান্ধী স্মারক বক্তৃতামালায় যা India : a Polyglot Nation and its Linguistic Problems vis-a-vis National Integration নামে পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়েছে বছর তিনেক আগে। আমাদের দেশ-নায়ক ও রাজনীতিকগণ তাঁর সুচিন্তিত অভিমত গ্রহণ করলে দেশের একটা বিরাট ও জটিল সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান হবে বলে বিশ্বাস করি।

॥ ৫ ॥

ভাষাতত্ত্বের নানা বিষয়ে ভাষাচার্য সুনীতিকুমারের বিশদতর আলোচনার কয়েকটি মাত্র নিয়ে এই ক্ষুদ্রায়তন প্রবন্ধে দিগ্‌দর্শন করাতে চেষ্টিত হয়েছি। অনেক অসম্পূর্ণতা ও ত্রুটি রয়ে গেছে, সবগুলি নিয়ে আলোচনা করলেও তা থাকত-ই। ব্যক্তিসত্তা অংশের সমষ্টি থেকে অনেক বড় এবং আলাদা এক মহিমায় গৌরবান্বিত সেই বিরাট মহিমার ছবি আঁকতে পারিনি। একমাত্র ভরসা চিত্রটি আমার অযোগ্য হাতে অনুজ্জ্বল হলেও মলিন আশা করি হয়নি।

সুনীতিকুমার

মৈত্রেয়ী দেবী

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়কে আমি কবে থেকে দেখেছি মনে নেই—আমার পিতা এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এ দুজনের সঙ্গে গল্প করতে আমার মনে হয় আমি যেন জ্ঞানোন্মেষের সময় থেকেই দেখে আসছি। সে যুগের যে বিদ্বৎমণ্ডলী তার মধ্যে তিনি উৎসাহী তরুণ এবং দৃপ্ত। তাঁর কাছে পড়াশুনো করবার আমার সুযোগ হয় নি, কিন্তু কখনো কোনো সমস্যা উপস্থিত হলে আমি গিয়েছি এবং তিনি সময় দিয়েছেন। কিছু দিন আগে বঙ্গভবনে তাঁর সঙ্গে একসঙ্গে থাকবার সুযোগ হয়েছিল। খাবার টেবিলে প্রায়ই দেখা হচ্ছিল। তখন ভাষা নিয়ে চারিদিকে খুব আলোচনা চলছে। সর্বভারতীয় ভাষা হিন্দী হবে কি না, ইংরেজি থাকবে কি যাবে? আমার তখন মনে হচ্ছিল, অন্তত যদি সর্বভারতীয় একটি 'স্ক্রিপ্ট' হয় তাহলে আমাদের বিভিন্ন প্রদেশের রচনা পড়া ও মনের দিক থেকে কাছাকাছি আসার সুবিধা হয়। আমি তখন ইংরেজি থেকে বাংলা রোমান স্ক্রিপ্টে একটা ডিক্সনারী গ্রন্থনের সংকল্প করেছি। সুনীতিবাবু আর এক যুগের মানুষ হলেও অনেক বিষয়ে তিনি খুব সহজেই এক পা এগিয়ে যেতেন। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম—সর্বভারতীয় একটি লিপি হলে কেমন হয়? তিনি বললেন—উদ্ধারের ঐ একটিই উপায়। আমি জিজ্ঞাসা করলাম—যদি আমি বলি রোমান লিপি সর্বভারতীয় লিপি রূপে গৃহীত হোক, তাহলে কি হবে? উত্তর—তাহলে আপনার মাথায় লাঠি পড়বে—প্রাণরক্ষা মুস্কিল হবে। তবে শেষ পর্যন্ত তা হবে—অনেক জল ঘোলা করে তবে হবে। সহজে কেউ সংস্কার ছাড়বে না।

আমি বললাম—আমাকে অমুক বলেছেন, আমি কি রবীন্দ্রনাথের কবিতা রোমান লিপিতে দেখলে দুঃখিত হব না? আমার কিন্তু দুঃখ নেই। বরং সুখ এই যে আরো অনেকে পড়তে পারবে। এবং উত্তর-ভারতে সবাই মোটামুটি বুঝবে।

রবীন্দ্র রচনা রোমান লিপিতে দেখলে মূর্চ্ছা যাবে গণ্ডমূর্খরা, যারা বোঝে না যে লিপি আর ভাষা এক নয়।—এই বলে তিনি বঙ্গভবনের নারায়ণকে ভালো সন্দেশ আনার জন্য খুব তারিফ করতে লাগলেন। তারপর আমায় বললেন, চেষ্টা

করুন, সফল হবেন না। সুনীতিবাবুর এই একটি দোষ ছিল, তিনি আমার পিতৃ-বন্ধু, আমরা সর্ব বিষয়ে কত ছোট, কিন্তু কিছুতেই তাঁকে দিয়ে 'তুমি' বলাতে পারিনি। সর্বদা সকলকে সম্মান করে কথা বলতেন।

সুনীতি চট্টোপাধ্যায়ের তিরোধানে আমাদের পরিচিত জগতের অনেকখানি হারিয়ে গেল। তাঁর বয়স হয়েছিল—যথাসময়ে রোগভোগ না করে চলে গিয়েছেন, তবু তাঁর মতন মানুষ দেশে আর একজন নেই তাই এটা ক্ষতি এবং ক্ষতি মাত্রই বেদনাজনক।

সুনীতিকুমার ও ভারত-সংস্কৃতি

ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

যে বাংলা ভাষায় আমরা অতি সহজে আত্মপ্রকাশ করি, সাহিত্যচর্চা করি, সর্বকার্যে যাকে নিত্য ব্যবহার করি, তার উৎপত্তি, বিকাশ ও বৈচিত্র্য যে নৃতাত্ত্বিক গবেষণার মতোই একটি বস্তুগ্রাহ্য, বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক ব্যাপার, আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ ইংরেজী গ্রন্থটি প্রকাশের পূর্বে আমাদের ততটা জানা ছিল না। বিজয়চন্দ্র মজুমদার অবশ্য সুনীতিকুমারের পূর্বেই এ বিষয়ে কিছু গবেষণা ও আলোচনা করেছিলেন, তারাপোরওয়ালাও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষাতত্ত্বের উপর অধ্যাপনা করে তুলনাত্মক ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধে একটি সীমাবদ্ধ পরিমণ্ডল তৈরী করতে পেরেছিলেন। কিন্তু বাংলা ভাষার গবেষণাকে রীতিমতো বৈজ্ঞানিক ও যৌক্তিক পারম্পর্যের মধ্যে অবধারণ করে মানবিকী বিদ্যার একটি নতুন আলোচনার সূচনা সুনীতিকুমারই করেছিলেন। তার পর সারা ভারতে তাঁর আদর্শেই বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষায় ভাষাতত্ত্বগত আলোচনা শুরু হয়। পৃথিবীর যখন যেখানে ভাষাতত্ত্বগত আলোচনা হয়েছে, সেখানেই তিনি সসম্মানে আহূত হয়েছেন এবং শুধু বাংলা ভাষাই নয় ভারতীয় ভাষাবর্গের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। কিন্তু তাঁর প্রতিভা শুধু এই সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রেই সমাপ্ত হয়নি। ভাষার সঙ্গে সম্পৃক্ত নৃতত্ত্ব, জাতিমালা, সামাজিক ইতিহাস ও নৃতাত্ত্বিক সংস্কৃতির বিভিন্ন শাখা-উপশাখাকে তিনি নিজস্ব ভাষাসাধনার আলোকে আলোকিত করেছিলেন। যাকে 'ইণ্ডোলজি' বা ভারততত্ত্ববিদ্যা বলে, তিনি ছিলেন তার মূর্তিমান বিগ্রহ। তাই শুধু ভাষাতত্ত্বের মধ্যে নয়, সমগ্র ভারত-সংস্কৃতির পটভূমিকায় তাঁর প্রতিভা আলোচনার যোগ্য।

ভারত-সংস্কৃতি, তার সভ্যতা ও ঐতিহ্য মিশ্র ও জটিল। এক দিকে আর্য-সভ্যতা-পরিবাহী মার্জিত ঋকৃথ, আচার-অনুষ্ঠান, মননবিদ্যা, জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে একটি ঐক্যবোধ ও সমন্বয়তত্ত্ব; আর এক দিকে দ্রাবিড়ী আবেগ ও ভক্তি-ধর্ম, যার মূল বৈশিষ্ট্য হল পরমতত্ত্বের মানবিকী-করণ। এ দুটি ধারা গঙ্গা-যমুনার মতোই প্রায় পাশাপাশি বয়ে চলেছে, কখনো-বা একে অপরের সঙ্গে মিশেও গেছে। এ দু ধারার সমন্বয় ও সংমিশ্রণই হিন্দুধর্ম, যেটি এদেশে সেমীয় সভ্যতার অনু-

প্রবেশের পূর্বেই মৌল বোধরূপে ভারতের মনের মাটিতে শিকড় চালিয়েছিল এবং সেটি হাজার খ্রীষ্টাব্দের আগে থেকেই পূর্বভারতেও ক্রমে ক্রমে সম্প্রসারিত হয়েছিল। কিন্তু এরই সঙ্গে আরও একটি কথা বুঝে নেওয়া দরকার। সেটি উত্তরভারতীয় আর্য সংস্কার ও বিন্ধ্যোত্তর দক্ষিণী সংস্কারের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত ছিল না। এটি হল প্রাগ্‌বৈদিক ও প্রাগ্‌দ্রাবিড় যুগের বিশাল জীবনবোধ। তাকে সাধারণতঃ এক কথায় অনার্যসংস্কার বলা হয়। নৃতত্ত্বে এর নানা নামধাম, জীবনচর্যার বিচিত্র বৈশিষ্ট্যের কথা ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ভূমিজীবী ও শিকারজীবী এক ধরনের মানবিক সংস্কার বিচ্ছিন্নভাবে ভারতের মাটিতে দৃঢ়মূল হয়েছিল এমন এক পর্বে, যার কথা ইতিহাসও ভালো করে জানে না। অথচ তা সুবৃহৎ, সুগভীর ও জটিল। কিন্তু স্পষ্ট প্রমাণের অভাবে এই কিরাত নিষাদ ও শূদ্র সংস্কৃতির পুরো রূপটা ধরা প্রায় দুঃসাধ্য। তা কয়েক হাজার বছর ধরে ছড়িয়ে আছে ভারতের তাবৎ মানুষের শিরাধমনীর মধ্যে। পরবর্তী বৈদিক, বৌদ্ধ ও পৌরাণিক সংস্কৃতি এবং দৈনন্দিন আচার ও কৃত্যকে এই অরণ্যচারী পর্বতকান্তারবাসী জীবনধারা পরোক্ষভাবে স্পর্শ করেছিল। এই সমস্ত বিষমবাদী সুরকে সঙ্গতির মধ্যে উপস্থাপনা করে আমরা তার নাম দিই ভারত-সাধনা। সুনীতিকুমার সেই মিশ্র জীবনধারার স্বরূপ সন্ধান করেছিলেন ভাষাবিকাশে, নৃতত্ত্বে, শিল্পে ও সাধনায়। দীনেশচন্দ্র সেন মনময়নসিংহ-গীতিকা পূর্ববঙ্গ-গীতিকার ভূমিকায় এই ধরনের একটি মন্তব্য করেছিলেন যে, রামায়ণ-মহাভারত প্রভৃতি হচ্ছে উত্তর-ভারতীয় উচ্চকোটির ব্যাপার, তার সঙ্গে বাঙালী জনমানসের কোন যোগ নেই। তিনি সীতা সাবিত্রী দ্রৌপদী প্রভৃতি পৌরাণিক চরিত্রগুলিকে "ঘাঘরা-পরা বিদেশিনী" আখ্যা দিয়েছিলেন। তাঁর মতে বরং উক্ত গীতিগুলি রামায়ণ-মহাভারতের চেয়ে বাঙালীর জীবনে অধিকতর সত্য ও সার্থক। সেই প্রসঙ্গে সুনীতিকুমার নিজ আদর্শ ও মন্তব্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছিলেন যে, দীনেশচন্দ্রের উক্ত মত ও মন্তব্য কখনোই ইতিহাস-সম্মত নয়। উত্তর ভারতীয় সংস্কার এবং বাঙালীর নিজস্ব সংস্কার, যার অনেকটাই বৈদিক ও পৌরাণিক সংস্কার-বহির্ভূত, উভয়ের সংমিশ্রণেই বাঙালী-জীবনের বিকাশ হয়েছে। উত্তর-ভারতীয় সংস্কার বাঙালীর অর্জিত সংস্কার, এবং গ্রামীন সংস্কার তার নিজস্ব ভাব-ভাবনার ভিত্তি। তার উপর এক দিকে বৌদ্ধ তান্ত্রিক, শৈবনাথ যোগী, বৈষ্ণব সহজিয়া ও আউল-বাউল-সাঁইগুরুর নানা দেহতান্ত্রিক চর্যা (কায়াসাধনা), আর এক দিকে উত্তর-ভারতীয় পৌরাণিক আদর্শ ও নীতিবাদ, শীল-সদাচার এবং ভক্তিমূলক দর্শন-প্রস্থান ইত্যাদি প্রভাবগুলি মিশে যাওয়ার ফলে এ

জাতি একটি বিচিত্র ও মিশ্র ধরনের জীবনাদর্শ অবলম্বন করেছে। বাঙালীর নাগরিক সংস্কার ও পল্লীজীবন, তার স্মৃতিসংহিতা-শাসিত আচার-আচরণ ও নারী-সমাজে কেন্দ্রীভূত ব্রতকৃত্য, স্ত্রী-আচার, জনম-মরণের হাজারো খুঁটিনাটি ব্যাপার—এর মধ্য দিয়ে এ জাতির সত্তার উধর্বায়ণ হয়েছে। সুনীতিকুমার তাঁর বিবিধ প্রবন্ধের মধ্য দিয়ে সেই সুরটাই ধরবার চেষ্টা করেছেন। সুতরাং তাঁকে শুধু ভাষাচার্য বললেই সব কথা বলা হল না। ভারতীয় সংস্কৃতির মূল বৈশিষ্ট্যটি তিনি যথার্থ উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন এবং এদিক থেকেই তিনি আমাদের নমস্য।

কিছু স্মৃতি

সত্যজিৎ রায়

সুনীতিকুমার আমার পিতৃবন্ধু ছিলেন। মাণ্ডে ক্লাব বা মণ্ডা সম্মিলনের সভ্য-তালিকায় সুনীতিকুমারের নাম, এবং চিড়িয়াখানার বাগানে তোলা উক্ত ক্লাবের সভ্যদের একটি গ্রুপ ফোটোগ্রাফে সুনীতিকুমারের ছবি আমি শিশু-বয়স থেকে দেখে এসেছি। দুঃখের বিষয় সুনীতিকুমারের সঙ্গে আমার সামনাসামনি সাক্ষাৎ হয়েছে মাত্র তিনবার। প্রথমবার প্রায় চল্লিশ বছর আগে। কী উপলক্ষ্যে মনে নেই, তিনি আমার মাতুলালয়ে এসেছিলেন সান্ধ্যভোজনে নিমন্ত্রিত হয়ে। সেবার পাটনার বিচক্ষণ অধ্যাপক শ্রীরঙীন হালদারের সঙ্গে তাঁকে গুরুগম্ভীর বিষয়ে আলোচনা করতে দেখে আমার কিশোর মনে তাঁর পাণ্ডিত্য সম্পর্কে বিশেষ সম্ভ্রমের ভাব জেগেছিল।

দ্বিতীয়বার সাক্ষাৎ বছর পনের আগে। রাজভবনে তাঁর সঙ্গে আমার নিমন্ত্রিত হবার সৌভাগ্য হয়েছিল কোনো এক বিশেষ উপলক্ষ্যে। সেবার তাঁকে দেখে-ছিলাম গ্রীসের রাণীর সঙ্গে গ্রীক ভাষায় কথা বলতে, যদিও রাণী তাঁর কথা বুঝতে পারেননি, কারণ সুনীতিকুমার যে-ভাষা ব্যবহার করেছিলেন তা ছিল আরিস্ত-তলের আমলের ভাষা। এ-ভাষা একজন বাঙালী অধ্যাপকের মুখে শুনে গ্রীস-সম্রাজ্ঞীর বিস্ময়বিমুগ্ধ দৃষ্টি আমার এখনো মনে আছে।

তৃতীয় এবং শেষবার সুনীতিবাবুকে দেখি মাত্র এক বছর আগে। এবারে একটি বক্তৃতায় পাণ্ডিত্য ছাড়াও তাঁর চরিত্রের অনেকগুলো দিকের—বিশেষত তাঁর তীক্ষ্ণ রসবোধের—পরিচয় পেয়েছিলাম। আশ্চর্য এই যে, সাক্ষাতের দীর্ঘ ব্যবধান সত্ত্বেও এই তিন বারের প্রতি বারই তাঁকে দেখে তাঁর চেহারার সঙ্গে সেই ষাট বছর আগে তোলা ছবির চেহারায় কোনো পার্থক্য পাইনি।

যে মনীষী পুরাতত্ত্বের চর্চায় তাঁর সমস্ত জীবন উৎসর্গ করেছিলেন, তিনি নিজেকে শেষ বয়স পর্যন্ত কী ভাবে এত সতেজ ও নবীন রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন সেটা আমার কাছে একটা পরমাশ্চর্যের বিষয়।

সুনীতিকুমার ও শিল্পকলা

রথীন মৈত্র

১৯৭৭ সালের মে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় চলে গেলেন। পণ্ডিত সুনীতিকুমার, ভাষাবিদ্ সুনীতিকুমার, জাতীয় অধ্যাপক সুনীতিকুমারের এই মৃত্যু অবশ্য অকাল-প্রয়াণ নয়—পরিণত বয়সের স্বাভাবিক পরিণতি। কিন্তু তা সত্ত্বেও মাঝে মাঝেই মনে হয়, কত বিরাট এক ব্যক্তিত্ব, কী অসাধারণ এক প্রতিভার অবসান ঘটল! অসামান্য মেধা, অপরিসীম জ্ঞানস্পৃহা নিয়ে তিনি সুদীর্ঘকাল জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চা করে গেছেন—যে কথা সকলেরই জানা। কিন্তু আমার আজ মনে পড়ছে শিল্পী সুনীতিকুমারকে, শিল্পপ্রেমী সুনীতিকুমারকে।

আমি সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়কে প্রথম দেখি ১৯৩২-৩৩ সালে, সে আজ অনেককাল আগের কথা। আমি তখন গভর্নমেণ্ট আর্ট স্কুলের ছাত্র (এখন যার নাম গভর্নমেণ্ট আর্ট কলেজ)। শিল্পী মুকুল দে ছিলেন অধ্যক্ষ। সেই সময় সুনীতিবাবুকে মাঝে মাঝেই শিল্পশিক্ষায়তনে যেতে দেখতাম। একবার বাৎসরিক প্রদর্শনী দেখতে গেছেন, ছবি দেখছিলেন, হঠাৎ দেখি সুনীতিবাবু আমার ছবির সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন। আমি এত অভিভূত হয়ে গিয়েছিলাম যে বলেই ফেললাম, "এটা আমার ছবি।" আমার নাম, পরিচয় জানিয়ে প্রণাম করতে গেলাম, কিন্তু তিনি তাঁর স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে বাধা দিলেন। পরে জেনেছি, সুনীতি-কুমার চট্টোপাধ্যায় প্রণাম গ্রহণের বিরোধী ছিলেন। সুনীতিবাবু বললেন—"ছবিটি আমার ভালো লেগেছিল, তাই দাঁড়ালাম ভালো করে দেখার জন্য।" আরও বললেন—"বাঁ দিকটা light colour-এর করলে ভালো হত।" বিদগ্ধ পণ্ডিত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের এই অভিমত শুনে আমি অত্যন্ত বিস্মিত হলাম এবং এক কথায় কৃতার্থও হয়ে গেলাম। আমি তখন ওঁর বাড়িতে যাওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করলাম, উনিও সানন্দেই আমন্ত্রণ জানালেন। তারপর থেকে মাঝে মাঝেই আমি সুনীতিবাবুর বাড়ি গিয়েছি। আড্ডা-গল্পে কত সময় কেটে গেছে—প্রাণ খুলে হাসিঠাট্টা করতেন, বয়সের ব্যবধান জ্ঞানের ব্যবধান সত্ত্বেও। নানা বিষয়ে চলত আলাপ-আলোচনা—কোনো বাধা-নিষেধই তিনি মানতেন না। সেই আড্ডা-গল্পে ভাষা ও সাহিত্যের সঙ্গে সঙ্গে Art-এর একটা বিশেষ ভূমিকা ছিল।

ODBL-এর স্রষ্টা নীরস ভাষাতত্ত্বের আবরণেই নিজেকে আবদ্ধ করে রাখেননি। বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে তাঁর অগাধ জ্ঞান, অদম্য কৌতূহলই তাঁর শিল্পপ্রীতিরও অন্যতম কারণ। এত কাজে তিনি ব্যস্ত থাকতেন, কিন্তু তারই মধ্যে শিল্পীদের সঙ্গে গা-ঘেঁষাঘেঁষি করতে চাইতেন—এটা তাঁর শিল্পপ্রেমেরই পরিচয়। কলকাতার প্রধান প্রধান প্রতিটি exhibition-এ তিনি ছবি দেখতে আসতেন, আসতেন এমন সময় যখন দর্শকদের ভিড় কম থাকে। প্রত্যেকটা ছবি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে অনেকক্ষণ সময় নিয়ে দেখতেন। যে ছবি তাঁর ভালো লাগতো না সেটি সম্পর্কে মতামত জানাতে দ্বিধা করতেন না। বিভিন্ন শিল্পীদের সঙ্গে তাঁর খুবই যোগাযোগ ছিল। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ক্ষিতীন্দ্র মজুমদার, নন্দলাল বসুকে তিনি বিশেষ শ্রদ্ধা করতেন। বয়োকনিষ্ঠ শিল্পী গোপাল ঘোষ, সুনীল পাল, মুরারি দত্ত, সতীন লাহা, শম্ভু শীল, কমলারঞ্জন ঠাকুর প্রমুখের সঙ্গেও তাঁর বিশেষ হৃদ্যতাই ছিল।

১৯৫৩ সালে আমার আমেরিকা যাওয়া সব ঠিক, সুনীতিবাবু ডেকে পাঠালেন। দেখা করতে গেলে বললেন—আমেরিকায় শিল্পের নিদর্শন বিশেষ কিছু পাওয়া যায় না, কিন্তু বিভিন্ন মিউজিয়মে গিয়ে 'মায়া' এবং অ্যাজেটেক সভ্যতার নিদর্শন দেখতে যেন ভুল না হয়। বিশেষভাবে উল্লেখ করলেন মেক্সিকোর কথা। মেক্সিকোয় শিল্প-সচেনতা খুবই বেশি, যা অনেক দেশেই নেই। সুতরাং ওখানে গেলে সত্যিকার আনন্দ পাওয়া যায়। শিল্পধারা সামাজিক শিল্পবোধের সঙ্গে ঐতিহ্যের সঙ্গে synthesis করেছে—যার জন্য ওখানে একটা নিজস্ব শিল্পবোধ দাঁড়িয়ে গেছে।

সুনীতিবাবু সারা পৃথিবী ঘুরে বিভিন্ন দেশের ছোট ছোট শিল্পনিদর্শন নিজের ঘরে কী সুন্দর ভাবে সাজিয়েছেন। অতুলনীয় তাঁর সংগ্রহ। সংস্কৃতি সম্পর্কে তাঁর অসামান্য জ্ঞান Art-কে বোঝার পক্ষে বিশেষভাবে সহায়ক হয়েছিল, Art সম্পর্কে তাই এত ভালো ধারণাও গড়ে উঠেছিল।

ভারতীয় শিল্পের বিভিন্ন ধারা সম্বন্ধেও তিনি যথেষ্ট অবহিত ছিলেন। গান্ধার ও মথুরা স্কুলের পার্থক্য, দাক্ষিণাত্যের মন্দিরের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে তাঁর বিশেষ জ্ঞান ছিল। কোনারক এবং খাজুরাহোর মন্দিরশিল্প সম্পর্কে তুলনামূলক বিচারে কোনারকের মন্দিরকে "more sculpturous" বলেছেন। ভারতের শিল্পকলা যা অজন্তা-ইলোরাতে, দক্ষিণ ভারতে, ওড়িশায়, উত্তর ভারতে ছড়িয়ে আছে—সে সম্পর্কে তাঁর বিস্ময়ের অন্ত ছিল না। "একসঙ্গে এতগুলো ব্যাপার কিভাবে

হয়েছিল”—অন্য অনেক ভাবনার সঙ্গে এ প্রশ্নও তাঁর মনে আসত। এত বিরাট সৃষ্টি কিভাবে ভারতবর্ষে সম্ভব হয়েছিল তার রহস্য তিনি বুঝতে চাইতেন।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পূর্ব এশিয়া পরিভ্রমণের সময় বরবুদরে, যবদ্বীপে যে শিল্প-সম্ভার দেখেছেন তার বিস্তৃত বিবরণ তিনি লিপিবদ্ধ করেছিলেন—যা সে সময়কার 'প্রবাসী'তে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। আধুনিক ভারতের শিল্পকলা সম্পর্কে স্থাপত্য এবং ভাস্কর্য সম্পর্কে তিনি ছায়াচিত্র সহযোগে বিভিন্ন জায়গায় বক্তৃতাও দিয়েছিলেন। ভারতের বাইরে তিনি যখন যেখানে গেছেন সর্বত্রই মিউজিয়ামে, curio বা সংগ্রহশালায়, Arts and crafts স্কুলে হাজির হয়েছেন সেই দেশের সংস্কৃতি এবং শিল্প সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভের উদ্দেশ্যেই, ভারতের শিল্পের সঙ্গে ওই দেশের শিল্পের তুলনামূলক বিচারও করেছেন। মালয়ে ইন্দোচীনে ভারতের প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। এখানে ভারতীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে নিজস্ব শিল্পবোধের সংমিশ্রণে এক নতুন শিল্পরীতির উদ্ভব দেখে তিনি মুগ্ধ না হয়ে পারেন নি। অন্ধ অনুকরণ নয়, জাতীয় শিল্পরীতির বিকাশ—কথাটা এভাবেও বলা যেতে পারে। প্রাম্বানান শৈব-মন্দিরে প্রস্তর-খোদিত রামায়ণী চিত্রাবলী দেখে সুনীতিবাবু আশ্চর্য হয়েছিলেন এবং এ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনাও করেছেন। অতীত ভারতের ধর্ম যে কত মহান ও জীবন্ত ছিল চোখের সামনে তার পরিচয় মূর্ত দেখে তিনি যেমন গৌরব বোধ করেছিলেন, তেমনই আধুনিক ভারতের দৈন্যদশা তাঁর মনে জাগিয়ে তুলেছিল অপার বেদনা।

জন্মভূমির প্রতি টান, দেশের শিল্প-সংস্কৃতির প্রতি অনুরাগ উনবিংশ শতকের বৈশিষ্ট্য—তার রেশ বিংশ শতাব্দীতেও এসেছিল কিছু পরিমাণে। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় সেই দেশপ্রেমের উন্মাদনার মধ্যেই লালিত হয়েছিলেন, জাতীয়তা-বোধের আদর্শেই চরিত্র গঠন করেছিলেন। ভারতের যে সমস্ত ধনী ব্যক্তির নিজের দেশের শিল্পসম্পদ সম্বন্ধে অজ্ঞতা অপরিসীম, বিদেশী জিনিসের প্রতি অনুরাগ অন্তহীন—তাদের প্রতি তাঁর অসন্তোষ এবং ঘৃণাও ছিল অতুলনীয়। জাতীয়তা-বোধ যতই প্রবল হোক সুনীতিকুমার আন্তর্জাতীয়তাবোধের পরিপন্থী ছিলেন না। মালয়ে যখন বেড়িয়েছেন তখন ভাষা এবং সাহিত্যচর্চার মধ্য দিয়ে বিপর্যস্ত জাতীয় সংস্কৃতিকে সুদৃঢ় করার জন্য ওখানকার স্থানীয় শিক্ষিত ব্যক্তিদের মালয়-সাহিত্য-পরিষৎ গঠনের পরামর্শ দিয়েছিলেন। “A federation of all cultures—সব জাতির সংস্কৃতি মিলে একটি বিরাট সভ্যতা-সংঘ”, সেখানে সকল জাতিরই স্থান থাকা উচিত—এই ছিল তাঁর বিশ্বাস।

শিল্পীদের সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গতাও ছিল যথেষ্ট। নন্দলালের সঙ্গে তিনি অনেকদিন কাটিয়েছেন। নন্দলাল বসুর ছবির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কেও তাঁর অভিমত ছিল খুব স্পষ্ট। নন্দলাল বাংলাদেশে শিবের conception-কে সম্পূর্ণ বদলে দিয়েছেন। শিবের Traditional figure ছিল স্থূলাকৃতি। নন্দলাল এই বস্তাপচা ধারণাটি বর্জন করে শিবকে দিলেন নতুন রূপ, নতুন শিল্পশ্রী। যাত্রা-দলের ভিখারী শিবের কল্পনায় যে রুচিহীনতার পরিচয় পাওয়া যেত তাকে নন্দলাল বসু গ্রহণ করেন নি। নন্দলালের ছবিতেই শিবের মহিমান্বিত রূপটি প্রথম উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। রুচির এই সূক্ষ্মতা তাঁরই সৃষ্টি। নন্দলাল বসুর ছবি সম্পর্কে এই ছিল সুনীতিবাবুর নিজস্ব ধারণা।

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পর্কেও তিনি গভীর শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। অবনীন্দ্রনাথের ছবি তিনি magnifying glass নিয়ে দেখতেন, বিভিন্ন দিক থেকে। ভারতের শিল্পে অবনীন্দ্রনাথ যে নবজাগরণ আনার চেষ্টা করেছিলেন—তারই জন্য সুনীতি-কুমার চট্টোপাধ্যায়ের শ্রদ্ধাও ছিল অপরিসীম।

রবীন্দ্রনাথের ছবি সম্পর্কে সুনীতিবাবুকে প্রশ্ন করলে তিনি কতকগুলি ছবির প্রশংসাই করেছেন।

শিল্পে আধুনিকতার বাড়াবাড়িকে তিনি বিশেষ মেনে নিতে পারেন নি। শিল্প সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব কিছু ধ্যান-ধারণা ছিল। তিনি মনে করতেন শিল্পকে Communicative হতে হবে, তার মধ্যে ঐতিহ্যের ছাপ থাকবে। শিল্প দেশ-কালবিচ্ছিন্ন হতে পারে না। সমকালীন শিল্পের ধারা সম্পর্কে অবশ্য তিনি বিশেষ প্রসন্ন ছিলেন না। Abstract Art বিমূর্ত শিল্প—তিনি পছন্দ করতেন না। আধুনিক ছবিতে sex-এর আতিশয্যও তাঁর কাছে রুচিবিগর্হিত ছিল। সুনীতি-বাবু মনে করতেন ছবিতে গোটা মানুষ থাকবে। বর্তমান যুগের ছবিতে মানুষ উঠে যাচ্ছে—এ তাঁর ভালো লাগত না। অনেক সময়েই তাঁর সঙ্গে অনেক শিল্পীর তর্ক হয়েছে—এটা space-এর যুগ, পৃথিবী এখন এইটুকু হয়ে গেছে; সমকালীন যুগ-বৈশিষ্ট্যকে এই পরিপ্রেক্ষিতে বুঝতে হবে; আর যুগের বৈশিষ্ট্য শুধু ভারতের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না। এসব কথার উত্তরে তিনি বলতেন—"থামো তো হে, space-এর যুগ। সাজপোশাকে নিগ্রো এবং ভারতীয়ের পার্থক্য ঠিকই বোঝা যায়।" তাঁর কথা বলার ধরন ছিল অত্যন্ত সরস। হিউমারের মধ্যে দিয়ে অনেক সীরিয়াস কথা বলে যেতেন অনায়াসে।

'ক্যালকাটা গ্রুপ' যখন Art-এর ক্ষেত্রে পশ্চিমী রীতিনীতিকে গ্রহণ করতে চাইছিল, ছবিকে চাইছিল আধুনিক করতে—তখন 'রূপযানী' নামে একটি গোষ্ঠীর সৃষ্টি। 'রূপযানী'র সঙ্গে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের বিশেষ যোগাযোগ ছিল। সুনীল পাল ছাত্রাবস্থায় নেপালে গিয়েছিলেন কাজ করার জন্যে, আর সুনীতিবাবু ১৯৪৪-এ State-guest হয়ে নেপাল যান। সুনীল পাল সুনীতিবাবুর সঙ্গে দেখা করেন। নানা আলাপ-আলোচনার পর সুনীল পাল শিল্পীদের একটি সংগঠনের পরিকল্পনা সুনীতিবাবুর কাছে প্রকাশ করেন। ১৯৪৬-এ সুনীল পাল কলকাতায় ফিরে এসে উত্তর কলকাতার শিল্পীদের নিয়ে 'রূপযানী' সৃষ্টি করলেন। 'রূপযানী' নামটি দিলেন হারীতকৃষ্ণ দেব। এই গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত শিল্পীরা সকলেই অবনীন্দ্রনাথের অনুসারী। এই সংগঠনের সভাপতি ছিলেন সুনীতিবাবু। এই সংগঠনটি সৃষ্টির মূলে তাঁর প্রেরণা, পরিচালনায়ও তাঁর অবদানই সর্বাধিক। মুরারী দত্ত, সতীন লাহা, শম্ভু শীল, কমলারঞ্জন ঠাকুর, সমর ঘোষ—এঁরা 'রূপযানী'র সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ৪২, জয় মিত্র স্ট্রীটে সুনীল পালের বাড়িতে সকলে মিলিত হয়ে আলাপ-আলোচনা করতেন। সুনীতিবাবু সেখানে নিয়মিত যেতেন। সংগঠনের মূলে জাতীয়তাবোধই বিশেষভাবে সক্রিয় ছিল। নিছক নান্দনিক দৃষ্টি থেকে কখনোই তিনি শিল্পকে বিচার করতে চাইতেন না। শিল্প, সাহিত্য—সংস্কৃতির সর্বক্ষেত্রে সে সময় জাতীয়তাবোধ তরঙ্গে তরঙ্গে ছড়িয়ে পড়েছিল। 'রূপযানী' তারই অভিব্যক্তি।

আর্ট কলেজের সঙ্গেও বিশেষ যোগাযোগ ছিল তাঁর। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি কার্যকরী সমিতির সদস্য ছিলেন। Academy of Fine Arts-এরও তিনি ছিলেন সহ-সভাপতি। "আত্মসংস্কৃতির্বাব শিল্পাণি"—Academy of Fine Arts-এ এই বাণী লিপিবদ্ধ করার পরিকল্পনাও সুনীতিবাবুরই। আত্মসংস্কৃতিই শিল্প—উপনিষদের এই বাণীটি তিনি মহামূল্যবান বলেই মনে করেছিলেন : একটা জাতিকে বিচার করতেন পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে—তবে সাজপোশাক, আচার-আচরণ, নাচগানের মধ্যে দিয়ে। সংস্কৃতিকে তিনি ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করেছিলেন। শিল্পের বিচারে তাই কিছুই তাঁর কাছে পরিত্যাজ্য ছিল না।

শিল্পবিচার এবং শিল্পকলা আলোচনার মধ্যে অবশ্যই সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর শিল্পপ্রীতি সীমাবদ্ধ রাখেন নি।—শিল্পী হিসেবেও তাঁর বিশেষ একটি পরিচয়

ছিল যা হয়তো আজও অনেকে জানেন না। সুনীতিবাবু অবসর সময়ে ছবি আঁকতেন—বিশেষত বিভিন্ন ধরনের স্কেচ তিনি করেছেন। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় আর নেই। আজ প্রকৃত নিষ্ঠা ও সক্ষমতায় সেই বহুমুখী প্রতিভার সবিশেষ মূল্যায়ন প্রয়োজন এবং সেই কারণেই তাঁর শিল্প সম্পর্কে ধ্যানধারণাও নতুনভাবে আলোচনা করতে হবে।

অনুলিখন : সুলেখা মল্লিক

মাস্টার মশাই ঃ সু কু চ

শওকত ওসমান

বহুকাল পূর্বে মাস্টার মশাই আমাকে একটি বই উপহার দিয়েছিলেন।

দাতার নাম পুরো নয়, আদ্যক্ষরে লেখা : সু কু চ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের বদলে তিনটি সংস্কৃত শব্দ, বাংলায় যার নির্গলিত অর্থ : ভাল এবং মন্দও।

এমন আত্মপরিহাস সকলের পক্ষে সম্ভব নয়। আত্ম-সচেতনতার ফলশ্রুতি আত্মপরিহাস। এমন চৈতন্যের অধিকারীগণ আপন ব্রত-মাহাত্ম্য সম্পর্কে নিঃ-সংশয়, নির্দ্বিধা। ইতিহাসের স্পন্দন-অস্থির হাত তাদের মনিবন্ধেই রাখী বেঁধে দিয়ে যায়।

কৈশোরে ১৯০৫ সনের স্বদেশী আন্দোলন এবং পরবর্তী দশকে বিস্তার-বিহ্বল জাতীয়তাবাদের আগমনী মাষ্টার মশাই আপন ধমনীতে অনুভব করেছিলেন বৈকি। তাই তাঁর নিকট মাতৃভাষা আর শুধু ভাষামাত্র থাকেনি, বরং জীবনকে দিগ্বিদিকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে দেওয়ার বাহন হয়ে দাঁড়ায়। অগ্নিগিরি বিদার-ব্যাকুল।

আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রকৃষ্টতম হাতিয়ার ভাষার প্রয়োজন তখন সর্বাধিক। কারণ, সংহতির উত্তমতম সড়ক-নির্মাতা আবেগের সমীকরণ। ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির ফারাক ঘুচানোর কাজে প্রতীক এবং ভাষা অপরিহার্য। সংঘের শবণ এবং ভাষার শরণ— একই মন্ত্রের ভিন্ন উচ্চারণ মাত্র।

তেমনই সংঘের শ্রমণ শ্রী সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় সাদর-সম্বোধনে যিনি ছিলেন আমার কাছে হামেহাল : মাস্টার মশাই। বৈদগ্ধ্যের তীর্থে তিনি অবতীর্ণ হন ইতিহাসের পথ ধরে। ইতিহাস-বোধ ছিল যেন তাঁর সহযোগী। হয়ত সব সময় বৈজ্ঞানিক ধারায় নয়, বরং আভ্যন্তরীণ প্রেরণায়। ভাষার প্রতি প্রেম দেশ-প্রেমেরই দীপ্তিচ্ছটা। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে ভাষাচার্য উপাধি দিয়েছিলেন। আচার্য প্রকৃত পক্ষে ঐতিহাসিক উন্মাদনার ধারক ও বাহক।

নিজ শিক্ষকের সংরাগ-লীলা দর্শনের বহু সুযোগ বর্তমান স্মৃতি-পাঠকের বহুবার ঘটেছিল।

অতীতের গুহা-অন্ধকার থেকে দু-একটি মাত্র আবিষ্কার।

জন-মুনিশ বহুপরিচিত শব্দ। জন মানে এখানে মজুর। তবে কি মুনিশ শব্দ লেজুড়? মাস্টার মশাইকে যখন বললুম, আরবীতে মুনিশ শব্দ আছে। তার অর্থ :

আরামদাতা। তখন ভাষাতত্ত্ববিদের চোখের ঝিলিক দর্শনীয় একটা কিছু। সঙ্গে সঙ্গে তিনি উচ্চারণ করলেন, আঃ, মজার ব্যাপার, সমাজের চেহারাও খুলে গেল। দাসেরা আরামদাতা বৈকি। অর্থাৎ শব্দটি দাস-সমাজ উদ্ভুত।

নিরীক্ষা সঠিক। আদর্শ কেতাবেই লিপিবদ্ধ থাকে। আর্বী-ফার্সি-ভাষাবাহী মধ্যপ্রাচ্যের অধিকাংশ দেশে দাসপ্রথা পনের বছর পূর্বেও চালু ছিল। হঠাৎ তেলের আধুনিক উৎপাদন ওই বর্বর প্রথা উচ্ছেদে ঢের বেশী সহায়ক হয়েছে, ধর্মের দোহাই যেখানে পাত্তা পায়নি।

স্মৃতিপট থেকে আরো একটি উদ্ধার।

ঢাকা শহরের অন্যতম প্রসিদ্ধ এলাকা "উয়ারি"। ফুটবলের জন্যেও একদা যুক্তবঙ্গে উক্ত নামধারী ক্লাবের খ্যাতি ছিল। সংস্কৃত উপকারিকা শব্দের অর্থ: তাঁবু। প্রাকৃতে পরিবর্তিত রূপ উআরিয়া। পরবর্তী কালে নানা রূপভেদে উয়ারি। ইতিহাসের সমর্থনও পাওয়া যায়। মোগল-পাঠান আমলে এখানে সেনানী-শিবির ছিল। ঢাকায় আজও আছে এক এলাকার নাম পীল্‌খানা। ফরাসী পিল্‌হ অর্থ হাতী। আধুনিক কালে ইংরেজরা নতুন নাম দেয় এলিফ্যাণ্ট রোড। সেনা-নিবাসের প্রমাণ এসব থেকেও পাওয়া যায়।

এমন ছোটখাট আবিষ্কারে মাস্টার মশাইয়ের উত্তেজনা কিন্তু কম ছিল না। স্মিত হাসির বিচ্ছুরণ সারা মুখাবয়বে, যুগপৎ অঙ্গ দোহার। কবিগুরুর ভাষাচার্য অপেক্ষা তাঁর জন্যে ভাষোন্মাদ উপাধি ঢের বেশী সংগতি-মুখর।

মাতৃভাষার ক্ষেত্রে মাস্টার মশাই ছিলেন গুণান্বিত কান্তলৌহ অর্থাৎ বিশেষ চুম্বক। প্রায় চল্লিশ বছর পূর্বে তাঁরই আকর্ষণে বর্তমান স্মৃতিধর ভাষার এমন সব খেলায় কম আসক্ত ছিল না। তখনও সেমান্‌টিস্ট বা শব্দার্থবিজ্ঞানীদের বাজার এদেশে অতি মন্দা। কার্নাপ, আইয়ার প্রমুখ লজিক্যাল পজিটিভিস্টরা তখনও বহু দূরে। ভাষাপ্রসূত ফল অপেক্ষা ফল-তৈরীর প্রক্রিয়া সম্পর্কে উৎসাহীজনের সংখ্যা বেশী। লিংগুইস্টিক ফিলজফির প্রতি মাস্টার মশাইয়ের আগ্রহ-অনাগ্রহ দেখার সুযোগ আমার ঘটেনি। কারণ, দ্বিখণ্ডিত দেশ। সম্পর্কও ঝাপসা আবহে পরিণত।

কালের ব্যবধান বিস্তর। তবু অতীত-ক্যান্‌ভাসের উজ্জ্বলতা সময় সাঁত্‌রেই জানান দিয়ে যায়।

বাঙলার প্রান্তরের মতই উদার এই মাস্টার মশাই। ছিয়াশি বছর বয়সে তিনি এদেশে সমন্বয়-সমৃদ্ধ মানবতার বাদ্‌শাজাদা দারা শিকোর শতবার্ষিকীতে সভাপতিত্ব করেন। নেপথ্যে তিনি ছিলেন আসল উৎসাহদাতা। তাঁর সহযোগী ছিলেন আর

এক উদারচেতা সমাজসেবী রবিউদ্দীন আহমদ। সভাপতি ও সহযোগীর বয়সের ব্যবধান ছত্রিশ বছর। কিন্তু একাত্মতা সমান। যাঁরা কালের প্রবাহ-প্রত্যয় হয়ে যান, কালের তোয়াক্কা তাঁদের থাকে না।

একবার মাত্র অল্প কয়েক দিনের জন্যে মাস্টার মশাইকে যোগাসনচ্যুত দেখেছিলাম। তা নেহায়েৎ চিন্তানায়কের প্রতিক্রিয়া।

১৯৩৯-৪০ খ্রীষ্টিয় সন। ভারতীয় মুসলিম লীগ তখন আর ১৯০৬ সনের প্রতিষ্ঠাকালীন হর্স রেসিং ক্লাবের মত মুসলমান অভিজাতদের জমায়েৎ হওয়ার আখ্ড়া নয়। বরং দ্রুত মুসলিম জন-মনে অনুপ্রবিষ্ট। সাম্প্রদায়িকতার নিগেটিভ আদর্শ-সম্বল মুসলিম লীগের হুলো উক্ত সমাজের চতুর্দিকে—এমন-কি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে ন্যাল্‌নেলে গতরে গড়ে উঠছিল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোগ্রাম "শ্রী ও পদ্ম"। রাজনৈতিক মতলবহাসিল কৌশল-অনুযায়ী তা হঠাৎ মুসলিম সম্প্রদায়ের ধর্মীয় চেতনায় কাঁটা হয়ে দেখা দিল। জোর দাবী উঠল মুসলিমলীগ-ভাবাপন্ন ছাত্রদের তরফ থেকে: শ্রীপদ্ম হঠাও। মুসলিম লীগেব মুখপত্র সব পত্র-পত্রিকায় তার চীৎকার সমান ধ্বনিত। এমন আবহাওয়ায় একদিন মাস্টার মশাইয়ের রুষ্ট কণ্ঠ শোনা গেল, "‥ এসব হচ্ছে কী? প্রতীক ছাড়া কোন ধর্ম বা রাষ্ট্র চলে? ওদের নিশানে চাঁদ, তারা প্রতীক নয়? রাজনীতির নামে এসব কী হচ্ছে?" কয়েক দিন মাত্র এই ব্যাপারে মাস্টার মশাইকে বিচলিত দেখেছিলাম।

ইতিহাস রায় দিয়ে গেল আরো বত্রিশ বছর পরে, ১৯৭২ সনে। মাস্টার মশাই সেই রায়ের যুগপৎ দর্শক এবং শ্রোতা। তিনি দেখলেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের নেতৃত্বে অর্জিত স্বাধীন প্রজাতন্ত্রী বাঙলাদেশ সরকারের মনোগ্রাম হ'ল শাপলা ফুল। পদ্মেরই গোত্রজ আত্মীয়।

মূর্খ, মূঢ় জন—যারা ইতিহাসকে আশু স্বার্থোদ্ধারের গোলাম ঠাওরায়, তাদের জন্যে কালের এই নির্মম ব্যঙ্গ-শ্লেষমিশ্রিত শক প্রয়োজন ছিল। তবে অন্ধতা ক্ষয় পেতেও দেরী হয়, সময় লাগে। তাই কালের পর্দায় আবার মূর্খতার পুনরাবৃত্তি এবং মূঢ়জনের অভ্যুদয় ঘটে।

গুরু হিসেবে মাস্টার মশাই ছিলেন শুধু অন্তরঙ্গ নন—বরং অনন্তরঙ্গ। ক্লাসে ভাষাতত্ত্বের রাশি রাশি নুড়ির মধ্যে তিনি তরলতার জায়গা করে দিতেন অতি সহজে, যেন ঝর্ণার ঝিরিঝিরি জলপ্রবাহ। স্বরাঘাত বা এ্যাক্‌সেণ্ট ভাষার আদল কী রকম ওলটপালট করে ছাড়ে তার উদাহরণ দিতেন। মেমসাহেব কীভাবে বিয়ারাকে ডাকে? বি—আ—রা। মাস্টার মশাইয়ের কণ্ঠস্বর তখন নারীসুলভ।

আবার পরক্ষণেই বাঙালী কণ্ঠস্বরে তিনি ভৃত্যের আহ্বায়ক। আরো একটি জ্যান্ত উদাহরণ একবার তিনি দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ জাপানে অতিথি। এক মণীষী ইংরেজী ভাষায় অভ্যর্থনা-নামা পড়লেন তাঁর সম্মাননায়। জবাব দিতে দাঁড়িয়ে কবিগুরু বললেন যে মহান দেশের ভাষা তিনি বোঝেন না। পেছনে উপবিষ্ট ভাষাচার্য রবীন্দ্রনাথের জেব্বার খুঁটে টান দিয়ে সতর্কতা ছাড়েন, "গুরুদেব, ভাষা ইংরেজী—ইংরেজী।" ভদ্রলোক জাপানী এ্যাক্সেন্টে পড়েছিলেন ইংরেজী। প্রত্যুৎপন্নমতি রবীন্দ্রনাথ সঙ্গে সঙ্গে ভুল শুধরে নেন। ঘটনা সামান্য। কিন্তু মাস্টার মশাইয়ের বর্ণনাভঙ্গীর চোটে ক্লাসরুম হাস্যরোলে ফেটে পড়ত।

উপভাষা বা আঞ্চলিক ভাষার দাপট সম্পর্কে তাঁর এক কাহিনী এখনও স্মৃতিপটে সজীব। লণ্ডনবাসী বিশিষ্ট ভাষাতত্ত্ববিদ এক শিক্ষক ছাত্রদের সঠিক উচ্চারণ শেখাচ্ছিলেন। আপাততঃ তিনি 'জল' বা water নিয়ে ব্যস্ত। কক্‌নী বুলিতে 'ওয়াটার' উচ্চারিত হয় 'উ-আ-আ-র' জাতীয় উচ্চারণে। তার অর্ধেক আবার বক্তার ঠোঁটে, বাকা গলায়। 'টি' অক্ষর গায়েব থাকে। ছাত্রেরা 'ওয়াটার, ওয়াটার' রবে ঝগড়া দশ মিনিট কসরৎ চালায়। সঠিক উচ্চারণ। ছাত্রদের সাফল্যে আনন্দিত চীৎকারে হেঁকে উঠলেন, 'দ্যাট্‌স, বে-আ-আ-র'। ইংরেজি 'বেটার' শব্দ কক্‌নী-বুলিতে ওই জাতীয় শোনায়। 'টি' অক্ষর যথারীত গায়েব।

পরিহাসপ্রিয়তা মাস্টার মশাইয়ের নিকট ছিল সহজাত ব্যাপার, যেমন অদ্বিতীয় তিনি মেহনতের ময়দানে, গোগ্রাসী পাঠক হিসেবেও তাঁর জুড়ি মেলা ভার। পরিশ্রম-সহিষ্ণু হওয়ার সাধনায় তিনি তাঁর স্বর্গীয় পিতৃদেবের উধৃতি দিতেন, 'দাঁড়াতে পারলে বসবে না। বসতে পেলে শোবে না।' যুগপৎ সাম্রাজ্যবাদ এবং গণতন্ত্রের ধ্বজাধারী মৃত উইন্‌স্টন চার্চিলের ঠিক বিপরীত সূত্র। তিনি আবার উপদেশ দিতেন এনার্জি বা উদ্যম-সঞ্চয়ে। মাস্টার মশাই পিতৃদেবের উপদেশ পালন করতেন। বয়স-ধর্মের শ্লথতা—কি দেহে বা মনে, মাস্টার মশাইয়ের মধ্যে দেখা যায়নি। রামায়ণ-ঘটিত বাদানুবাদে তাঁর কোমর-বাঁধা বীরমূর্তি স্মরণীয়।

কতো রকম বিষয়ের উপর না তিনি লিখেছেন। ভ্রমণ-কাহিনী, কলকাতার হিন্দুস্তানী, আলবেরুনী ও ভারত-সংস্কৃতি, সিন্ধু দেশে আরবী ভাষায় প্রথম মহাভারত, রাজনীতি, সামাজিক সমস্যা—এমন তরবেতর ব্যাপার। 'অরিজিন এ্যাণ্ড ডেভেলপমেণ্ট অফ বেঙ্গলি ল্যাংগুয়েজ' তাঁর মহত্তম কীর্তি। মাস্টার মশাইয়ের জ্ঞান-পরিব্রজনার ভূগোল দেখে বিস্ময় লাগে। তেইশটি ভাষায় তিনি "সুপ্রভাত", "ধন্যবাদ" জ্ঞাপন করতে পারতেন। এখানে কটি ভাষা প্রশ্ন নয়। তাঁর অনুরাগের

দিগন্ত কতো দূর বিস্তৃত—সেই প্রশ্ন বার বার মনে চাড়া দিতে থাকে। জীবনের চতুর্দিকে তাঁর কৌতূহল। মানবিক কোন কিছু তাঁর নিকট তুচ্ছ নয়। বরং আকর্ষণের চুম্বক। উপনিষদের ঋষিদের ঐতিহ্যধারায় তিনি হাঁকযোগে ডাক দিয়ে যেতে পারতেন, "মধুরং মধুরং পার্থিব রজঃ। আগত্তু—আগত্তু। মধুময়, মধুময় এ পৃথিবীর ধূলি। এসো এসো।" রবীন্দ্রনাথ জাভা সুমাত্রা মালয় শ্যাম প্রভৃতি দেশে সফরকালে খামখা তাঁকে যাত্রাসঙ্গী করেননি।

ভাষাতত্ত্ববিদ কিন্তু মাস্টার মশাই শীর্ষ ভারততাত্ত্বিকদেরও অন্যতম। চিরসহচর সুঠাম স্বাস্থ্য, পঞ্চাশের কাছাকাছি তাঁর কপালের নিকটবর্তী দু-পাশে খসা-কেশ আদলটি একদা মানচিত্রে দাক্ষিণাত্যের কথা স্মরণ করিয়ে দিত। ভারততাত্ত্বিক দেশের অবয়বও যেন নিজ অঙ্গে ধারণ করেছিলেন। কিন্তু তিনি আবার ভৌগোলিক পৌত্তলিকতার ঘোর বিরোধী। চিন্তার জমিনে তিনি বিশ্বের বাসিন্দা। নিবিড় আড্ডা-প্রেমিক, নিপাট বাঙালী কোন রকমের প্রাদেশিকতা বা চণ্ড দেশপ্রেম তাঁকে কোনদিন আছ্ড়ে ফেলতে পারেনি। রোমান বর্ণলিপি প্রবর্তনের ব্যাপারে তাঁর দৃঢ় মতামত মাস্টার মশাইয়ের বিশ্বগ্রাসী স্বরূপের প্রকৃষ্ট পরিচয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসী বিশ্বকোষ-প্রণেতাদের স্মরণ করিয়ে দেয়, তার সদা-জাগর, বিদ্যোৎসাহী, অনুসন্ধিৎসু মানস-বিহার। তিনি এদেশে সকল জ্ঞানপিপাসুর চিরকালীন সমসাময়িক বা Perpetual Contemporary হয়ে থাকবেন।

১৯৩৯-৪১ বিধিবদ্ধভাবে দু বছর এবং অতঃপর দেশবিভাগের পূর্বকাল পর্যন্ত বর্তমান লেখকের এই বনস্পতির ছায়ায় বিদ্যাভ্যাসের সুযোগ ঘটেছিল।

সৌভাগ্যসূত্রে লব্ধ বিরল এমন চিন্তাকাশগামী নিখাদ স্বর্ণ সোপান—কোন্ মূর্খতায় স্মৃতিচ্যুত হতে দেব?

বাঙ্‌লা ছন্দ ও সুনীতিকুমার

ক্ষুদিরাম দাস

আচার্য সুনীতিকুমার তাঁর ODBL গ্রন্থে বাঙ্‌লা ভাষার উপর শ্বাসাঘাত ধর্মের কার্যকারিতার বিবরণ দিতে গিয়ে অনিবার্যভাবে বাঙ্‌লা ছন্দের প্রসঙ্গে এসেছেন। কারণ, ছন্দ ভাষার প্রাণধর্মের সঙ্গে নিত্যসম্বন্ধে আবদ্ধ। বিভিন্ন ভাষার প্রকৃতি অনুসারে সেই সেই ভাষার ছন্দের প্রকৃতিও বিভিন্ন হয়ে পড়ে। আমাদের ভাষায় সেই প্রকৃতির অনুসন্ধানে সুনীতিকুমার দেখেছেন, আধুনিক ভারতীয় ভাষাগুলির মধ্যে পূর্ব-মাগধী শাখা এবং বিশেষভাবে বাঙ্‌লা, শব্দ ও বাক্যের উচ্চারণে শ্বাসাঘাত (Stress, ঝোঁক, বল) নীতি আশ্রয় করেছে। বাঙ্‌লা ভাষার আদিযুগের পর থেকে উচ্চারণে এই ঝোঁকের প্রবণতা প্রায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। এই ব্যাপারে ইংরেজি ভাষার সঙ্গে বাঙ্‌লার আংশিক সাদৃশ্যও লক্ষণীয় হয়েছে। পার্থক্য এই যে, বাঙ্‌লায় ঝোঁক নিয়মিতভাবে শব্দের প্রথম অক্ষরে (অক্ষর = Syllable), ইংরেজিতে তা নয়, তা ছাডা ঝোঁকের প্রকৃতিতেও কিছু পার্থক্য ধরা যেতে পারে। আচার্য পুনশ্চ দেখেছেন, বাঙ্‌লা বাক্যের উচ্চারণরীতি হল কয়েকটি শব্দের মিলিত এক একটি গুচ্ছ নিয়ে বিরামযুক্ত উচ্চারণের একটি প্রবাহ। স্বাভাবিক এই বিরামকে যতি (pause, breath-pause) বলা যায়। এক, দুই, তিন এমনকি চারটি শব্দের এক-একটি গুচ্ছের পর এই বিরাম আসে। সেক্ষেত্রে মূল ঝোঁক পড়ে শব্দগুচ্ছের প্রথম শব্দটির প্রথমে। গুচ্ছমধ্যবর্তী অন্যান্য শব্দের আদ্যক্ষরে ঝোঁক থাকলেও তা তেমন প্রবল হয় না। তা ছাড়া এও বলা যায় যে গদ্য-উচ্চারণে বা সাধারণ কথা-বার্তায় ঐ বিরাম প্রায়শ অর্থানুসারে, স্বল্প-অর্থসমাপ্তির (Sense-pause) সঙ্গে মিলিয়েই ফেলা হয়। এই যতি, যা গদ্যের উচ্চারণকে অর্থের সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ন্ত্রিত করছে, তা কিন্তু পদ্যের ক্ষেত্রে বিশেষ সুরধর্মের (Rhythm) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, প্রয়োজনে অর্থধর্মকে উল্লঙ্ঘন করতে কবিতার যতির বিন্দুমাত্র দ্বিধা ঘটে না। পরবর্তিকালে সুনীতিকুমার যখন ব্যাকরণ রচনা করেন তখনও তিনি গদ্য ও পদ্যের Sense-pause-কে ছেদ এবং breath-pause যতিরূপে বর্ণনা করেছেন। বলা বাহুল্য, সুনীতিকুমারের এই ভাষা-পর্যবেক্ষণ বৈজ্ঞানিক ও বাস্তবাশ্রিত (descriptive)। তাঁর পূর্বে পশ্চিমা পণ্ডিতদের বাঙ্‌লা ভাষা আলোচনায় এবিষয়ে স্থির-নিশ্চয় ঘটেনি, মতদ্বৈধ ছিল, এদেশীয় বৈয়াকরণ ও ছান্দসিকদের আলোচনায়

স্ববিরোধ ছিল যথেষ্ট, তবে ঐসব ক্ষেত্রে অনুসন্ধিৎসা ও পরস্পরবিরোধ তাঁকে সুসমঞ্জস একটি ধারণায় উপনীত হতে প্রেরণা দিয়েছিল নিশ্চয়ই। ODBL যখন লেখেন তখনকার তরুণ ছান্দসিক প্রবোধচন্দ্র সেনের আলোচনা থেকে তিনি উৎসাহিত হয়েছিলেন ব'লে উল্লেখ করেছেন এবং অক্ষরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত ও স্বরবৃত্ত এই তিনটি আখ্যা এবং কিছু উদাহরণও তাঁর গ্রন্থ থেকে সমাহরণ করেছিলেন। বেশ কিছুকাল পরে যখন ব্যাকরণ লেখেন তখন অমূল্যরতন মুখোপাধ্যায়ের বাঙ্‌লা ছন্দেঃ বৈজ্ঞানিক মূলসূত্র নির্ণয়ের ব্যাপারে আচার্য নিজকৃত ব্যাখ্যানের প্রতিরূপ অনুভব ক'রে তাঁর দেওয়া নামকরণ তানপ্রধান, ধ্বনিপ্রধান, শ্বাসাঘাত-প্রধান বিকল্পে তাঁর ব্যাকরণ-পুস্তকে সন্নিবেশিত করেন এবং আরও লক্ষণীয় এই যে, তানপ্রধান ও ধ্বনিপ্রধান (অক্ষরবৃত্ত ও মাত্রাবৃত্ত) ছন্দের চতুর্মাত্রিক পর্বগণনা থেকে তিনি বিরত হন। রবীন্দ্রনাথ ও প্রবোধচন্দ্র তখন ঐ দুই বিষয়ে চতুর্মাত্রিক যতি ও পর্বের পক্ষপাতী ছিলেন। অমূল্যধনের বিশ্লেষণপদ্ধতি ও সুরধর্মগত নামকরণ গ্রহণ ক'রে, ভাষাবিজ্ঞানের দিক থেকে পূর্বে তিনি যা আন্দাজ করেছিলেন তারই বিস্তারিত সিদ্ধি অন্যের হাত দিয়ে ফিরে গ্রহণ করলেন, এটি বেশ কৌতুকজনকই বটে। অবশ্য কী ভাষাতত্ত্বের গ্রন্থে, কী ব্যাকরণে তিনি মৌলনীতি প্রদর্শনেই তাঁর আলোচনা সীমিত রেখেছিলেন, কবিদের তাবৎ রচনায় যেসব বিস্তৃত বৈচিত্র্য এবং আপাত-বিরোধ দেখা যায় তার সামঞ্জস্য নির্ণয়কল্পে শ্রম নিয়োগ ক'রে ছন্দ বিষয়ে পৃথক গ্রন্থ রচনার সময় ও মনোযোগ দিতে পারেন নি।

বাঙ্‌লা ছন্দের ক্রমবিকাশকে ইতিহাস-অনুগত ভাবে লক্ষ্য করা যেতে পারে। প্রথমে বুঝ্‌তে হবে বাঙ্‌লা অন্যান্য আধুনিক ভাষার মতই জীবন্ত সচল অগ্রগামী। এর উচ্চারণরীতি একশ' দুশ' বছর ধ'রে পরিবর্তিত হতে হতেই চলেছে এবং ভবিষ্যতেও কত পরিবর্তন হবে। বাল্যকালে আমার পাঠশালার এক বৃদ্ধ গুরুমশায়কে বলতে শুনতাম—সরিষা, আঁকুশী, আলিপনা, আঙটী, পানিফল, রাজতন্ত্র, বিষবৃক্ষ প্রভৃতি। আমরা উচ্চারণ করতাম--সর‍্ষ্যা, আঁকশি, আঙ্‌টি, আল্‌পনা, পা'ন্‌ফল, রাজ্‌তন্ত্র প্রভৃতি। বর্তমান পূর্ববঙ্গ উচ্চারণ আইজ, কাইল, চাইর, কইর‍্যা, আষ্ট, ডাকাইত, প্রভৃতি চারশ' বছর আগে সারা বাঙ্‌লারই ছিল। আরও আগে তদ্ভব শব্দের (তৎসম তো বটেই) শেষের অ, ই, উ স্পষ্ট উচ্চারিত হ'ত, যেমন পাত (অ), কাম (অ), আজি, আজু, আঁখি, বহু (= বধূ), তীন (অ) = তিন্, আমার (অ), কানাইর (অ) প্রভৃতি। মধ্যযুগে ক্রমাগত স্বরমধ্য ব্যঞ্জন লোপ করার প্রবণতার ফলে যে-সব স্থানে অই, অউ, আই, আউ, উচ্চারণ ঘটেছিল, সেসব

স্থানে প্রথম-প্রথম উক্ত দুইস্বর উচ্চারণে পৃথক্‌মূল্যের ছিল, পরে সেগুলি দ্বিস্বরে অর্থাৎ মিলিত একটি দীর্ঘস্বরে রূপান্তরিত হয়। এই সব পরিবর্তিত উচ্চারণ কবিদের ছন্দোরীতিতেও মাত্রামূল্যের পরিবর্তন ঘটিয়েছে। বর্তমানে ঐসবের অনেক বদলে গেছে ঠিকই, কিন্তু রক্ষণশীলতার বশে কিছু থেকেও গেছে আবার। একটা দৃষ্টান্ত দিই। ছন্দোনির্ণয়ে এ দৃষ্টান্তটি গুরুত্বপূর্ণ। আজকের মৌখিক ভাষায় আমরা বলি—মেঘ্ জল্ চোখ্ দেশ্ (বি)ষাদ্ (আ)মার্ (ভাব)তের। নিজেকে পরীক্ষা করুন, দেখবেন ঐ ব্যঞ্জনান্ত অক্ষর (Syllable) গুলি উচ্চারণে মৌলিক স্বরান্ত অক্ষরের সমমূল্যই পাচ্ছে উচ্চারণকালের দিক থেকে। অর্থাৎ 'আ' বলতে যে পরিমাণ সময়, কাশ্ বলতেও সেই পরিমাণ সময়, আকাশ্ দু'মাত্রায় দুটি অক্ষর। মধ্যযুগে ঠিক তা ছিল না। ঐগুলির স্বরান্ত উচ্চারণ লোপ পাওয়ার পর পূর্বেকার দু'অক্ষরের দু মাত্রা মূল্য টান দিয়ে পূরণ করা হতে লাগ্‌ল, অন্ততঃ ছন্দের ক্ষেত্রে। দু'অক্ষর এক হয়ে পড়্‌ল কিন্তু টান দিয়ে মাত্রামূল্য দুই-ই রেখে দেওয়া হ'ল। উচ্চারণে যে ক্ষতি হ'ল টান দিয়ে তা পূরণ করার চেষ্টা করলাম। আজও তাই চলছে। অন্ততঃ অক্ষরবৃত্ত ও মাত্রাবৃত্তে। আর শ্বসিত রীতির ছন্দে প্রায়শই ওগুলির মাত্রা এক, ক্বচিৎ দুই হতেও পারে। আসলে মৌখিক ভাষা গতিশীল হয়েছে, ছন্দোবোধ থেকেছে রক্ষণশীল। একটু ভবিষ্যদ্বাণী ক'রে বলা যায়, আজ থেকে একশ' দেড়শ' বছর পরে ঐটুকু রক্ষণশীলতার বালাইও ঘুচে যাবে। বাঙ্‌লার স্বাভাবিক উচ্চারণের সঙ্গে যে ছন্দের বেশি মিল, সেই ছড়ার ছন্দ বা শ্বসিত ছন্দই থাকবে, মাত্রাবৃত্ত রীতিটাই অতিকৃত্রিম ও প্রত্ন হয়ে পড়বে, আর পয়ার-জাতীয়ের স্থান নেবে গদ্যছন্দ, এখনই যার অধিকারের প্রবল প্রতাপ দেখা যাচ্ছে।

ছন্দের পর্বগত (পর্ব = Bar, দুই যতির মধ্যবর্তী অক্ষরসমষ্টি) অক্ষরগুলির মাত্রামূল্য উপলব্ধি করার ক্ষেত্রে ভাষার পরিবর্তনের এই সব রীতি বুঝতে হবে। কবিকঙ্কণ মুকুন্দের মূলপাঠ নির্ণয় করার সময় আমরা দেখেছি, হইল (হৈল), লইয়া (লৈয়া, লয়্যা), কৈল এবং করিল—প্রভৃতি শব্দকে তিনি ছন্দের প্রয়োজনে কখনও দু'মাত্রার কখনও তিনমাত্রার মূল্যে স্থান দিয়েছেন। দু'মাত্রার বেলায় কৈল, বৈল, কিন্তু তিনমাত্রা পূরণের প্রয়োজনে করিল, বলিল। তা ছাড়া অক্ষরমাত্রিক (তানপ্রধান) রীতিতেই মুখ্যতঃ ছন্দনির্মাণ করে গেলেও তিনি যৌগিক অক্ষরকে (অন্ পুন্ সন্ বক্ চক্ প্রভৃতি) ছন্দের প্রয়োজনে কখনও একমাত্রার মূল্য দিয়েছেন, কখনও দু'মাত্রার। এর দৃষ্টান্ত এত প্রচুর যে ব্যাপারটিকে ব্যতিক্রম বলা যায় না। হয়ত মুখের কথাতেও তখন ঐ দুমাত্রা রীতি সমর্থনের অন্ততঃ একটা আভাস

বিদ্যমান ছিল। বৈষ্ণব পদাবলীতেও ঠিক তাই। এমন কি যৌগিকের যে দ্বিমাত্রিকতা মাত্রাবৃত্তরীতির আজ অবশ্যকরণীয় নিয়ম, ব্রজবুলি পদাবলীতে তাও অমান্য করা হয়েছে, অবশ্য খুব বেশি ক্ষেত্রে নয়। রবীন্দ্রনাথ দিক্‌প্রান্ত দিক্‌সীমা ঐ (ওই) প্রভৃতি শব্দের গ্রন্থনে অক্ষরমাত্রিকে যৌগিক অক্ষরগুলিকে কদাচিৎ দুই মাত্রা ব'লে গ্রহণ করেছেন এবং আরও নানান্ আপাত-ব্যতিক্রম ঘটিয়েছেন, কিন্তু ছন্দের সুরধর্মে ঠিক চলে গেছে, শ্রুতিকটু হয়নি। দিক্ শব্দ সমাসবদ্ধ হলেও তার স্বাধীনসত্তাও পাঠককে শ্রোতাকে ভুলতে দেয় না। বৈজ্ঞানিক বোধের অভাবে ঐরকম দুর্বিপাক আধুনিক কবিতায় ছন্দ-চর্চায় ঘটেছে। 'অনেকদিন খিদিরপুর ডকের অঞ্চলে' এই পঙ্‌ক্তির নেক্ ও দির এ দুই সিলেব্‌ল্‌কে আধুনিক কবি একমাত্রা ধ'রে পয়ার (১৪ মাত্রার) মেলাতে চেয়েছেন, অথচ সে চেষ্টা দুরূহই হয়েছে, কারণ লেখায় দৃশ্যত অনেক ও দিন, খিদির ও পুর একীকৃত হলেও উচ্চারণস্মৃতিতে অনেক ও খিদির স্বাধীন শব্দ। সুতরাং 'নেক' ও 'দির' শব্দান্তও যৌগিক হিসেবে দু'মাত্রার মূল্য পাবে। "অনেক দিন খিদির পুর ডকের- অঞ্চলে। কাবাকে খুঁজেছি প্রায় গোরুখোঁজা ক'রে।" এই দুই চরণের প্রথমটি পরিস্ফুট ধ্বনিমাত্রিকতার, দ্বিতীয়টি অক্ষরমাত্রিকতার। ছন্দোময় বাক্ কিছু কৃত্রিম অথচ মনোহর। তবে এতে স্বাভাবিক উচ্চারণের অল্পস্বল্প ব্যতিক্রম ঘটানো যেতে পারে, এবং তা সুন্দরও লাগে, কিন্তু পরিচয় ও অভ্যস্ত কথনের রীতিকে কখনো একেবারে উল্টে পাল্টে দেওয়া যায় না।

সুনীতিকুমারের প্রাথমিক আলোচনার পূর্বেই বাঙ্‌লায় তিন রীতির ছন্দ লক্ষ্যগোচর হয়েছিল এবং তিনি প্রবোধচন্দ্র সেনের আলোচনা ও নামকরণের দ্বারা উপকৃত হয়েছিলেন, একথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। ছন্দের আলোচনায় সুনীতিকুমার দেখেছিলেন যে বাঙ্‌লায় এবং সেই সঙ্গে অসমীয়া ওড়িয়ায় শ্বসিত উচ্চারণরীতি প্রাকৃত-অপভ্রংশের মাত্রামূলক রীতি থেকে সমমাত্রিক (যতিসহ গোটা সুরধর্ম ধ'রে ১৬) অক্ষরমূলক রীতির নব্যপদ্ধতির জন্ম দিয়েছে। নব্যরীতির এই ছন্দের মূল ব্যাপারটি তিনি বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের সাহায্যে ধরিয়ে দিলেন। এই রীতির উচ্চারণ কেবল যে শব্দের আদিতে ঝোঁকের সৃষ্টি করেছে তা-ই নয়। যতির বিরামকে আরও দীর্ঘ ও স্পষ্ট করেছে এবং শ্বাসাঘাত ও যতির মাঝখানে শব্দগুচ্ছের এক একটি পর্বেরও সৃষ্টি করেছে। প্রাকৃত এবং অপভ্রংশেও যতির স্থান ছিল, কিন্তু তার মূল্য ছিল নগণ্য। যতি প্রায় না দিয়েও মাত্র স্বল্প টান রেখে একটি সংস্কৃত-প্রাকৃত-অপভ্রংশ চরণ উচ্চারণ করা চল্‌ত। কিন্তু বাঙ্‌লায় তা

সম্ভব নয়। প্রথমের দিকে যখন শব্দের শেষের স্বর বিলুপ্ত হয়নি তখনই পয়ারে প্রথম-আট এবং পরের ছয়ের শেষে পূর্ণযতি সুনির্দিষ্ট হয়ে গিয়েছিল। সুনীতিকুমারের উপলব্ধিতে অপভ্রংশ পাদাকুলকের ষোলমাত্রা চাল পয়ারেও একহিসেবে ছিল ও আছে, যতির দু'টি বিরামের মধ্যে ঐ দুটি মাত্রা-সময় সুপ্তভাবে থাকে, সুরসহ (Rhythmic quality) যাঁরা পয়ার আবৃত্তি করেন তাঁদের কণ্ঠ মনোযোগ সহকারে শুনলেই তা ধরা পড়বে। মাত্রা-নিয়ন্ত্রিত পাদাকুলক ছন্দোবন্ধ থেকে ঝোঁক-প্রযুক্ত পয়ারের পর্ব যখন ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে এমন সময় পূর্ব-চলিত পূর্ণ ধ্বনিমাত্রিক পদ্ধতির সঙ্গে অক্ষরমাত্রিক পদ্ধতির একটা বিমিশ্রণ ঘটেছিল। পরে ধীরে ধীরে অক্ষরমাত্রিকতার পূর্ণ প্রতিষ্ঠা ঘটেছে কবিকঙ্কণ রায়গুণাকরে এসে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন খুলে দেখুন—

নীল জলদসম কুন্তলভারা।
বেকত বিজুলি শোভে চম্পকমালা॥
সীসত শোভয়ে তোর কামসিন্দুর।
প্রভাত সময়ে যেহ্ন উয়ি গেল সুর॥ ইত্যাদি।

এর প্রথম দুই ছত্র লক্ষ্য করুন। প্রথম ছত্রের 'নী' এই মৌলিক অক্ষর এবং কুন্ এই যৌগিক অক্ষর এবং দ্বিতীয় ছত্রের চম্ অক্ষরকে দু'মাত্রা করে ধরলে তবেই ৮+৬ (অথবা ৮+৮)-এর চাল সম্পূর্ণ হয়। অর্থাৎ ঐ দুই ছত্রে ধ্বনিমাত্রিকের আমেজ পাওয়া যাচ্ছে। কবিতাটির পরের ছত্রগুলিতে অবশ্য ঐরকম ব্যতিক্রম আর দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু অন্যত্র বহু পদে ১২।১৩ অক্ষরের (Syllable) চরণ দেখা যায়, সেগুলিতেও কোথাও কোথাও প্রাচীন দীর্ঘমাত্রকতার আশ্রয় নিলে তবেই ৮+৬-এর সমাধান ঘটে। যেমন,—এহা দেখি রসত মন কর দূরে, গা(ই)ল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ, অতিবড দুষ্ট হৃদয় বনমালী। ত্রিপদীর (অর্থাৎ ত্রিপর্বিক ৮+৮+৮+২) ক্ষেত্রে যেমন—সর্বাঙ্গ সুন্দরী তোএ দেব মুরারী মোএঁ, হংস রএ সরোবরে শুআহো পাঞ্জরে কুয়িলী সে নন্দন বনে। অর্থাৎ আ, ঈ, ঊ, প্রভৃতির এবং ব্যঞ্জনান্ত যৌগিকের দু'মাত্রার সংস্কার তখনও মন থেকে মুছে যায় নি। কবিকঙ্কণের সময়েও যায় নি, তার প্রমাণ, তিনি অক্ষরমাত্রিক রীতিতে কাব্য লিখলেও যৌগিক ব্যঞ্জনান্ত অক্ষরকে প্রয়োজনে দু'মাত্রার মূল্যও দিয়েছেন। যেমন, শূন্যে করিয়া স্থিতি চিন্তিলান মহামতি; নিরুপম পরকাশ মন্দ মধুর হাস; মধুর সংগীত কবিকঙ্কণে ভণে ইত্যাদি। সুনীতিকুমার দেখেছিলেন যে কৃষ্ণকীর্তনের পয়ারে আই আউ প্রভৃতি যেখানে আছে সেখানে গণনায় চরণ ১৪র বেশি অক্ষরের পাওয়া গেলেও

বস্তুত উচ্চারণে ও শ্রবণে তা ১৪ই হবে, কারণ, পাশাপাশি অবস্থিত ঐ স্বরগুলির দ্বিতীয়টি তখনই উচ্চারণে ক্ষীণ হয়ে দ্বিস্বরতার প্রায় সৃষ্টি করেছে, ফলে দাঁড়াচ্ছে প্রায় ১৪ অক্ষরই। লক্ষণীয় হ'ল সেই সর্বগ্রাসী সুরধর্ম, যার প্রভাবে অল্পস্বল্প এদিক ওদিক সমান হয়ে যাচ্ছে, কুঁদের মুখে বাঁক থাকছে না।

তাঁর অধ্যয়নে আরও একটি ব্যাপার ধরা পড়েছে। এটি কৃষ্ণকীর্তন পরবর্তী মধ্যযুগের। ঐ সময় উচ্চারণে শ্বাসাঘাত-বিস্তারের বশে মধ্য ও অন্ত্য স্বরের বিলোপ জন্য এক অভিনব পরিস্থিতির অভ্যুদয় হয়েছিল। লিখনে চোদ্দ অক্ষরের বেশি, ১৭-১৮ পর্যন্ত, অথচ উচ্চারিত মাত্রা ১৪ই, কারণ স্বরলোপজন্য হস্ ব্যঞ্জনগুলির কোনো মূল্যই তখন দেওয়া হচ্ছিল না। যেমন, রাবণ্ রাজার্ সানা টোপর্ বাণের্ তেজে কাটে (দৃশ্যত ১৮), কৃষ্ণের্ নন্দন্ বীর্ রুধিল যেহেন প্রচণ্ড (দৃশ্যত ১৭)—এরকম অজস্র দৃষ্টান্ত। সুনীতিকুমারের এই অধ্যয়ন যথাযথ, তবে, একটা কথা বলার আছে। আমরা সবক্ষেত্রে পালা গায়ক ও পুঁথি লেখকদের রচনাই পেয়ে থাকি। কবিরা ঠিক কী করেছিলেন তা অন্তত কিছু পরিমাণে আমাদের অজ্ঞাতই থেকে গেছে। তথাপি পালা গায়েনরা যেহেতু বাঙ্লা ভাষা-ভাষী, তাঁদের আবৃত্তি থেকেও পরিস্থিতির হদীস নিশ্চয়ই কিছু পাওয়া যায়। আর এক কথা। শেষ স্বরলোপের ফলে ক্ষয়পূরণ না হয়ে অর্থাৎ দীর্ঘ না হয়ে হ্রস্ব যে হচ্ছে তার কারণ নিশ্চয়ই ষোড়শ শতাব্দী থেকে ছড়ার ছন্দের বিস্তার। পয়ারের উচ্চারণের সঙ্গে ছড়ার ছন্দের উচ্চারণ মিশ্রিত হয়ে কিছুকাল বেশ বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করেছিল। একমাত্র শ্বসিত উচ্চারণেই আশ্রিত স্বরবর্ণের বিলোপ এবং হলন্ত যৌগিক অক্ষরের এক মাত্রার উচ্চারণের দিকে প্রবণতা সৃষ্টি। এই রীতিতে অক্ষরের সংকোচন-প্রসারণ রূপ স্থিতিস্থাপকতা গুণের প্রসারও লক্ষণীয় ব্যাপার। দরকার হ'লে চলিত ভাষার ছন্দে এই যে প্রসারন (নাই নাই না-ই)-এর প্রকৃতি অবশ্য মাত্রাবৃত্ত ঢঙ্ থেকে স্বতন্ত্র। যাই হোক, কৃত্তিবাসের অনুরূপ বহু ছত্রের দু'টি দেখা যাক—

অন্য কথা কইতে রাজার মুখে বাইরায় রাম।
নয়ন মুদিলে দেখে দূর্বাদলশ্যাম ॥

এর প্রথমটিতে ছড়ার ছন্দের আভাস এবং দ্বিতীয়টিতে পয়ারের ১৪র বাঁধন স্পষ্ট। অবশ্য দ্বিতীয়টিও যে ছড়ার ছন্দে না পড়া যায় এমন নয়। ছড়ার রীতির সঙ্গে পয়ার রীতির মিশ্রণের বিষয়টি ছান্দসিক প্রবোধচন্দ্রও লক্ষ্য করেছেন দেখছি। আচার্য তাঁর OBDL-এ অক্ষরমাত্রিক ছন্দে তৃতীয় পরিবর্তন স্তরের উল্লেখ করেছেন। এটি সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীর। পয়ারকে অতিরিক্ত হস্‌যুক্ত ও স্বরময় কথ্যভাষার ভঙ্গি

থেকে মুক্ত করে যুক্তাক্ষরযুক্ত, স্বরান্ত সাধুভাষায় রূপান্তরিত করার প্রয়াস চলেছিল এ সময়। হরফ্‌ গুণে পয়ারকে দৃশ্যত সাধুভাষার ছন্দ হিসেবে দেখা ও প্রচলিত করার দিকে কবিদের ঝোঁক দেখা যায়। এইভাবে পয়ার-জাতীয় ছন্দ অনেকটা সাধুভাষার ছন্দ হিসেবে স্থান লাভ করেছে। আর এই সাধুরীতি বেশ কিছুকাল ছড়ার ছন্দের প্রসার রোধ করেছিল এমনও অনুভব করেছেন ভাষাবিজ্ঞানী।

সুনীতিকুমার বাঙ্‌লায় ছন্দোনির্মিতির নিয়ন্ত্রী শক্তিরূপে বিশেষ সুরধর্ম (Rhythmic quality) লক্ষ্য করেছেন। OBDLএ তিনি লিখছেন—'The tune made an adjustment of irregularities in the shape of absence of or excess over the requisite number of syllables.' অথবা 'rhythmic adjustment of the line' অথবা 'The rhythm requires the lengthening of দে-শ and বিষা-দ্‌ to make up for the loss of final (অ) which counted as a syllable.' বাঙ্‌লায় Syllableএর অতিনির্দিষ্ট মাত্রা নেই, তা সুরপ্রবাহের বশগামী, অথবা আরও পরিষ্কার করে বলতে গেলে বলতে হয় যৌগিক স্বরান্ত হলন্ত এমন কি কদাচিৎ মৌলিক স্বরান্ত অক্ষরও কখন হ্রস্ব উচ্চারিত হবে কখন দীর্ঘ, তা নির্ভর করবে এবং পর্ববিন্যাসও নিয়ন্ত্রিত হবে বিশেষ বিশেষ সুরধর্মের দ্বারা, তবে ঐ সুরধর্ম কথন-রীতিকে উৎকটভাবে লঙ্ঘন ক'রে অস্বাভাবিকতার সৃষ্টি করবে না, এই যা। উদাহরণ দিয়ে বলা যায় যে, হৃৎপদ্ম, মৃৎপাত্র, দিক্‌প্রান্ত এই ধরনের শব্দে হৃৎ, মৃৎ, দিক্‌ কোনো ক্ষেত্রে দীর্ঘ হবে, কিন্তু দীর্ঘ করা হলে পরবর্তী যৌগিক পদ্‌ পাত্‌ প্রান্‌ আর দীর্ঘ হবে না, কারণ পরপর দু'টি দীর্ঘ আমাদের উচ্চারণে ও কানে স্বাভাবিক নয়। অবশ্য শ্বসিত ঢঙের ছন্দে এও যে একেবারে অচল এমনও নয়। এই দিক্‌ থেকে বলা যায়, আধুনিক বাঙ্‌লা যৌগিক স্বরান্ত ও ব্যঞ্জনান্ত অক্ষরগুলির স্থিতি-স্থাপকতা গুণ রয়েছে। কেন রয়েছে, কেন কথ্য থেকে ছন্দের উচ্চারণে হৃৎ, মৃৎ, দিক্‌ এবং ঐরকম অন্‌ পুন্‌, সন্‌, রক্‌, ঐ, থৈ, দৈ, নাই প্রভৃতি অক্ষর কোথাও দীর্ঘ হবে, তার মূল নিহিত রয়েছে ঐ সুরধর্মের মধ্যে। এই বিষয় লক্ষ্য ক'রে রবীন্দ্রনাথও পুনঃপুনঃ এই ধরনের মন্তব্য করেছেন :

"ছন্দের কোনো অকাট্য নিয়ম নেই (অক্ষরের মাত্রা গণনা বিষয়ে—লেখক) এ কথাটা মনে রাখা দরকার……কিঙ্কিণীতে ঘুণ্টি কিভাবে ও কত সংখ্যায় সাজানো সে কথাটা গৌণ, তার ঝংকারের লয়টাই আসল কথা।"

"ইংরেজির ছন্দে এ্যাক্‌সেন্ট এর প্রভাব ; সংস্কৃত ছন্দে দীর্ঘস্বরের সুনির্দিষ্ট

ভাগ। বাঙ্‌লায় তা নেই, এইজন্য লয়ের দাবিরক্ষা ছাড়া বাঙ্‌লা ছন্দে মাত্রা বাড়িয়ে-কমিয়ে চলার আর কোনো বাধা নেই" ইত্যাদি।

একদা বিশেষ বিশেষ স্বরধর্ম ধরেই ছান্দসিক অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় বাঙ্‌লা ছন্দের তিনটি পৃথক্ উচ্চারণ পদ্ধতি বা ঢঙ্ নির্ণয় করেছিলেন এবং তদনুযায়ী পর্বের প্রকৃতি এবং পর্বানুগত আক্ষরিক ধ্বনিরও মূল্যায়ন করেছিলেন। সুষম পর্বের অর্থাৎ যতি বিভক্ত অংশের ভাগে ভাগে উচ্চারণ এটি ত্রিবিধ বাঙ্‌লা ছন্দের সামান্য প্রকৃতি। এরই মধ্যে প্রচলিত অক্ষরবৃত্তে শ্বাসাঘাতের প্রাবল্য ও অক্ষরসমূহের পৃথক্ পৃথক্ স্পষ্ট ধ্বনিমূল্য আত্মসমর্পণ করেছে তানময় সুরধর্মের কাছে। মাত্রাবৃত্তের ক্ষেত্রে তিনি দেখেছেন পর্বমধ্য কথাগুলির বিচিত্র অক্ষরবিন্যাস কতকটা পূর্বেকার প্রাকৃত-অপভ্রংশ ধ্বনিমাত্রামূলক পদ্ধতির অধীন, তা অক্ষরস্থ ধ্বনিগুলির বিশেষ মূল্য দিয়ে মন্থরগতিতে চলতে চায়। আর চটুল নৃত্যের ভঙ্গিতে অগ্রসর হতে চায় এমন ছড়ার ছন্দের স্বরধর্মের সঙ্গে প্রবলভাবে শ্বসিত উচ্চারণের সামঞ্জস্য তিনি লক্ষ্য করেছেন। পরবর্তী কালে ব্যাকরণ রচনার সময় সুনীতিকুমার ছান্দসিক অমূল্যধনের বিবরণযুক্ত ত্রিবিধ নামকরণকে ভাষাবিজ্ঞানের দিক থেকে যৌক্তিক বলে গ্রহণ করেছেন দেখতে পাই। অবশ্য ঐ নামকরণের সঙ্গে পুরাতন অক্ষরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত ও স্বরবৃত্ত নাম বিকল্পে রেখে দিয়েছেন যাতে শিক্ষার্থিদের পক্ষে বোঝার বিভ্রাট না হয়। এর পর নামকরণ প্রভৃতি বিষয়ে নোতুনতর কোনো ধারণার পক্ষপাতী তিনি হতে পারেননি। কেবল মনে পড়ে, আমাকে তিনি একসময় প্রশ্ন করেছিলেন—"পয়ারের Chantingএ মুসলিম কোনো কোনো গায়ক চার মাত্রার পর যতিবিন্যাস ক'রে এক একটা চরণকে চার ভাগে ভাগ ক'রে পড়েন শুনেছি। পারলে একটু পরীক্ষা ক'রে দেখবেন তো।" আমার যতদূর জানা ছিল তাতে এরকম দেখা যেত না, এবং আবাল্য রামায়ণ, মনসার ভাসান এবং পটুয়াদের সুরে আবৃত্তির সঙ্গে পরিচিত হয়েও কি-হিন্দু কি-মুসলমান কোনো গায়ককেই পয়ার-আবৃত্তিতে চারের পর পূর্ণ যতি দিতে শুনিনি। কারণ, তা দিলে শ্বসিত ছড়ার ভঙ্গিমা এসে যায়। সেই কথা বললাম এবং ভালো ক'রে লক্ষ্য করব এও জানালাম। আসল কথা বোধ হয় এই যে, রবীন্দ্রনাথ ও ছান্দসিক প্রবোধচন্দ্র কি পয়ারজাতীয় কি আট-এর মাত্রাবৃত্তে চারমাত্রায় যতিনির্দেশের পক্ষপাতী ছিলেন (অধুনা প্রবোধচন্দ্র অবশ্য ঐ স্থানে লঘুযতি ধরছেন) এবং সেই অনুসারে ভাষাবিজ্ঞানীর মনে একটা খটকা দেখা দিয়েছিল। কিন্তু লক্ষণীয় এই যে আরও পরে ছান্দসিক প্রবোধচন্দ্র যখন Syllabic, Moric এবং Accented ছন্দঃপদ্ধতিত্রয়ের নোতুন নামকরণ করলেন (মিশ্রকলা-

মাত্রিক, কলামাত্রিক ও দলমাত্রিক) তখন সুনীতিকুমার তা গ্রহণ করেননি, অন্ততঃ উদাসীন রইলেন। তাঁর ODBLএর সম্প্রতি যে পরিশিষ্ট তিনি যোজনা করেছিলেন তাতে কেবল বলেছেন যে বাঙ্‌লা ছন্দের মৌলিক ব্যাপারগুলি এখন পরিষ্কার ভাবেই বোঝা গেছে, শুধু নামকরণ ও খুচরো কয়েকটি বিষয়ে পারস্পরিক মতভেদ রয়েছে। তাঁর অভিপ্রায়ের অনুসরণে বলা যায়, তানময় স্বরধর্ম ও তদনুযায়ী পর্ব ; প্রায়-প্রাচীনরীতির অক্ষর-ধ্বনি মাত্রা ; শ্বাসাঘাত-মিশ্রিত স্বরধর্ম ও তদনুযায়ী মাত্রা শৈথিল্য—এই তিনটিই মৌল ব্যাপার। তা ছাড়া Rhythmic Qualityর দ্বারা সংরক্ষিত ও পরিবেষ্টিত থাকে বলেই মৌলিক যৌগিক সব অক্ষরই বাঙ্‌লায় কৃত্রিমতা-মনোহর স্বরধর্মের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে উচ্চারণের স্বাভাবিক মূল্য উল্লঙ্ঘন ক'রে দীর্ঘায়িত হয়, কোথাও কম, কোথাও একটু বেশি। বর্তমানে আমরা তাঁর দ্বারা স্পষ্টভাবে কথিত না হলেও, তাঁর অভিপ্রায় অনুসারে অন্য দু'-একটি বিষয়ের আলোচনায় অগ্রসর হচ্ছি।

খাঁটি পয়ারের চাল আটে ছয়ে (অথবা আটে আটে, যতি দু'টি সহ)। এর মধ্যে অর্ধযতি বা লঘুযতি পাঠের স্বাভাবিকতাবশে কোথায় পড়বে? অমূল্যধন বলছেন শব্দভিত্তিক হবে। প্রবোধচন্দ্র বলছেন লঘুযতি চারে চারেই পড়বে, কিন্তু যেখানে ঐ চার শব্দের মাঝখানে শেষ হচ্ছে সে সব ক্ষেত্রে যতিবিলোপ হবে। যেমন—/ 'কাননে কু/সুম কলি' অথবা 'পড়েছে তো/মার পরে প্রদীপ্ত বা/সনা/ অর্ধেক মা/নবী তুমি অর্ধেক ক/ল্পনা' প্রভৃতি ক্ষেত্রে। এ বিষয়ে আমাদের প্রশ্ন. তাহলে আর ছন্দের ছন্দত্ব থাকে কোথায়, আর প্রয়োজনই বা কী? শব্দার্থ এক পথে চলে, ছন্দ, সুর, তাল চলে অন্যপথে, নিজের পথে। ছন্দের তাল অর্থের বেতালকে মানতে যাবে কীজন্য? যেখানে ছন্দের যতির সঙ্গে শব্দার্থের মিল ঘটছে সেখানে সোনায় সোহাগা। কিন্তু যেখানে তা হচ্ছে না সেখানে ছন্দের প্রাগ্‌-অধিকার না মানলেই নয়। আমাদের গুরুমশায় তো পড়তেন—'পার কর বলিয়া ডা কিলা পাটনীরে'। অথবা, 'কিবা শোভা নদীতে ফু টিল কোকনদ। কই, অর্থবিভ্রাট হচ্ছে বলে আমরা তো খেদোক্তি করিনি। রামায়ণাদির আবৃত্তিতেও তো এই রীতিই দেখি। কবির চিত্তে যে ভাব ও কল্পনার লীলা তার সঙ্গে তাল রাখতে পারে এমন ভাষা মানুষের আজও গড়ে উঠেছে কি? কাব্যের ক্ষেত্রে ছন্দ বা সুরধর্মকেই প্রধান বলে মান্য করতে হবে, স্পষ্টার্থবহতাকে নয়। অতএব যতিলোপ নয়, শব্দভিত্তিক পর্বাঙ্গও নয়, যতি ও অর্ধযতি নিজ খুশীতেই পড়ছে, পড়বে। বলা বাহুল্য মাত্রাবৃত্তের ক্ষেত্রেও অনুরূপভাবে পড়তে হবে—'সপ্তা হপরে'। 'সাতশ তপ্রাণ' অথবা, 'বনচূড়া রঙিল'।

স্বর্ণরে খায়। পূর্বদিগন্তের॥ প্রান্তরে খায়।' এর অন্যথা সমীচীন হবে না। কবিরা ইচ্ছে করে বৈচিত্র্য সৃষ্টি করার জন্য এরকম করেন, মাঝে মাঝে তালের খণ্ডন ঘটলে একঘেয়েমি কেটে যাবে, প্রবোধচন্দ্রের এধরনের মন্তব্যও শ্রোতব্য ব'লে বিবেচনা করা যায় না। অবশ্য যে-ক্ষেত্রে ছন্দের উপর শব্দার্থ আধিপত্য বিস্তার করুক এমনতর মনোভাব নিয়েই লেখা হচ্ছে, যেমন অমিত্রাক্ষর অথবা গদ্যছন্দে, সেখানে যতি বা অর্ধযতি শব্দানুসারেই বিহিত করতে হবে। সুনীতিকুমার অর্থনিরপেক্ষ-ভাবেই তিন রীতির ছন্দে (অমিত্রাক্ষর বাদ দিয়ে) অর্ধযতি বিন্যাসের পক্ষপাতী ছিলেন, যদিচ ছাত্রপাঠ্য ব্যাকরণে তা দেখান নি, মতভেদের ব্যাপার রয়েছে ব'লে।

তিনরীতির স্বরধর্ম-মিশ্র ছন্দের নামকরণ বিষয়ে সুনীতিকুমার অমূল্যধনের অভিমতও মেনে নিয়েছেন, দলমাত্রিক কলামাত্রিক প্রভৃতি লক্ষ্য ক'রেও অবহিত হন নি, নইলে নবযোজিত পরিশিষ্টে অথবা ব্যাকরণে তার উল্লেখ করতেন। বস্তুতঃ একটি ঢঙের নাম হবে Syllable (দল)এর উল্লেখ ক'রে, একটির নাম হবে mora (কলা)র উল্লেখ ক'রে, অন্যটির নাম অনর্থবহ 'মিশ্রকলা' দিয়ে—এ খুবই অসামঞ্জস্যের ব্যাপার দাঁড়ায়। যদি Syllable বোঝাতে 'দল' শব্দই বাঞ্ছনীয় হয়, তাহ'লে ঐ শব্দেই কিছু যোগ-বিয়োগ ক'রে অন্যগুলিও বোঝাতে হয়, নতুবা 'কলামাত্রিক' তো ধ্বনিমাত্রিকেই গিয়ে দাঁড়ায়, আর 'মিশ্র' বলতে ঐ দল-কলারই মিশ্রণ বোঝায়। তাছাড়া 'দলমাত্রিক' শব্দ বরং পয়ার ঢঙের পক্ষেই অধিকতর প্রযোজ্য হয়ে পড়ে; কারণ, এতেই তো একদল = একমাত্রা (শব্দশেষের নিয়মিত যৌগিক ব্যঞ্জনান্ত দল ছাড়া) অক্ষরবৃত্তেই তো সবচেয়ে বেশি লক্ষণীয়। আরও দেখি, দল-মাত্রাই কি শ্বসিত ছন্দের প্রধান লক্ষণ? প্রধান লক্ষণ তো ঐ শ্বাসাঘাত বা স্বরাঘাত বা 'প্রস্বর' যার বলে মাত্রামূল্য অত্যন্ত অস্থির হয়ে পড়ে। সবচেয়ে বিভ্রাটের সৃষ্টি করেছে 'মিশ্রকলা' নাম। মনে হচ্ছে এ ছন্দ অর্ধেক মাত্রাবৃত্তের ধর্ম রক্ষা করে, অর্ধেক অক্ষরবৃত্তের, তাই 'মিশ্র'। কথা হ'ল এই যে, উক্ত পয়ার ঢঙের ছন্দে মাঝের সিলেব্‌ল্‌এর দীর্ঘতা অতিকিঞ্চিৎ, এক সিলেব্‌ল্ = একমাত্রা এর হেরফের হয় না বলেই চলে (হলে বলব, এটি ভুল হ'ল) অথবা শব্দশেষে ব্যঞ্জনান্ত যৌগিক থাকলে সেখানে দু'মাত্রা। এটি যে নিয়মিত ভাবে কেন হয় তার বৈজ্ঞানিক কারণ পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে। এই যে অতিনিশ্চিত সুনিয়মিত একটি ব্যাপার এরই জন্যে ব্যাপক 'মিশ্র' বিশেষণ লাগাতে হবে? আর পুরাতন-স্মৃতির মাত্রাবৃত্ত ঢঙ্ বা স্বরধর্মের বিশেষত্ব ধ'রে সুবর্ণিত ধ্বনিপ্রধান যদি অব্যাপ্তি-অতিব্যাপ্তি-দোষ-হীন আখ্যা না হয়, তাহ'লে এর যে আধুনিক স্থির-লক্ষণ (মধ্যযুগে যে ব্যতিক্রমই

থাক্ না কেন), যৌগিকের অবশ্য দ্বিমাত্রিকতা—সেই লক্ষণ ধ'রেই তো ত্রুটিহীন নামকরণ করা যেতে পারে।

এইবার আলোচনার শেষের দিকে আসছি। ছন্দের প্রকৃতি-বিশেষে পর্ব (Bar) কত কত মাত্রায় হবে? পর্বে পর্বে যতিই বা কতক্ষণ থাকবে? ছান্দসিকেরা এর যে জবাব দিচ্ছেন তাতেও দেখা যায় ঐ অন্তর্লীন বিশেষ বিশেষ সুরধর্মই মাত্রা-সমঞ্জস পর্ববিভাগের নিয়ন্তা। এবিষয়ে তাঁরা একমত যে শ্বসিত বা ছড়া-জাতীয় ছন্দের পর্ব সর্বত্র চারমাত্রা ওজনের। প্রয়োজনমত বাড়িয়ে-কমিয়ে চারমাত্রার মাপ ঠিক রাখতে হবে। মাত্রাবৃত্ত বা যৌগিক-দ্বিমাত্রিকে সুনীতিকুমার ও অমূল্যধনের মতে ৫, ৬, ৭, ৮, আর রবীন্দ্রনাথ ও প্রবোধচন্দ্রের মতে ঐ সঙ্গে চারও। রবীন্দ্রনাথ গানের সুরতালের দিক লক্ষ্য রেখে তিনের কথাও উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, মাত্রাবৃত্তের মূলে তিনের বাঁধন, অন্য দুই রীতির মূলে দুয়ের বাঁধন। মাত্রাবৃত্তের পাঁচ=৩+২, ক্বচিৎ ২+৩; ছয়ের পর্বের ক্ষেত্রে ৩+৩; আটের বেলায় ৩+৩+২, সাতের বেলায় ৩+৩+১। রবীন্দ্রনাথের মতে ৯ মাত্রার পর্ব চলে, অমূল্যধনের মতে চলে না, ৬+৩এ ভেঙে নিতে হয়। বস্তুতই আধুনিকে নয়ের পর্ব অচল, কিন্তু মধ্যযুগে পয়ার-ঢঙেও তা ছিল। কবিকঙ্কণ তাঁর ত্রিপদীবন্ধে ৭+৭+৯এর বিষম চালে একচরণ অন্তত ছ'টি ক্ষেত্রে দেখিয়েছেন। কবিকঙ্কণের মূল পাঠ আমরা ধ'রে ফেলায় এটিও ধরা পড়েছে। প্রাকৃত পৈঙ্গলে মাত্রামূলক ৭+৭+৯এর ত্রিপদীর পরিচয় রয়েছে। এরই অনুসরণে ব্রজবুলির কবি গোবিন্দদাস বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে ৭+৯এর গ্রন্থন করেছেন। ৮+৮ হিসাবেই ওগুলি আমাদের কানে ভালো শোনায় বটে, কিন্তু যখন দেখা যায় যে ৮+৮ করতে গেলে প্রায়শই 'চঞ্চল চরণক মলতলে ঝংকরু' এরকম শব্দাগ্রেই ভেঙে নিতে হচ্ছে, তখনই সংশয় জাগে এবং ৭+৯এর (প্রাঃ পৈঙ্গলের নাগেন্দ্র কি মহেন্দ্র মনে পড়ছে না) মধ্যেই স্থির হতে হয়। যাই হোক আমাদের পর্ব-ধারণা শক্তি আগের থেকে হ্রাস পেয়েছে একথা মানতেই হবে (কারণটা ঐ 'বল' বা ঝোঁক যা লঘুতর পর্বের দিকে নিয়ে আসে), মাত্রানির্ভর ঢিমে-তেতালা আর ধাতে সইছে না। 'বদসি যদি কিঞ্চিদপি' প্রভৃতি অপভ্রংশের দশমাত্রিক পর্বের ছন্দ, বাঙলায় পাঁচে-পাঁচে ভাঙলে তবেই উচ্চারণ সুখাবহ হবে।

পরিশেষে ছন্দের যতির সঙ্গে গানের তালের সম্বন্ধ। সুনীতিকুমার সুরধর্ম বা সাংগীতিকতা লক্ষ্য করেছেন। বিশ্লেষণ ক'রে এ বিষয়টি বোঝান নি। অমূল্যধনের মতে অনেক ক্ষেত্রেই তালের পদক্ষেপের সঙ্গে কবিতার যতির মিল পাওয়া যায়।

প্রবোধচন্দ্রের মতে না পাওয়াই স্বাভাবিক, কারণ "বাক্‌বিন্যাস স্বভাবতই নির্ভর করে ভাষাগত ভাবের উপর। সংগীতের পক্ষে তা অলঙ্ঘনীয় নয়।" মনে সন্দেহ হয় যথাযথ কথা শুনছি কিনা, কারণ কথার ভাবের সঙ্গে সুরের সংগতিবিধানই তো রবীন্দ্রনাথের সংগীতশিল্পের প্রণিধানযোগ্য বিষয়। তা ছাড়া কাব্যাঙ্গ সংগীতেও তাই, কাওয়ালি, একতালা ঝাঁপতাল প্রভৃতি দেখুন, পূর্বেকার গান-কবিতার যতির সঙ্গে মেলে কি না। প্রবোধচন্দ্র উদাহরণ দিয়েছেন—ঐ আসে/ঐ অতি/ভৈরব /হরষে। আমাদের ধারণায় এটি জোর ক'রে ব্যতিক্রম সংঘটন। নৃত্যে প্রয়োগ করার জন্যই ঐধরনের তাল পর্ব গঠনের প্রয়োজন হয়েছিল। নতুবা সাধারণভাবে কবিতাটি—ঐ আসে ঐ/অতি ভৈরব/হরষে প্রভৃতি পর্বেও অনায়াসে দাদ্‌রা তালে গীত হওয়ার যোগ্য ছিল। এরকম স্বেচ্ছাকৃত বিভ্রাট তিনি অন্য দু'একটি ক্ষেত্রেও করেছেন। কবিতার উচ্চারণে মাত্রামূল্য গাণিতিক নয়, গানে গাণিতিক, এরকম কথা (প্রাবোধচন্দ্র) কোন পার্থক্যের নির্দেশক নয়, কবিতাতেই বা মাত্রাপাঠ গাণিতিক হবে না কেন? কে ঠিক আবৃত্তি করছে, কে করছে না এ কবিতার সমঝদার বেশ ধরে ফেলবেন, ১ মাত্রার জায়গায় ১½ অথবা দু'মাত্রার জায়গায় ১½ তাঁর কানে লাগা উচিত। অবশ্য ঐ নিয়ে মারামারি করা হয় না, বা সমঝদার মেলে না, সে ভিন্ন কথা। গান এবং কবিতার তাল ও যতির মূলে আদিমে একটা মিল ছিলই। কিন্তু সুরে গান আগে, না কবিতা আগে, কে নির্ণয় করবে?

সেই বিজ্ঞ যুবক

রমাপদ চৌধুরী

শিক্ষিত পৃথিবীর কাছে বাঙালীর গর্ব করে বলার মত মানুষটি বিদায় নিয়ে চলে গেলেন।

পৃথিবীর সর্বত্রই এখন খাটো মানুষগুলিরই দাপট বেশি। কারণ এটা মঞ্চের যুগ। বক্তৃতামঞ্চের, নাটমঞ্চের। রেডিও, টিভি, খবরের কাগজের পাদপ্রদীপ সারা পৃথিবীতেই কত সহজে ক্ষুদ্র মস্তিষ্ককে মহামনীষী বানিয়ে দিচ্ছে। যারা সে-যুগে সেকেন্দ্রিয়ার গ্রন্থাগার ধ্বংস করেছিল তাদের সঙ্গে এ-যুগের মানুষের মানসিকতায় বোধহয় খুব একটা পার্থক্য নেই। এ-যুগে তাই ঋষির চেয়ে তবলা-বাজিয়ের কদর বেশি। তবু এতদিন সান্ত্বনা ছিল, একজন ঋষি আছেন।

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের নামের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলাম 'শেষের কবিতা' পড়ার অনেক আগেই। তারপর একসময় কোন আসরে কিংবা বিবাহ-বাসরের চৌকাঠের বাইরে দাঁড়িয়ে তাঁকে দেখেছি, তাঁর অনর্গল পাণ্ডিত্যের বিশ্বভ্রমণ তন্ময় হয়ে শুনেছি।

প্রথম আলাপ যেদিন কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে গেলাম তাঁর কাছে, কোন স্বর্গত সাহিত্যিকের দুঃস্থ পরিবারবর্গের জন্যে সরকারী সাহায্য আদায়ের চেষ্টায়।

নির্জন নিঃশব্দ বসার ঘরটিতে অপেক্ষা করছি, পাশেই একটি সুবিশাল তাম্রপাত্রে জলে ভাসছে শুধু কয়েকটি তাজা রক্তপদ্ম। কোথাও আর কোন ফুলের বাহুল্য নেই। সঙ্গে সঙ্গে সেই ভোজনরসিক অনর্গল-বাক্ মানুষটির ভিতরটা যেন এক লহমায় দেখতে পেলাম। আর তখনই সিঁড়ি ভেঙে নামা চটির শব্দ মিলিয়ে গিয়ে অশীতিপর সেই বলিষ্ঠ যুবক সশরীরে উপস্থিত। পরিচয় করিয়ে দিতে না দিতেই বলে উঠলেন, আরে আসুন আসুন। অক্লেশে আবার সিঁড়ি ভেঙে উঠলেন। তাঁর তিনতলার ঘরের চারপাশে বই, বই, আর বইয়ের মাঝখানে ফিরে গিয়ে যেন স্বস্তি পেলেন।

উদ্দেশ্য শোনামাত্র চঞ্চল হয়ে উঠলেন, দীর্ঘ একখানা চিঠি লিখে দিলেন। টেলিফোন করবেন কাকে কাকে তাও জানালেন। এমন কি প্রয়োজন হলে কার সঙ্গে দেখা করবেন, তাও।

তারপরই সাহিত্যিকদের আর্থিক অবস্থা থেকে সে-যুগের সামাজিক অবস্থা। কবি কথার অর্থ যে কবিতা-লিখিয়ে নয়, গল্পকার-ঔপন্যাসিক-ঐতিহাসিক-দার্শনিক থেকে ঋষি পর্যন্ত সকলেই কবি, বেদব্যাস বাল্মীকির তো এত সম্মান, অথচ প্রাচীনকালে এদেশে কোথায় কখন লেখক এবং শিল্পীদের বসবাস করতে হতো গ্রামের বাইরে, বৃক্ষমূলে, তা থেকে চারণ এবং সূত, ব্রাত্যোস্তোমর বিধানে তাদের কিভাবে ব্রাহ্মণত্ব গেল ইত্যাদি ইত্যাদি। তারই ফাঁকে ফাঁকে সরস রসিকতা। এবং বিশ্বভ্রমণ। ফেরার পথে মনে হয়েছিল একটি ঘণ্টায় আমি অনেক কিছু জেনে গেছি এবং সেই সত্যটি যে আমি কিছুই জানি না।

এরপরও তাঁর কাছে কয়েকবার যাবার সৌভাগ্য হয়েছে।

কি যেন বলছিলাম তাঁকে, ভুরু কুঁচকে কান পেতে শোনার এমন ভঙ্গি করলেন অস্বস্তি বোধ করলাম। তারপরই হঠাৎ বলে উঠলেন, বদ্ধমানের সঙ্গে মেদনীপুরের টান কেন ?

হেসেছিলেন সব শুনে, আর আমি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। কারণ প্রথমটির সঙ্গে আমার কোন সম্পর্কই ছিল না চল্লিশ বছর বয়স অবধি, যদিও সেটি আমার জন্মভূমি। আর দ্বিতীয়টি আমার জন্মস্থান হলেও তিরিশ পঁয়ত্রিশ বছর কোলকাতায় বসবাস করে আমার ধারণা ছিল আমি পুরোপুরি ভাষা বদলে ফেলেছি।

অবাক হবারই কথা, কারণ আজ অবধি অন্য কেউই এই কথাটা আবিষ্কার করতে পারেন নি, কারণ সযত্নে ও দুটো প্রভাব লুকোবারই চেষ্টা করে এসেছি।

এরপরও যখনই গিয়েছি তিনি সদাহাস্য অকৃপণ বক্তা।

একটি দিনের কথা মনে আছে। যথারীতি তাঁর গল্প চলছে, সেদিন তাঁর বসার ঘরেই, নীচে, হঠাৎ টেলিফোন এলো। উঠে গেলেন পাশের ঘরে। দু'চারটি কথা ইংরেজীতে, তারপর বহুক্ষণ অনর্গল কোন বিদেশী ভাষায় কথা বলে গেলেন টেলিফোনে। জিজ্ঞেস করতে সঙ্কোচ হয়েছিল, তাই আজও জানি না কোন্ ভাষা!

কিন্তু বহুভাষাবিদ্ এটাই তাঁর পরিচয় নয়। তিনি ছিলেন সেই দুর্লভ বৈজ্ঞানিক, যিনি ভাষার নাড়ীনক্ষত্র পরীক্ষা করে ইতিহাসকে জীবন্ত করে তুলতেন।

তাঁকে দেখেই মনে হয়েছিল, যিনি সব সময়ে কাজের মধ্যে ডুবে থাকেন, তাঁরই বিলিয়ে দেবার মত প্রচুর অবসর থাকে।

ভাষাতত্ত্ববিদ্যা ও সুনীতিকুমার

দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ছিলেন ভাষাতত্ত্ববিদ্যার একচ্ছত্র অধিপতি। প্রথম প্রকাশেই তিনি এই গৌরবান্বিত আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন এবং জীবনাবসান পর্যন্ত পূর্ণ গরিমায় পূর্ণ মহিমায় এই আসনে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি আজ অস্তমিত,—সে আসন শূন্য আজি—।

তাঁর কীর্তিস্তম্ভ 'Origin and Development of the Bengali Language' দুটি বিরাট খণ্ডে সমাপ্ত হয়েছিল ১৯২৬ সালে। তখন তাঁর বয়স ৩৬ বৎসর। তাঁর লেখা থেকে পাই, এর ১২।১৩ বছর আগে অর্থাৎ ২৩।২৪ বছর বয়স থেকে ইংরাজী ভাষা ও জর্মনিক ভাষাতত্ত্ব পড়তে পড়তে নিয়মতান্ত্রিকভাবে নিজের মাতৃভাষার ইতিহাস অনুসন্ধান করার বাসনা তাঁর মনে দানা বাঁধে। ইংরাজী ভাষার তত্ত্বকথা জানার জন্য যে সব আধুনিক পদ্ধতির ব্যবহার তিনি দেখেছিলেন, সেগুলি তাঁর বিস্ময় ও উৎসাহ জাগিয়ে তুলেছিল। তখন থেকেই পড়তে লাগলেন ইংরাজী ভাষাতাত্ত্বিকদের রচনা ও তার সঙ্গে ভারতীয় আর্যভাষার অনুসন্ধানী পণ্ডিতদের লেখা,—Uhlenbeck, Wackernagel, Whitney, Pischel, Beames, Bhandarkar, Hoernle, Grierson প্রভৃতি। আর যোগাড় করতে লাগলেন বই থেকে ও মুখের কথা থেকে সব মালমশলা যা ছড়িয়ে আছে চারদিকে। তিনি ইংরাজী 'বি' গ্রুপে এম্-এ পাস করেন। ৩।৪ বছর এলোমেলো সংগ্রহের পর ১৯১৬ সালে তিনি P.R.S.-এর জন্য তিন বছরের গবেষণা সূচী খাড়া করলেন, নাম দিলেন "An Essay Towards an Historical and Comparative Grammar of the Bengali Language"। নিদর্শন হিসাবে হাজির করলেন বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব বিষয়ক একটি প্রবন্ধ "The Sounds of Modern Bengali"। ১৯১৯ সালে শিক্ষার্থে ইউরোপ যাত্রায় বহু ভাষাতাত্ত্বিক পণ্ডিতের কাছে তাঁর প্রারব্ধ কাজের প্রচুর উন্নতি করার সমস্ত সুযোগের সদ্ব্যবহার করলেন। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি প্রথমে Phonetics-এ ডিপ্লোমা, পরে ১৯২১ সালে Indo-Aryan Philology নামে thesis দিয়ে D. Litt. ডিগ্রী লাভ করেন। এর পরেও আবার, বিশেষ করে ফ্রান্সে কয়েকজন ভাষাতাত্ত্বিক পণ্ডিতের এবং জর্মনী ও গ্রীসে কয়েকজন পণ্ডিতের কাছে

নানাভাষার বিদ্যা সংগ্রহ করেন। ইংলণ্ডে জর্জ গ্রীয়ার্সন বিশেষ করে তাঁর গবেষণার বিষয়ে আগ্রহান্বিত ছিলেন। তাঁর সঙ্গে ও ফরাসী পণ্ডিত ঝু-ল ব্লখের পাণ্ডিত্যের সংস্পর্শে এসে তিনি অশেষ লাভবান হয়েছিলেন। এঁদের কথা তিনি কৃতজ্ঞ-চিত্তে স্মরণ করেছেন। (ODBL, Preface)

দেশে ফিরে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের খয়রা অধ্যাপক হলেন ভারতীয় ভাষাতত্ত্ব ও ধ্বনিতত্ত্বে, এবং তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব বিভাগের বিভাগীয় প্রধান, ১৯২২ সালে। বাংলা ভাষার তাত্ত্বিক পদ্ধতিতে তাঁর নিজস্ব সংগ্রহ ক্রমাগত বিদেশের বিশেষজ্ঞদের কাছে শিক্ষা ও সমালোচনায় পরিশীলিত হয়ে ODBL যখন অপূর্ব পাণ্ডিত্যের নিদর্শনরূপে প্রকাশিত হল বিশ্ববিদ্যালয় মুদ্রণালয় থেকে,—ভাষা-শিক্ষার্থীরা যে তা অপরিসীম শ্রদ্ধা ও বিস্ময়ের সঙ্গে গ্রহণ করেছিল তাতে সন্দেহ নেই। তার মধ্যে নিঃসংশয়ে ছিলেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ, যিনি বহুদিন থেকে বাংলা ভাষার তাত্ত্বিক আলোচনায় প্রবেশ করেছিলেন ;—১৯০৯ সালে তাঁর "শব্দতত্ত্ব" গ্রন্থের প্রকাশ। পাশ্চাত্ত্য ভাষাতাত্ত্বিকদের আলোচনা যে তিনি খুঁটিয়ে পড়তেন, সে বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়েছে তাঁর রচনা। ১৯২৭ সালে কবিগুরুর দ্বীপময় ভারত পরিভ্রমণের সঙ্গী ছিলেন সুনীতিকুমার। কবির বিচক্ষণ দৃষ্টি চিনতে ভুল করেনি তাঁকে। "জাভাযাত্রীর পত্রে" (প্রকাশ, ১৯২৯) তাঁর সম্বন্ধে কবির মন্তব্য কবিসুলভ অতিরঞ্জন-যুক্ত নয়.মোটেই। এতে তিনি লিখেছিলেন :

"আমাদের দলের মধ্যে আছেন সুনীতি। আমি তাঁকে নিছক পণ্ডিত বলেই জানতুম। অর্থাৎ আস্ত জিনিসকে টুকরো করা ও টুকরো জিনিসকে জোড়া দেওয়ার কাজেই তিনি হাত পাকিয়েছেন বলে আমার বিশ্বাস ছিল। কিন্তু এবার দেখলুম বিশ্ব বলতে যে ছবির স্রোতকে বোঝায় যা ভিড় করে ছোটে এবং এক মুহূর্ত স্থির থাকে না তাকে তিনি তালভঙ্গ না করে মনের মধ্যে দ্রুত এবং সম্পূর্ণ ধরতে পারেন আর কাগজে কলমে সেটা দ্রুত এবং সম্পূর্ণ তুলে নিতে পারেন। এই শক্তির মূলে আছে বিশ্বব্যাপারের প্রতি তাঁর মনের সজীব আগ্রহ। তাঁর নিজের কাছে তুচ্ছ বলে কিছুই নেই, তাই তাঁর কলমে তুচ্ছও এমন একটা স্থান পায় যাতে তাকে উপেক্ষা করা যায় না। সাধারণত একথা বলা চলে যে শব্দতত্ত্বের মধ্যে যারা তলিয়ে গেছে, শব্দচিত্র তাদের এলেকার সম্পূর্ণ বাইরে, কেননা চিত্রটা একেবারে উপরের তলায়। কিন্তু সুনীতির মনে সুগভীর তত্ত্ব ভাসমান চিত্রকে ডুবিয়ে মারে নি, এই বড়ো অপূর্ব। সুনীতির নীরন্ধ্র চিঠিগুলি তোমরা যথাসময়ে পড়তে পাবে,—দেখবে

এগুলো একেবারে বাদশাই চিঠি। এতে চিঠির ইম্পিরিয়ালিজম্, বর্ণনাসাম্রাজ্য সর্বগ্রাহী, ছোট বড়ো কিছুই তার থেকে বাদ পড়ে নি।"

সুনীতিবাবুর 'দ্বীপময় ভারত', 'বৈদেশিকী' প্রভৃতি গ্রন্থে এর পরিচয় সুস্পষ্ট। প্রসারিত দৃষ্টিতে তিনি সব জিনিস দেখেছেন, মনে রেখেছেন সব খুঁটিনাটি। তাঁর ধীশক্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল দুটি দুর্লভ গুণের উপর। একটি হল দুরন্ত জ্ঞানপিপাসা—কোন কিছু বাদ না দিয়ে সব কিছু জানার আগ্রহ। দ্বিতীয়টি হল তাঁর অসাধারণ ধারণ-শক্তি, স্মরণের মধুচক্রে সব কিছু সঞ্চিত রাখার অপরূপ ক্ষমতা। মহারথ কর্ণের সহজাত কবচ কুণ্ডলের মত মনে হয় এই গুণ দুটি তাঁর আজন্ম সম্পদ ছিল। এই গুণের পরিচয় বহুক্ষেত্রে দেখে আমি শ্রদ্ধায় অভিভূত হয়েছি। প্রথম গুণটির সঙ্গে সংযুক্ত ছিল তাঁর চিরযৌবনোদ্দীপ্ত উচ্ছল প্রাণশক্তি। এর জন্য তিনি ৮০ বছর বয়সেও বলতেন "I am a young man of eighty"—আমি আশি বছরের যুবক। ১৯৫৩ সালে আমেদাবাদে সর্বভারতীয় প্রাচ্যবিদ্যা সম্মিলনের তিনি নির্বাচিত হয়েছিলেন মূল সভাপতি। সেখানে আমার চাক্ষুষ পরিচয় হয়েছে তাঁর যৌবন-চঞ্চল কর্মশক্তিমান্ ব্যক্তিত্বের সঙ্গে। এখানে কিছুক্ষণ বক্তৃতা দিলেন, ঘুরে এলেন অন্য একটি বিভাগে, কিছু শুনলেন, কিছু বললেন, ক্লান্তিহীন অচঞ্চল। সকালে দুপুরে সন্ধ্যায়। তারই সঙ্গে চলেছে তাঁর অনবদ্য table talk—খুঁটিনাটি নানা ব্যাপারের আলোকময় ফুলঝুরি। একটি চিঠিতে (১৯৬১ সালের ৬ ডিসেম্বর) পরিচয় পাই কী কর্মচঞ্চল জীবনযাত্রা ছিল তাঁর ইউরোপে শিক্ষার্থীরূপে—

"My Dear Dwijen Babu,

I was really glad to read that you have at last been established at Edinburgh. Your real 'tapasya' now has begun and you ought to make the best use of every moment available. The competence you will acquire now will carry you through life in intellectual studies··· But you must acquire some competence in Greek while you are there, and also in Latin, Gothic. Besides, since you are in Edinburgh where there is some study (of) Celtic, if you can manage to add a little Old Irish, it will not come amiss.

I would advise you to do what I did when I was in

Great Britain. Go to some Gaelic church or chapel in Edinburgh some Sunday and attend a Gaelic Service to listen to the swing of the language. Take a little bus drive round about Edinburgh and you can go as far as Glasgow. Then finally, you must make a tour of the Highlands. Go by train from Edinburgh to Inverness, stay there for a day, and come down by steamer along the Caledonian canal spending a day at Fort Augustus, as we did, to Oban. Stay there for one night, and then take a bus drive through the magnificent Trossach Hills back to Brig of Ayr, and then from there by train to Edinburgh. I did this little journey in 1921, and I still after 40 years vividly remember each scene...

অত্যন্ত কুণ্ঠার সঙ্গে ব্যক্তিগত চিঠি থেকে শুধু প্রয়োজনীয় উদ্ধৃতিই দিলুম যাতে অনুমান করতে পারি জ্ঞান আহরণের কি দুর্বার ও প্রচণ্ড আগ্রহে কর্মব্যস্ত ছিলেন তিনি ওদেশে ছাত্রাবস্থায়। অনেক উপদেশ দিয়েছিলেন তিনি। তার মধ্যে একটি "গৃহীত ইব কেশেষু মৃত্যুনা ধর্মমাচরেৎ"—ছাত্রদের (শিক্ষকরাও চিরকালের ছাত্র) জ্ঞান আহরণই হল তপঃ, তাই হল ধর্ম। শিক্ষকতা শুরু করার সময়ে তাঁর উপদেশ ছিল ··"ছাত্রদের কাছে উজাড় করে দিতে হবে, যা কিছু জানি, আর পরিষ্কার বলতে হবে, যা জানি না।" এইসব উপদেশের মধ্যে পাওয়া যায় তাঁর শিক্ষা ও দৃষ্টিভঙ্গির বিশেষত্ব।

ODBL-এর কথায় ফিরে আসি,···এতে কি কি আলোচিত হয়েছে, কোথায় তাঁর নিজস্ব দান, কি বৈশিষ্ট্য দেখা যায় এই গ্রন্থে, যা তাঁকে এককালে সুদুর্লভ অতুলনীয় পণ্ডিতের মর্যাদা দিয়েছে। প্রধানত বাংলাভাষার উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ এই গ্রন্থের আলোচ্য বিষয় হলেও তাঁর দৃষ্টির স্বভাবসুলভ ব্যাপকত্বের ফলে, যার কারণ আগেই বিশ্লেষণ করেছি এবং পূর্ব-পরিকল্পিত বিষয়বস্তুর সঙ্গে দেশবিদেশের থেকে নানা সংগ্রহের ফল যুক্ত হওয়ায় ফলে এই গ্রন্থে বহু বিষয় পরিবেশিত হয়েছে যাকে অনেকে বলবেন অপ্রাসঙ্গিক।

প্রথম সর্বভারতীয় ভাষাতাত্ত্বিকদের সম্মেলনে (পুনা, ১৯৭০) সুনীতিবাবু ছিলেন সভাপতি। তাঁর ভাষণে তিনি বলেছেন:

"ভাষাতত্ত্ব পাঠ শুরু করার সময়ে দেখেছি বিষয়টি কারও ঠিকমত জানা ছিল না বললেই হয়, আর জনপ্রিয়তা ছিলই না। এই বিষয়কে ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপকেরা অবজ্ঞার চোখে দেখতেন এমন কি সন্দেহের চোখেও এবং কার্যত নিষিদ্ধ করে রেখেছিলেন। আমি যখন ১৯০৭ সালে কলেজে পড়া আরম্ভ করি, তখন ভাষাকে তুলনা করে পড়ার ব্যবস্থা ছিল না। প্রাচীন ব্যাকরণের পদ্ধতিতে বর্ণনামূলকই ছিল।...আমি বলেছি ইংরাজীতে B. A. Honours ও M. A. পড়তে পড়তে ইণ্ডো-ইউরোপীয় ও ভারতীয় আর্য ভাষার ভাষাতত্ত্বের দিকে আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছিল। ইউরোপে গিয়ে আমি খুব সুবিধা পেয়েছিলুম। সেখানে Daniel Jones প্রভৃতি মনীষীদের কাছে বিশেষত দু বছর ধরে ধ্বনিতত্ত্বে নিয়মিত চর্চা করে জেনেছিলুম ভাষার বর্ণনা-মূলক, ইতিবৃত্তমূলক ও তুলনামূলক শিক্ষায় ধ্বনিতত্ত্বের গুরুত্ব কতখানি।" (অনুবাদ আমার)

এই ধ্বনিতত্ত্বে শিক্ষার পরিচয় ODBL-এ আগাগোড়া ছড়ানো রয়েছে। বিভিন্ন ভাষার বিভিন্ন রকমের Transliteration বা অনুলিখন পদ্ধতি দিয়ে ODBL-এর আরম্ভ। এতে বাংলাধ্বনি এবং সংস্কৃত, প্রাকৃত, ফারসী, আরবী ও অন্যান্য ভাষার ধ্বনি সম্বন্ধে তাঁর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম জ্ঞান প্রকাশ পেল। তারপরে Phonetic transcription যা তাঁরই ভারতে প্রথম দান বলা চলে, তার বিস্তৃত তালিকা অবশ্যই বিস্ময়ের সঞ্চার করেছিল। প্রায় দেড়শ' পৃষ্ঠাব্যাপী Introduction এবং তার পরে আবার প্রায় শ'খানেক পাতার Appendix পাঁচটি। তারপর ৪২০ পৃষ্ঠাব্যাপী Phonology এবং ৪০০ পৃষ্ঠাব্যাপী Morphology—এই বিস্তৃত পাণ্ডিত্যের নিদর্শন ইতিপূর্বে দেখা যায় নি। প্রায় সর্বত্র তিনি বাংলা শব্দ না হলে রোমান অক্ষরে এবং যেখানে উচ্চারণ বিশেষ ভাবে উল্লেখ্য সেখানে Phonetic transcript দেখিয়েছেন।

Phonology অংশে প্রথমে সমগ্রভাবে ভারতীয় আর্য ভাষার ধ্বনির ইতিহাস বলেছেন। সংস্কৃত, মধ্য ভারতীয় আর্য ভাষা ও বাংলা ভাষার বিভিন্ন স্তরের ধ্বনির ক্রমবিকাশ দেখিয়ে পারস্পরিক তুলনা করেছেন। তারপর বাংলার ধ্বনির দুটি প্রধান বিভাগ করে (স্বদেশী ও বিদেশী উপাদান) ধ্বনি বিবর্তনের আলোচনা করেছেন। বাংলার স্বরাঘাত পদ্ধতির ক্রমবিকাশ ও ছন্দের বিকাশের সঙ্গে তার সম্বন্ধ একটি বিশেষ অধ্যায়ে আলোচনা করে তারপর প্রথমে প্রাচীন ও মধ্য ভারতীয় আর্য ভাষায় ধ্বনিগুলির বিবর্তনধারা দেখিয়ে বাংলা ভাষার ধ্বনির

ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ক্রমে ক্রমে দেখিয়েছেন। বাংলায় অপিনিহিতি, অভিশ্রুতি ও স্বরসঙ্গতির ব্যবহার সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য বাংলাভাষাতত্ত্বে এক বিশেষ দান। 'বাংলা-ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা' গ্রন্থেও তিনি এর বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। বিদেশী উপাদানের আলোচনাও তাঁর বেশ বিস্তৃত। আরবী, ফারসী, পোর্তুগীস ও ইংরাজী ভাষা থেকে বাংলায় যে সব শব্দ এসেছে তাদের ধ্বনিতাত্ত্বিক পরিবর্তন তিনি সুন্দরভাবে দেখিয়ে দিয়েছেন। তিনি এতই খুঁটিয়ে কাজ করেছেন যে প্রাচীন বাংলা, মধ্য বাংলার সঙ্গে আধুনিক বাংলার উদাহরণগুলি তুলনা তো করেছেনই, তাছাড়া অসমীয়া, ওড়িয়া, মৈথিলী ভাষা থেকে এবং বাংলার বিভিন্ন উপভাষার তুলনামূলক আলোচনা কোন কিছুই তিনি বাকি রাখেন নি। এর থেকে অংশ নিয়ে নিয়ে নানা গবেষণা নিবন্ধ তৈরি হতে পারত। ধ্বনিতাত্ত্বিক বিবর্তন দেখাতে গিয়ে অনেক সময়ে ক্রমপর্যায়ে বহু শব্দ লিখিত নিদর্শন থেকে উদ্ধার করা সম্ভব যেখানে হয় নি সেখানে তিনি আনুমানিক শব্দ গঠন করে নিয়েছেন ধ্বনিসূত্র অনুযায়ী। এখানেই তাঁর কৃতিত্ব। এ বিষয়ে যাঁদের দক্ষতা নেই তাঁরা এ চেষ্টায় অকৃতকার্য হবেন—ভ্রান্ত নিরুক্তি বা লোকনিরুক্তির জালে কখন জড়িয়ে পড়বেন, তাঁরা জানবেন না। বস্তুতঃ ধ্বনিতত্ত্বের বিস্তৃত ও গভীর জ্ঞান না থাকলে শব্দের ব্যুৎপত্তি নির্ণয়ের চেষ্টা বিফল হতে বাধ্য।

Morphology অংশে প্রকৃতি প্রত্যয় নির্ণয় করতে তিনি ভাষার ইতিহাসের দিক থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নেন নি। বিশেষ্যের শব্দরূপ অংশে লিঙ্গ, বচন, কারক ও অনুসর্গ আলোচনা করেছেন। Syntax নামে কোনও অংশ না করায় তিনি এই Morphology অংশেই কিছু কিছু Syntax-এর প্রসঙ্গ এনে ফেলেছেন যেমন বিভিন্ন কারক বোঝাতে বিভিন্ন বিভক্তির ব্যবহার, যদিও তেমন আলাদা করে তিনি দেখান নি। পদাশ্রিত নির্দেশক বা সংখ্যাবাচক শব্দাংশ আলোচনা করে সংখ্যাবাচক বাংলা শব্দগুলির ঐতিহাসিক বিবর্তনের আলোচনা করেছেন। সর্বনামের ও ক্রিয়াপদের বিস্তৃত বিবর্তন বিবরণ বিশেষ উল্লেখ্য কৃতিত্ব তাঁর।

সাধারণ ব্যাকরণে Morphology-রই আলোচনা সমধিক। 'ভাষা প্রকাশ বাংলা ব্যাকরণ' নামে ১৯৩৯ সালে তিনি একটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। ODBL-এ যা আছে তারই সার সংক্ষেপ তিনি করেন নি এই গ্রন্থে। অনেক বিষয় নূতন করে আলোচিত হয়েছে এখানে। তা ছাড়া ধ্বনিতত্ত্বের আলোচনা এত বিস্তৃতভাবে ইতিপূর্বে কোনও ব্যাকরণে করা হয় নি। তার কারণ ধ্বনিতত্ত্বের আলোচনার যোগ্যতা ইতিপূর্বে কারও ছিল না এদেশে। ব্যাকরণের প্রয়োজন সম্বন্ধে এ দেশের

মনীষীরা অবহিত ছিলেন। ১৩০৮ সালের বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় ও বঙ্গদর্শনে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ও রবীন্দ্রনাথ লিখলেন যথার্থ বাংলা ব্যাকরণ প্রণয়ন করার প্রয়োজন রয়েছে। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন,—

> "বাংলায় জল হইতে জোলো,……জ্যাঠা হইতে জ্যাঠাম প্রভৃতি চলিত কথাগুলি হইতে উয়া, তা, আম প্রভৃতি প্রত্যয় সংকলন করিয়া ভাবী ব্যাকরণকারের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছিলাম। ব্যাকরণ তাঁহারাই করিবেন। আমার কেবল মজুরিই সার।"

রামেন্দ্রসুন্দর তাঁর "বাংলা ব্যাকরণ" প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের প্রশংসা করেছিলেন,—

> "আমরা যতদূর বুঝিয়াছি রবিবাবু (বাংলা ব্যাকরণ শাস্ত্রে) সেই মশলা সংগ্রহের জন্য সকলকে আহ্বান করিয়াছেন মাত্র এবং এই মজুরের কার্যে যদি কেহ অপমানবোধ করেন, এই কর্মকে হেয় কার্য জ্ঞান করেন, সেই জন্য স্বয়ং মজুর বৃত্তি গ্রহণ করিয়া অন্যের অনুকরণীয় হইয়াছেন মাত্র। তজ্জন্য তিনি ধন্য; তজ্জন্য তিনি কৃতজ্ঞতার ভাজন; তজ্জন্য সাহিত্যসমাজ তাঁহার নিকট ঋণবদ্ধ। তিনি পাণিনি স্থলাভিষিক্ত হইবার স্পর্ধা করেন নাই। তবে ভবিষ্যতের পাণিনি যে অট্টালিকা নির্মাণ করিবেন তাহার কোন ক্ষুদ্র অংশের নক্সায় আঁচড় ফেলিবার চেষ্টা করিয়া যদি সফল হন বা কোন ক্ষুদ্র অংশের ভিত্তি স্থাপনে সমর্থ হন তাহা হইলেই তাঁহার কৃতিত্ব প্রশংসার্হ হইবে।"

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ব্যাকরণকারদের কেবল মালমশলার যোগানদারই ছিলেন না। সুনীতিবাবু ODBL-এর মুখবন্ধে তাঁর সম্বন্ধে বলেছিলেন যে তিনিই প্রথম ভাষার সমস্যাগুলোর মোকাবিলা করেছিলেন বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি দিয়ে। তাঁর মতে কবি ছিলেন—

> "a keen philologist as well, distinguished alike by an assiduous enquiry into the facts of the language and by a scholarly appreciation of the methods and findings of the modern western philologist."

কবি ধ্বনিতত্ত্ব ও ধ্বন্যাত্মক শব্দ এবং বাংলা বিশেষ্য প্রভৃতি সম্বন্ধে যে সব প্রবন্ধ ইতিপূর্ব লিখেছিলেন তার সম্বন্ধে তিনি বলেছেন—

> "These papers may be said to have shown to the Bengali enquiring into the problems of his language the proper lines of approaching them."

রবীন্দ্রনাথের ঐ সব রচনা "শব্দতত্ত্ব" গ্রন্থে প্রকাশিত হয় ১৯০৯ সালে। তারপর যখন তাঁর ভাষাতত্ত্ব বিষয়ক দ্বিতীয় গ্রন্থ "বাংলা ভাষা পরিচয়" প্রকাশিত হয় ১৯৩৮ সালে তখন সুনীতিবাবু প্রতিষ্ঠিত ভাষাতত্ত্ব-যুগন্ধর। তাই রবীন্দ্রনাথ "ভাষাচার্য" উপাধি দিয়ে তাঁকে এই গ্রন্থটি উৎসর্গ করলেন। এই গ্রন্থের গোড়ায় কবি লিখেছেন—

> "ভাষাতত্ত্বে প্রবীণ সুনীতিকুমারের সঙ্গে আমার তফাৎ এই—তিনি যেন ভাষা সম্বন্ধে ভূগোল্ বিজ্ঞানী, আর আমি যেন পায়ে চলা পথের ভ্রমণকারী। নানা দেশের শব্দমহলের এমন কি তার প্রেতলোকের হাটহদ্দ জানেন তিনি, প্রমাণে অনুমানে মিলিয়ে তার খবর দিতে পারেন সুসম্বন্ধ প্রণালীতে।"

পরে আবার লিখেছেন—

> "যে প্রাচীন প্রাকৃতের সঙ্গে বাংলা প্রাকৃতের নিকট সম্বন্ধ তার রঙ্গভূমিতে আমাদের স্বরবর্ণগুলি জন্মান্তরে কী রকম লীলা করে এসেছে তার অনুসরণ করে এলে অপভ্রংশের কতকগুলি বাঁধারীতি হয়ত পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু সে পথের পথিক আমি নই। খবর নিতে হলে যেতে হবে সুনীতিকুমারের দ্বারে।"

ভাষা-বিচক্ষণ কবি রবীন্দ্রনাথের এই সব মন্তব্যে ভাষাতাত্ত্বিক সুনীতিকুমারের নিঃসন্দিগ্ধ শ্রেষ্ঠত্ব অতি সুন্দর প্রকাশিত হয়েছে।

ODBL গ্রন্থের Foreword লিখেছিলেন স্যর জর্জ আব্রাহাম গ্রীয়ার্সন, যাঁর "ভারতীয় ভাষার সমীক্ষা" (একাধিক খণ্ডাংশ সমন্বিত এগারোটি বৃহৎ গ্রন্থে বিধৃত) ভাষাতত্ত্বে এক বিরাট দান। সুনীতিবাবু তাঁর ভারতীয় আর্যভাষার বহির্বর্গ বিভাগের সম্যক্‌ভাবে খণ্ডন করেছেন যুক্তি উদাহরণ দিয়ে। এই গ্রীয়ার্সন লিখলেন—

> "Endowed with a thorough familiarity with Bengali, —his native tongue,—he has been able to bring together an amount of material which no European could ever have hoped to collect; and he has had

the further advantage of pursuing his theoretical studies under the guidance of some of the greatest European authorities on Indian philology. This work is accordingly the result of a happy combination of proficiency in facts and of familiarity with theory and exhibits a mastery of detail controlled and ordered by the sobriety of true scholarship."

এর চেয়ে সুষ্ঠু সমালোচনা আর হয় না। সুনীতিবাবু যদিও স্বীকার করেছেন যে ঝু-ল ব্লখের "মারাঠী ভাষার গঠন" তাঁর গ্রন্থের কাঠামো ঠিক করে দিয়েছিল এবং স্বভাবসিদ্ধ গুরুপ্রশংসায় তিনি ব্লখের সম্বন্ধে উচ্ছ্বসিত, তবু গ্রীয়ার্সনের তীক্ষ্ণ বিচার অনুযায়ী তিনি ব্লখের চেয়ে অনেক বেশি যোগ্যতা দেখিয়েছেন—সিন্ধী ব্যাকরণের প্রণেতা Trumpp, হিন্দী ব্যাকরণ প্রণেতা Kellogg, বা হিন্দুস্থানী ব্যাকরণ প্রণেতা C. J. Lyall-এর চেয়েও।

তিনি বলেছেন, "আমার কাজ, এই ক্ষেত্রে ভারতে প্রথম বলে স্বাভাবিকভাবেই চিহ্নিতস্তম্ভের সুবিধা পেয়েছিল, যা থেকে বহু পরবর্তী গবেষক নীতি, পদ্ধতি ধারার অনুসরণ করার সুযোগ পেয়েছেন।" (সভাপতির ভাষণ ১৯৭০) তিনি একটি ভাষাতত্ত্বের চর্চার নিজস্ব ধারার (School) সৃষ্টি করেছেন ভারতীয়দের জন্যে, যা হিন্দী, উর্দু, তামিল, তেলুগু, মালয়ালাম, কন্নড, বাংলা, ওড়িয়া, মৈথিলী, অসমীয়া, কাশ্মীরী, পঞ্জাবী, সিন্ধী, ভোজপুরী প্রভৃতি ভাষার উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ আলোচনায় গবেষকেরা স্বচ্ছন্দে অনুগমন করে কৃতবিদ্য হয়েছেন।

তাঁর "ভাষাপ্রকাশ বাংলা ব্যাকরণের" প্রসঙ্গ আরও একটু তুলে বলতে চাই, ODBL সাধারণের কাছে গম্ভীর ও প্রকাণ্ড বিস্ময় বলে দূরে সরানো ছিল, কিন্তু ব্যাকরণ হিসাবে এই গ্রন্থকে এড়ানো গেল না, পঠনীয় বলে বিবেচিত করতে ভাষাশিক্ষকদের ভীতির সঞ্চার হয়েছিল। কারণ, এই ধরনের পাঠ্য ছাত্রদের কাছে পরিবেশনের যোগ্যতা অর্জন করাও শিক্ষকদের কাছে সুকঠিন ছিল। তাঁর ব্যাকরণ আরও এক সম্প্রদায়কে অসন্তুষ্ট করেছিল, যাঁরা সংস্কৃত ব্যাকরণের সাজে বাংলা ব্যাকরণকে দেখতে অভ্যস্ত ছিলেন। এঁরা তাঁর ধ্বনিসূত্রানুমোদিত শব্দের ব্যুৎপত্তি বুঝতে না পেরে অনেক সময় ভ্রান্ত-নিরুক্তি দিয়ে তাঁর বিকৃত অনুসরণ করতে গিয়েছেন।

ODBL-এর অনেক কথা তাঁর বাংলা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা' এবং

"Languages and Literatures of Modern India" প্রভৃতি গ্রন্থে পুনরুল্লিখিত হয়েছে। এর কারণ তাঁর গবেষণা-দৃষ্টির একটা নিজস্বতা ছিল। গবেষণা সম্বন্ধে তিনি বলতেন—"খণ্ডন আর মণ্ডন"। শুধু পূর্বসূরীদের মতামত খণ্ডন করাই নয়, ইতিপূর্বে পণ্ডিতদের যে সব সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে তা যদি ত্রুটিহীন হয় তবে সেগুলিকে নিজস্ব বক্তব্যের অনুকূল করে সাজিয়ে গুছিয়ে বা মণ্ডন করে উপস্থিত করাকেও গবেষণা বলা চলে, এই কথা বলতেন তিনি। তাই নিজের যে সব বক্তব্য সম্বন্ধে তিনি নিশ্চিত ও প্রমাণিত বলে জানতেন, তাদের পুনরুল্লেখ করায় দোষ দেখতেন না।

আরও একটি আপাতদৃষ্টিতে ত্রুটির কথা বলতে হয়। তা হল বাংলা ভাষার উদ্ভব ও ক্রমবিকাশের সঙ্গে সোজাসুজি সম্পর্কহীন অনেক কথা তিনি বলেছেন ODBL-এ। এ সম্বন্ধে তাঁর নিজেরও বোধ ছিল। তিনি লিখেছেন (Preface, xiv) :

> "But in my own book, as I find, I had to discuss many points, some of them side-issues, especially in the 'Introduction', which should be but merely touched upon in a work of a professedly linguistic cparacter, not being immediately a 'propos' for history of language and perhaps, I had to be fuller in detail, and at times, repetition became unavoidable."

তাঁর মতে ভাষাতাত্ত্বিক বিবর্তনের সঙ্গে জাতি, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে পিছনে না রেখে বিচার করা চলে না। F. W. Thomas-এর কাছে তাঁর কৃতজ্ঞতা তিনি বহুবার স্বীকার করেছেন। সংস্কৃতি সভ্যতার দিকে Thomas-এর দৃষ্টি সব সময়েই থাকত। তা ছাড়া সুনীতিবাবুর Philology একটা নিজস্ব ধারায় গড়ে উঠেছে। ভাষাকে তিনি সভ্যতা সংস্কৃতি সাহিত্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত রেখেই আলোচনা করেছেন। তাঁর এ বিষয় অভিমত উদ্ধার করে বলাই ভালো।

> "Language is after all a living phenomenon, and it is perpetually on the move—it is like a life-giving stream or river……In our linguistic studies, this imaginative aspect of language we should never lose sight of, and this aspect of it is on a mundane plane—but it brings an awareness of the power and beauty,

as well as the romance and mystery of man's speech."

(সভাপতির ভাষণ, পুনা ১৯৭০)

ভ্রমণপ্রিয় ছিলেন তিনি। দেশেবিদেশে তিনি স্বচক্ষে দেখতে ভালবাসতেন তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি, সভ্যতা, স্বকর্ণে শুনতে ভালবাসতেন নিজস্ব ভাষা ও সঙ্গীত। তাঁর এই বহুবিধ মানবিক বিদ্যার দিকে আকর্ষণ থাকার জন্যই ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁর দর্শন ছিল বিশিষ্টতামণ্ডিত। Philologyর যে সংজ্ঞা দেওয়া হয় "কোনও একটি বিশেষ অঞ্চলে সমভাষী জনসম্প্রদায়ের সংস্কৃতি ও ভাবধারার লিখিত নিদর্শনের ভাষাবিষয়ক আলোচনা" তা তাঁর ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধে দৃষ্টিভঙ্গিই সার্থকতা দিয়েছে। নানা ধ্বনিতত্ত্ব সম্মেলন, ভাষাতত্ত্ব সম্মেলন বা সাহিত্য সম্মেলন উপলক্ষে তিনি যখনই যেখানে যেতেন, সেই দেশের সভ্যতা-সংস্কৃতি-ভাষা বিষয়ক একটি রচনা প্রণয়ন করতেন। সংস্কৃতির দিকে দৃষ্টি রেখে দেশবিদেশের নিজস্ব "ইজ্ম্" আবিষ্কার করেছেন তিনি। Africanism, Indianism প্রভৃতির সন্ধানে তিনি জীবনের শেষ দিক অতিবাহিত করেছেন। Balts and Aryans নামে এ জাতীয় গ্রন্থ বোধ হয় তাঁর সর্বশেষ রচনা। তাঁকে ভারতের মানবিকী বিদ্যায় জাতীয় অধ্যাপক নিযুক্ত করা সার্থক হয়েছিল।

আরও একটি কথা না বললে তাঁর সম্বন্ধে আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। একথা অনেকেই জানেন আধুনিক ভাষাতত্ত্ব নামে ভাষাতত্ত্বের এক নবীন দৃষ্টিভঙ্গি দেখা গেছে, যা সুনীতিবাবুর ভাষাতত্ত্বের পদ্ধতি থেকে ভিন্ন। এই নবীন ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁর মনোভাব কেমন ছিল তার স্পষ্ট ছবি তুলে দেওয়া দরকার। আশী বছর বয়সে তিনি বলছেন "ভাষা ও সাহিত্য চর্চা আমি আজও করে যাচ্ছি— এই ৫৬ বছর ধরে আমি ভারতে ভাষাতত্ত্বের গতি প্রগতির সঙ্গে নিজেকে যুক্ত রেখেছি।" এই নবীন ভাষাতত্ত্বকে তিনি দু তিন কথায় অভিযুক্ত করেছেন। একটি হল, গণিতের দিকে বা অন্যান্য তাত্ত্বিক বিষয়ের দিকে এর নির্ভরতা। দ্বিতীয়, নূতন নূতন পরিভাষার প্রতি অতিরিক্ত ঝোঁক এবং সর্বোপরি ভাষার প্রাচীন ইতিহাসকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করা। তা ছাড়া যে সব নব নব শব্দসংক্ষেপ (Abbreviation) ও তাই দিয়ে formula বা সূত্র রচনার প্রবণতা যা সাধারণ পাঠকের কাছে বিষয়বস্তুকে দুর্বোধ্য করে তোলে। তাঁর একটি প্রবন্ধ ছিল ভাষাতাত্ত্বিকদের নবম আন্তর্জাতিক সম্মিলনে, নাম ছিল "The Levels of Linguistic Analysis"—এতে তিনি তাঁর স্বাভাবিক উদারতায় প্রাচীন ও নবীন দুই পন্থার ত্রুটি সংশোধন করে মিলিত করে ভাষাচর্চার পদ্ধতি নিরূপণ করতে

চেয়েছেন এবং অধিকাংশ নবীন ভাষাতাত্ত্বিক যে প্রাচীন পদ্ধতিকে নস্যাৎ করতে চেয়েছেন সেজন্য তিনি ব্যথিত। তিনি অনেক সময় আমাদের বলেছেন—এই আধুনিক বিদ্যা এখনও আকাশে বিচরণ করছে, মাটিতে এর পা পড়েনি। আর প্রাচীন ভাষাতত্ত্ব বিদ্যা সম্বন্ধে গ্যালিলিও তাঁর প্রাণদণ্ড গ্রহণের পূর্বে মাটির উপর পদাঘাত করে যে বলেছিলেন—"তবুও এটা ঘুরছে"—সেই কথাটিও অনেক সময় বলতেন।

তাঁর পাণ্ডিত্য তাঁকে এমনই বিরাটত্ব দিয়েছিল যে তিনি যদি তাঁর সমুন্নত মস্তক নিচু করে সকলের সঙ্গে না মিশতেন, তাহলে তাঁর জীবন ভরে এত মাধুর্য তিনি উপভোগও করতে পারতেন না, পরিবেশনও করতে পারতেন না। হৃদয়ের মহানুভবতা ও ছাত্রবৎসলতা তিনি ছদ্ম সুদূর ব্যবধানের অন্তরালে সুগূহিত করে রেখেছিলেন।

এক বিরাট আদর্শ রেখে গেছেন তিনি তাঁর ছাত্রদের জন্য। তাঁর বিষয়ে চিরকালের শিক্ষার্থীদের জন্য রেখে গেছেন তাঁর অমূল্য কর্মকৃতিত্ব যার জন্য তিনি হয়ে থাকবেন "সহস্রায়ু"।

গোষ্পদে প্রতিবিম্বিত পূষন্

নারায়ণ সান্যাল

জুলিয়াস সমাধিমন্দিরে মোজেস্-এর মূর্তিটা যেন চোখের উপর ভাসছে। জ্ঞান-তপস্বী সত্যদ্রষ্টা মোজেস্ বসে আছেন সিংহাসনে, কিন্তু পরমুহূর্তেই যেন উঠে দাঁড়াবেন। দক্ষিণ হস্তে পাষাণ-ফলক, তাতে 'টেন কমাণ্ডমেণ্টস্' উৎকীর্ণ করা। বাম হস্ত দৃঢ় মুষ্টিবদ্ধ। ঈগলদৃষ্টিদহনকারী জ্বলন্ত একজোড়া চোখ। দৃঢ়নিবদ্ধ 'বঙ্কিমী' ওষ্ঠাধর। বলিরেখাঙ্কিত অশীতিপর জ্ঞানবৃদ্ধের পেশীবহুল সর্বাবয়বে জরা কিন্তু কোনও ছায়াপাত করেনি। উনি চারশ' বছর পূর্বে জন্মালে মিকেলাঞ্জেলো বোধকরি ওঁকেই মডেল করে তাঁর মোজেস্-মূর্তি গডতেন।

সুনীতিকুমারের দক্ষিণ হস্তেও জ্ঞানরাজ্যের ছাড়পত্র, মুষ্টিবদ্ধ বাম হস্তে অজ্ঞান-অশিক্ষা-কুসংস্কারের বিরুদ্ধে দৃঢ় প্রতিবাদ। সাতাশি বছর বয়সেও তিনি অজর, প্রাণচঞ্চল, তরুণ। অটুট স্বাস্থ্য, অনাবিল স্মৃতিশক্তি এবং অনবক্ষয়ী মেধা। শুধু অজর নন, অমরও। রবিবার, বাইশে মে, 1977, বিকাল চারটা দশে তিনি প্রমণ রেখে গেলেন—রামমোহন, বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ, রাধাকৃষ্ণাণ-এর এই উত্তরসূরীও মৃত্যুঞ্জয়ী।

'সমসাময়িকের দৃষ্টিতে সুনীতিকুমার' যদি আলোচ্য বিষয় হয় তবে আমি ওর মধ্যে নেই। তিনি এ দুনিয়ায় এসেছিলেন গত শতাব্দীর দশ-বছর বাকি থাকতে, আমি এসেছি এ শতাব্দী যখন প্রথমপাদ পাড়ি দিচ্ছে। শুধু তাই নয়, তাঁর কর্মময় জীবনের সাতাশিটা বছরের মধ্যে মাত্র শেষ নয় বছর আমি তাঁর সান্নিধ্যে আসার সুযোগ পেয়েছি। তার পূর্বে তাঁর ফটো দেখেছি, প্রবন্ধ পড়েছি এবং দূর থেকে বার কয়েক দেখেছি মাত্র—মঞ্চের মধ্যমণি হিসাবে উনি, দর্শকের আসনে দূরতম প্রান্তে আমি। ততদিনে আমার খান পনেরো বই ছাপাখানার মুখ দেখেছে; কিন্তু কোনদিন তার কোনও কপি সুনীতিকুমারকে শ্রদ্ধার্ঘ্য পাঠানোর কথা আমার মনেও আসেনি। কী হবে ভস্মে ঘি ঢেলে? উনি প্রতি হপ্তায় দশ-বিশখানা সদ্য-প্রকাশিত বই উপহার পান, তার মধ্যে আমার বই ভিড় বাড়িয়ে কী করবে? তাঁর সান্নিধ্যে প্রথম আসার অভিজ্ঞতাটি আমার রীতিমতো নাটকীয়। গোষ্পদ ছিল তার পঙ্ককুণ্ডে আত্মনিমগ্ন, সপ্তবর্ণে ভাস্বর ভাস্করই নভোচারণপথে সকৌতুকে ঐ গোষ্পদকে উদ্ভাসিত করে তোলেন। সেই দুর্লভ অভিজ্ঞতাটি আমি সবিস্তারে বর্ণনা করেছি

আমার 'পঞ্চাশোধ্বে'-গ্রন্থে; কিন্তু তার কিছুটা পুনরুক্তি না করে কিছুতেই বোঝাতে পারব না লিলিপুটিয়ান কেমন করে ব্রব্‌ডিংন্যাগিয়ানের মুখোমুখি হল:

সেটা 1968 সাল।

তারিখটা মনে নেই। বারটা আছে। রবিবার। সকালবেলা বাইরের ঘরে বসে খবরের কাগজ পড়ছি, হঠাৎ টেলিফোনটা বাজল। বড় মেয়ে বুলবুল ছিল কাছেই। সে-ই সাড়া দিল। তারপর আমার দিকে ফিরে বলল, তোমার ফোন, সাম মিস্টার চ্যাটার্জি খুঁজছেন।

উঠে এসে ওর হাত থেকে রিসিভারটা নিলাম। আত্মঘোষণা করতেই ওপ্রান্তবাসী বলেন, যাক, এবারেও তাহলে রঙ নাম্বার হয়নি।

প্রশ্ন করি, আপনি কে কথা বলছেন?

—আমি, মানে, সুনীতি চাটুজ্জে বলছি।

আমি অত্যন্ত দ্রুতগতিতে অতীত জীবনটা একবার হাতড়ে নিই। সুনীতি চাটুজ্জে নামের কোনও লোকের সঙ্গে কখনও পরিচয় হয়েছে মনে পড়ল না।

হঠাৎ খেয়াল হল, দিনকতক আগে মেসার্স এস. এম. চ্যাটার্জি নামে একটি কণ্ট্রাক্‌টার্স ফার্ম একটি সরকারী কাজ পেয়েছেন, আমিই তাঁদের টেণ্ডার অ্যাক্‌সেপ্ট করেছি। মনে হল, নিতান্ত কোনও জরুরী প্রয়োজনে উনি রোব্বারে বাড়িতে ফোন করছেন। এস. এম. চ্যাটার্জির পুরো নামটা আমার জানা ছিল না। বলি, বলুন? কি বলছেন?

—আপনার 'অপরূপা-অজন্তা' বইখানা এইমাত্র শেষ করলুম।

ঠিকেদার ভদ্রলোক যে সাহিত্য-রসিক তাও জানা ছিল না আমার। সেই সূত্র ধরে উনি যে আমাকে বাড়িতে ফোন করে খেজুরে-আলাপ জুড়েছেন এটাও ভাল লাগল না। বললাম, ও। আমার নিরুৎসাহে ও-প্রান্তবাসী কী বুঝলেন, তা তিনিই জানেন। তবু বললেন, বেশ ভাল হয়েছে বইটা।

আমি গাম্ভীর্য বজায় রেখে বলি, শুধু সে-কথা জানাতেই ফোন করছেন?

তবু ও-প্রান্তবাসীকে নিরুৎসাহিত করা গেল না। বললেন, হ্যাঁ। আপনার পাব্‌লিশারকে ফোন করে আপনার বাড়ির ফোন-নাম্বার পেলাম।

আমি ইংরাজি বর্ণমালার পঞ্চদশ বর্ণটি ওঁকে পুনরায় শুনিয়ে দিলাম।

উনি এবার বললেন, আপনার কি এখন অবসর আছে? আমার বাড়িতে একবার আসতে পারেন?

এই প্রথম আমার খট্‌কা লাগল, কোথায় কী-যেন ভুল হচ্ছে! মেসার্স এস.

এম. চ্যাটার্জি কোম্পানীর প্রোপাইটার এভাবে সরকারী এঞ্জিনিয়ারকে তাঁর বাড়ি যেতে বলবেন না। ইতস্তত করে বলি, ইয়ে, মাপ করবেন···আমি ঠিক আপনাকে 'প্লেস' করতে পারছি না, মিস্টার চ্যাটার্জি। কোথায় আমাদের আলাপ হয়েছে বলুন তো?

—আহা হা! আলাপ হয়নি। আলাপ করবার জন্তই তো ডাকছি···

বিদ্যুৎচমকের মত একটা চিন্তা মাথায় খেলে গেল। কিন্তু সেটা নিতান্তই অসম্ভব! তবু নিমজ্জমান মানুষ যেভাবে শেষ-কুটোটা আঁকড়ে ধরে সেই ভাবে বলে উঠি: বাই এনি চান্স···আপনি কি···মানে, কী ভাবে বলব? অর্থাৎ আপনি কি আমাদের জাতীয় অধ্যাপক আচার্য সুনীতিকুমার···

মাঝপথে আমাকে থামিয়ে দিয়ে উনি বলে ওঠেন, আচার্য-ফাচার্য নয়, তবে আমি যে সেই সুনীতিকুমারই বটে, তা তো গোড়া থেকেই বলছি।

আমি নেই!! হাত দুটি জোড় করলে উনি দেখতে পাবেন না, মাঝ থেকে রিসিভারটা পড়ে ভাঙবে। তবু কণ্ঠস্বরে ক্ষমা-চাওয়ার অভিব্যক্তি যতটা আনা যায় সেই চেষ্টা করে বলি, স্যার! আমি যে স্বপ্নেও ভাবতে পারছি না···আপনি এভাবে আমার টেলিফোন নাম্বার সংগ্রহ করে···মানে···কী বলব? আমি, স্যার···

—আপনার হাতে এখন সময় আছে? আমার বাড়িটা···

—জানি স্যার! 'সুধর্মা'। আমি এখনই আসছি!

—শুনুন। আসবার সময় এক কপি 'অপরূপা-অজন্তা' নিয়ে আসবেন।

তখন খেয়াল হয়নি, গাড়িতে যেতে যেতে মনে হল—দ্বিতীয় এক কপি বই উনি নিয়ে যেতে বললেন কেন? যে কপিটা উনি পড়েছেন সেটা কেমন করে পেলেন? আমি কোনও কম্প্লিমেণ্টারি কপি পাঠাইনি। ওঁকে কম্প্লিমেণ্টারি কপি পাঠাবার কথা আমার মনেও আসেনি। বইটা মাস কতক আগে প্রকাশিত হয়েছে। দীর্ঘ দিন ওটার পিছনে খাটতে হয়েছে। প্রকাশক মশায়ের কাছে শুনেছি বইটা বাজারে কাটছে না, পোকায় কাটছে। বিদগ্ধ-পাঠকের মধ্যে একমাত্র বনফুল একটি চিঠি লিখে আমাকে অভিনন্দিত করেছেন। তাঁর চিঠির একটি পংক্তি পড়ে পড়ে ততদিনে আমার মুখস্থ হয়ে গেছে—

"এর জন্য আপনি অনেক খেটেছেন, অনেক পড়েছেন, কিন্তু এও বুঝতে পারছি এর সম্যক্ মূল্য সাধারণ বাঙালী পাঠকসমাজ আপনাকে দেবে না। ক্ষীর হজম করার শক্তি যে আর তাদের নেই—রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে দল বেঁধে 'ফুচ্কা' খেতে তারা আজ অভ্যস্ত।"

ঐ একটি পংক্তিই সেদিন ছিল আমার তিন বছরের পরিশ্রমের পুরস্কার।

সদর-দরজায় কল-বেল বাজাতে ভিতরে মিষ্টি সুরেলা শব্দ-ঝংকার শোনা গেল। অচিরে একটি গৃহভৃত্য দ্বার খুলে দিল, খুলে দিল ফ্যানটাও। বসতে বলল আমাকে। বাড়িয়ে ধরল একটি বাঁধানো খাতা। তাতে নাম পরিচয় লিখে দিলাম। সে ভিতরে চলে গেল।

ঘরে দু-একটি মূর্তি—ব্রোঞ্জ ও পাথরের। দেওয়ালে গাঁথা কতকগুলি সাদা মার্বেলের ফলক, তাতে কি লেখা আছে খোদায় মালুম। বর্ণমালাই চিনতে পারলাম না; হিব্রু-টিব্রু হবে বোধ হয়। মনে হল, একটি পিপড়ে অ্যালকোহল-মিশ্রিত চাইনীজ-ইংক-এর বোতলে অবগাহন-স্নান সেরে ঐ মার্বেল-ফলকের পথ বেয়ে টল্‌তে টল্‌তে রাত করে বাড়ি ফিরেছে! একটু পরেই ডাক এল। গৃহভৃত্যের পিছু পিছু উঠে এলাম তিন তলায়।

মাঝারি মাপের ঘর। অর্ধেকটা জুড়ে প্রকাণ্ড একটা পালঙ্ক। কিন্তু প্রকাণ্ড হলে কি হবে, মনে হল রাতের প্রথম প্রহরেও গৃহস্বামী ঢেঁকি-অবতার হতে পারেন না; কারণ পালঙ্কের তিন-চতুর্থাংশ সিংহ-ভাগ দখল করে আছে নানান জাতের গ্রন্থ। একটি বড় টেবিল—তাও পুস্তকে উপচীয়মান। দুটি কাচের আলমারি—তাতে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সংগৃহীত শিল্পসম্ভার। খুঁটিয়ে দেখার সময় হল না। নজর হল,—'মোজেস্' বসে আছেন 'টেন কমাণ্ডমেণ্টস্' হাতে। খালি গা, পরনে ধুতি, হাতে বই, পায়ে বিদ্যাসাগরী চটি। আমি প্রণাম করতে গেলাম, উনি ব্যাঘ্র-ঝম্পনে বাধা দিলেন। বললেন, কলির ব্রাহ্মণকে প্রণাম করতে নেই!

ওঁর প্রথম কথাতেই আমার সঙ্গে মতানৈক্য হল।

—আমার বইখানা এনেছেন?

আমি সে-কথার জবাব না দিয়ে বললাম, আমাকে 'আপনি' বলবেন না স্যার! প্রণাম না নিলেন, নাই নিলেন, 'তুমি' বলুন।

—না, না। ওটা আমার ধাতে নেই। 'আপনি-তুমি'র রকমফের হলে ঐ সঙ্গে ক্রিয়াপদগুলোকেও তো বদলাতে হয়। সে বড় বখেড়া। তাই আমার ছাত্রের ছাত্র-কেও 'আপনি' বলি।

উপায় কি? ভদ্রলোক যখন ব্যাকরণে এত কাঁচা তখন মেনে নিতে হল।

বইটা আমার হাত থেকে নিয়ে বলেন, কই, আমাকে দিচ্ছেন তা তো লিখে দেননি?

আমি বিনা বাক্যব্যয়ে প্রথম পৃষ্ঠায় ওঁর নামটা লিখে বইটি আবার ওঁকে

দিলাম। উনিও বিনা বাক্যব্যয়ে উঠে দাঁড়ালেন। কষির কাপড়টা সাঁটতে সাঁটতে ঘরের ওপ্রান্তে গেলেন এবং ফিরে এলেন আর এক কপি 'অপরূপা-অজন্তা' হাতে। সেটা আমার দিকে বাড়িয়ে ধরে বলেন, এই নিন আপনার বই।

মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না। উনি আরাম-কেদারায় অর্ধশয়ান হয়ে বলেন, আমি বনফুলের সঙ্গে একমত হতে পারিনি। এ কথা যদিচ ঠিক যে ইদানীং সাধারণ বাঙালীর ক্ষীর হজম করবার ক্ষমতা ক্রমশঃ লুপ্ত হতে বসেছে, এবং দল বেঁধে 'ফুচ্‌কা' খেতেই তারা অভ্যস্ত—তবু আমার বিশ্বাস, আপনাকে এ বই একদিন দ্বিতীয় সংস্করণ ছাপতে হবে। তখন ঐ কপিটা কাজে লাগবে। খুলে দেখুন।

ভাষাবিদ এবং বৈয়াকরণিকের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য সত্ত্বেও সেই মুহূর্তে আমার মনে পড়ল লুই ক্যারল ব্যবহৃত ব্যাকরণ-অস্বীকৃত সেই শব্দটি: 'কিউরিয়সার! অ্যাণ্ড কিউরিয়সার!' বইটা খুলে দেখি—মার্জিনে অসংখ্য মন্তব্য। বর্ণাশুদ্ধি সংশোধন করেছেন, পাঙ্কুয়েশন-মার্ক বদলেছেন, গোটা বইটা প্রুফ-রীডিং করেছেন! কোথাও মার্জিনে লিখেছেন, 'রেখাচিত্র চাই; কোথাও 'অমুক গ্রন্থের অমুক পৃষ্ঠা দেখুন'; কোথাও-বা উৎসাহবর্ধক দু-একটি প্রসংশাসূচক ইণ্টারজেক্‌শন! দু-এক স্থলে ওঁর সংশোধনের অর্থ বোধগম্য হল না। প্রশ্ন করলাম, লেওনার্দোর 'লাস্ট-সাপার' কথাটায় ঢেরা দিয়েছেন কেন?

ওঁর চোখ দুটি হাসিতে চিকচিক করে উঠল। বললেন, যেহেতু লেওনার্দো দ্য ভিঞ্চি 'লাস্ট-সাপার' নামে কোনও ছবি আঁকেননি।

আমি স্তম্ভিত! ঢোক গিলে বলি, তার মানে? 'মোনালিজা' ছাড়া ওঁর 'লাস্ট-সাপার'ই তো···

বাধা দিয়ে বললেন, দু'দশক তো পার হয়ে গেছে দেশটা স্বাধীন হবার পর। লেওনার্দো যে ছবিটা এঁকেছিলেন তার নাম তিনি 'লাস্ট-সাপার' দেননি। তাঁর ভাষায় যদি বলতে চান, বলুন 'চেনা উল্‌তিমা' (Cena ultima)। আর যদি মনে করেন সে ভাষায় বললে আপনার পাঠকের মগজে ঢুকবে না, তবে যে ভাষায় বইটা লিখেছেন সেই সাদা বাঙলায় বলুন—'শেষ সায়মাশ।' ইংরাজের দেওয়া নাম এখনও চালাতে হবে কেন?

এই হচ্ছেন সুনীতিকুমার! অজ্ঞাত অপরিচিত একটি লেখকের বই পড়ে যদি ভালো লাগে তখন তিনি অমূল্য সময় নষ্ট করে তার প্রুফ-রীডিং করতে বসে যান; তার পাব্‌লিশারের সঙ্গে যোগাযোগ করে তার টেলিফোন নাম্বার সংগ্রহ করেন।

তাকে ঘরে ডেকে সমঝিয়ে দেন—দেশটা দু'দশক আগে স্বাধীন হয়েছে!

* *

দীর্ঘ কর্মময় জীবন। 26. 11. 1890 তারিখে রাসপূর্ণিমায় তাঁর আবির্ভাব। গুরু নানকের জন্মদিনে। সেদিন নাকি চন্দ্রগ্রহণ হয়েছিল, যেমন হয়েছিল শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব মুহূর্তে। নিতান্ত মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে। অসাধারণ মেধা। বি. এ.-তে প্রথম এবং এম. এ.-তেও উপর্যুপরি দুবার প্রথম শ্রেণীতে প্রথম। তারপর প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তিলাভ। উচ্চশিক্ষার্থে বিলাত-যাত্রা। 1921-এ পেলেন লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি. লিট.।

পরের বছর স্বদেশে প্রত্যাবর্তন। মণিকার স্যার আশুতোষ ওঁকে নিয়োগ করলেন ভারতীয় ভাষাতত্ত্বের 'খয়রা'-অধ্যাপকরূপে। অধ্যাপক অধ্যয়ন করবে না, এ কেমন কথা? প্রফেসর তারাপোরওয়ালার কাছে পড়তে শুরু করলেন 'আবেস্তা'। একই সঙ্গে বঙ্গভাষার আদিম উৎস সন্ধানে অভিযাত্রাও রইল অব্যাহত। অনতিবিলম্বে সেই মননের ফলশ্রুতিরূপে দেখা দিল দুই খণ্ডে প্রকাশিত তেরশ' পৃষ্ঠার মহাগ্রন্থ; বঙ্গভাষার 'টেন কমাণ্ডমেন্টস্' The Origin and Development of Bengali Language—মনীষীমহলে যার সংক্ষিপ্ত অভিধা: ও. ডি. বি. এল। তারপর নিরবচ্ছিন্ন ধারায় মুদ্রাযন্ত্র থেকে জলপ্রপাতের মতো ঝরে পড়তে থাকে: বেঙ্গলি সেল্ফ-টট্, এ বেঙ্গলি ফোনেটিক রীডার, ইন্দো-এরিয়ান অ্যাণ্ড হিন্দি কিরাতজনকৃতি, ইত্যাদি, ইত্যাদি এবং ইত্যাদি।

1927-এ রবীন্দ্রনাথের সহযাত্রী হিসাবে পূর্ব-এশিয়ায় ভ্রমণ—জাভা, সুমাত্রা, বালি, শ্যাম, কাম্বোজ, ওঙ্কারথম। সে তথ্য শাশ্বত হয়ে রইল 'দ্বীপময় ভারত-'এ।

কিন্তু সুনীতিকুমারের কর্মচঞ্চল সুদীর্ঘ জীবনের বহুমুখী বিকাশের মূল্যায়নে আমি আজ কলম নিয়ে বসিনি। আমার লক্ষ্য: গোষ্পদে প্রতিবিম্বিত পূষন্!

তাই বলি, সেই দুর্লভ সাক্ষাৎকারের পর যদিও আর কোনদিন সাহস করে তাঁর ভদ্রাসনে যাইনি, তবু এর পর থেকে আমার প্রকাশিত গ্রন্থগুলির একটি করে কপি তাঁকে পাঠাতাম। কোনও দিন প্রাপ্তিস্বীকার করেননি, বা টেলিফোন করেননি। ক্রমশঃ বুঝতে পারলাম, 'অপরূপা-অজন্তার' লেখককে উনি স্বাভাবিকভাবেই ভুলে গেছেন। কোনও পত্রপত্রিকায় আমার লেখা ছাপা হয় না। দীর্ঘ দিনের ফারাকে আমার গ্রন্থগুলি পেলেও তিনি নিশ্চয়ই এতদিনে আমার নামটা স্রেফ ভুলে গেছেন।

তাঁর সঙ্গে আমার দ্বিতীয় সাক্ষাৎটাও নিতান্ত নাটকীয়।

ন্যাশনাল লাইব্রেরীতে গিয়েছিলাম 'অ্যাটম বোমা'র বিষয়ে খোঁজ-খবর নিতে। তখন আমি 'বিশ্বাসঘাতক' লিখছি। সেটা 1974 সাল। সন্ধ্যা নাগাদ রীডিং রুম থেকে বেরিয়ে বাস ধরব বলে চলেছি, হঠাৎ নজর হল সুনীতিকুমার তাঁর নির্দিষ্ট বাড়িটির বাগানে গোলাপগাছের চর্চা করছেন। ওঁর হাতে একটা খুরপি। পিছনে জলের ঝারি হাতে একজন বেয়ারা। আমার দিকে উনি চকিতে চোখ তুলে একবার তাকালেন। উনি নিশ্চয় আমাকে চিনতে পারেননি, আমি রিফ্লেক্স-অ্যাকশনে হাত দুটি জোড় করে ওঁকে নমস্কার করলাম। ওঁর হাত জোড়া—খুরপিটা উঁচু করলেন, অর্থাৎ প্রত্যভিবাদন সেরে গোলাপচারায় পুনরায় মনঃসংযোগ করলেন। আরও চার-পাঁচ কদম হেঁটেছি, হঠাৎ শুনতে পেলাম উনি পিছন থেকে আমার নাম ধরে ডাকছেন। চমকে পিছন ফিরি। এগিয়ে আসি বেড়ার কাছে। উনি ফুলবাগিচায়, আমি পথের মাঝখানে; গোষ্পদ ও সূর্যের মাঝামাঝি যথারীতি অনড় প্রাচীর।

উনি সরাসরি প্রশ্ন করলেন, গজমুক্তা বইটা আপনার লেখা, তাই নয়?

সবিনয়ে অপরাধ স্বীকার করি।

বললেন, তাতে আপনি বলেছেন, এলিকাম ম্যাক্সিমাম্ (ভারতীয় হাতী) এবং লক্সডণ্টা আফ্রিকানা (আফ্রিকার হাতী) ক্রশব্রীডে বাচ্চা হয় না। তাই না?

এবারও স্বীকার করতে হল।

অতঃপর ওঁর প্রশ্ন—Camelus bactrianus এবং Camelus dromedarius-এর ক্রশব্রীডে কি বাচ্চা হয়?

উত্তর দূর-অস্ত্, প্রশ্নটাই আমার মগজে ঢুকল না। আমার যে 'এক-বাঁও' মেলেনি তা উনি বুঝতে পারলেন। তাই প্রশ্নটা আরও মোলায়েম করে বললেন, 'গজমুক্তা' পড়তে পড়তে এ প্রশ্নটা আমার মনে জেগেছিল। মঙ্গোলিয়ার দুই কুঁজ বিশিষ্ট উট এবং আরবীয় এক কুঁজ ওয়ালা উটের মিলনে কি বাচ্চা হয়? দুটোই তো Camelus? তা হলে বাচ্চার কুঁজ কটা হবে?

আমি হাত দুটি কচলে বলি, স্যার, আমি সিবিল এঞ্জিনিয়ার, জীববিজ্ঞানের এসব প্রশ্ন—

—তাহলে হাতীর কথা কেমন করে লিখলেন?

—বই পড়ে স্যার! হাতীর উপর বই লিখব বলে শুধু হাতীর উপরেই—

কথাটা আমার শেষ হল না। এবার উনিই ইংরেজি বর্ণমালার পঞ্চদশ বর্ণটি আমাকে শুনিয়ে দিলেন, ও! বুঝেছি। হাতীর খবর আপনি জানেন। উটের নয়।

তৎক্ষণাৎ ফিরে গেলেন গোলাপচারার কাছে।

আমি আরও মিনিট খানেক নিশ্চল দাঁড়িয়ে থাকি। দেখে মনে হল না—ঐ গোলাপচারার সেবায় নিমগ্ন মালিটি 'উট-রোগে' ভুগছেন।

এই হচ্ছেন সুনীতিকুমার! অনুপপত্তি নিরাকরণ-মানসে তিনি অনায়াসে প্রতিবিম্বিত হতে প্রস্তুত গোষ্পদেও! জিজ্ঞাসু সুনীতিকুমারের নেই কোনও জ্ঞানের অভিমান। আর যে মুহূর্তে বুঝলেন, তাঁর সমস্যার সমাধান সেই ক্ষুদ্র জীবের দ্বারা সম্ভবপর নয়, তৎক্ষণাৎ তাকে ছেঁড়া-কাগজের ঝুড়িতে ফেলে দিলেন।

তাঁর সঙ্গে আমার তৃতীয় সাক্ষাৎ তাঁকে নিমন্ত্রণ করতে যাওয়ায়। আমার কন্যার বিবাহে তিনি নিমন্ত্রণ রাখতে এসেছিলেন। সে কৌতুকর ঘটনার কথা 'পঞ্চাশোধ্বে'-গ্রন্থে বিস্তারিত লিখেছি, পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। 'বিজলী গ্রিল'-এর 'ফিস্ ওলী' পরিবেশন করতে গিয়ে কি-জাতের বিড়ম্বনায় পড়েছিলাম! ঐ 'ওলী' বা 'ওলি' শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থটি ধরতে না পারা পর্যন্ত তিনি সেটা মুখে পুরতে রাজী নন। বারে বারে আপন মনেই বলতে থাকেন, 'ওলী' শব্দটা কোথা থেকে এল? জার্মান ভাষায় ভাজাকে বলে gebacken অথবা gabraten; ফরাসী ভাষায় ভাজা মাছ হচ্ছে frit poissons; স্প্যানিশে যতদূর মনে পড়ছে মাছ-ভাজা হচ্ছে frito pescado; ইতালিয়ান fritte pesce! Olee কোথা থেকে এল?

আমার মেজদা নিরুপায় হয়ে বলেছিলেন, আজ্ঞে আপাতত এল রান্নাঘর থেকে। স্রেফ 'মাছ ভাজা' বলেই ওটাকে ধরে নিন না! ব্যুৎপত্তিগত না হোক, উৎপত্তিগত হদিসটা তো পেলেন।

সুনীতিকুমার খুশি হলেন। বললেন, তাই বলুন। মাছ-ভাজা। ওলী নয়। তাহলে ওপিঠটা খাওয়া যেতে পারে। ওলীর এপিঠ-ওপিঠ কিছুই চিনি না, কিন্তু ভাজা-মাছ উল্টে খেতে জানি।

এই হচ্ছেন সুনীতিকুমার! ভাষাবিদ হওয়া সত্ত্বেও তিনি ভোজনরসিক। জ্ঞানতপস্বী হওয়া সত্ত্বেও নিজের স্বীকৃতি-মতে 'ভাজামাছ উল্টে খেতে' জানেন।

ক্রমে সাহস বাড়ল। পরিচয় ঘনীভূত হল। স্নেহচ্ছায়ায় আশ্রয় পেলাম। অর্ধশতাব্দীকাল সাংস্কৃতিক সমস্যার চূড়ান্ত সমাধান সন্ধানে আসমুদ্রহিমাচলের পণ্ডিতাগ্রগণ্যের দল বারে বারে ছুটে এসেছেন যে 'সুধর্মায়', সেখানে হংসমধ্যে বকের মতো আমিও হাজিরা দিয়েছি। তবে বড় দেরি হয়ে গেছে। এতদিন কেন এ সুযোগ নিইনি? কেন সাহস পাইনি? ওঁর মহাপ্রয়াণের বছর দুই আগে একদিন দুরন্ত কৌতূহল হল জানতে—জ্ঞানমার্গের চরম সীমান্তে উপনীত ঐ জ্ঞাননির্ধূত-

কল্মষ কি জেনেছেন সেই পরম সত্যকে? যে ধনে ধনী হলে মণিকে মণি মনে হয় না? প্রশ্নমাত্র আমার হাত থেকে ছিনিয়ে নিলেন নোটের খাতাটা। নির্দ্বিধায় লিখে দিলেন ছয়-ছয়টি ভাষায় অকপট স্বীকারোক্তি।

এই হচ্ছেন সুনীতিকুমার!

সত্যাশ্রয়ী। ভড়ং নেই কোন। স্পষ্টভাবে শুধু বললেন, আমি শুধু জানি যে, আমি জানি না। কিন্তু আমরা যে জানিই না যে, আমরা জানি না। তাই তো বারে বারে ছুটে গিয়েছি তাঁর কাছে। সে কথা নয়, আমি শুধু ভাবছি—ঐ খাতা-খানা যদি আর একবার তাঁর সামনে মেলে ধরার সুযোগ পাই, তাহলে আজ তিনি কী লিখে দিতেন? সত্যাশ্রয়ী দ্রষ্টা কি এবার, আজকের দিনে, লিখে দিতেন: বেদাহমেতম!

অধ্যাপক সুনীতিকুমার

সুকুমারী ভট্টাচার্য

সুনীতিবাবুর সঙ্গে প্রথম পরিচয় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠকক্ষে ১৯৪২ সালে। আমাদের সংস্কৃত ছাত্রছাত্রীদের বিশেষ সৌভাগ্য যে আমরা জনকয়েক অত্যুজ্জ্বল মেধাবী পণ্ডিতের কাছে পাঠ নিতে পেরেছিলাম। এঁদের মেধার প্রকাশ ছিল বিভিন্ন প্রকারের: কেউবা টোলের ধরনের পণ্ডিত, যেমন সীতারাম শাস্ত্রী মশায়, অনন্ত শাস্ত্রী মশায় বা সকলনারায়ণ শর্মা। কেউ বা টোলে শুরু করে রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্যে এসে অন্য ভাবে বিকশিত হয়ে উঠেছিলেন, যেমন বিধুশেখর শাস্ত্রী মশায়। কেউ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদ্যালাভ করে নিজের চর্চা ও মননশীলতায় গৌরব অর্জন করেছিলেন, যেমন প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় বা চিন্তাহরণ চক্রবর্তী মশায়। আবার বটকৃষ্ণ ঘোষ বা সুনীতিবাবুর মতো অধ্যাপকেরা ছিলেন দেশের ও বিদেশের শিক্ষায় এবং নিজস্ব মনস্বিতায় ভাস্বর।

অন্যান্য অধ্যাপকেরা যা পড়াতেন তার সঙ্গে কোনো না কোনো ধরনের পরিচয় পূর্ব হতেই ছিল আমাদের। কিন্তু ভাষাতত্ত্ব, যা সুনীতিবাবু পড়াতেন তার সম্বন্ধে কোনো পূর্বপ্রস্তুতি তখনকার দিনে বি. এ. পাঠ্যতালিকায় থাকত না। বিষয়টি দুরূহ এবং নতুন, কিন্তু সেটা একেবারেই টের পাইনি; কারণ ওঁর অধ্যাপনায় বিষয়টি সম্পূর্ণ সজীব হয়ে উঠত। দু-চার সপ্তাহ পর থেকেই দিন গুনতাম প্রহর গুনতাম ওঁর ক্লাসটির জন্যে। বর্ণের উচ্চারণস্থান ইত্যাদি তত্ত্বগুলিকে উনি সরস করে তুলতেন বিভিন্ন আঞ্চলিক উচ্চারণ বিকারের উদাহরণ দিয়ে। শব্দের নির্বচন ও ব্যুৎপত্তি যখন পড়াতেন তখন পৃথিবীর বহু দেশের বহু যুগের শব্দ দিয়ে বোঝাতেন কোন সব উচ্চারণস্তর ও রূপভেদ পার হয়ে শব্দটি তার বৈদিক, গ্রীক, লাতিন, ফরাসী, জার্মান বা বাঙলা অসমীয়া অথবা পাঞ্জাবী চেহারায় পৌঁছেছিল। এছাড়া যা মুগ্ধ করত তা হল—শব্দ ওঁর কাছে অন্য একভাবে সজীব ছিল: সংস্কৃতির এক-একটি বিশেষ স্তরে তৎকালীন জীবনযাত্রার বিশেষ রূপটি বিধৃত থাকে বহু শব্দে। মানুষ যখন নখ দিয়ে খুঁড়ে খাবার খেত তখন খন্-ধাতু নিষ্পন্ন (বিপর্যাস দ্বারা) নখ শব্দের সৃষ্টি হল। এর মধ্যে সেই সেই নিরূপকরণ আদিম জীবনযাত্রার চিহ্নটি থেকে গেছে। অনায়াসে পৃথিবীর বহু বিভিন্ন ভাষা থেকে ভাষাতত্ত্বের মূলসূত্রগুলির উদাহরণ দিয়ে যেতেন; বিস্ময়কর ক্ষিপ্রতার সঙ্গে ভাষা

থেকে দূরান্তরের ভাষায় উপনীত হতে পারতেন এক-একটি সূত্রের ব্যাখান প্রসঙ্গে ; সেই অনায়াস সৌকর্য অভিভূত করত মনকে। যে বৃহৎ জ্ঞানক্ষেত্রে ওঁর স্বচ্ছন্দ সঞ্চরণ ছিল তার পরিসর তখনই, ১৯৪২ সালেই, সত্যিই রোমাঞ্চকর ছিল। উদাহরণের সেই দিগ্‌বিসারিত ভূমি থেকে দুটি ধারণা হয়েছিল তখনই : প্রথম, ভাষার ইতিহাস মানুষের সভ্যতার ইতিহাসেরই এক মূর্ত প্রতিচ্ছবি ; দ্বিতীয়, মানুষের সভ্যতার ভাষা গোষ্ঠীগুলি পরস্পরের দ্বারা কত বেশি প্রভাবিত। কেমন করে যেন মানবসভ্যতার বৈষম্যের সঙ্গে সৌষম্যগুলির পরিচয় পেয়ে এক ধরনের অন্তর্নিহিত ঐক্যের আভাস পাওয়া যেত। এ যে তিনি উচ্চারণ করে কোনোদিন বলেছিলেন তা নয়, কিন্তু যেভাবে পড়াতেন তাতে এবং তাঁর জ্ঞানের অবিশ্বাস্য পরিধির দ্বারা এ বোধ সঞ্চারিত হত সহজেই। যখন সংস্কৃত ছেড়ে ইংরিজি পড়তে যাই '৪৩ সালে, তখন সে সিদ্ধান্ত নেওয়া খুব কঠিন হয়েছিল ঐ দীপ্র অধ্যাপনা আর পাব না বলে। হয়ত সেই অভাববোধই পরে টেনে এনেছিল ওঁর ব্যক্তিগত সান্নিধ্যে।

পঞ্চাশের দশকে প্রায়ই যেতাম ওঁর কাছে ভয়ে ভয়ে নানা জিজ্ঞাস্য নিয়ে। ক্রমে ক্রমে আবিষ্কার করেছিলাম সে-ভয় সম্পূর্ণ অমূলক ছিল। পিতৃকল্প আচরণে প্রচুর প্রশ্রয় ছিল, আর ছিল সামান্যতম জিজ্ঞাসুর প্রশ্ন জিজ্ঞাসা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিরহংকার আগ্রহ ও ধৈর্য। একটু শক্তি বা আগ্রহ কারো মধ্যে দেখা গেলেই তাকে বহু ভাবে আশ্বাস ও সাহায্য দিয়ে উৎসাহিত ও প্রতিষ্ঠিত করেছেন, একথা বহু জনের কাজেই শোনা যাবে।

পরবর্তীকালে তাঁর কাছে অসংখ্য বার অজস্র জিজ্ঞাসা নিয়ে গিয়েছি। ওঁর সেই সব অধ্যাপনার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য মনে পড়ে। কখনো কোনো অবস্থাতেই একটি অহমিকার বাক্য শুনিনি বরং বহুবার শুনেছি, "এ বিষয়ে আমি সামান্যই জানি।" বলা বাহুল্য, ওঁর সামান্য জানা বহুক্ষেত্রেই অসামান্য বলে প্রতিপন্ন হয়েছে। স্বভাবসিদ্ধ এ-বিনয়ে কিন্তু কোনো কাপট্য ছিল না ; উনি সত্যিই মনে করতেন, জ্ঞানের পরিমাণ ওঁর সামান্য। গত বছরে গ্রীক ভাষার এক বিদেশী অধ্যাপককে ওঁর কাছে নিয়ে যাই আলাপ করাবার জন্যে। তাঁকে সুনীতিবাবু ওঁর গ্রীক বইগুলি দেখাচ্ছিলেন। এক সারির মধ্যে বই দেখাতে দেখাতে একটি বই বাদ দিয়ে পরেরগুলো দেখালেন। উনি অন্য কাজে একটু দূরে যেতেই আমি কৌতূহলী হয়ে সেই বইটি তুলে দেখি সেখানির গ্রন্থকার বইটি সুনীতিবাবুকে উৎসর্গ করেছেন। ছিয়াশি বছর বয়সের লব্ধপ্রতিষ্ঠ পণ্ডিতের এই অকৃত্রিম বিনয় ও সৌজন্য দেখে

বিদেশী পণ্ডিত মুগ্ধ, স্তব্ধ। অন্য আত্মম্ভরী পণ্ডিতদের আত্মপ্রচারের আগ্রহ মনে পড়ল ; মনে হল, "অল্প লইয়া থাকি তাই মোর যাহা যায় তাহা যায়।"

কতবার ধৃষ্টতা করে প্রশ্ন করতে গিয়ে তর্ক তুলেছি; উনি সিঁড়ি উঠে তেতলায়, কখনো বা পড়ার ঘরে মই দিয়ে পেড়ে বই এনে তর্কের মীমাংসা করেছেন। সসংকোচে বলেছি, "আপনি বললেই ত হত।" বলেছেন, "তা কেন হবে ? এ বিষয়ে যিনি শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত শুধু তাঁর কথাই প্রামাণ্য, তাঁর কথাই মানবেন। এ ত আমার গবেষণার বা অধিকারের বিষয় নয়।" কোনো ছাত্র বা ছাত্রীর কাছে যদি অণুমাত্র জ্ঞানও আহরণ করে থাকেন ত বহুজনের সামনে বলেছেন, "এই যে, ওঁর কাছে এটা শিখেছি সেদিন।" ছাত্র-ছাত্রীরা লজ্জা পেতেন, উনি কিন্তু সত্যিই বিশ্বাস করতেন, "সর্বত্র জয়মিচ্ছন্তি পুত্রাৎ শিষ্যাৎ পরাজয়ম্।" কখনো কোন প্রশ্নের উত্তর ওঁর জানা না থাকলে সঙ্গে সঙ্গে সাগ্রহে বলতেন, "খোঁজ পেলে জানাবেন কিন্তু।" এমনই বুভুক্ষা ছিল জ্ঞানের জন্যে।

কোন বিষয় অধিগত করতে হলে উনি সর্বদাই আকর গ্রন্থের সন্ধান করতেন। হয়ত গুজরাতের ইতিহাস জানতে হবে, উনি বিশ্বকোষ দেখে, গুজরাতী সাহিত্যের ইতিহাস, দেশটার প্রামাণ্য ইতিহাস, পুরাকীর্তির আকর গ্রন্থ, গুজরাতী শিল্পের সচিত্র গ্রন্থ, গুজরাতী ধর্ম দর্শনের মূলগ্রন্থ এই সব পড়ে জ্ঞানের তৃষ্ণা মেটাতেন। যেক্ষেত্রে আমরা গুজরাত সম্বন্ধে একটি মোটামুটি প্রামাণ্য গ্রন্থ পড়ে ক্ষান্ত হই, সেখানে উনি এইভাবে এত খেটে অনুসন্ধিৎসা চরিতার্থ করতেন। ভাসা-ভাসা খবর বা অসম্পূর্ণ তথ্যে ওঁর খুব আপত্তি ছিল, এ বিষয়ে উনি অসম্ভব খুঁতখুঁতে ছিলেন। মাঝে মাঝে মনে হয়েছে, এত খুঁটিয়ে জানবার কি দরকার! কিন্তু ওঁর শিক্ষা-সাধনার প্রকৃতিই এই ছিল, ফাঁকি দেবার অনুমতি উনি নিজের মধ্যেই পাননি।

মানবিকী বিদ্যার ক্ষেত্রে দু-একটি বিষয় বাদে বাকি সবগুলিতেই ওঁর অতৃপ্ত আগ্রহ ও আশ্চর্য অধিকার ছিল। এ যে কি দুরপনেয় পিপাসা তা যাঁরা ওঁর সান্নিধ্যে এসেছেন তাঁরাই জানেন। হয়ত কেল্‌টিক কবিতা মূল ভাষায় পড়ছেন, জিজ্ঞাসা করলাম, "কেল্‌টিক শিখেছিলেন কেন ?" উত্তর দিলেন, "স্বান্তঃ সুখায়।" বারে বারে এ উত্তর শুনেছি, ভেবেছি, সে কেমন অন্তর যা বিশ্বের প্রায় সর্ববিধ জ্ঞাতব্যে এমন আগ্রহী। ওঁকে দেখতে দেখতে জেনেছি এখানে ওঁর মন্ত্র "ভূমৈব সুখং নাল্পে সুখমস্তি, ভূমৈব বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ।"

ছাত্র হিসেবে নিয়মিত শিক্ষা করেছিলেন, ইংরেজি সাহিত্য, আইন ও

ভাষাতত্ত্ব। কিন্তু ইতিহাস, পুরাতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, বহু বিভিন্ন দেশের ও যুগের সাহিত্য, স্থাপত্য, ভাস্কর্য, চিত্রশিল্প, সংগীত, কিছু দর্শন, ধর্ম, দেবকল্পনা ইত্যাদি নানা বিষয়ে ওঁর নিত্যজাগ্রৎ আগ্রহ ও প্রগাঢ় অধিকার ছিল। এর সব কটিই উনি আয়ত্ত করেছিলেন আকর গ্রন্থের সাহায্যে এবং নিজে চোখে দেখে ও কানে শুনে। এত সবে ওঁর কিছুমাত্র ব্যবহারিক প্রয়োজন ছিল না অধ্যাপনা বা জীবিকার জন্যে, তাগিদ এসেছিল ঐখান থেকে, স্বান্তঃসুখায়। ফলে বিদ্যা ওঁর বোঝা হয়ে ওঠে নি, আনন্দের বস্তু হয়েছিল। অসামান্য মেধার অধিকারী ছিলেন জন্মস্বত্বে, কিন্তু তারই সঙ্গে দেখেছি পরিশ্রম করবার অনন্যসাধারণ ক্ষমতা। চোখের সামনে ওঁকে বহু নতুন বিষয় আয়ত্ত করতে দেখেছি অশীতিপর বয়সেও ; যে নিষ্ঠা ঐকান্তিকতা ও তন্ময়তা দেখেছি এ প্রয়াসে তা ভোলবার নয়। একটি বিষয়ে চর্চা করতে গিয়ে তৎসংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয় এসে গেছে এবং ঐরকম একাগ্র পরিশ্রমের দ্বারাই আয়ত্ত করেছেন সেগুলিকেও। আনুষঙ্গিক বিষয়গুলি সম্বন্ধেও সমান আগ্রহ ও অনুসন্ধিৎসা—উৎসমুখ সন্ধান করে আনিয়ে, ছবি দেখে, প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ করে সেগুলির রহস্য উদ্‌ঘাটনে প্রবৃত্ত হয়েছেন। এ চেষ্টা একদিকে যেমন ভাসাভাসা জ্ঞান বা বিদগ্ধমণ্ডলীতে আলাপ করবার জন্যে প্রয়োজনীয় তথ্যটুকু জেনে নিয়ে ক্ষান্ত হওয়া নয়, অন্যদিকে তেমনি বিদ্যার ভারবাহী রাসভের মতোও নয়। সমস্তটায় মিশে থাকত একটা আন্তরিক প্রেরণা, রসজ্ঞের আনন্দ বিচিত্র বিস্তৃত জ্ঞানের মুক্ত আকাশে মনের লঘু পক্ষ-সঞ্চরণ। এই চির-অতৃপ্ত অন্বেষণা ও অতন্দ্র সাধনা দেখাও এক ধরনের শিক্ষা ছিল ওঁর পরিচিতদের কাছে। একথা সত্যি যে অবিসংবাদিত প্রতিভা সুনীতিবাবু জন্মস্বত্বে পেয়েছিলেন—ঐ ক্ষুরধার বুদ্ধি, বিস্ময়কর স্মৃতিশক্তি ও বিদ্যাচর্চার প্রায়-অমানুষিক শক্তি—এই সমাবেশ একই আধারে কালেভদ্রে হয়, কিন্তু এসব মূলধনকে তিনি অক্লান্ত নিষ্ঠায় খাটিয়েছিলেন। শতকরা নব্বই জন বুদ্ধিমান বাঙালি বুদ্ধিজীবীর মতো বুদ্ধির পুঁজিটুকু ভাঙিয়েই কর্মজীবনটা কাটিয়ে দেন নি। সমস্ত সাধনারই একটা কঠিন অভ্যাসের দিক আছে ; বিভিন্ন ভাষাশিক্ষার প্রস্তুতি হিসেবে বহু বিভিন্ন লিপি ও ব্যাকরণ আয়ত্ত করার মধ্যে একটা দীর্ঘকালব্যাপী শুষ্ক প্রয়াসের প্রয়োজন। একাজ তিনি নিষ্ঠার সঙ্গে বারংবার করেছেন সেই সব ভাষার সাহিত্যরস-লাভের প্রস্তুতি হিসেবে।

জ্ঞান সুনীতিবাবু শুধু পুঁথির থেকে পান নি, প্রচুরভাবে লাভ করেছেন দেশ-বিদেশের মানুষের সঙ্গে মিশে। মানুষ কালে একান্তই সীমিত, বর্তমানের গণ্ডীর বাইরে তার পা দেবার উপায় নেই, অতীত আছে প্রত্নতত্ত্বে, গ্রন্থে, ভবিষ্যৎ আছে

অন্ধকারে। কিন্তু বর্তমানের মানুষ স্থানে খণ্ডিত নয়, এখানে মানুষের যে-বিস্তৃতি তাকে যথাসম্ভব ব্যবহার করেছেন সুনীতিবাবু পৃথিবী পরিক্রমার দ্বারা। লোকে গত ত্রিশ বছরের যশস্বী সুনীতিবাবুর দেশ-বিদেশে আমন্ত্রিত হয়ে যাওয়াটাই জানে, কিন্তু তার বহু আগে থেকে তিনি বিদেশে গিয়েছেন এবং কখনও কখনও বেশ কষ্ট করেই দেশভ্রমণ করেছেন। বিশের দশকের শেষদিকে ইয়োরোপে ঘোরার সময় পুঁজি ছিল যৎসামান্য। গ্রীসের বিস্তৃত অঞ্চলে ঘুরেছেন গাধা ভাড়া করে। বলা বাহুল্য, এ ভ্রমণ আরামের নয়; কোন অদম্য কৌতূহলে তিনি প্রচুর শারীরিক অস্বাচ্ছন্দ্য এমন অনায়াসে সহ্য করেছেন? মানুষকে, মানুষের কীর্তিকে, তার আপন পট-ভূমিতে স্পষ্ট করে স্বচক্ষে দেখবার, সমস্ত চিত্ত দিয়ে গ্রহণ করবার আগ্রহে। গল্প করেছেন ভ্রমণের নানারকম বিপর্যয় সম্বন্ধে (কিছু কিছু ‘পথচলতি’-তে আছে), কিন্তু তাঁর কাছে সব ক্ষতি পূরণ হয়ে গেছে, কারণ বহু বিচিত্র মানুষকে তিনি দেখেছেন। তাদের সঙ্গে মিশে তাদের জীবনযাত্রা খাওয়া-পরা-থাকার বিভিন্ন প্রণালী, তাদের আচার অনুষ্ঠান, শিল্প সংগীত, ধ্যান ধারণা ধর্ম দর্শন সংস্কৃতির বিভিন্ন প্রকাশ সরাসরি জানতে পেরেছেন। তাঁর জীবনের মূল মন্ত্র ছিল : মানুষের কোনো কিছুই আমার পর নয়। মানুষের ইতিহাস বিজ্ঞান শিল্প ধর্ম ইত্যাদি সম্বন্ধে গ্রন্থলব্ধ জ্ঞানকে তিনি বারবার যাচাই করে দেখেছেন পৃথিবীর সব দেশের জীবিত মানুষের নিকষপাষাণে। এজন্যে জ্ঞান তাঁর শুধু যে সাবলীল ও লঘুভার হয়েছে তাই নয়, মানুষের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে সম্পৃক্ত থাকার ফলে এমন এক ধরনে সজীব হয়ে উঠেছিল যা সচরাচর দেখা যায় না।

সুনীতিবাবুর বিদ্যাবত্তার পরিমাপ করার ধৃষ্টতা গোষ্পদের আধারে সমুদ্রের পরিমাপ করার মতোই হাস্যকর, সে-চেষ্টাও করব না। এ প্রবন্ধে শুধু তাঁর বিদ্যা-চর্চার কয়েকটি দিক সম্বন্ধে বললাম। পরিশেষে আদ্য প্রসঙ্গে ফিরে আসব— অধ্যাপক সুনীতিকুমার। তাঁর শিক্ষাদান-ক্ষেত্র কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দীর্ঘ-কাল পূর্বে তিনি অবসর নিয়েছিলেন আনুষ্ঠানিকভাবে, অধ্যাপক-জীবন থেকেও; কিন্তু অধ্যাপনার বিরতি ছিল না। প্রাচ্য ভূখণ্ডের মানবিকী বিদ্যার এমন কোনো ক্ষেত্রই ছিল না যেখান থেকে জ্ঞানব্রতীরা বারংবার তাঁর দ্বারস্থ না হয়েছে। এ বিষয়ে তাঁর ক্লান্তি আপত্তি বা অসহিষ্ণুতা ছিল না। মনে রাখতে হবে এসময়ে তিনি শ্রুতকীর্তি, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের পণ্ডিতদের সঙ্গে জ্ঞানচর্চার নানা বিস্তৃত ক্ষেত্রে নিরন্তর পত্রালাপে আদানপ্রদান চলেছে এবং দেশে নানা গুরুত্বপূর্ণ পদে তিনি অধিষ্ঠিত, বহু শিক্ষা-সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। সব

কটিরই দাবি ছিল তাঁর সময়ের ওপরে। তবু জিজ্ঞাসুকে কখনো বিমুখ করেন নি এবং প্রত্যেক শিক্ষার্থীর সঙ্গে কথা বলেছেন স্বয়ং শিক্ষার্থীর মতো, (ছাত্রছাত্রীদের 'আপনি' বলাটা শুধু বিদেশী ভদ্রতাপ্রসূতই নয়, এইখানেই তার মূল উৎস, শিক্ষার ক্ষেত্রে এই আন্তরিক বিনীত ভাবে ;) সকলের সঙ্গে আলোচনা করেছেন, অকৃপণ-ভাবে বহুমূল্য সময় দিয়েছেন, প্রয়োজনমতো বই ধার দিয়েছেন, নিয়েছেনও। শিক্ষার্থী হয়ে যাঁরা এসেছেন বহুবার তাঁদের জন্যে বিদেশ থেকে বই নিজে সংগ্রহ করেছেন। সামান্য বুদ্ধিমত্তা আগ্রহ বা পরিশ্রমের আভাস পেলে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন তাদের উৎসাহিত করতে, গ্রন্থপঞ্জী লিখিয়ে দিয়ে, দুরূহ বিষয় বুঝিয়ে দিয়ে, সংশ্লিষ্ট প্রসঙ্গ উত্থাপন করে চর্চার পরিসর বাড়িয়ে দিয়ে। পাঠার্থী যেখানে জটিলতার আশঙ্কা করে নি সেখানে স্বয়ং সংশয়-প্রশ্নের অবতারণা করে এবং সম্ভাব্য সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে দিগ্‌দর্শন করিয়ে পথের সন্ধান দিয়েছেন। ওঁর সঙ্গে কোনো বিষয়ের আলোচনা করলে একটি বোধ খুব সহজে সঞ্চারিত হ'ত মনে, তা হল : ভাষাতত্ত্বই হোক বা ইতিহাস দর্শন ধর্মতত্ত্ব বা দেবতত্ত্বই হোক কোনো বিষয় বিচ্ছিন্নভাবে চর্চা করা যায় না। চর্চা মুখ্যত মানব-সভ্যতার, এগুলি সবই তার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ এবং একান্তভাবে পরস্পর-সম্পৃক্ত। এ বোধ মনে সংক্রামিত হত বলে পাঠার্থীর চর্চার পরিসরে একটা ব্যাপ্তি আসত, নিজের সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির ত্রুটি চোখে পড়ত, বুঝতে পারা যেত যে কোনো একটি বিষয় আয়ত্ত করতে গেলে তৎসংশ্লিষ্ট আরো বহু বিষয়ে বেশ কতকটা জ্ঞান থাকা একান্তই অপরিহার্য। যেহেতু সমস্ত জ্ঞানান্বেষণার কেন্দ্রে আছে মানুষ ও তার বিচিত্র প্রকাশ—স্থানে এবং কালে—সেইহেতু সমস্ত চর্চাটি ঐ কেন্দ্র থেকে পরিধির দিকে ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়বে আপনিই, এবং বহু-বিধ জ্ঞানের চক্রবাল অতিক্রম করেই তার অগ্রসৃতি।

সুনীতিবাবুর কাছে শিক্ষার্থী হয়ে যাঁরা গেছেন তাঁদের সকলেরই একটা অভিজ্ঞতা হয়েছে : আলোচনান্তে তাঁরা ফিরেছেন নতুন এক প্রেরণা উদ্দীপনা নিয়ে। শুধু জ্ঞান দিয়ে এটা হয় না ; কারণ এমন বহু পণ্ডিত আছেন যাঁদের কাছে গিয়ে জ্ঞানের বৃদ্ধি ঘটলেও ছাত্রছাত্রী ফেরে দ্বিগুণ হতাশা নিয়ে, "কত জানার আছে, আমি কিছুই জানিনে" এই বোধ নিয়ে। জ্ঞানের উত্তুঙ্গ শিখর থেকে হেঁট হয়ে, এঁরা তাকান নিচু তলার শিক্ষার্থীর দিকে ; তাঁদের লব্ধ জ্ঞান তাই হতাশাই আনে শুধু। সুনীতিবাবু এটা করতে জানতেন না। অগাধ জ্ঞানের অধিকারী হয়েও উনি নিজের চারিদিকে দুরধিগম্যতার পরিমণ্ডল রচনা করেন নি কখনও। ওঁর সঙ্গে আলোচনা করলে অবশ্যই ওঁর বিপুল জ্ঞানের পরিচয় পেয়ে শিক্ষার্থী

বিস্মিত বোধ করত কিন্তু সমস্ত আলোচনার মধ্যে ওঁর জ্ঞানস্পৃহার উৎসে যে নানা বিচিত্র কৌতূহল জিজ্ঞাসা ও যে সজীব মানবকেন্দ্রিক আগ্রহ দেখা যেত—জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে সম্পৃক্ত বলে সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয় নতুন একভাবে তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে দেখা দিত—তাতেই মনে এক অভিনব উদ্দীপনা জাগত। ওঁর জ্ঞান মৃত বিস্তার পিণ্ড ছিল না, জীবনের হৃৎস্পন্দনে সজীব ছিল বলেই তা জ্ঞানার্থীকে বিকর্ষণ করত না, নবতর চর্চার দিকে আকর্ষণ করত, চিত্তবৃত্তিকে নতুন পর্যায়ে উন্মেষিত করতে পারত। আজ মনে হয় অধ্যাপক সুনীতিকুমারের চূড়ান্ত সার্থকতা, তাঁর অধ্যাপনার চরম তাৎপর্য এইখানেই।

রবিবাসরে সুনীতিকুমার

সন্তোষকুমার দে

১৯৩৭ সালের কথা, খুলনা শহরের করনেশান হলে খুলনা সাহিত্য সভার বঙ্কিম জন্মোৎসবের এক বিশেষ অধিবেশন হয়, ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় সভাপতি হয়ে সেই সভায় গিয়েছিলেন। খুলনায় থাকতে আমি খুলনা সাহিত্য সভার সদস্য ছিলাম, সেখানে মানকুমারী বসু কবিতা পড়তেন। যে সময়ে এই সভাটি হয় তখন বঙ্কিমচন্দ্র সাম্প্রদায়িক লেখক এবং তিনি মুসলমান সমাজকে হেয় প্রতিপন্ন করে তাঁর সাহিত্য রচনা করেছেন এই সব আজগুবি অভিযোগ এনে নানাস্থানে আন্দোলন হচ্ছিল, অত্যুৎসাহীরা 'আনন্দ মঠ'-এর মত উপন্যাসও আগুনে পুড়িয়ে প্রতিবাদ জানিয়েছিল। আমায় যখন খুলনা সাহিত্য সভা থেকে আমন্ত্রণ জানানো হল তখন আমিও সুনীতিবাবুর দর্শন লাভের সুযোগ পাওয়ার লোভে কলকাতা থেকে খুলনায় গিয়েছিলাম। মনে আছে, সভার দিন কি কারণে খুলনাগামী ট্রেন লেট করে পৌছেছিল। তখন এমন সচরাচর ঘটত না। দৌলৎপুর কলেজের যে সব অধ্যাপক ঐ সাহিত্য সভায় আমন্ত্রিত হয়ে এসেছিলেন তার মধ্যে আমার শিক্ষাগুরু, বাংলা ছন্দশাস্ত্রের 'রূপকার', সুনীতিকুমারের বিশেষ বন্ধু, অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র সেন-ও ছিলেন। তিনি সভাস্থল থেকে কমপক্ষে দুইবার রেল-স্টেশনে গিয়ে ফিরে এসেছিলেন। শেষ পর্যন্তও তিনি স্টেশনে গিয়ে সঙ্গে করে সুনীতিকুমারকে সভায় নিয়ে এলেন। সভার উদ্যোক্তারাও অবশ্য স্টেশনে উপস্থিত ছিলেন। অন্য সভায় সভাপতিরা এসেই যেন সকলকে ধন্য করেন, আর এই সভাপতিকে দেখলাম ট্রেন লেট হওয়ার জন্য তিনিই যেন দায়ী! অতি বিনয়ের সঙ্গে তিনি বিলম্বের জন্য দুঃখ প্রকাশ করলেন সভামঞ্চে উঠেই। বিশ্ব-বিখ্যাত মানুষটির এই ভদ্র ব্যবহারে আমরা মফঃস্বলবাসীরা সত্যই মুগ্ধ হয়েছিলাম।

ঐ সভায় আমি 'বঙ্কিমচন্দ্রের সাম্প্রদায়িকতা" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ পড়লাম। কবিতা নয়, গল্প নয়—প্রবন্ধ, তাও আবার এমন একটা বিষয়ে যা নিয়ে তখন চারিদিকে আন্দোলন চলছে। স্বভাবতই লেখাটা তাই অল্পবিস্তর সবার মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল। প্রবন্ধ পাঠ শেষ হলে খুলনার একজন বিশিষ্ট প্রবীণ মুসলমান জননেতা মঞ্চে উঠে সর্বসমক্ষে আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরে আশীর্বাদ করলেন এবং বললেন, বিষয়টি আলোচনা করে তুমি খুব ভালো করেছ, বন্দে

মাতরম্ মন্ত্রের ঋষির প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছ। সুনীতিকুমারও বক্তাকে সমর্থন করে আমায় অশীর্বাদ জানালেন। সভান্তে আমার অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র সেন সুনীতিকুমারের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলেন—আমি তাঁর ছাত্র। সুনীতিকুমার সস্নেহে বললেন, তোমার প্রবন্ধটি 'দেশ' পত্রিকায় পাঠাও, এটি প্রচারিত হওয়া প্রয়োজন।

১৭ পৌষ, ১৩৪৪ সংখ্যার 'দেশ'-পত্রিকায় প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু একজন নগণ্য ছাত্রের লেখা একটি অকিঞ্চিৎকর প্রবন্ধ যে সুনীতিকুমার অনুগ্রহ করে শুনেছিলেন এটাই আমার পরম আশ্চর্য মনে হয়েছিল। আরও আশ্চর্য হয়েছিলাম যখন কলকাতায় দেখা হলে তিনি বলেছিলেন, আপনিই তো প্রবোধবাবুর ছাত্র যিনি বঙ্কিমচন্দ্রের বিষয়ে প্রবন্ধ পড়েছিলেন! (তিনি আমায় 'আপনি' বলাতেও কম আশ্চর্য হই নি)।

নিতান্ত এই ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ অতি সংকোচের সঙ্গে আজ প্রায় ৪৪ বছর পরে উল্লেখ করছি, কারণ সেই অতি সামান্য ঘটনার রেশ ধরে সুদীর্ঘকাল আমি তাঁর স্নেহলাভে ধন্য হয়েছিলাম, যার ফলে রবিবাসরেও তাঁকে বার বার আনতে পেরেছিলাম।

কিন্তু রবিবাসরে সুনীতিকুমারের স্মৃতিচারণের পূর্বে মানুষ-সুনীতিকুমারের আর একটি পরিচয় যা আমার পাওয়ার সৌভাগ্য ঘটেছিল সে ঘটনাটি উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করি।

ভারতবর্ষে রসায়ন-শিল্পের প্রতিষ্ঠাতা, বেঙ্গল কেমিক্যালের প্রথম ম্যানেজিং ডিরেক্টর ডাক্তার কার্তিকচন্দ্র বসুর জীবন-কথা আমি উপন্যাস আকারে মাসিক বসুমতী পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে লিখেছিলাম, পরে তা "সঞ্জয় উবাচ" নামে গ্রন্থাকারে বের হয়। ডাঃ বসুর যোগ্য উত্তরসাধকেরা যখন তাঁর জন্মশতবার্ষিকী পালন করেন তখন অনুগ্রহ করে আমাকেও স্মরণ করেন। তাঁর জন্মদিনের স্মরণ-সভায় প্রতি বৎসর অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি সভাপতিত্ব করেছেন, তার মধ্যে প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি ফণীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, খাদি-প্রতিষ্ঠানের সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত, বনফুল, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, নরেন্দ্র দেব প্রভৃতি অনেকেই এসেছেন। এবার জন্মশতবার্ষিকীতে কাকে সভাপতি করা যায় তার জন্য উদ্যোক্তারা আমার পরামর্শ চান। আমি জাতীয় অধ্যাপক ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের নাম প্রস্তাব করলে, উদ্যোক্তারা বললেন, তাঁকে রাজি করাবার ভার তবে আপনাকে নিতে হবে। আমি মনে মনে প্রমাদ গণলেও চেষ্টা করতে স্বীকৃত হলাম। তাঁর মত ব্যস্ত

মানুষকে যদি নির্ধারিত দিনে পাওয়া সম্ভব না হয় তবে আর কাকে বলা যাবে তা নিয়েও আলোচনা হল। শেষ পর্যন্ত দুর্গানাম জপ করে সুনীতিকুমারের চরণপ্রান্তে হাজির হলাম এবং নিজের সৌভাগ্যে বিশ্বাস করতে দ্বিধা করতে লাগলাম, যখন ঐ একই তারিখে তাঁর অন্য সভায় সভাপতিত্ব করবার কথা আছে ডায়েরি দেখে তা জেনেও বললেন, ওদের ওখানে না হয় একটু পরে যাব, কার্তিকবাবুর সভায় যেতেই হবে। আমি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে ডাঃ বসুর জন্মশতবর্ষ পালনের উদ্যোক্তাদের এসে সুখবর জানালাম এবং সেই মত আমন্ত্রণ-পত্র ছাপতে দেওয়া হল।

ডাঃ কার্তিকচন্দ্র বসুর জন্মশতবর্ষ বেশ ঘটা করেই উদ্‌যাপিত হল। সভাটি বসেছিল বিবেকানন্দ রোড ও আমহার্স্ট স্ট্রীট জংশনের কাছাকাছি বিবেকানন্দ হলে। সভায় তিলধারণের স্থান ছিল না। বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন। সর্বক্ষণ সুনীতিকুমার সানন্দে সভার কাজ পরিচালনা করলেন। সর্বশেষে সভাপতির ভাষণ দিতে উঠে সেই পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহের সর্বশ্রেণীর মানুষের সুমুখে অকুণ্ঠে বললেন, অল্প বয়স হতে তাঁর দৃষ্টিক্ষীণতার কথা, আর্থিক অনটনের জন্য ডাক্তারকে চোখ দেখানো ও উপযুক্ত চিকিৎসার অসুবিধার কি ভাবে সুরাহা ঘটেছিল তাঁর পিতার সহকর্মী প্রবোধচন্দ্র বসুর সদ্য পাশ করা ডাক্তার পুত্রের বদান্যতায়। সেই ডাক্তার আর কেউ নন, এই স্বনামধন্য চিকিৎসক এবং ভারতবর্ষের রসায়ন-শিল্প সহ বহু শিল্পের প্রবর্তক ডাক্তার কার্তিকচন্দ্র বসু। সুনীতিকুমার তাঁর সভাপতির ভাষণে সুস্পষ্ট ভাষায় বললেন, ডাঃ বসু সেদিনকার সেই দৃষ্টিক্ষীণ দরিদ্র বালকটির চক্ষু সযত্নে পরীক্ষা করে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে চশমা পর্যন্ত দিয়ে যদি সাহায্য না করতেন তবে আজ আপনারা যে-সুনীতিকুমারকে চেনেন জানেন, সে-সুনীতিকুমার হয়তো নিতান্তই অজ্ঞাত অখ্যাত একজন কেরানী হয়েই জীবনযাপন করতে বাধ্য হতেন। তিনি বললেন, জীবনে যদি আমি কিছু করে থাকি তবে করেছি এই চোখের দৃষ্টি ফিরে পেয়েছিলাম বলে এবং তার জন্য সারা জীবন আমি ডাক্তার বসুর কাছে ঋণী।

তাঁর সেদিনকার বক্তৃতা শুনে শুধু আমি নই, যাঁরা সুনীতিকুমারকে সুদীর্ঘকাল ধরে একজন বিশ্ববিখ্যাত পণ্ডিত বলে জানতেন তাঁরাও তাঁর হৃদয়ের মহত্ত্বে মুগ্ধ হয়েছিলেন।

এবার বলি সুনীতিকুমারের সঙ্গে রবিবাসরের যোগাযোগের কথা ও কয়েকটি বিশেষ স্মরণীয় অধিবেশনে তাঁর বক্তৃতার কথা। রবিবাসর বঙ্গীয় সাহিত্য-সেবীগণের

মিলন-সভা রূপে ১৩৩৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৩৮৯ সালে তার ৫৩ বর্ষ চলছে। এই সাহিত্য সভাটির বিশেষ গৌরব এই যে এইটিই একমাত্র সাহিত্য সভা যেখানে রবীন্দ্রনাথ এবং শরৎচন্দ্র উভয়েই সদস্য ছিলেন এবং রবীন্দ্রনাথ ছিলেন রবিবাসরের অধিনায়ক। রবিবাসরের ইতিহাস সুদীর্ঘ, বলতে গেলে বাংলা সাহিত্য-জগতের সকল সেরা মানুষই কোন না কোন সময়ে রবিবাসরের সদস্যপদ গ্রহণ করেছেন। এখনও প্রধান সাহিত্যিকদের এটি একটি বিশিষ্ট মিলনক্ষেত্র। যাঁরা সদস্য নন, —যেমন হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন, অধ্যাপক রঙ্গিন হালদার, শিল্পী অসিতকুমার হালদার, দেবেশ দাস, প্রভৃতি কলকাতায় এলে রবিবাসরে যোগ দিয়েছেন, অনেকে প্রবন্ধও পড়েছেন—তাই নিয়ে আলোচনার ঝড় বয়েছে। যেমন হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় 'বড়ু চণ্ডীদাস' প্রবন্ধ পাঠের পর ডঃ সুনীতিকুমারের সুদীর্ঘ আলোচনা। প্রফুল্লকুমার সরকারের 'ক্ষয়িষ্ণু প্রবন্ধ' পাঠের পর স্যার যদুনাথ সরকারের সুদীর্ঘ আলোচনা—যার ফলে "ক্ষয়িষ্ণু হিন্দু" গ্রন্থের জন্ম। পুরাতন রেকর্ডে সুনীতিকুমারের বহুবার রবিবাসরে উপস্থিত থাকা ও আলোচনায় অংশ-গ্রহণের বিবরণ আছে। আমিও তাঁকে কয়েকবার রবিবাসরে আমন্ত্রণ করে এনেছি, তিনি সানন্দে নিজেই এসেছেন, তাঁর বাড়ি গিয়ে সঙ্গে করে আনতে হয় নি। একদিন সাহস করে বলেও ছিলাম, সদস্যপদ গ্রহণ করতে। হেসে বলেছিলেন, কতটুকু সময় কলকাতায় থাকতে পারি যে নিয়মিত সভায় যাবো। রবিবাসরের সীমিত সংখ্যক সদস্যের মধ্যে একটি পদ দখল করে রাখা ঠিক নয়।

১৯৭৫ সালে আমেরিকায় গিয়ে 'আবিষ্কার' করলাম, সুনীতিকুমার যে সময় হতে রবিবাসরে যাতায়াত করেছেন বলে আমি জানতাম তারও কমপক্ষে দশ বছর আগে অর্থাৎ রবিবাসর স্থাপিত হবার দুই-তিন বছরের মধ্যেই, আজ থেকে কম-পক্ষে পঞ্চাশ বছর আগে রবিবাসরের একটি সভায় তিনি শরৎচন্দ্রের সঙ্গে সর্বপ্রথম পরিচিত হন বলে তিনি জানিয়েছেন। নিউ ইয়র্কের বাঙ্গালীদের ক্লাবের "সংবাদ বিচিত্রা" নামে একটি পত্রিকায় সুনীতিকুমার যে প্রবন্ধে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর প্রথম সাক্ষাতের বিবরণ লিখেছেন তা হয়েছিল শ্যামবাজার ট্রাম-ডিপোর পিছনে অবস্থিত একটি বাড়িতে। দীর্ঘকাল পরে তিনি গৃহকর্তার নাম বা সভার নাম মনে করতে পারেন নি। ঐ সময় 'সংবাদ বিচিত্রা' হতে শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে বিশেষ সংখ্যা প্রকাশের জন্য আমার কাছেও একটি লেখা চান। নিউ ইয়র্কে বসেই লিখতে হয়েছিল বলে আমি সভার সঠিক তারিখটি আমার প্রবন্ধে উল্লেখ করতে পারি নি, তবে সভাটি যে জীবনৌকায় মন্মথ ঘোষের বাড়িতে অনুষ্ঠিত

রবিবাসরে ঘটেছিল সেকথা উল্লেখ করেছিলাম। সুনীতিকুমার সে লেখাটি দেখে খুশী হয়েছিলেন।

সেক্‌স্‌পীয়রের ৪০০ বৎসর পূর্ণ হলে রবিবাসরের একটি বিশেষ অধিবেশন হয় রবিবাসরের তৎকালীন প্রবীণতম সদস্য কেশবচন্দ্র গুপ্তের গিরিশপার্কের সুমুখে অবস্থিত বাড়িতে। কেশবচন্দ্র কলেজে সুনীতিকুমার এবং শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় উভয়েরই বছর দু-তিন অগ্রবর্তী ছিলেন, সারাজীবন উভয়কেই নাম ধরে ডাকতেন, তাঁরাও 'কেশবদা' বলতেন। তখন ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় রবিবাসরের সর্বাধ্যক্ষ, অথচ তাঁর তুল্য ইংরাজি সাহিত্যের অধ্যাপকও আমাদের মধ্যে কেউ ছিলেন না। তাই কেশবচন্দ্র আমায় বললেন—শ্রীকুমারকে বলো, সেক্‌স্‌পীয়র সম্বন্ধে সে-ই আলোচনা করুক।

তাহলে সভাপতি হতে কি সুনীতিবাবুকে ডাকা যায়?

'দি আইডিয়া'—কেশববাবু খুশি হয়ে বললেন, তুমি বলে দেখো। যদি তোমার কথায় সুনীতি রাজি না হয় তখন আমিই বলবো।

সুনীতিবাবু রাজি হয়েছিলেন, এসেছিলেন এবং সানন্দে সেদিন রবিবাসরে শুধু সভাপতিত্ব করলেন না। যখন 'কেশবদা'-র আদেশে শ্রীকুমার সম্পূর্ণ বাংলা ভাষায় (একটিও ইংরাজি শব্দ উচ্চারণ না করে) এক ঘণ্টারও অধিক সময় ধরে সেক্‌স্‌পীয়র সম্বন্ধে বললেন, তারপর সভাপতির ভাষণে বহুভাষাবিদ সুনীতিকুমারও বাধ্য হলেন শুধু বাংলায় তাঁর আলোচনা করতে। সে আলোচনাও, বলা বাহুল্য, অত্যন্ত মূল্যবান ও উপভোগ্য হয়েছিল।

ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারের ৮০ বৎসর পূর্ণ হলে লেডী রাণু মুখার্জীর আহ্বানে অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টস ভবনে রবিবাসরের যে অধিবেশন হয় সেখানে আমন্ত্রিত হয়ে সুনীতিকুমার এসেছিলেন এবং তাঁর বয়োজ্যেষ্ঠ রমেশচন্দ্র সম্পর্কে কলেজে ছাত্র-জীবনে তাঁরা রমেশচন্দ্রকে কত সমীহ এবং ভয় করতেন তার অতি আন্তরিক কাহিনী শুনিয়েছিলেন। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ও তাঁর সভাপতির ভাষণে এই দুই মনীষীর ছেলেবেলার কথার স্মৃতিচারণ করেছিলেন। সে দিন বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের প্রধানেরা সবাই উপস্থিত ছিলেন—তার অনেকেই সুনীতিকুমারেরও ছাত্র বা ছাত্রস্থানীয় ছিলেন। সে যেন এক নবরত্ন সভার দৃশ্য চাক্ষুষ করেছিলাম।

ডঃ হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় তখন রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য। তাঁর

আহ্বানে রবিবাসর। প্রসঙ্গক্রমে বলে রাখি, রবীন্দ্রভারতীর এ পর্যন্ত যেসব উপাচার্য এসেছেন—ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ রমা চৌধুরী, ডঃ প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত এবং ডঃ দেবীপদ ভট্টাচার্য, সকলেই রবিবাসরের সদস্য। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এবং কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য ডঃ সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায়ও রবিবাসরের সদস্য আছেন। ডঃ হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ির অদূরে কন্যাগৃহে তখন উপস্থিত ছিলেন বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র সেন। তিনি যখন দৌলৎপুর কলেজে অধ্যাপক ছিলেন তখন খুলনা সাহিত্য সভায় ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় সভাপতি হয়ে গিয়েছিলেন সে কাহিনী পূর্বেই উল্লেখ করেছি। তাঁকে গিয়ে ধরলাম, হিরণ্ময়বাবুর বাড়ি রবিবাসরে যেতে হবে—সেখানে সুনীতিকুমারও আসবেন কথা দিয়েছেন। শুনে তিনিও আসতে রাজি হয়েছিলেন।

যতদূর মনে পড়ে, সেদিন পাঠক ছিলেন এঁদের সকলেরই বন্ধু কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক ডঃ বিজনবিহারী ভট্টাচার্য। আমার মাথায় একটা দুষ্ট বুদ্ধি খেলে গেল—একটা সাদা প্যাড আর ডটপেন সুনীতিকুমারের হাতের কাছে রেখে দিলাম, আশা, যদি তাঁর ইচ্ছা হয়—কোনও কিছু লিখবেন বা স্কেচ আঁকবেন। যাঁরা সুনীতিকুমারকে অন্তরঙ্গ ভাবে জানেন তাঁরা নিশ্চয় দেখেছেন এই মহাপণ্ডিত মানুষটির হাতের স্কেচ কি সুন্দর।

আমায় সেদিন তিনি নিরাশ করলেন না, অবলীলাক্রমে দু-চার টানে একটি বিড়াল এঁকে দিয়েছিলেন। মনীষীর ছেলেখেলা, সেটিই আমি সযত্নে রবিবাসরে ছেপেছিলাম (পঞ্চম খণ্ড, ১৩৮০)।

ভাষাতত্ত্বের শ্রেষ্ঠ তাত্ত্বিক, বিশ্ববরেণ্য মনীষী আচার্য সুনীতিকুমারের অন্তরের মহত্ত্বের কথা রচনাপ্রারম্ভে উল্লেখ করেছি, তাঁর চরিত্রের আর দুটি বিশেষ দিক উল্লেখ করে তাঁর পুণ্য স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করব।

যিনি তাঁকে নাম ধরে ডাকতেন এবং উত্তরে তিনিও যাঁকে 'দাদা' সম্বোধন করে তৃপ্ত হতেন, 'অর্চনা' পত্রিকার সম্পাদক, প্রবীণ সাহিত্যিক ও ব্যবহারজীবী শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র গুপ্তের তিরোধানের পর রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার ভবনে রবিবাসরের যে স্মরণসভা হয় সেখানেও তাঁকে আমরা পেয়েছিলাম। মৃত্যুর পট-ভূমিকায় তাঁর সেদিনকার ভাষণ চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। তিনি বলেছিলেন, আমাদের শাস্ত্রে বলে আত্মা অবিনশ্বর, ইহলোকের সঙ্গে পরলোকের একটা যোগ আছেই তবে তা আপাতদৃষ্টিতে গোচরীভূত হয় না। কিন্তু তিনি এসব নিয়ে মাথা ঘামান না। তিনি রবীন্দ্রনাথের একটি গানের কলি তুলে তাঁর বক্তব্য শেষ

করেছিলেন—যাতে কবি সমুখের শান্তি পারাবারে কর্ণধারকে তরণী ভাসাতে অনুরোধ করছেন। যে কর্ণধার আমাদের চিরসাথী তিনিই আমাদের 'মহা অজানার' পথে নিয়ে যাবেন। ভাবগম্ভীর পরিবেশে সে দিনের ভাষণে তাঁর বিদগ্ধ চিত্তের সেই গভীর অনুভূতির কথা আমাদের মুগ্ধ করেছিল। সে কথায় পাণ্ডিত্যের অভিমান ছিল না, ছিল যেন সেই কর্ণধারের প্রতি আত্মসমর্পণের ও আস্থা স্থাপনেরই আভাস ও আকৃতি।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সুনীতিকুমারের যে কত নিবিড় পরিচয় ছিল সেকথা সকলেরই জানা। কিন্তু তিনি যে রবীন্দ্র-সঙ্গীতও কত গভীরভাবে ভালো-বাসতেন সে কথা বলেই আজকের প্রসঙ্গ শেষ করব। রবিবাসরের অধিবেশনে শুরুতে ও শেষে প্রায়ই রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশিত হয়, সে গানও যে তিনি কিছুমাত্র উপেক্ষা না করে বেশ তৃপ্তির সঙ্গে শুনতেন সেটা লক্ষ্য করেই সাহসে ভর করে একবার গ্রামোফোন কোম্পানীর এক রবীন্দ্রসঙ্গীতের আসরে রবীন্দ্রসদনে তাঁকে একখানি নিমন্ত্রণপত্র ডাকে পাঠিয়ে অনুরোধ করেছিলাম—যদি অনুগ্রহ করে আসেন। ভাবতে পারিনি, অমন উড়ো চিঠি ডাকে পেয়ে তাঁর মত ব্যস্ত মানুষ শুধু গান শুনতে বালিগঞ্জ থেকে ক্যাথিড্রাল রোডে রবীন্দ্রসদন পর্যন্ত আসবার ক্লেশ স্বীকার করবেন। আমি তখন গ্রামোফোন কোম্পানীর প্রচার-সচিবের কাজ করতাম, তাই এই অনুষ্ঠানের আয়োজনে আমায় কিছুটা অংশ নিতে হয়েছিল। আমি তাই প্রেক্ষাগৃহের মধ্যে শিল্পীদের সঙ্গে ছিলাম।

সহসা প্রবেশদ্বারের একজন স্বেচ্ছাসেবক ছুটে এসে খবর দিল, ডঃ চ্যাটার্জি এসেছেন। তক্ষুণি প্রবেশদ্বারে গিয়ে তাঁকে সসম্মানে অভ্যর্থনা করে একেবারে সুমুখের আসনে এনে বসালাম এবং তিনি যে অনুগ্রহ করে এসেছেন তার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলাম আর গ্রামোফোন কোম্পানীর ম্যানেজিং ডিরেক্টরের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলাম। তাঁর সাক্ষাৎ পেয়ে কর্তাব্যক্তিরাও মহাখুশী।

সুনীতিকুমার হাত ধরে আমায় তাঁর পাশের আসনে বসিয়ে বললেন, 'রবীন্দ্র-সঙ্গীতের আসরের খবর পেলে না এসে পারি? এ যে আমার একান্ত আদরের সামগ্রী।' বলে তিনি একটি ঘটনা বললেন।

বিদেশে ঘুরতে ঘুরতে রোমে গিয়েছেন—সেখানে তাঁকে একটা বড় সভায় বক্তৃতা করতে হবে। বক্তৃতা-মঞ্চে বাঘা বাঘা ব্যক্তির মধ্যে তিনি বসে আছেন। দর্শকদের মধ্য কেউ পরিচিত আছেন কিনা চিনতে পারছেন না। বক্তৃতা-টক্তৃতা শেষ হলে যখন তিনি নেবে এলেন—অগুণতি লোকের ভিড়, বলা বাহুল্য বেশীর

ভাগই গণ্যমান্য ব্যক্তি, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশিষ্ট পণ্ডিত-মহল। সেই ভিড়ের মধ্যেই এসে একটি সুবেশ পদস্থ ব্যক্তি একেবারে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলেন। পরিচয় দিলেন—তাঁর প্রাক্তন ছাত্র, তখন World Health Organisation-এ ভারতের পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করছেন এবং পদাধিকার বলে সে সংস্থার অধিকর্তা বা অনুরূপ কোন উচ্চপদস্থ ব্যক্তি। নাম—B. R. Sen.

একে ছাত্র, তাহে ভারতীয় এবং বাঙালী—পরন্তু যখন শুনলেন তাঁর গৃহে গেলে খাঁটি বাঙালী খানা খাওয়াবেন, তখন সরকারি আতিথ্য ত্যাগ করে প্রাক্তন ছাত্রের বাড়ি তিনি গিয়েছিলেন। গিয়ে খাওয়া তো হলই তার থেকে বেশী পরিতুষ্ট হলেন সেন-গৃহিণীর সংগৃহীত রবীন্দ্র-সঙ্গীতের রেকর্ডগুলি শুনে। বললেন—মনে হল যেন দেশেই ফিরেছেন। কি মাধুর্যে মন ভরে গেল তা ভাষায় বুঝিয়ে বলতে পারবেন না তিনি।

সুনীতিকুমার যে এতটা রবীন্দ্র-সঙ্গীতে অনুরাগী ছিলেন তা কি তাঁর পাণ্ডিত্যের প্রভায় বাইরে থেকে বোঝা যেত?

আচার্য সুনীতিকুমার

শুদ্ধসত্ত্ব বসু

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মশায়ের পাণ্ডিত্য বিচারের ভার কে নিতে পারেন—সে সম্পর্কে আমার যথেষ্ট সংশয় আছে। তিনি বাংলা ভাষা সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক আলোচনা করে ভাষাতত্ত্ব বিষয়ের পণ্ডিত বলে সাধারণ মানুষের কাছে পরিচিত হয়েছেন; কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি 'খয়রা অধ্যাপক' ছিলেন। ভাষাতত্ত্বের বিষয়ে বিশ্বে যে সব সংস্থা আছে, সেখানকার তিনি সম্মানিত সদস্য ছিলেন, জাগতিক ভাষাতত্ত্বের আলোচনায় তিনি অগ্রণী ছিলেন। সত্যিই ভাষাতত্ত্বের তিনি এক সুমহান্ পণ্ডিত, কিন্তু সেই মাহাত্ম্য কেমন—তা বিচার করবেন কে? বাঙালীদের মধ্যে অপর এক শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত শ্রীসুকুমার সেন রয়েছেন, তিনিই বোধ হয় একমাত্র লোক—যিনি ব্যাখ্যা করে, বিশ্লেষণ করে বুঝিয়ে দিতে পারেন—সুনীতিকুমার কোন্ পর্যায়ের ভাষাবিদ্। শ্রীসুকুমার সেন হলেন সুনীতিকুমারের ছাত্র।

আমাদের কাছে—আমরা যারা বাংলা ভাষা নিয়ে কাজ করি, ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করি, সুনীতিকুমার ভাষাচার্য হিসাবে শ্রদ্ধাভাজন। রবীন্দ্রনাথ সুনীতিকুমারকে 'ভাষাচার্য' উপাধিতে ভূষিত করেছেন, আমরা এই বিশেষণেই খুশী। O. D. B. L. পড়ে সত্যিই বোঝা যায়—সুনীতিকুমারের ভাষা সম্পর্কে জ্ঞানের গভীরতা। মুগ্ধ বিস্ময়ে বাংলা ভাষার অধ্যাপকেরা শ্রদ্ধানত ভাবে তাঁর পাণ্ডিত্যের দিকে তাকিয়েই থাকেন। তাঁর ভাষাজ্ঞানের পরিধি ও গভীরতা বিচার করার ক্ষমতা আমাদের অনেকেরই নেই।

'বাংলা ভাষার ভূমিকা' নামের গ্রন্থখানি তাঁকে উৎসর্গ করা হয়েছে, এটি লেখার সময় হাজার প্রশ্ন নিয়ে তাঁর কাছে গেছি, তিনি সঙ্গে সঙ্গে সরল ভাষায় ভাষাতাত্ত্বিক তাবৎ প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন, নানা উদাহরণ দিয়ে কূট প্রশ্নের প্রাঞ্জল উত্তর দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন। প্রশ্রয় পেয়ে অন্য বিষয় সম্পর্কে দু-একটা কৌতূহলী প্রশ্ন করেছি, তৎক্ষণাৎ মুখে মুখে তিনি তার জবাব দিয়েছেন। শুধু আমার প্রশ্ন নয়, তাঁর কাছে নানাজন আসতেন, নানা জিজ্ঞাসা নিয়ে। বিবিধ বিষয়ের সেই সব প্রশ্নের জবাব দিচ্ছেন সুনীতিকুমার অনায়াস ভঙ্গীতে—অগাধ বিশ্বাসে এবং স্নেহের অতিশয্যে। তাঁকে আমার মনে হতো জীবন্ত অভিধান। যাদুকর যেমন করে তাক

লাগিয়ে দেন, তেমনি লেখাপড়া-জানা মানুষের হাজার রকম প্রশ্নের সহজ জবাব দিয়ে তিনি উপস্থিত সকলের বিস্ময়ভাজন হতেন।

সুনীতিকুমারের জ্ঞান শুধু মাতৃভাষাকে কেন্দ্র করে—তা কিন্তু নয়, পৃথিবীর সব ভাষা সম্পর্কেই তাঁর অতুলনীয় জ্ঞান ছিল। তিনি ইংরাজীতে এবং সংস্কৃতে এম. এ. পাস করেছিলেন, কিন্তু ভারতীয় সব ভাষাতেই তাঁর সমান পাণ্ডিত্য ছিল, অ-ভারতীয় ভাষাগুলিও তাঁর দখলে ছিল। বিশ্ব ভাষা সম্মেলনে তাঁর বক্তৃতা এবং আলোচনাগুলি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে তিনি বিশ্বের সর্বাগ্রগণ্য ভাষাতাত্ত্বিক বলে কেন চিহ্নিত হয়েছিলেন। এহেন সুনীতিকুমারকে আমাদেব মতো ক্ষুদ্র অধ্যাপকেরা কিভাবে পরিমাপ করবে?

বিশ্বভাষা সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান কত বিস্তৃত এবং ব্যাপক ছিল—সেই বিষয়ে একটা ঘটনার উল্লেখ করি।

একবার এক বিখ্যাত বিশ্বভাষাতাত্ত্বিক কলকাতায় আসেন। তিনি মাদাগাস্কারের সুবিখ্যাত পণ্ডিত, নাম রামামঞ্জি জর্জেস (Ramamonjy Georges)। ভারত সরকারেব আমন্ত্রণে সাংস্কৃতিক সফরে তিনি এসেছেন. এবং কলকাতাতে তাঁকে ভারত সরকার পাঠিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে অনুরোধ করে যেন তাঁর সভায় কোনো ভাষাতত্ত্বের পণ্ডিত উপস্থিত হন, এবং যোগ্য সমাদর যেন তাঁকে দেখানো হয়।

১৯৬৮ সালের এপ্রিল মাসে রামামঞ্জি জর্জেস আসেন। তারিখটা বোধ হয় ১৪. ৪. ১৯৬৮ হবে। সরকারের অতিথি, সুতরাং তৎকালীন পি আর. ও. শ্রীগোপাল ভৌমিক মশাই আমাদের আমন্ত্রণ জানালেন শ্রীরামামঞ্জি জর্জেসের সভায় উপস্থিত হবার জন্যে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে এই সভার আয়োজন করতে হয় খুবই অল্প সময়ের মধ্যে। বিরাট ভাষাতাত্ত্বিক এক পণ্ডিতের সম্বর্ধনা সভায় যে খুব বেশী লোক সমাগম হবে না—এ একরকম স্বতঃসিদ্ধ ব্যাপার। তাই গোপালবাবু বিশেষভাবে জানিয়েছিলেন—সভায় যেন যাই। সভাটিও বিরাট কোন হলে হয়নি, ছোট্ট একটি হলে অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ভবানীপুরের চক্রবেড়িয়া রোডে থিয়েটার সেণ্টার হলে সভা বসলো। বিশিষ্ট কিছু শ্রোতৃবৃন্দের সঙ্গে সভাপতি রূপে উপস্থিত হলেন ভাষাচার্য সুনীতিকুমার। তাঁকে এক রকম জোর করে ধরে নিয়ে আসা হয়েছে। গোপালবাবু নিজের করুণ অবস্থার কথা বলে সুনীতিকুমারকে রাজী করান এবং তৎক্ষণাৎ তিনি সভায় চলে আসেন। সময়মতো মাদাগাস্কারের পণ্ডিতও এলেন। বলা বাহুল্য, সভায়

আশানুরূপ ভিড় হয়নি।

সভারম্ভে ঘোষিত হলো সুনীতিকুমার পৌরোহিত্য করবেন, এবং তিনিই সভাপতি হিসেবে রামামঞ্জি জর্জেসকে সভায় পরিচিত করিয়ে দেবেন। সুনীতিকুমার আধঘণ্টা পূর্বেও জানতেন না যে আজ তাঁকে এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করতে হবে।

সুনীতিকুমার সভার কাজ শুরু করে দিলেন। শ্রী রামামঞ্জি জর্জেসের পরিচয় প্রসঙ্গে মাদাগাস্কারের ভাষার কথা উঠলো,—স্বাভাবিক ভাবে এই প্রসঙ্গ উঠলো —কারণ রামামঞ্জি মশাই তাঁর দেশের একজন বিশিষ্ট ভাষাবিদ্ পণ্ডিত। সুনীতিকুমার মাদাগাস্কারের ভাষার বর্তমান সমস্যার কথা তুললেন, এবং বর্তমান সময়ে ঐ ভাষায় বিবিধ যে সব সমস্যা দেখা দিয়েছে—সেগুলি একে একে ব্যক্ত করে গেলেন। সেই বক্তৃতা শুনে মনে হতে পারে যে বুঝি তিনি তৈরী হয়ে এসেছেন, কিন্তু আকস্মিকভাবে তাঁকে সভায় টেনে আনা হয়, বিশেষ অনুরোধের বলে, এবং মাদাগাস্কারের ভাষা নিয়ে যে তাঁকে কিছু বলতে হবে—এমন ধারণাও তাঁর ছিল না। একেবারে সহসা বা অকস্মাৎ তাঁকে বলতে হয়েছিল।

রামামঞ্জি জর্জেস মুগ্ধ বিস্ময়ে সুনীতিকুমারের সেই মনোজ্ঞ আলোচনা শুনছিলেন এবং তাঁর দেশের ভাষায় এই সব রহস্য রয়েছে, এমন কূট সমস্যাবলী আছে—তার সবটুকু তাঁরও অজানা ছিল, এবং নিজের বক্তৃতার সময়ে অকপটে তা স্বীকার করে সুনীতিকুমারের অবিশ্বাস্য ভাষাজ্ঞানের প্রশংসা করলেন, শেষে বললেন—তাঁর মাতৃভাষা সম্পর্কে তিনি যে রহস্য ও সমস্যার বিষয়ে জ্ঞাত হলেন, দেশে ফিরে গিয়ে তিনি সেই বিষয় নিয়ে নতুন করে গবেষণা শুরু করবেন।

আমরা স্তম্ভিত, গর্বে বুক ফুলে উঠলো। এই রকম ভাষাজ্ঞানের অদ্বিতীয় পণ্ডিতকে আমরা এত কাছে পেয়েছি, তাঁর পদতলে বসে ভাষাতত্ত্বের প্রাথমিক পাঠ নিতে পেরেছি!

রবীন্দ্রনাথ তাঁকে ভাষাচার্য বলেছেন। আচার্য হিসাবে যে তিনি কেমন নিষ্ঠাবান—সে সম্পর্কেও আমার কিছু অভিজ্ঞতা আছে। সুনীতিকুমার বহু ভাষাবিদ্—স্বাভাবিক ভাবেই তাঁকে ভাষাসমূহের ব্যাকরণও জানতে হয়েছে, শিখতে হয়েছে। ব্যাকরণ সম্পর্কে তাঁর আকর্ষণ আমার মনে হয় সহজাত, ব্যাকরণ পড়তে পড়তে এমন টান সম্ভব নয়। জন্মাবধি ব্যাকরণের জন্যে এক গভীর মমতা না থাকলে তাঁর মতো জ্ঞানী হওয়া সম্ভব নয়। তিনি বাংলা ভাষাকে সংস্কৃত ভাষার নাগপাশ থেকে মুক্ত করেছেন, এবং আধুনিক বাংলা ভাষাকে একটা স্বতন্ত্র মর্যাদা

দিয়ে নিজের পায়ে দাঁড় করিয়েছেন। ধ্বনিতত্ত্বের আলোচনা এবং ব্যাকরণের নবীকরণের ব্যাপারটা স্মরণ করলেই তা স্পষ্ট হবে। অপিনিহিতি এবং অভিশ্রুতির ব্যাপারটা সম্পূর্ণভাবে তাঁর একক গবেষণার ফসল। বাংলা ভাষার সমাস-প্রকরণের যে পদ্ধতি তিনি দিয়েছেন—তাও স্বতন্ত্র এবং আধুনিক বাংলা ভাষার উপযোগী। আধুনিক বাংলা ভাষাকে সামনে রেখেই তিনি আধুনিক বাংলা ভাষার ব্যাকরণ রচনা করেছেন।

বাংলা ভাষার খুঁটিনাটি কিছু বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা নিয়ে তাঁর কাছে প্রথম যাই; সম্পূর্ণ অজানা সাধারণ ছাত্রের চেহারায় তাঁর সঙ্গে দেখা করে আমার বাসনার কথা নিবেদন করি। শুনেছিলাম তাঁর অপার দাক্ষিণ্যের কথা—জ্ঞান-লাভেচ্ছু কোন প্রার্থী কখনো তাঁর কাছ থেকে রিক্ত হাতে বিমুখ হয়ে ফিরে আসেন নি। এই ভরসা নিয়ে গেছি। ভাষাতত্ত্বের না-বোঝা কয়েকটি প্রশ্নের কথা বললাম, তিনি খুব সংক্ষেপে তৎক্ষণাৎ সে সব প্রশ্নের উত্তর দিলেন—তবে এত সংক্ষিপ্ত সেই সব উত্তর—যাতে আমার মতো দীন বুদ্ধির ছাত্রের পক্ষে সহজে বুঝে ওঠা মুশকিল হলো। আমি তা নিবেদন করলাম এবং আরও দু একটি প্রশ্ন করলাম—যেগুলি ঠিক সাধারণ ছাত্রের প্রশ্ন ছিল না। তিনি এবার আমার আপাদমস্তক লক্ষ্য করে বললেন—দেখুন, ভাষাতত্ত্ব সম্পর্কে আগ্রহ খুব কম লোকেরই থাকে, গোড়ায় বিষয়টা দেখার আগ্রহ হলেও এ পথে চলতে শুরু করে অনেকেই রণে ভঙ্গ দেন ও পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেন, আপনিও তা করবেন, সুতরাং আমাকে অকারণ বিরক্ত করা কেন? আপনার প্রশ্নের জবাব দিচ্ছি—আর বিরক্ত করবেন না।

সুনীতিকুমার ছোট বড় সকলকেই আপনি বলতেন, আমার তীব্র নিষেধ সত্ত্বেও তিনি আমাকেও আপনি বলে সম্বোধন করতেন। [আর তিনি পায়ে হাত দিয়ে প্রণামের ঘোরতর বিরোধী ছিলেন, বলতেন—আমার পায়ের ধুলো নিলে আমি তবে পায়ে হাত দিয়ে নমস্কার করবো—এই রকম শাসন তিনি করতেন।]

আমার উত্তর জেনে উঠে আসবো ভাবছি, এমন সময় সুনীতিকুমার বললেন—আচ্ছা, আপনার ভাষা শেখার আগ্রহ আছে বলছেন, ঠিক আছে। আমি একটা বই-এর নাম বলছি—এই বইটা পড়ে আমার কাছে আসুন, দেখি কেমন আপনার আগ্রহ।

তিনি তারাপোরওয়ালার একটি বই-এর কথা বললেন, বইটি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত হয়েছিল বটে, কিন্তু তখন তার মুদ্রিত কপি বাজারে মিলছিল না, নানা দোকানে খোঁজ করে বইটি পাওয়া গেল না। অবশেষে ন্যাশনাল

লাইব্রেরীতে গিয়ে বইটির হদিস পেলাম। বেশ মোটা বই, কয়েক মাস ধরে পড়লাম। তারপর এক সন্ধ্যায় ভাষাচার্যের কাছে গিয়ে হাজির হলাম সুধর্মায়, সুধর্মা তাঁর বাড়ির নাম, স্বর্গে দেবসভার নাম সুধর্মা, আর মর্ত্যে আচার্য সুনীতিকুমারে বাড়ির নাম। তারাপোরওয়ালার বইটি পড়েছি বলতে তিনি বললেন —পরদিন সকালের দিকে আসুন, ছুটি আছে, আলোচনা করা যাবে।

নির্দিষ্ট সময়ে গেলাম। ভাবছি ভাষাতত্ত্ব সম্পর্কে নিশ্চয়ই কিছু প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবেন। তিনি এসে কিন্তু একটি প্রশ্নই শুধু করলেন—কিছু বুঝেছেন? আমার অকপট উত্তর—না, তেমন কিছু বুঝিনি, তবে আদ্যন্ত পড়েছি।

এই উত্তর শুনে তিনি কয়েক ঘণ্টা ধরে সস্নেহে দুরূহ ভাষাতত্ত্বের কয়েকটি জটিল বিষয় অতি সহজ করে আমাকে বুঝিয়ে দিলেন। কি গভীর স্নেহে ও মমতায় এমন আগ্রহ নিয়ে তিনি এক অপরিচিত ছাত্রের কাছে ভাষাতত্ত্বের রসজ্ঞ আলোচনা করলেন! সেদিনের পর থেকে বহুবার তাঁর কাছে বহু প্রশ্ন নিয়ে গিয়েছি, সব সময়ই তিনি উদার দাক্ষিণ্যে আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছেন সব। আধুনিক শিক্ষকের এখন সময় কমে গেছে খুব, ক্লাসেও বিস্তৃতভাবে পড়াবার সময় পান না, বাড়িতে আসা ছাত্রকেও পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পড়াবার বুঝিয়ে দেবার প্রেরণা ও প্রয়োজন বোধ করেন না, কিন্তু বিশ্বভাষাতাত্ত্বিক সুনীতিকুমারের অতি দীন অতি অজ্ঞ ছাত্রকেও একেবারে নীচু শ্রেণীর বিষয় বোঝাবার জন্যে অখণ্ড সময় ছিল। একবার যে কেউ তাঁর কাছে প্রশ্ন করেছেন, তিনিই বুঝেছেন যে যতক্ষণ না সেই বিষয় সম্পর্কে প্রশ্নকর্তার পরিষ্কার ধারণা জন্মাচ্ছে, ততক্ষণ আচার্য সুনীতিকুমার ক্ষান্ত হতেন না।

আচার্য সুনীতিকুমার ছিলেন একটি জীবন্ত অভিধান, জ্ঞানের এমন সচল মনুমেণ্ট আমার জীবনে আমি প্রত্যক্ষ করিনি। কি করে যে তিনি বিবিধ বিষয়ের তাবৎ কূট সমস্যা এবং তাদের সমাধান মগজে সাজিয়ে রাখতেন—তা বলতে পারি না। মনীষা বলতে বোধ হয় এই জাতীয় পাণ্ডিত্যই বোঝায়! আর আচার্য কথাটার মানে বোধ হয় সুনীতিকুমার, তাঁর আদর্শ, শিক্ষা আর চারিত্র্য।

ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

ডঃ পবিত্র সরকার

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের (১৮৯০-১৯৭৭) জীবনবৃত্তান্তের বড়ো-বড়ো খবরগুলি এখন সকলেরই মোটামুটি জানা। অসচ্ছল পিতার ঘরে তাঁর জন্ম, আর ভারত-ভূভাগের সবচেয়ে বরেণ্য মনীষী রূপে তাঁর মৃত্যু। সাতাশি বছরের সুদীর্ঘ জীবন ক্রান্তীয় জলবায়ুতে তত সুলভ নয়, তবু তাঁর মৃত্যু যে আমাদের সকলের কাছে অকালমৃত্যু বলেই মনে হল—এই ধাঁধা তাঁর কাজের সামনে দাঁড়ালে পরিষ্কার হয়ে যায়। একা তিনি প্রায় বিশজন মানুষের কাজ করে গেছেন। ইংরেজিতে লেখা তাঁর বইয়ের সংখ্যা সাতাশের মতো, বাংলা বই একুশটি। হিন্দিতে অন্তত একটি বই তাঁর মৌলিক প্রণয়ন। সম্পাদনা করেছেন প্রায় বারো-তেরোটির মতো পাঠ্য। এ ছাড়াও অসংকলিত নিবন্ধ, অন্যের বইয়ের মুখবন্ধ বা ভূমিকা, সমালোচনা ইত্যাদির সংখ্যা আড়াইশোর মতো। ৩রা জুলাইয়ের ভবন'স জার্নালে[১] তাঁর ইংরেজি ও হিন্দি রচনার একটি অসম্পূর্ণ হিসেব এইভাবে দেওয়া হয়েছে—

	ইংরেজি	হিন্দি
বই	২১	৭
প্রবন্ধ	৩৩৫	৪২
সমালোচনা	১২৩	—
	২৬	১১
মোট রচনা	৫০৫	৬০

এ হিসেব নিখুঁত নয়, কারণ হিন্দিতে তাঁর বেশির ভাগ বইই অন্যদের করা অনুবাদ। আর ইংরেজি বইয়ের সংখ্যাও একটু বাড়বে।[২] কিন্তু এ থেকেই বোঝা যাবে, চিন্তা শ্রম ও লেখায় তাঁর মতো অনলস ও বিশ্রামহীন মানুষের দেখা কদাচিৎ মেলে। আর কেবল বই বা রচনার নিছক সংখ্যা দিয়েও তাঁর প্রজ্ঞার

১ Bhawan's Journal, Vol. XXIII, No. 25, July 3, 1977, P. 27

২ শ্রীঅনিল কাঞ্জিলালের করা একটি পূর্ণাঙ্গতর গ্রন্থতালিকার জন্য 'পরিচয়', সুনীতিকুমার স্মরণ সংখ্যা, আগস্ট, সেপ্টেম্বর, পৃঃ ২২১—২৩৩ দ্রষ্টব্য।

পরিমাপ করা যাবে না। তাঁর বইয়ের বিষয় ও লক্ষ্যের বৈচিত্র্যও তো কম নয়। সমগ্র পৃথিবীর বুধমণ্ডলীর সশ্রদ্ধ অনুধ্যানের যোগ্য গ্রন্থ যেমন তিনি লিখেছেন, তেমনি বাংলাদেশের বালক শিক্ষার্থীর ব্যবহার্য গ্রন্থও তিনি রচনা করেছেন। কিন্তু তিনি কি শুষ্ক জ্ঞানী ছিলেন কেবল? নিছক পাণ্ডিত্য-বারিধি? কেবল অধ্যয়ন-অধ্যাপন-চিন্তন-বিজ্ঞাপনের দ্বারা গ্রথিত ছিল তাঁর জীবন? তা তো কখনোই নয়। বনস্পতি যেমন মাটি জল বায়ু রৌদ্র সমস্ত কিছু থেকে জীবন আহরণ করে—শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে দশ দিককে স্পর্শ করতে চায়, সুনীতিকুমারও তেমনই আকাঙ্ক্ষা বিস্তার করেছেন জীবনের সমস্ত জ্ঞান, আস্বাদ ও শোভার দিকে। বিদেশী বাগ্‌ভঙ্গির অনুবাদ করে বলতে পারি তাঁর অস্তিত্বের পরিসর ছিল জীবনের চেয়ে অনেক বৃহদাকার। তিনি ভূপরিক্রমণ করেছেন একাধিকবার—অস্ট্রেলিয়া ছাড়া পৃথিবীর আর সবকটি মহাদেশে তাঁর পদার্পণ ঘটেছে। খাদ্যবস্তুতে তাঁর উদার আগ্রহ নিয়ে তৈরি হয়েছে বহু কিংবদন্তী। পৃথিবী জুড়ে মানুষের শিল্প দেখেছেন ঘুরে ঘুরে, সংগ্রহ করে এনেছেন ছবি বা বহনীয় শিল্পদ্রব্য—নিজে ছবিও আঁকতেন তিনি—এবং হিউম্যানিস্ট ভাবুকদের মতো যা কিছু মানবসংক্রান্ত তাই ছিল তাঁর জিজ্ঞাসার অন্তর্গত। বাংলাদেশে সুনীতিকুমারই সম্ভবত শেষ রেনেশাঁস-ব্যক্তিত্ব। এবং জীবৎকালেই তিনি তাঁর সাধনার যোগ্য স্বীকৃতি পেয়েছেন। নানা উৎস থেকে অর্জিত তাঁর বহুমুখী সম্মান ও প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতির সংক্ষিপ্ত একটি তালিকা এখানে তুলে দিই:

ডি. লিট. (গবেষণালব্ধ): লণ্ডন

ডি. লিট. (সাম্মানিক): রোম, দিল্লি, ওসমানিয়া, কলকাতা,
রবীন্দ্র-ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়

দেশিকোত্তম: বিশ্বভারতী

সাহিত্যবাচস্পতি: হিন্দি সাহিত্য সম্মেলন

পদ্মভূষণ: ১৯৫৫; পদ্মবিভূষণ: ১৯৬৩

সভাপতি: রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটি, বেঙ্গল, দুবার—১৯৫৩—৫৫; ১৯৭০—৭২; অল ইণ্ডিয়া ওরিয়েন্টাল কনফারেন্স, আমেদাবাদ, ১৯৫৩; বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা; সাহিত্য আকাদেমি, নয়াদিল্লি, ১৯৬৯; ইনস্টিট্যুট অফ তামিল স্টাডিজ; ইনস্টিট্যুট অব রাশিয়ান স্টাডিজ; ইনটারন্যাশনাল ফোনেটিক অ্যাসোসিয়েশন, লণ্ডন।

চেয়ারম্যান: সংস্কৃত কমিশন, ১৯৫৬—৫৭[৩]।

---

৩ Bhawan's Journal, পূর্ববৎ, P. 26.

তাঁর বই ও অন্যান্য রচনাকে খুব সাদামাঠাভাবে ভাষা ও সংস্কৃতি এই দুই বিষয়-বিভাগে ফেলতে পারি। তাঁর ছাত্রপাঠ্য নানা গ্রন্থ, সম্পাদনা এবং সংস্কৃতের নানা ছন্দে রচিত শ্লোকগুলিকে[8] বাদ দিয়েই আমরা এই ভাগ করছি। ভাষা সংস্কৃতিরই যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ তা আমরা জানি, কিন্তু সুনীতিকুমারের জ্ঞানচর্চার প্রধান অভিমুখিতা ও তার পটভূমি বোঝবার জন্য এই দ্বিধা বিভাগের দরকার আছে। এই লেখাগুলি থেকে স্পষ্ট হয়—আজকালকার ভাষায় যাদের স্পেশালিস্ট বলা হয় সুনীতিকুমারের তুলনায় তাঁরা কতো বালখিল্য-মাপের।

তাঁর গবেষণার সুনির্দিষ্ট এলাকা কী ছিল? এই প্রশ্নের কোনো সুনির্দিষ্ট উত্তর নেই। তাঁর সর্বঙ্কষ মনীষায় ধরা পড়েছে আর্য, দ্রাবিড়, কিরাত ও অস্ট্রিক ভারতের মানুষের জীবন-মনন-শিল্প-সংস্কার, অন্য দিকে ভারতবর্ষের বাইরে চীন, ইরান, বালতিক ভূভাগ, আফ্রিকা (সাহারার উত্তর ও দক্ষিণ উভয় প্রান্তের) ও ইসলামী মধ্যপ্রাচ্যের প্রাচীন সংস্কৃতিতেও তিনি স্বচ্ছন্দে পর্যটন করেছেন। ইউরোপের প্রাচীন কাব্য-পুরাণকে তিনি বাঙালির কাছে সুলভ করেছেন; আবার ভ্রমণ সূত্রে আমন্ত্রণ করেছেন মালয়, জাভা, বলি আর শ্যামের রূপ-চিত্রময় বিপুল জীবনচর্যাকে। শ্রীঅনিল কাঞ্জিলালের দেওয়া সংবাদ থেকে জানি, তাঁর লেখা গ্রীক ভাস্কর্য সম্বন্ধে একটি বই এখনও পর্যন্ত ছাপাই হয়নি। মামুলি ভ্রমণকাহিনী যে যোগ্য হাতে পড়লে কত অসামান্য হয়ে উঠতে পারে তা জানবার জন্য 'ইউরোপ ১৯৩৮' বইটি পড়াই যথেষ্ট। এই মানুষকে ইদানীংকার ছক-মাপা পাণ্ডিত্যের কোঠায় ফেলবার চেষ্টা পণ্ডশ্রম হতে বাধ্য।

আমার এ প্রবন্ধের নাম 'ভাষাচার্য' সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। অর্থাৎ ভাষাতাত্ত্বিক হিসেবেই তাঁর মুখ্য পরিচয়—এই সংস্কার আমার মনের ভিতরে আছে—তা ঐ নামকরণকে প্রভাবিত করেছে। কিন্তু আগেই বলেছি, বর্তমানকালে ভারতবর্ষের সর্বাগ্রগণ্য ভাষাতাত্ত্বিক হয়েও সুনীতিকুমার ভাষাকে তার সাংস্কৃতিক শেকড়গুলি থেকে ছিঁড়ে নিয়ে দেখতেন না—জীববৈজ্ঞানিকেরা যেমন ল্যাবরেটরির টেবিলে মৃত প্রাণীর দেহ নিরীক্ষণ করে। মানুষের সংস্কৃতি ছিল তাঁর মূল আলোচ্য এবং সে ব্যাপারে তিনি কোনো গণ্ডিকাটা প্রাদেশিকতায় ভোগেন নি। বরং উল্টোটাই আরো বেশি করে সত্য—তাঁর মতো বিশ্বমনস্ক প্রজ্ঞাজীবী ভারতবর্ষে আর জন্মেছে কিনা সন্দেহ। আরেকবার স্মরণ করিয়ে দিই যে, পৃথিবীকে, নানা সভ্যতার অতীত-

---

৪ পাদটীকা ২-এর সূত্র দ্রষ্টব্য: ২৩৩ পৃষ্ঠা।

বর্তমানকে, তিনি শুধু পুঁথি পড়ে জানেন নি। কিংবা ঘরে বসে ধ্যান করে হাতে পাননি তাঁর মনোলোকের সাংস্কৃতিক আন্তর্জাতিকতাকে। তিনি ছিলেন সচল জ্ঞানভিক্ষু, ভিন্ন ধরনের এক wandering scholar যিনি মানুষের স্বভাবগত ঐক্য সন্ধানের জন্যই পরিক্রমা করেছেন তার নানা বিচিত্র সংস্কৃতিতে; বিষয়ের এক শাখা থেকে অন্য শাখায়, কখনো বা নিকটবর্তী ভিন্ন একটি বিষয়ে; জানার এক ব্যাপ্তি থেকে ভিন্নতর ব্যাপ্তিতে। তাঁর এই গতিশীলতার বিশ্রাম হল তাঁর মৃত্যুতে, নইলে পঁচাশি বছর বয়সেও যিনি রামায়ণ-সংক্রান্ত বিতর্কে ঝাঁপিয়ে পড়তে সাহস পান, তাঁর মতো জীবন্ত জ্ঞানসাধক আর কে ছিলেন? যাঁরা তাঁকে কাছ থেকে দেখেছেন তাঁরা জানেন যে, তাঁর মতো মুক্তবুদ্ধি ও বিবেকসম্পন্ন জ্ঞানীও আর দুটি পাওয়া যাবে না। নিজের ভুল স্বীকার করতে তাঁর দ্বিধা বা আড়ষ্টতা ছিল না, নিজের সিদ্ধান্তকে একমাত্র ভেবে গোঁ ধরে বসে থাকার অনড় পাথুরে মানসিকতা থেকেও তিনি মুক্ত ছিলেন। এই প্রবন্ধের লেখক মাত্র দুবার সংক্ষিপ্তভাবে তাঁর বাড়িতে গিয়ে তাঁর কথা শোনবার সুযোগ পেয়েছিলেন। প্রথম দিন তাঁর একটি কথা শুনে তিনি হতচকিত বোধ করেন। নিজেদের বংশোদ্ভবের কথা বলতে গিয়ে তিনি বললেন, "জানোই তো, আমরা হলুম গিয়ে কুলীন বামুন। তবে শরৎচন্দ্রের 'বামুনের মেয়ে' পড়েছ তো? কাজেই কীরকম কুলীন বামুন কে জানে?" অনেক পণ্ডিতই অন্য বিষয়কে যতটা বৈজ্ঞানিক স্বচ্ছতা দিয়ে বিচার করতে পারেন নিজেকে সেভাবে পারেন না। সুনীতিকুমার ছিলেন এক গৌরবময় ব্যতিক্রম। কাজেই এই অত্যন্ত প্রাণবান্, চলিষ্ণু, সমন্বয়ী ব্যক্তিত্বটিকে রদ্যাঁর 'ভাবুক' নামক প্রস্তরমূর্তির সঙ্গে তুলনা করার কোনো মানে হয় না—'স্টেট্‌স্‌ম্যানে'র শোকলিপিতে যেমন করা হয়েছে। সুনীতিকুমারের ব্যক্তিত্বের সবগুলি মাত্রাকে কোনো মূর্তিতে ফুটিয়ে তোলার মতো ভাস্কর পৃথিবীতে কোনোদিন জন্মাবে না। কী করে জ্ঞাপন করা যাবে তাঁর চরিত্রের সেই সযত্নপ্রচ্ছন্ন মহত্ত্বের ইতিবৃত্ত, নিম্নে যার সংবাদ পাই আমরা?—

"উচ্চশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার হৃদয়ও উচ্চ হইয়াছিল এবং প্রথম জীবন হইতেই নিজের অভাব থাকা সত্ত্বেও অপরের দুঃখ দেখিলেই তাহাকে সাহায্য করিতেন। আমার পিতৃবিয়োগের সময় আমার বয়স মাত্র ১০ বৎসর ছিল। আমাকেও কামারহাটী সাগরদত্ত ফ্রী স্কুলে ৭ বৎসর পড়িয়া ১৯১৫ সালে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করিতে হইয়াছিল। সুনীতিবাবু সকল খবর রাখিতেন এবং আমার শিক্ষাগ্রহণকালে প্রয়োজন মত আমাকে অর্থ ও পুস্তকাদি দান করিয়া উৎসাহিত

করিতেন। প্রয়োজন হইলেই কলিকাতার উচ্চশিক্ষিত ও ধনী অধিবাসীদিগের নিকট আমাকে পরিচয়-পত্র দিয়া আমার বিদ্যাশিক্ষার পথ সুগম করিয়া দিতেন।"[৫]

১৯৫২ থেকে তেরো বছর বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভাপতিত্বের নিষ্ফলা জীবিকার কথা ছেড়ে দিলে সুনীতিকুমারের মূল বৃত্তিগত পরিচয় হল, আচার্যের। ১৯২২ থেকে ১৯৫২—অর্থাৎ তিরিশ বছরেরও বেশি সময় তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষাতত্ত্বের খয়রা অধ্যাপক ছিলেন। ১৯৬৫ থেকে হলেন জাতীয় অধ্যাপক। তাঁর প্রথম দিককার, এবং সবচেয়ে মূল্যবান বইগুলি ভাষাতত্ত্বের বই। এর মধ্যে যে বইটি তাঁর এবং একালের ভারতীয় মনীষার বিস্ময়কর এক কীর্তিস্তম্ভ তা হল ১৯২৬ সালে প্রকাশিত 'The Origin and Development of the Bengali Language, সংক্ষেপে ODBL। তা ছাড়াও, Indo-Aryan and Hindi (1942, 1960), 'রাজস্থানী ভাষা' (১৯৪৯)—এ দুটি বই তাঁর নির্দিষ্ট ও নির্বাচিত ভাষাকে বিষয় ধরে নিয়ে লেখা। এ তিনটি বই-ই সাধারণভাবে ভাষার ইতিহাসের পর্যালোচনা। ভাষার বিবরণ, অর্থাৎ তার পদগঠনের রীতিনীতি, বাক্য-প্রণয়ন-পদ্ধতি ইত্যাদির কথা তিনি তার ইতিহাস আলোচনার সূত্রেই বলেছেন, অন্তত বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে। তা ছাড়া তাঁর ব্যাকরণগুলি তো আছেই। তাঁর "ভাষাপ্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ" (তৃতীয় সংস্করণ ১৯৪৫) বাংলা ভাষার একটি প্রায় পূর্ণাঙ্গ বিবরণ। বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব সম্বন্ধেও তাঁর কৌতূহল প্রথম থেকেই। ১৯২১-এ প্রকাশিত তাঁর "Bengali Phonetics" নিবন্ধটি[৬] এবং পরবর্তীকালের ' Bengali Phonetic Reader" (1928) এ ক্ষেত্রে তাঁর সর্বাঙ্গীণ অধিকারের সাক্ষ্য হয়ে আছে।

আমার মনে হয়, ভাষাতত্ত্বে দুটি জায়গায় সুনীতিকুমার নিজের গৌরবে ভাস্বর —ভাষার ইতিহাস-আলোচনা ও ধ্বনিতত্ত্ব Phonetics। ধ্বনিতত্ত্বের আন্তর্জাতিক পত্রিকা Phonetica-কে সম্পাদকমণ্ডলীর একজন হিসেবে এই সেদিন পর্যন্ত তাঁর

---

৫ ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ["ভারতবর্ষ" পত্রিকার সম্পাদক], "ভাষাচার্য সুনীতিকুমার স্মরণে", "নৈবেদ্য", দ্বিতীয় বর্ষ, দ্বিতীয় সংকলন, গড়িয়া, ২৪ পরগণা থেকে প্রকাশিত, ১৪ পৃষ্ঠা।

৬ Bulletin of the School of Oriental Studies, London, Vol. I, Pt. 1, PP. 1-25.

নাম দেখেছি। আর ODBL-এর দু খণ্ডে[৭] বাংলা ভাষার নষ্ট কোষ্ঠী তিনি যেভাবে উদ্ধার করেছেন, তার তুলনা তো দেখি না। পৃথিবীতে আর কোনো ভাষার এত তথ্যসমৃদ্ধ ও বিপুলায়তন ইতিহাস লেখা হয়েছে কিনা সন্দেহ। বইটির জন্য জর্জ আব্রাহাম গ্রীয়ার্সন তাঁকে যে প্রায় নব্য-পাণিনি বলেই অভিনন্দিত করেছিলেন—তা নিরর্থক উচ্ছ্বাসমাত্র নয়। বস্তুত পক্ষে ODBL শুধু যে বাংলা ভাষার ইতিহাস তা নয়—এটি নব্য ভারতীয় আর্য ভাষার সামগ্রিক ইতিহাস। বাংলার ইতিহাসের সঙ্গে অসমীয়া, ওড়িয়া, মৈথিলী, হিন্দী, গুজরাটী, মারাঠী ইত্যাদি যাবতীয় ভাষার ইতিহাসের হুলুকসন্ধান এই বইয়ে পাওয়া যাবে।

ভাষাতত্ত্বের কোন ঐতিহ্যের অন্তর্গত সুনীতিকুমার? সে কথা জানতে গেলে সংক্ষেপে ভাষাবিজ্ঞানের দেড়-দুশো বছরের অগ্রগতির ইতিহাস একটু বলা দরকার। মনে রাখতে হবে, এই কলকাতাতেই স্যার উইলিয়াম জোন্‌সের দেওয়া একটি বক্তৃতার[৮] সূত্র ধরে ভাষাতত্ত্ব প্রথম বিজ্ঞানসম্মত চরিত্র গ্রহণ করে, এবং প্রাগ্‌-বৈজ্ঞানিক ভাষাচর্চার সমাপ্তি ঘটে। গত শতাব্দীর গোড়া থেকে দুর্ধর্ষ জার্মান পণ্ডিতদের হাতে যে ভাষাবিজ্ঞান গড়ে ওঠে তার নাম তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব—Comparative Philology। তারই হাত ধরে এগিয়ে আসে ঐতিহাসিক ভাষাতত্ত্ব—Historical Philology। ঐতিহাসিক ভাষাতত্ত্ব গত শতাব্দীর শেষ পাদে জার্মান নব্য-বৈয়াকরণদের ('য়ুংগ্রামাটিকের') হাতে একটি কঠোর নিয়মবদ্ধ শাস্ত্রের চেহারা পায়। এতে তাঁদের কেউ কেউ এমনই খুশী হয়ে গিয়েছিলেন যে, তাঁরা বলতেন, ভাষাতত্ত্বে আর কিছু করার নেই, আমরা ভাষা পরিবর্তনের সব নিয়ম বার করে ফেলেছি। যেখানে নিয়ম নেই বলে মনে হচ্ছে, সেখানেও খুঁজলেই নিয়ম পাওয়া যাবে। এ শতাব্দীর গোড়া পর্যন্ত এভাবেই চলেছে। নিওগ্রামারিয়ানদের একটি দল ধ্বনিতত্ত্ব বা Phonetics সম্বন্ধে উৎসাহী ছিলেন—ঐতিহাসিক নয়, বর্ণনামূলক ধ্বনিতত্ত্বে, অর্থাৎ ভাষায় যে-সব ধ্বনির ব্যবহার হয় সেগুলির

---

৭ লণ্ডনের জর্জ অ্যালেন অ্যাণ্ড আন্‌উইন কোম্পানি ১৯৭২-এ আরেকটি সংক্ষিপ্ত তৃতীয় খণ্ডও প্রকাশ করেছে প্রথম দুটি খণ্ডের পুনর্মুদ্রণের (১৯৭০) সঙ্গী হিসেবে। তাতে আছে কিছু সহায়ক ও অতিরিক্ত তথ্য, যৎসামান্য সংযোজন ও সংশোধন।

৮ ২রা ফেব্রুয়ারি, ১৮৮৬ তারিখে এশিয়াটিক সোসাইটির বার্ষিক অধিবেশনে তিনি গ্রীক ল্যাটিন সংস্কৃত গথিক কেলটিক এবং পারস্য ভাষার একটি সম্ভাব্য উৎস থাকতে পারে, এমন ইঙ্গিত দেন।

উচ্চারণ ও শ্রুতিগত বিশেষত্ব কী—তা নির্ণয়ে তাঁরা আগ্রহী হন। জিফার্স (Eduard Sievers) এঁদের অন্যতম। এঁদের থেকে একটু স্বাধীনভাবে ইংলণ্ডে হেনরি সুইট ধ্বনিতত্ত্ব চর্চায় উদ্যোগী হন—তাঁর বই Handbook of Phonetics বেরোয় ১৮৭৭ সালে। তাঁর শিষ্য ড্যানিয়েল জোন্‌স ইংলণ্ডে ধ্বনি-তত্ত্ব চর্চার ধারাটিকে অব্যাহত রাখেন। তাঁর Outline of English Phonetics বেরোয় ১৯১৪ সালে। সুনীতিকুমার ধ্বনিতত্ত্ব বিভাগে জোন্‌সেরই সাক্ষাৎ শিষ্য। তাঁর ১৯২১-এর Bengali Phonetics নিবন্ধটি জোন্‌সের আদল অনুসরণ করে লেখা। মনে রাখতে হবে—আজকাল Phonetics বলতে আমরা যা বুঝি সুনীতিকুমারের এ লেখাটি ঠিক তা নয়। এ একই সঙ্গে ধ্বনিতত্ত্ব Phonetics ও স্বনিমতত্ত্ব Phonology বা Phonemics—কারণ এতে বাংলা ভাষায় কী কী 'স্বনিম' Phoneme ও 'বিস্বন' Allophone ব্যবহার হয় তার বিবরণ যেমন আছে তেমনি সেগুলির উচ্চারণগত লক্ষণও বর্ণিত হয়েছে। তবে ১৯৩৩-এর পর মার্কিন দেশে স্বনিমতত্ত্বের যে নতুন প্রকরণ-পদ্ধতি গড়ে ওঠে তার তুলনায় সুনীতিকুমারের পদ্ধতি একটু পুরোনো, আর তাঁর আদর্শ ও লক্ষ্যও একটু ভিন্ন। সে কথায় পরে আসছি।

ভাষার ইতিহাস চর্চায় সুনীতিকুমারের যোগ উনবিংশ শতাব্দীর ঐ নিও-গ্রামারিয়ানদের ঐতিহ্যের সঙ্গে। ১৯২২-এ প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি যাঁদের কাছে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাতত্ত্ব পড়েছিলেন সেই জুল ব্লখ Jules Block, আঁতোয়ান মেইয়ে Antoine Meillet প্রভৃতি সকলেই ছিলেন য়ুংগ্রামাটিকের সম্প্রদায়ের দূরবর্তী শিষ্য, কিংবা তাঁদের দ্বারা অল্পবিস্তর প্রভাবিত। তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বে মেইয়ের মতো পণ্ডিত তাঁর সমকালে ছিল না, এখনও আছে কিনা সন্দেহ। ওদিকে জুল ব্লখ লিখেছেন মারাঠী ভাষার ইতিহাস ফরাসীতে—সেটিই ODBL-এর সাক্ষাৎ আদর্শ। অবশ্য মেইয়েও লিখেছিলেন আর্মেনীয় ভাষার ইতিহাস (১৯০৩)। এসব থেকে মনে হয়, ধ্বনিতত্ত্ব চর্চার প্রেরণা সুনীতিকুমার নিয়েছিলেন ইংরেজ গুরুর কাছ থেকে, কিন্তু ভাষার ইতিহাস লেখার আদলটি নিয়ে-ছিলেন ফরাসী গুরুদের কাছ থেকে। দুই বিদ্যার দুটি ভিন্ন উৎস এভাবে নির্দেশ করা যেতে পারে।

কাজেই তুলনামূলক-ঐতিহাসিক ভাষাতত্ত্বের ধারাবাহিকতা রক্ষা করেই সুনীতিকুমার গবেষণা করলেন এবং ১৯২৬-এ তাঁর ODBL প্রকাশ করলেন। এ কেমন বই? এক কথায় বলতে পারি, পৃথিবীতে সুনির্দিষ্ট ভাষার ইতিহাস যত

লেখা হয়েছে তার মধ্যে সম্ভবত এটি সর্বোত্তম বই। তার অর্থ এই নয় যে, এটি সম্পূর্ণ ত্রুটিবর্জিত। তাঁর সময়ের সীমাবদ্ধতা এ গ্রন্থটিরও কিছু কিছু অসম্পূর্ণতার জন্ম দিয়েছে। Syntax বা অন্বয় সম্বন্ধে এতে আলোচনা নেই। একটি তরুণ বন্ধু সে জন্য সম্প্রতি একটু আক্ষেপ করেছেন।[১] কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, ভাষা-তত্ত্ব চর্চার যে উত্তরাধিকারের মধ্যে সুনীতিকুমার শিক্ষা নিয়েছেন এবং কাজ করেছেন, তাতে অন্বয়ের স্বীকৃতি বা গুরুত্ব ছিল সামান্যই। ধ্বনি পরিবর্তন historical phonology তাঁর অভিনিবেশের সিংহভাগ আকর্ষণ করত, বাকি মনোযোগটুকু থাকত পদপ্রকৃতির পরিবর্তনের historical morphology অনু-ধাবনের জন্য। সেই সব বিখ্যাত জার্মান তুলনামূলক বৈয়াকরণদের বই দেখলে এ সত্য সুগোচর হবে।

সুনীতিকুমার যে সময়ে ODBL-এর কাজ করছেন তখন কি ভাষাতত্ত্বের এই একটিমাত্র ধারাই ছিল—এই ঐতিহাসিক তুলনামূলক ভাষাসমীক্ষা? তা তো নয়। এই শতাব্দীর গোড়া থেকে ভাষাতত্ত্বে আরেকটি দৃষ্টিভঙ্গির অভ্যুদয় ঘটেছে, মূলত জেনিভার অধ্যাপক ফার্দিনান্দ দ সোস্যুর Ferdinande de Saussure-এর শিক্ষার ফলে। তিনি ক্লাসে বক্তৃতার সূত্রে বলতেন, ভাষার ইতিহাসই diachrony ভাষাতত্ত্বের একমাত্র আলোচ্য নয়; ভাষার একটি নির্দিষ্ট সময়ের স্থিতা-বস্থাও synchrony আলাদা করে বিচার করা চলে। এর পর থেকেই ঐতিহাসিক-তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের পাশ কাটিয়ে সম্পূর্ণ নতুন এক ভাষাবিজ্ঞান গড়ে উঠল—তার নাম সামান্য ভাষাবিজ্ঞান বা general linguistics। দ সোস্যুরের বক্তৃতা সম্পাদনা করে তাঁর দুটি ছাত্র একটি বই ছাপালেন ১৯১৬ সালে। এ বইয়ের প্রকাশকে ভাষাতত্ত্বে কোপারনিকান বিপ্লবের মতো যুগান্তকারী ঘটনা বলা হয়েছে। দ সোস্যুরের তত্ত্বগুলি নিয়ে চেকোস্লোভাকিয়ার প্রাহা (প্রাগ) শহরে কিছু ভাষা-তাত্ত্বিক সমিতিবদ্ধ হলেন কুড়ির দশকের শেষ ভাগে। ইংলণ্ডে অটো ইয়েসপার্সেন ইংরেজি ভাষার আধুনিক তত্ত্ব সম্বন্ধে গবেষণা শুরু করলেন। দ সোস্যুরেরই পরোক্ষ প্রভাব মার্কিনী ভাষাতত্ত্ববিদ লিওনার্ড ব্লুমফিল্ডকে নিওগ্রামারিয়ানদের প্রভাব থেকে ছিনিয়ে আনল এবং মার্কিন দেশে Descriptive Linguistics বা বর্ণনামূলক ভাষাতত্ত্বের পিতৃপুরুষ হিসেবে তাঁকে প্রতিষ্ঠিত করল ১৯৩৩ সালে। পৃথিবীর ভাষা-তত্ত্ব চর্চার মানচিত্রে তুলনামূলক-ঐতিহাসিক ভাষাতত্ত্ব ক্রমশ কোণঠাসা হয়ে পড়ল।

---

১ রমাপ্রসাদ দে, "সুনীতিকুমার: পুনর্পাঠ", শেখর বসু রায় সম্পাদিত "ঐকতান" শারদীয়া সংখ্যা, ৩য় বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ৮৫-৯১ পৃষ্ঠা।

সুনীতিকুমার যখন তাঁর সবচেয়ে বড়ো কাজ নিয়ে ব্যস্ত, তখন তিনি নিশ্চয়ই জানতেন যে, তাঁর ধরনের ভাষাতত্ত্ব ক্রমশ তার কেন্দ্রীয় জায়গাটি হারাচ্ছে। দ সোস্যুর তাঁর প্যারিসের শিক্ষাগুরু মেইয়ের পূর্বসূরী ছিলেন জেনিভায় এবং তাঁর তত্ত্ব সুনীতিকুমারের অজ্ঞাত ছিল এমন মনে করার কারণ নেই। তবু বাংলা ভাষার ইতিহাস এমন করে তিনি কেন লিখলেন? কেন পরে ব্যাকরণ রচনার বাইরে তার চালু অবস্থার বর্ণনায় তিনি প্রবৃত্ত হলেন না? তার একটা কারণ এই যে, এই ভাষার প্রতি তীব্র মমতা ছিল তাঁর; দ্বিতীয় কারণ, ভাষা বিশেষের নির্দিষ্ট অবস্থার বিবরণ তখনও বিশেষ লেখা হয়নি—অর্থাৎ দ সোস্যুরের মডেলে কাজ তেমন শুরুই হয়নি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে সেসব কাজ দেখাই দেয়নি তেমন করে। ফলে, সুনীতিকুমার স্বধর্মের, অর্থাৎ নিজের আদর্শের অন্তর্ভুক্ত থেকে নিজের কাজটি অত্যুত্তম করে শেষ করলেন।[১০]

তিনি কী করলেন না—এই নিয়ে অভিযোগ না করে তিনি কী করেছেন, তারই যথার্থ উপলব্ধি করাটাই আমার কাছে বেশি জরুরি বলে বোধ হয়। আমি জানি, ভাষাতত্ত্বচর্চা থেকে ক্রমশ তিনি সরে এসেছিলেন, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে মার্কিন দেশে যে নব্য ভাষাতত্ত্বের অর্থাৎ বর্ণনামূলক ভাষাতত্ত্বের বিশেষ রমরমা ঘটেছিল তা তাঁর পছন্দসই ছিল না। কেন ছিল না, তা বোঝা দুঃসাধ্য নয়। ভাষা তাঁর কাছে ছিল মানবসংস্কৃতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত, তাকে ল্যাবরেটরির টেবিলে এনে ব্যবচ্ছেদ করার পক্ষপাতী তিনি ছিলেন না। ১৯৫৭ সালে নোয়াম চমস্কি ভাষাতত্ত্বে নতুন যে বিপ্লব ঘটিয়েছেন তাতে ভাষা বিবৃতির ঐ মহাযুদ্ধকালীন ধরন

১০ তাঁর ধ্বনিতত্ত্বের কাজটি এখনও পর্যন্ত বাংলাভাষার ধ্বনিতত্ত্বের বিষয়ে শেষ কথা হয়ে আছে। ১৯৪৫-এ চার্লস এফ. ফার্গুসন, ১৯৬০-এ ফার্গুসন ও মুনীর চৌধুরী, ১৯৬৪তে আব্দুল হাই বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করেছেন, কিন্তু সুনীতিকুমারের নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে তাঁরা তাঁর অতিরিক্ত নতুন কথা সামান্যই বলেছেন। ঐ কাজটি (Bengali Phonetics বা পরে A Brief Sketch of Bengali Phonetics নামে পুস্তিকা মার্কিন ভাষাতাত্ত্বিক ব্লুমফিল্ডেরও সপ্রশংস স্বীকৃতি লাভ করেছিল। দ্রষ্টব্য Hockett, chales F. (ed.), A Leonard Bloomfield Anthology, Bloomington, Indiana University Press. P. 178.

সম্পূর্ণরূপে ধিক্কৃত ও হতমান হয়েছে। ফলে এক হিসেবে সুনীতিকুমারের ধারণারই জিত হয়েছে বলতে হবে। কিন্তু একথা স্বীকার করতে হবে যে, চম্‌স্কি প্রবর্তিত নতুন ভাষাচিন্তাকেও তিনি গ্রহণ করতে পারেননি। এটা অবশ্য বিমুখিতার ঘটনা নয়, ততদিনে তাঁর মনোযোগ অন্যত্র সঞ্চারিত হয়েছে। যদি তিনি চম্‌স্কি-তত্ত্বের উপরকার কঠোর খোলসটা ভেঙে তার ভিতরটা দেখার সুযোগ একটু করে নিতেন তাহলে দেখতে পেতেন ভাষা সম্বন্ধে তাঁর নিজের যে কিছু কিছু বোধ ছিল সেগুলি চম্‌স্কিতেও স্বীকৃত। তিনি ভাবতেন, সমগ্র মানবভাষার মূলসূত্রগুলি এক ; চম্‌স্কি প্রবর্তিত ভাষাচিন্তা এই প্রত্যয়ের উপর অনেকটাই দাঁড়িয়ে আছে। তাঁর সময়কার ভাষাতত্ত্বে 'ভাষায় কী আছে' তা না দেখিয়ে 'ভাষায় কী ঘটছে'—তাই দেখাতে চাইত। চম্‌স্কিও বলেন, ভাষার প্রাণ হচ্ছে তার সচল ব্যবহারের মধ্যে, Process-গুলিতে, ধ্বনি বা পদের টুকরো সাজানোর খেলাতে নয়।

ঠিক 'ভাষাতাত্ত্বিক' বলতে যা বোঝায় সুনীতিকুমার তা ছিলেন না। ইণ্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে Portraits of Linguists নামে দুখণ্ডে বিরাট যে বইটি বেরিয়েছে সে ধরনের কোনো বইয়ে সুনীতিকুমারের কোনো জীবনী ছাপা হবে কি না আমি জানি না।[১১] পৃথিবীতে ভাষাতত্ত্ব এর মধ্যে যে বারবার দিক পরিবর্তন করেছে—তাতে সুনীতিকুমারের কোনো দান নেই। কিন্তু এই নেতি-বাচক কথা দিয়ে তাঁকে বুঝতে গেলে তাঁর কীর্তির প্রতি ভয়াবহ অবিচার করা হবে। আগেই বলেছি, তাঁর মতো করে একটি ভাষার এমন সর্বাঙ্গীণ ইতিহাস পৃথিবীর খুব কম পণ্ডিত লিখতে পেরেছেন। বিদেশের ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা-বিশেষজ্ঞদের কাছে তাঁকে giant হিসেবে উল্লিখিত হতে শুনেছি আমি নিজেই। ভারতীয় আর্য ভাষার সুনির্দিষ্ট এলাকায় ঢুকতে হলে পৃথিবীর সমস্ত বাঘা পণ্ডিত-কেই তাঁর ছাত্র হয়ে আসতে হবে।

ভাষাতত্ত্বচর্চা থেকে শেষ দিকে তাঁর আগ্রহ স্খলিত হয়েছিল—এ নিয়েও ক্ষোভ বা নিন্দা করার কোনো কারণ দেখি না। তিনি তো কেবল বিশেষজ্ঞ ছিলেন না, তিনি ছিলেন হিউম্যানিস্ট জ্ঞানজীবী, সুতরাং সভ্যতা-সংস্কৃতির আরো বহু দিকে তাঁর অন্বেষণ চলেছে। যাঁরা চম্‌স্কির কথা তোলেন, তাঁরা নিশ্চয়ই জানেন যে, ভাষাতত্ত্বে ঈষন্মাত্র আগ্রহ রক্ষা করে চম্‌স্কি একসময় ভিয়েৎনামে মার্কিন সাম্রাজ্য-

---

১১ এর প্রথম খণ্ডে সুনীতিকুমারের লেখা স্যর উইলিয়াম জোন্‌সের জীবন ও কর্মের বিবরণ মুদ্রিত হয়েছে।

বাদের বিরুদ্ধে বুদ্ধিজীবীদের আন্দোলন গড়ে তুলতে সম্পূর্ণ আত্মনিয়োগ করেছিলেন। তা নিয়ে চম্‌স্কির নিজের দেশে তো ভাষাতাত্ত্বিক মহলে তেমন কোনো হাহাকার শুনিনি। চম্‌স্কি যেমন, সুনীতিকুমারও তেমনি একটি নির্দিষ্ট খণ্ডবিদ্যা বা discipline-এর চেয়ে অনেক বড়ো। সুনীতিকুমার আমাদের যা দিয়ে গেছেন, বাংলা ভাষাচর্চার ক্ষেত্রে তা-ই একজনের সারাজীবনের কাজ। তাঁর আত্মসার্থকতার আদর্শ একসময় ভাষাতত্ত্বের ক্ষুদ্র গণ্ডিকে অতিক্রম করে গিয়েছিল, তাই বলে আমরা নিজেরা প্রবঞ্চিত বোধ করব কেন? ভারতবর্ষের আর কোন্ পণ্ডিত আমাদের প্রত্যাশার অতিরিক্ত এত দান করেছেন?

রামায়ণ-বিতর্ক ও সুনীতিকুমার

শুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায়

রামায়ণ-বিতর্ক প্রসঙ্গে আচার্য সুনীতিকুমার তাঁর পরিকল্পিত বইখানি লিখে যেতে পারলেন না। কলকাতা গ্রন্থমেলার উদ্বোধনের দিন এ নিয়ে একটু প্রগল্ভ পরিহাস করেছিলাম। উত্তরে একটু গম্ভীর হয়ে বললেন, "অন্ধ মানুষটাকে নিয়ে সবাই টানা-হেঁচড়া করছে। কত কাজ বাকি। কত পড়াশুনো করার আছে। আর পারব কিনা খোদায় মালুম।" কণ্ঠে আফশোসের সুর। সুনীতিবাবুর মুখে আফশোস বা নৈরাশ্যের কথা বিশেষ শোনা যেত না। সাধারণতঃ শোনা যেত প্রবল আত্মপ্রত্যয় বা দৃঢ় প্রতিবাদ। ইদানীং যদিও মাঝে মাঝে বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ছিলেন পারিপার্শ্বিকের প্রতি, কিন্তু শারীরিক সামর্থ্য নিয়ে সংশয় প্রকাশ করতে বিশেষ শোনা যেত না। সেদিনকার কথার তিন মাসের মাথায় তিনি চলে গেলেন অতর্কিতে। রামায়ণ-প্রসঙ্গে তাঁর বই লেখা আর হল না। যদিও যাবার আগে জেনে গেছেন তাঁর সুযোগ্য শিষ্য শ্রীসুকুমার সেনের 'রামকথার প্রাক্-ইতিহাস' প্রস্তুত হয়ে গেছে। তাঁরই অনুরোধে লেখা বই। তাঁকেই উৎসর্গ করা। এইটুকু তৃপ্তি নিয়ে গিয়েছেন তিনি।

রামায়ণ-বিতর্কের সময় তাঁর চরিত্রের এক আশ্চর্য পরিচয় পেয়েছিলাম। রামায়ণ-প্রসঙ্গে রাঁচির পাদ্রী বুল্‌কে-র হিন্দি বইখানির প্রসঙ্গ তিনি মাঝে মাঝেই উল্লেখ করতেন। তাঁর আর দশটা কথার সঙ্গে এই প্রসঙ্গও শুনতাম। এ ব্যাপারে এমন বিদ্যে নেই যে গভীরে প্রবেশ করব। তাঁর কাছে যখনই গিয়েছি কোনো জিজ্ঞাসা নিয়ে, হয়তো আপিসের ব্যাপারেও, একটা প্রশ্নের উত্তরের সঙ্গে দশটা জিনিস জেনে এসেছি। দশ মিনিটের জন্যে গিয়ে আড়াই ঘণ্টা কাটিয়ে এসেছি। এ অভিজ্ঞতা অনেকেরই হয়েছে। তবে আলোচনা একপক্ষীয়ই হত। শ্রোতার চেয়ে উচ্চতর ভূমিকা গ্রহণ করার সুযোগ প্রায় কখনই হয়নি।

তুলসীদাসের রামচরিত মানসের চারশো বছর পূর্তি উপলক্ষে দিল্লীতে সাহিত্য অকাদেমি রামায়ণ-প্রসঙ্গে এক আন্তর্জাতিক সেমিনারের আয়োজন করেন। তার উদ্বোধনী ভাষণে আচার্য সুনীতিকুমার কিছু বলেছিলেন। তখন তা নিয়ে বিশেষ আলোড়ন হয়নি। কলকাতায় এশিয়াটিক সোসাইটিতে পঠিত একটি নিবন্ধ নিয়ে সংবাদপত্রে আলোচনার সূত্রপাত। ঠিক আলোচনা নয়, প্রায় শতকরা নব্বইটি

প্রতিবাদ। একটি বাঙলা সংবাদপত্রে তো ধারাবাহিক চিঠির আসর খুলে দেওয়া হল—অধিকাংশই ক্রুদ্ধ প্রতিবাদ। এ তো গেল প্রকাশ্য। তাঁর কাছে ব্যক্তিগত-ভাবে আসতে লাগল অজস্র চিঠি—রামভক্তদের কদর্য কটূক্তিতে ভরা। এই রকম অবস্থায় কলকাতায় সাহিত্য অকাদেমির পক্ষ থেকে একটা সভা করার কথা ভাবছি—অকাদেমির মাসিক সাহিত্যালোচনা সভার কার্যক্রমের অঙ্গ হিসেবে। ইচ্ছে সুনীতিবাবুকে দিয়ে রামায়ণ নিয়ে বলানো। ওঁর কাছে সরাসরি প্রস্তাবটি পাড়তে সাহস হচ্ছে না। শ্রীমতী সুকুমারী ভট্টাচার্যকে কথাটা বললাম। তিনি আচার্য সুনীতিকুমারকে বলবেন বলে রাজি হলেন। কদিন পরেই সুকুমারীদির কাছ থেকে খবর এল—"সুনীতিবাবু রাজি। সভার আয়োজন করুন। তবে একটি শর্ত। সুনীতিবাবু একা বলবেন না। আরো কয়েকজনকে ডাকুন।" বিপদে পড়লাম। এ বিষয়ে সুনীতিবাবুর সঙ্গে একই সভায় আর কে বলতে সম্মত হবেন? চারদিকে প্রতিবাদের ঝড় উঠছে। আবার নির্দেশ এল—স্বয়ং আচার্যদেবের নির্দেশ—"যাঁদের তাঁর মতের বিরুদ্ধে বলার আছে, তাঁদেরই বিশেষ করে ডাকুন।" বিপদ আরো বাড়ল। সভার প্রস্তাব করেই বিপদ ডাকলাম দেখছি। বক্তার তালিকাও সুনীতিবাবুর কাছ থেকে এল—শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার, শ্রীদীনেশচন্দ্র সরকার, শ্রীসুকুমার সেন এবং শ্রীনীহাররঞ্জন রায়। রমেশবাবুর কাছে গেলাম। তিনি অসুস্থ। সভাসমাবেশে যাওয়া একেবারে নিষিদ্ধ তখন। ইতিমধ্যে সংবাদপত্রে রামায়ণ-বিতর্ক নিয়ে রমেশবাবুর যে-মন্তব্য বেরিয়েছে তা সুনীতিবাবুর অনুকূল নয়। যাই হোক, রমেশবাবু শরীরের কারণে সভায় আসতে সম্মত হলেন না। সুনীতি-বাবু তাই শুনে রমেশবাবুর বক্তব্য লিখিত আকারে সভায় উপস্থাপিত করা যায় কিনা চেষ্টা করতে বললেন। তাঁর তীব্র আগ্রহ, পণ্ডিতজনের মতামত সভায় পেশ করা হোক। রমেশবাবুর লিখিত ভাষণ বা তাঁর বক্তব্য টেপ করে আনা সম্ভব হল না। সুনীতিবাবু সেজন্য একটু ক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন। সভার দিন বলেছিলেন, "রমেশ-বাবুর মতামতটা শোনা গেলে ভালো হত।"

প্রস্তাবিত দ্বিতীয় বক্তা শ্রীদীনেশচন্দ্র সরকার। তাঁকে অনুরোধ করতে প্রথমে দ্বিধা প্রকাশ করলেন। তাঁর বক্তব্য সুনীতিবাবুর অনুকূলে যাবে না, সেই কারণে ঐ সভায় বলতে তাঁর দ্বিধা। সে কথা সুনীতিবাবুকে জানানো হলে তিনি প্রবল-ভাবে বললেন, "সেইজন্যই তো চাই যে ড. সরকার বলুন। আমার বিরুদ্ধ মতই তো শুনতে চাই। পণ্ডিতজনেরা যদি আমার মত ভুল প্রমাণ করেন আমার কোনো দুঃখ নেই। কিন্তু ভক্তবাবাজীদের আবেগের কাছে হার স্বীকার করব না।"

শ্রীদীনেশচন্দ্র সরকার শেষ পর্যন্ত রাজি হলেন। তারপর শ্রীসুকুমার সেন। তাঁকে বোধ হয় আচার্যদেব নিজেই অনুরোধ করেছিলেন। আমি বলতেই জানালেন যে তিনি লিখিত ভাষণ পাঠ করবেন। এত অল্প সময়ের বিজ্ঞপ্তিতে তিনি এক আশ্চর্য সুন্দর তথ্যবহুল নিবন্ধ প্রস্তুত করে নিয়ে এসেছিলেন। তার একটি সংশোধিত রূপ পরে অকাদেমির Indian Literature পত্রিকায় প্রকাশিতও হয়েছিল। নীহার-বাবুও প্রথমে দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন আচার্য সুনীতিকুমারের উপস্থিতিতে তাঁর বক্তব্য পেশ করতে। অবশেষে সুনীতিবাবুর ব্যক্তিগত অনুরোধে তিনি সভাপতি হিসেবে সভার শেষে তাঁর বক্তব্য পেশ করতে সম্মত হন। সভার দিন স্থির হল ১৩ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৬, জাতীয় গ্রন্থাগারের প্রেক্ষাগৃহে।

এবারে দুশ্চিন্তা হল সভায় যথেষ্ট জনসমাগম হবে কিনা তাই নিয়ে। সুকুমারীদি বললেন যে, জনদশেক শ্রোতার দায়িত্ব তিনি নিতে পারেন। এ জাতীয় সভায় জন পঞ্চাশেক শ্রোতা হলেই আমরা খুব খুশি হই। সভার আয়োজন চলছে। নতুন এক দুশ্চিন্তা ঢুকিয়ে দিল পুলিস মহল থেকে। রামায়ণ প্রসঙ্গে সুনীতিবাবুর সাম্প্রতিক উক্তি নিয়ে এক প্রবল ঝড় উঠেছে। নানা মহলে বিরূপতা। সুনীতি-বাবুর কাছে প্রত্যহ অস্বাক্ষরিত, বেনামী চিঠি আসছে তাঁকে ভয় দেখিয়ে। এমন অবস্থায় এজাতীয় আলোচনাসভা করা উচিত হবে কিনা, আচার্য সুনীতিকুমারের সাহিত্যসচিব শ্রীঅনিলকুমার কাঞ্জিলাল যখন কথাটা তুললেন, তখন সত্যি দুশ্চিন্তা বাড়ল। ঝুঁকি নেওয়াটা কতদূর সমীচীন হবে? সুনীতিবাবুকে সেকথা জানানোও হল। তিনি আমলই দিলেন না। বললেন, "মারলে মারবে, কিন্তু সভায় গোলমাল করতে দেব না।" বুঝলাম তাঁকে বুঝিয়ে নিরস্ত করা যাবে না। এতখানি এগিয়ে নিজেদের উপরই রাগ হতে লাগল। এই বাড়াবাড়িটা না করলেই হত বোধ হয়। শেষকালে ওঁর যদি কিছু হয়, তখন আফশোসের সীমা থাকবে না। অনিলবাবুর সঙ্গে পরামর্শ করলাম। ঠিক হল পুলিস সহায়তা চাওয়া হবে সভার দিন। কিন্তু তাতেও আচার্যদেবের আপত্তি। শেষ পর্যন্ত স্থির হল ওঁকে না জানিয়েই গোপনে ব্যবস্থা করতে হবে। আই. জি. শ্রীরঞ্জিত গুপ্তকে টেলিফোন করলাম। এমন সভা ডেকে আমরা ঝুঁকিই নিয়েছি বলে তিনি, মনে হল, প্রচ্ছন্ন তিরস্কারই করলেন আমাকে। যাই হোক, পুলিস কমিশনার শ্রীসুনীল চৌধুরীর সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দিলেন। তাঁকে বলতে আলিপুর থানার সাহায্যে সাদা পোশাকের পুলিসের ব্যবস্থা করে দিলেন। দু-তিনদিন খুব থানা পুলিসের সঙ্গে যোগাযোগ করতে গেল। এ খবর সুনীতিবাবু ঘুণাক্ষরেও জানলেন না।

সভার দিন জাতীয় গ্রন্থাগারে তাঁর কক্ষে উপস্থিত হতেই মনে হল, তিনি বেশ উত্তেজিত। হেসে বললেন, "সবাই আসছেন তো?" ঠিক যেন গড়ের মাঠে বড় খেলার আগে অধিনায়কের মনের অবস্থা। নিজে থেকেই বললেন, "আজ আমি বেশি কিছু বলব না। সবার কথা শুনব।" হাতে দেখলাম রবীন্দ্রনাথ থেকে দুটি উদ্ধৃতি, টুকে দিয়েছেন অনিলবাবু। কাগজখানা দেখিয়ে বললেন, "আজ শুধু রবীন্দ্রনাথের উক্তিটুকুই পড়ে শুনিয়ে দেব।"

ইতিমধ্যে বেশ কয়েকজনের কাছ থেকে অনুরোধ এসেছে, তাঁরা সভায় কিছু বলতে চান, স্বভাবতই সুনীতিবাবুর মতের বিরুদ্ধে। তা নিয়েও কিছুটা বিব্রত আছি। স্থির হয়েছে, নির্ধারিত বক্তাদের বাইরে আর কাউকে বলতে না দেবার চেষ্টা করা হবে। যদি কিছু বাদানুবাদ হয়, শ্রীমতী সুকুমারী ভট্টাচার্য সম্মত হয়েছেন তিনি সুনীতিকুমারের সপক্ষে বলবেন। সভা শুরু হতে তখনও খানিকটা বিলম্ব আছে। সুনীতিবাবু এসব সময় স্বভাবতই একটু অধৈর্য হয়ে পড়তেন। তিনি তাঁর কক্ষ থেকে সভাকক্ষ পর্যন্ত হেঁটে এলেন। আমরা শুধু লক্ষ্য রাখছি হঠাৎ কিছু অঘটন না ঘটে। পুলিসের ব্যবস্থা যথেষ্ট আছে কিনা কে জানে! সভায় অভূতপূর্ব জনসমাবেশ। বসবার জায়গা দিতে পারা যাচ্ছে না। আমাদের যেমন শিহরণ, তেমন আশঙ্কা। সুনীতিবাবুর বোধহয় ইচ্ছে ছিল সভার কাজ বাঙলায় হোক। কিন্তু প্রথম বক্তা শ্রীদীনেশচন্দ্র সরকার ইংরেজিতে বলতে চাইলেন। শ্রীসুকুমার সেনের ভাষণও ইংরেজিতে প্রস্তুত। তৃতীয় বক্তা স্বয়ং আচার্য সুনীতিকুমার। সভামঞ্চে সেদিন তিনি তাঁর স্বভাবসিদ্ধ পরিহাসপ্রিয়তা নিয়ে সকলের সঙ্গে কথা বললেন। শ্রোতৃমণ্ডলী অংশত তাঁর প্রতিকূল হতে পারে তা জেনেও তিনি সেদিন শিশুর মত উল্লসিত। যখন তৃতীয় বক্তা হিসেবে তাঁর নাম ঘোষণা করা হল, শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্যে এক শিহরণের হিল্লোল জেগে উঠল। তিনি দাঁড়াতেই শ্রোতৃমণ্ডলী তাঁকে যেন বীরের সংবর্ধনা জানালেন। আমাদের ভয় কেটে গেল। তাঁর ভাষণের মধ্যে প্রশ্নও এল সভাকক্ষ থেকে। তিনি বিরক্ত হলেন না বিন্দুমাত্র, ক্ষিপ্র উত্তর দিলেন। আমাদের বিচারে সভা দারুণ সফল হল।

আচার্য সুনীতিকুমার রামায়ণ-বিতর্ক নিয়ে যে-সব প্রশ্ন তুলেছিলেন তার আলোচনার যথার্থ স্থান এটা নয়, যোগ্য পাত্রও আমি নই। তিনি বোধহয় পাঁচটি প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছিলেন।

১. রাম-কথার প্রধান সংকলয়িতা চ্যবন

২. বিষ্ণু-অবতার হিসেবে রামকে প্রতিষ্ঠিত করা পরবর্তীকালের ঘটনা

৩. বৌদ্ধজাতকে রামকাহিনীর উল্লেখ

৪. রাম-সীতার ভাই-বোন সম্পর্ক এবং

৫. সীতাহরণ কাহিনীর পিছনে গ্রীক প্রভাব।

এর মধ্যে অনেকগুলি প্রসঙ্গই নতুন নয়। এ নিয়ে বিতর্ক বহুদিনের। অনেকে মনে করেন বিতর্কের সমাধান হয়ে গেছে, অনেকে মনে করেন বিতর্ক এখনও খোলা আছে। বস্তুত সুনীতিকুমার বিতর্কগুলিকে আবার জাগিয়ে দিয়েছেন। তিনি শেষ কথা বলেননি, বলতে চানওনি। তিনি বারে বারে বলেছেন, তাঁর ধারণা ভুল হতে পারে। পণ্ডিতজনেরা আলোচনা করুন, তাঁর ভুল প্রতিপন্ন করুন। যুক্তি দিয়ে বিচার হোক। অন্ধ ভক্তিবশে যেন প্রচলিত ধারণা বলে যা চলছে তা মেনে না নেওয়া হয়। সুনীতিকুমারের মত, যা আদৌ তাঁরই মস্তিষ্কপ্রসূত অভিনব মত নয়, শেষ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত নাও হতে পারে। তা নিয়ে সুনীতিকুমারের কোনো অহমিকাও ছিল না। তিনি কেবল আলোচনা বা বিতর্ক প্রবর্তন করতে চেয়েছিলেন। এই উপলক্ষে আচার্য সুনীতিকুমারের এক আশ্চর্য সংস্কারমুক্ত যুক্তিবাদী মনের পরিচয় আমরা পেলাম। মনে রাখতে হবে ছিয়াশি বছরের এক বৃদ্ধ, ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তান, এই বিতর্কের প্রবর্তন করে গেলেন অকুতোভয়ে। সুনীতিকুমার কালাপাহাড় নন। ভারতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের এক সনিষ্ঠ ছাত্র। রামকথার প্রতি অপরিসীম শ্রদ্ধা নিয়েও তাঁর যুক্তিবাদী সংস্কারমুক্ত মনে যেসব প্রশ্ন জেগেছে তা নিয়ে আলোচনা করতে তিনি ভয় পাননি। আমরা জানি, ভয় পাবার কারণ ছিল। যেসব রুচিহীন অশালীন কদর্য চিঠি তাঁর কাছে এসেছে তা আমরা দেখেছি। নানাভাবে তাঁকে ভয় দেখানো হয়েছে। সবংশে রৌরব বাস থেকে একমাত্র পৌত্রের জীবনহানি পর্যন্ত সব রকম অভিশাপ ও ভয় দেখানো হয়েছিল। কিন্তু মুক্ত মনের মানুষ সুনীতিকুমার মাথা নত করেননি কুসংস্কার এবং ভক্তিবাদের কাছে। মাথা নিচু হবার কারণ ঘটেছিল আমাদের—অনেক প্রতিষ্ঠিত মহল থেকে যে ভাবে সুনীতিকুমারকে সেদিন আক্রমণ করা হয়েছিল, সেজন্য। যুক্তির কাছে হার স্বীকার করতে তাঁর দ্বিধা ছিল না, তিনি পণ্ডিতমণ্ডলীর কাছে সবিনয়ে ব্যাকুলভাবে সেকথা বার বার বলেছেন। উনিশ শতকের রামমোহন-বিদ্যাসাগরের যুক্তিবাদী ঐতিহ্য সত্ত্বেও সম্প্রতিকালে সুনীতিকুমারের রামায়ণ সম্পর্কিত উক্তি নিয়ে যে ঝড় উঠেছিল তা আমাদের লজ্জারই কারণ। সংস্কার ও ভক্তির বিরুদ্ধে সিংহবিক্রমে সুনীতিকুমারের সংগ্রাম আমাদের গৌরবকে অক্ষুণ্ণ রেখেছে।

এই সূত্রে আরেকটি অনুরূপ ঘটনার উল্লেখ করা যেতে পারে। ধর্মানন্দ

কোশাম্বীর একখানি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ 'ভগবান বুদ্ধ'—বুদ্ধদেব সম্বন্ধে ঐতিহাসিক আলোচনা। বইখানি ভারতের বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদের জন্য সাহিত্য অকাদেমি কর্তৃক গৃহীত হয়। কয়েকটি ভাষায় অনুবাদ প্রকাশিতও হয়। হঠাৎ বইখানি নিয়ে আপত্তি উঠল বিশেষ মহল থেকে। বইখানিতে নাকি বুদ্ধের ভগবানত্বকে খাটো করে দেওয়া হয়েছে। সুতরাং বইখানি ধর্মের প্রতি আঘাত। আপত্তির ফলে তদানীন্তন অকাদেমি সভাপতি শ্রীজওহরলাল নেহরু নির্দেশ দিলেন অন্যান্য ভাষায় বইখানির অনুবাদ বন্ধ থাক। তার ফলে বাঙলায় অনুবাদ প্রকাশ বন্ধ হয়ে গেল। সুনীতিকুমার অকাদেমি-সভাপতি হবার পর ব্যাপারটি তাঁর নজরে আনা হয়। জওহরলাল নেহরুর নিষেধ, অনেকেই সাহস পাচ্ছিলেন না তার বিরুদ্ধতা করতে। সুনীতিকুমার নিজে চিঠি লিখে প্রস্তাব আনলেন অকাদেমিতে। বললেন, ঐতিহাসিক আলোচনায় বাধা দেওয়া হবে কেন? কেউ চাইলে এই বইয়ের যুক্তি খণ্ডন করে নতুন গ্রন্থ রচনা করতে পারে। সুনীতিকুমারের ব্যক্তিগত আগ্রহে ও চেষ্টায় অকাদেমির দীর্ঘকালের নিষেধাজ্ঞা উঠে গেল। মানুষের যুক্তিবাদী জ্ঞানের প্রতি শ্রদ্ধাশীল সুনীতিকুমার রামায়ণের ক্ষেত্রেও যেমন, ভগবান বুদ্ধের ক্ষেত্রেও তেমনি। সুনীতিকুমার বারে বারে বলতেন, "সারাজীবন জ্ঞান-বুদ্ধির চর্চা করেছি। তার বাইরে কি আছে জানি না। হয়তো জানা যায়ও না।"

শিল্পী সুনীতিকুমার

লীলা মুখোপাধ্যায়

আমার বাবা ভাষাতাত্ত্বিক সুনীতিকুমারের পেশা ছিল ভাষাতত্ত্ব, কিন্তু জীবনের আসল রস ছিল শিল্পচর্চায়। শ্রেষ্ঠ আনন্দ ছিল শিল্পরস গ্রহণে। এই আনন্দ-ভাণ্ডারের সন্ধান পেয়েছেন খুব ছোটবেলাতেই। তাই আমরা জানি, স্কুলে পড়ার সময় থেকেই ছবির বই, মিউজিয়ামে ছবি মূর্তি ইত্যাদি দেখার জন্য দূর দূর পায়ে হেঁটে চলে যেতেন। তাঁর এই শিল্পপ্রেমিকতাই পরবর্তীকালে বিশ্বের নানা দেশের ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি প্রভৃতি জানার প্রেরণা দিয়েছে। কোন দেশের ভাষাচর্চা করতে গিয়ে শিল্পচর্চাও তাঁর অন্যতম বিষয়বস্তু হয়ে পড়ত। শিল্পচর্চার মাধ্যমেই সে দেশের ইতিহাস, ভূগোল, সাহিত্য, রাজনীতি সবই তাঁর জানার বিষয় হত। তাই তাঁর জ্ঞানের পরিধিও সীমা-পরিসীমা ছাড়িয়ে চলে গিয়েছিল। এই শিল্প-প্রেমিকতা নীরস ভাষাতত্ত্বকে দিতে পেরেছিল সরসতা।

শিল্পের প্রতি তাঁর যে কি পরিমাণ অনুরাগ ছিল তা ধারণার বাইরে। বাবাকে যেমন সদাসর্বাদা অসংখ্য বই-এর মধ্যে ডুবে থাকতে দেখা যেত, তেমনি তাঁর চতুর্দিকে ছড়িয়ে থাকত শিল্পসামগ্রী, শিল্পবিষয়ক বইপত্র। গভীর মন নিয়ে কিছু লিখছেন বা পডছেন, হঠাৎ উঠে গিয়ে সংগ্রহশালার শিল্পদ্রব্য নিয়ে নাড়া-চাড়া শুরু করে দিতেন। কোন মূর্তিকে এগিয়ে আনতেন, কাউকে বা পিছিয়ে দিতেন। দু-এক মিনিট দাঁড়িয়ে দেখতেন আবার গিয়ে লেখা শুরু করতেন। মনে হত, একঘেয়ে নীরস তত্ত্ববিষয়ক বইপত্র পড়তে পড়তে হঠাৎ মনটাকে শিল্পরসে সিক্ত করে নিয়ে যেতেন—আবার নতুন উদ্যমে শুরু করতেন লেখা আর পড়া। বাবার ডাইরি, নোটবুক, বইপত্র, লেখার কাগজ ইত্যাদি সবকিছুর মধ্যেই তাঁর প্রিয় শিল্পীদের আঁকা ছবির ছোট ছোট প্রিণ্ট, সুন্দর কোন শিল্পনিদর্শন ইত্যাদি থাকত। সময়-অসময়ে ওগুলি দেখা, মাঝরাতে ঘুম ভেঙে গেলে উঠে আলো জেলে সেগুলি দেখে আবার শুয়ে পড়া এ তো তাঁর অভ্যাসে পরিণত হয়েছিল। কালো পাথরের উপর খোদিত হর-পার্বতীর মূর্তির সামনে দাঁড়ালে, বাবা বলতেন —'আমার উপাসনার কাজ হয়।' শিল্প তাঁকে কোন আধ্যাত্মিক জগতে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিল তা আমরা তাঁর জীবনের নানা ঘটনায় দেখেছি। শিল্প তাঁর সারা জীবনকে জুড়ে বসেছিল। দেশে-বিদেশে অজস্র বার ভ্রমণ করেছেন। বেড়ানোর

প্রধান আনন্দ ছিল দেশের শিল্পসংগ্রহশালাগুলি তন্নতন্ন করে দেখা, বার বার দেখেও যেন তাঁর দেখার ইচ্ছা কমত না। আমরা যে যখন কোন দেশে বেড়াতে গিয়েছি, জোর করে বলে দিয়েছেন, কোথাও কোন মন্দির কোন মিউজিয়াম বা কোন বিখ্যাত ভাস্কর্য-শিল্পসৃষ্টি থাকলে, সেগুলি যেন দেখতে না ভুলি।

শিল্পরসিক ও শিল্পীদরদী বাবার পরিচয় অনেকেই জানেন। কিন্তু শিল্পী সুনীতিকুমারের পরিচয় হয়ত অনেকেই জানেন না। কৃতি ছাত্র হিসাবে লেখাপড়া নিয়েই সদাসর্বদা ব্যস্ত থাকতেন, ছবি আঁকাটা তাঁর কাছে গৌণ ছিল—এটা তাঁর একান্ত নিজস্ব হবি। ঠিক কবে থেকে ছবি আঁকা শুরু করেন, না জানা থাকলেও কলেজ-জীবনে নাটক, বিশেষতঃ ঐতিহাসিক নাটকগুলির (চন্দ্রগুপ্ত ইত্যাদি), পোশাক-পরিচ্ছদ সঠিক কি ধরনের হওয়া উচিত তার জন্য বিভিন্ন লাইব্রেরী ও মিউজিয়াম ঘুরে সেই সময়ের সৈনিক, প্রজা, নারী, রাজন্যবর্গের ছবি থেকে তাদের অঙ্গসজ্জা, পোশাক ইত্যাদি অতি যত্নে স্কেচ করে আনতেন, সেইমত নাটকের পোশাক ইত্যাদি প্রস্তুত হত। শুনেছি, বাবার বিশেষ বন্ধু শিশির ভাদুড়ী তাঁর সীতা প্রভৃতি নাটকের পোশাক ইত্যাদির ব্যাপারে বাবার স্কেচ এবং পরামর্শ নিতেন।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক হিসাবে থাকার সময় ক্লাসে গিয়ে মাঝে মাঝে দেখতেন, কোন ছাত্র বোর্ডে কিছু ব্যঙ্গচিত্র আঁকার চেষ্টা করেছেন। সেই ছাত্রকে দিয়ে বোর্ড পরিষ্কার করিয়ে নিজে দৃঢ় পরিচ্ছন্ন রেখায় কিছু এঁকে সকল ছাত্রছাত্রীকে চমকে দিয়েছেন।

কিন্তু আমাদের কাছে বাবার আঁকা এক আশ্চর্য আনন্দের খোরাক যোগাত। তখন মনে হত, বাবার আঁকার উদ্দেশ্যই ছিল আমাদের আনন্দ দেওয়া। ছোটবেলার বহু স্মৃতি বাবাকে ঘিরেই গড়ে উঠেছে। সারাদিনের অধ্যাপনার কাজকর্ম মিটিং ইত্যাদি সেরে সন্ধ্যার পর সময়টা ছিল আমাদের জন্যে। সুর করে পাঠ করতেন নানা ভাষার কাব্য মহাকাব্য। ছবি আঁকতেন আমাদের ফরমাশ মত। আমরা গল্প শুনতাম আর ছবি আঁকা দেখতাম। অনেক সময় এ সব আঁকা হত ঘরের মসৃণ লাল মেঝের উপর সাদা চক দিয়ে। কুমীরের পিঠে বাঁদর চড়ে নদী পার হচ্ছে, হনুমান কলা খাচ্ছে তার বিরাট লাঙ্গুল কাঁধে ফেলে—গণেশ অথবা হাতি পিছনে হাত রেখে কখনও বা দুই পা তুলে নাচছে।

শকুন্তলার পুত্র ভরতের সিংহের দাঁত গোনার গল্প আমাদের খুব প্রিয় ছিল, তারও ছবি আঁকতেন। বিশেষ ভাবে দেখেছি, বিভিন্ন দেশের যোদ্ধাদের পোশাক-

পরিচ্ছদ তাঁকে খুব আকৃষ্ট করত, তাই নানা সাজের যোদ্ধা খুব আঁকতেন, আর ভালবাসতেন ঘোড়া আঁকতে। ছবির বক্তব্যই ছিল তখন আমাদের কাছে প্রধান আকর্ষণ ও আনন্দের। রেখার বলিষ্ঠতা বা কিরূপ দ্রুতগতিতে অবলীলাক্রমে সে-গুলি আঁকতেন এটা চিন্তা করার বয়স তখন আমাদের হয়নি।

বেশ কিছু পরে দিদি বাবাকে দিয়ে কিছু ছবি আঁকিয়ে রাখে। ছবি আঁকার জন্য বিশেষ পরিবেশ বা মনের অবস্থার প্রয়োজন হত না। মন দিয়ে কিছু লিখছিলেন বা কোন বিশিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে গুরুগম্ভীর কিছু আলোচনা করছেন, গিয়ে হাজির হয়েছি খাতা নিয়ে, কাগজের টুকরো নিয়ে, আব্দার ধরেছি ছবি আঁকার। বিরক্ত না হয়ে তখনই কথা বন্ধ করে, লেখা বন্ধ করে, সেই কলম দিয়েই এঁকে দিয়েছেন—পাল্কীতে বউ চলেছে--ঘোড়সওয়ার বর্ম পরে হাতে বল্লম ধরে ছুটে চলেছে—সাবিত্রী-সত্যবান—আরো কত কি! রেখার উপর অসামান্য দখল ছিল বাবার, অর্থাৎ "সরল রেখাপাতের উপযোগী হস্তশক্তির" অধিকারী ছিলেন তিনি।

বাবার আঁকা প্রায় পঁচিশ-তিরিশটা স্কেচ আছে সবই কলম বা পেনসিলে। কয়েকটি পাথরের উপর বিশেষ ভাবে খোদাই করা। অবনীন্দ্রনাথের বিশেষ প্রিয় ছিলেন বাবা। শ্রীনন্দলাল বসু ও অবনীন্দ্রনাথের প্রভাব বাবার জীবনে খুবই পড়েছিল। এঁদের শিল্পের আধ্যাত্মিক ভাব তাঁকে যে অপার্থিব অমৃতের স্বাদ দিয়েছে সে কথা বাবা সব সময় স্বীকার করতেন। অবনীন্দ্রনাথ, বাবার ছবি আঁকার কথা জানতেন কিনা জানি না। তবে বাবার কাছেই শুনেছি, অবনীন্দ্রনাথ বলতেন, "উট, মুট, ঘোড়া তিন শিল্পের গোড়া"। বাবাও সেই মত উট মুট (অর্থাৎ মুখ) ও ঘোড়া আঁকায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন।

সীল এবং সিম্বল বা প্রতীক চিহ্নের নকশা তৈরী করা বাবার আরো একটি বিশেষ আনন্দের কাজ ছিল। বেশ কয়েকটি স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠানে বাবার দেওয়া প্রতীক চিহ্ন প্রচলিত। সব কিছুর মধ্যেই একটা পরিচ্ছন্ন সৌন্দর্যের সংমিশ্রণ ঘটাতে বাবা খুবই পছন্দ করতেন। তাঁর শিল্পের প্রতি অপরিসীম অনুরাগ জীবনের সকল ক্ষেত্রকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করতে সাহায্য করেছে। বাড়িতে বিশেষ অতিথি আপ্যায়নের অঙ্গ হিসাবে আলপনা ফুল সাজানো এগুলো আমাদের একান্ত অপরিহার্য কাজ ছিল। জীবনশিল্পী কেবল ছবিই আঁকবেন না, তার পরিবেশও যেন সুরুচির সৌন্দর্যের পরিচয় বহন করে।

আমাদের হিন্দুস্থান পার্কের বাড়ি যখন তৈরী হয় তার ছোটখাটো প্রতিটি কোণই সুন্দর শিল্পসম্মত করে তোলার চেষ্টা করেছেন। স্টোর-রুম বা ভাঁড়ার-ঘরের

দরজার মাথার উপর সাদা পাথরে খোদাই করা আলপনার আকারে আঁকা আছে লক্ষ্মীর দুটি পা, রান্নাঘরের প্রবেশপথের মাথার উপর কালো পাথরের উপর খোদাই করা আছে সিম্বলিক ডিজাইনে উনুনের উপর ভাতের হাঁড়ি, স্নানের ঘরের দরজার উপর আছে জলের ধারা। এসব বাবার হাতেরই আঁকা, এ ছাড়া সারা বাড়িতে বিখ্যাত সব বাণী বিভিন্ন ভাষায় খোদিত হয়ে আছে, আর আছে রবীন্দ্রনাথের স্বহস্তে লিখিত কবিতার দুটি লাইন।

শিল্পী নন্দলাল বসুর আঁকা হরপার্বতী কালো পাথরে খোদিত হয়ে আছে—এটি আমাদের বাড়ির অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্পদ। যে কাঠের সুদৃশ্য টেবিলে এটি বসানো আছে তার পরিকল্পনা এবং টেবিলের উপর বসানো বাঘছালের সাদৃশ্যের ইতালীয় মার্বেল পাথর, সবই বাবার শিল্পীমনের পরিচয় দেয়। শিল্পী এবং শিল্প-অনুরাগী বাবা তাঁর জীবনের সকল ক্ষেত্রে মিলেমিশে এত একাকার হয়ে গেছেন যে একে আলাদা করে বিশ্লেষণ করা প্রায় অসম্ভব। তাই শিল্পী হিসাবে তাঁর পরিচয় দিতে গিয়ে বার বার শিল্পপ্রেমিক ও শিল্পীদরদী বাবার কথা এসে পড়ে। তাঁর শিল্পীদরদী মনের বহু পরিচয় পাওয়া যায়, বহু ঘটনার কথাই আমরা জানি। প্রখ্যাত ভাস্কর সুনীল পাল তাঁর একটি ছবির নামকরণে রবীন্দ্রনাথের কবিতার দুটি ছত্র উদ্ধৃত করেন—এতে বানানে ভুল থাকায় বাবা সেটি সংশোধন করে দেন—তাতে শিল্পী লজ্জিত হলে বাবা বলেন, "ওর জন্যে ভেবো না, বানান ঠিক করে লেখার অনেক লোক আছে—তোমাদের কাজের লোক নেই।"

অবনীন্দ্রনাথ নন্দলাল ছিলেন বাবার কাছে, শিল্পজগতের শ্রেষ্ঠ পুরুষ। তাঁর মতে পৃথিবীর সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের যে দান ; শিল্পজগতে এঁদের দান তার চেয়ে কিছু কম নয়। শিল্পী যামিনী রায় সম্বন্ধে নানা প্রবন্ধে তাঁর বলিষ্ঠ রেখা ও বর্ণ-বিন্যাসের ধারা প্রভৃতির মান যে কত উর্ধ্বে তা বলেছেন। যে কেউ ছবি আঁকতে পারতেন বাবার যেন তাঁর প্রতি একটা প্রচ্ছন্ন পক্ষপাতিত্ব ছিল বলে মনে হত। কোন শিল্পীর প্রদর্শনীতে যেতে বললে খুব কম সময় তিনি তাঁকে নিরাশ করেছেন। কেউ শিল্পকর্ম বা ছবি দেখাতে এলে প্রচুর উৎসাহ দিয়েছেন। আমার আজও মনে পড়ে, স্বনামধন্যা লেখিকা শ্রীমতী কবিতা সিংহ আমার মেজদির বন্ধু —স্কুলজীবনে খুব সুন্দর ছবি আঁকতেন (জানি না আজও আঁকেন কিনা)। একটা ছোট খাতায় গল্প বা নাটক ছবির আকারে দৃশ্যের পর দৃশ্য এঁকেছিলেন—বাবা তার খুব তারিফ করেছিলেন সহজ সরল রেখাচিত্রের জন্য—সেই খাতাটি বোধহয় এখনও বাবার লাইব্রেরীতে পাওয়া যাবে।

গ্রীক শিল্পের নিরলঙ্কার সৌন্দর্যের অপরূপ মহিমা বাবাকে যেমন মুগ্ধ করত—দক্ষিণ ভারতের কারুকার্যময় মূর্তি স্থাপত্য বা অন্য শিল্পসামগ্রী অথবা আফ্রিকার সহজ সরল বলিষ্ঠ শিল্পসৃষ্টি দেখেও সমান আনন্দ পেতেন। কাচের বা মাটির কোন সুন্দর মূর্তি চোখে পড়লে ধাতুতে ঢালাই করিয়ে তাকে চিরস্থায়ী করে রাখার চেষ্টা করেছেন। লণ্ডন মিউজিয়াম থেকে পশ্চিম আফ্রিকার বেনিন নগরীর নিগ্রোকন্যার মূর্তির প্লাস্টার অব প্যারিসের অনুলিপি দেশে এনে ব্রোঞ্জে ঢালাই করিয়ে নিয়েছেন—এ মূর্তি বাবার যে কত প্রিয় তা তো অনেকেই জানেন!

বাবার সঙ্গে বিদেশে ঘোরার অমূল্য সুযোগ আমার জীবনে এসেছিল। ব্রিটিশ মিউজিয়াম, ন্যাশনাল আর্ট গ্যালারী সর্বত্রই তাঁর সঙ্গে ঘুরে ঘুরে বেড়িয়েছি। কি অসীম আনন্দে, কি নবীন উৎসাহে চুরাশী বছরের বাবা সব কিছু দেখিয়েছিলেন! অপূর্ব সংগ্রহশালা প্রাচীন গ্রীক ভাস্কর্যের, মিশরীয় আসিরীয় ভাস্কর্যের নিদর্শন, গ্রীক মৃৎপাত্রের সংগ্রহ, চীনা শিল্পের সংগ্রহ, ভারতের অমরাবতীর ভাস্কর্যাবলী ইত্যাদি, ওদিকে ইতালী ইউরোপের রেনেসাঁ যুগের অমর শিল্পীদের চিত্রমালা। প্রতিটি মূর্তির, প্রতিটি চিত্রের শিল্পগত উৎকর্ষ এবং বর্ণনা শুনতে শুনতে মুগ্ধ হয়ে যেতাম—দুঃখ হত আমার তাদের জন্য, যারা এ সুযোগ পেল না। কোন্ মূর্তির পর কোন্ মূর্তি, কোন্ চিত্রের পর কোন্ চিত্র—কোন্‌টি কোন্ সালের, কোথায় তার সৌন্দর্য, কি তাঁকে মুগ্ধ করেছে অনর্গল তা বলে চলতেন। এখন আক্ষেপ হয়, কেন তা লিপিবদ্ধ করে রাখিনি? সারাদিন ঘোরাঘুরিতে ক্লান্ত থাকতাম—মনে হত, বাবা তো আছেনই, দরকার পড়লেই জেনে নেব।

বিদেশে দেখেছি অসম্ভব হিসাব করে চলতেন বিদেশী মুদ্রা বাঁচানোর জন্য, কারণ কোথাও কোন সুন্দর শিল্প-নিদর্শন দেখেছেন তা কিনতে হবে—কোথাও কোন পুরাতন মুদ্রার অনুকরণ দেখেছেন তা সংগ্রহ করতে হবে—বাবার কাছে দুষ্প্রাপ্য বিদেশী মুদ্রার সার্থক ব্যবহার তো এইসব সংগ্রহেই। বিদেশ থেকে বরাবর যা কিছু এনেছেন—আমাদের জন্য বা নিজের সংগ্রহশালার জন্য, শিল্পসৌন্দর্যের বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে তা অতুলনীয়। বাবার জীবনে কোন কিছু কুৎসিত, খেলো, মেকি, চটকদার জিনিসের স্থান ছিল না—তাই যা কিছু করে গেছেন, যা কিছু রেখে গেছেন তাই সুন্দর অমূল্য ও চিরন্তন হয়ে থাকবে।

যে নিষ্ঠার সঙ্গে ভাষার বিশ্লেষণ, গবেষণা, তার উন্নতির চেষ্টা করে গেছেন—সেই একাগ্রতা সেই নিষ্ঠার সঙ্গে যদি শিল্পচর্চা করতেন, হয়ত বিশ্ববরেণ্য পণ্ডিত সুনীতিকুমারের নাম দেশবরেণ্য শিল্পী হিসাবেও প্রতিষ্ঠা পেত। জানি না কেন

নিজের এই প্রতিভার তেমন মূল্য বাবা দেননি, হয়ত গবেষণার জন্য শিল্পচর্চার যতটুকু প্রয়োজন বোধ করেছেন তার চেয়ে বেশী সময় এতে ব্যয় করার পক্ষপাতী ছিলেন না। আজ আর এ প্রশ্ন তুললে কারো কাছে কোন উত্তরই পাওয়া যাবে না। একমাত্র যিনি জবাব দিতে পারতেন তিনি তো এখন সেই অমৃতলোকে, সেখানে শুধু আনন্দ, শুধু শান্তি, শুধু সৌন্দর্য।

সুনীতিকুমারের সংস্কৃতি-চিন্তা

উজ্জ্বলকুমার মজুমদার

যৌবনকালের শিক্ষা সমাপ্ত করার পর থেকেই সুনীতিকুমার সংস্কৃতিচর্চায় মন দিয়েছিলেন এবং মৃত্যুর পূর্বক্ষণ পর্যন্ত প্রায় ষাট বছর তিনি এই মানবসংস্কৃতির নিরন্তর চর্চাই করে গেছেন। সুনীতিকুমার কতগুলি ভাষা জানতেন এবং ভাষাতত্ত্ব-চিন্তায় তিনি নিজস্ব কীর্তি কী রেখে গেছেন তার পরিমাপ ভাষাতাত্ত্বিক পণ্ডিতেরা করছেন এবং ভবিষ্যতেও করবেন। কিন্তু মনে হয়, তাঁর মূল লক্ষ্য ছিল মানববিদ্যা-চর্চা বা সংস্কৃতিচর্চা, ভাষাতত্ত্বচর্চা যার অন্যতম উপাদান মাত্র। পঞ্চাশ বছরের কিছু বেশি আগে সুনীতিকুমার শান্তিনিকেতন-আশ্রমের প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীদের বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতির বক্তৃতায় (১৩৩১) বলেছিলেন, বিশ্বসংস্কৃতির অংশ হিসেবে সবকিছুই আমাদের সাধনার বিষয়। ভারতীয় মনে এই বিশ্বসংস্কৃতি-বোধ রবীন্দ্রনাথের পর তিনিই বিশেষ করে জাগিয়েছিলেন। সেই বক্তৃতায় তিনি বলেছিলেন, এখন আমাদের ভাবরাজ্য বিস্তৃত হয়েছে। এমন কি, গভীরতার চেয়ে বিস্তৃতির দিকেই আমাদের ঝোঁক পড়েছে বেশি। যথার্থ পণ্ডিতের পক্ষে বিস্তার আর গভীরতা দুটিই একসঙ্গে আয়ত্ত এ যুগেই সম্ভবপর হয়েছে। সাধারণ জিজ্ঞাসুর পক্ষে হয়তো এই দুটিকে সমান ভাবে আয়ত্ত করা সম্ভব হবে না। কিন্তু সাধারণ জিজ্ঞাসুর লক্ষ্য হবে, একটি বিষয় ভালোভাবে জেনে অন্য সবকিছুর রসাস্বাদ করবার অধিকার অর্জন করা। কিন্তু একটি বিষয়ে গভীরতা না থাকলে আমাদের ভারসাম্য থাকবে না, বহুবিস্তারের ফলে আমরা পথভ্রষ্ট হয়ে যাবো। আবার কোনো বিশেষ বিষয়কে ভালো করে জানতে হলে কেবল সেই বিষয়ে আবদ্ধ হয়ে থাকলেও চলবে না। ব্যাপক ভাবে দেখলে প্রত্যেক বিষয়েরই যথার্থ পরিচয় হয়। কারণ 'পরিধি' না থাকলে 'কেন্দ্র' কোথায় তা বুঝবো কী করে? তাই সুনীতিকুমারের মতে, সংস্কৃতি-চর্চায় মানসিক রাজ্যে 'কেন্দ্রে'র যেমন প্রয়োজন, 'পরিধি'রও তেমনি প্রয়োজন। এই যুগে আমাদের গতি পরিধিমুখী। তাই সঙ্গে সঙ্গে তিনি সাবধান করে দিয়েছেন এই বলে যে, এখন যেমন জ্ঞানরাজ্যে আমরা বিস্তারমুখী ও পরিধিমুখী, আগে ছিলাম কেন্দ্রমুখী। শ্রেষ্ঠ মানসিক উৎকর্ষ হয় এই দুইয়ের সামঞ্জস্যে।

কিন্তু এই সামঞ্জস্যে আনবার বাধা ঘটছে নানাভাবে সাম্প্রতিক কালে। রাজ-নৈতিক কারণে, আত্মরক্ষার চেষ্টায় বাইরের জগতের ওপর দেশের মানুষের অশ্রদ্ধার

ভাব এখন জাগছে। পাছে বাইরের জগৎ এসে তার উন্নত কারিগরী বিদ্যা, জীবন-পদ্ধতি ও চিন্তার সমৃদ্ধি দিয়ে আমাদের ভাসিয়ে নিয়ে না যায়, সেইজন্যে আমরা ভাবছি, বাইরের জগৎকে অস্বীকার করে নিজেদের কেন্দ্রকে আঁকড়ে ধরতে পারলেই আমাদের আত্মরক্ষা হবে। সুনীতিকুমার যখন একথা লিখেছেন তখন দেশে অসহযোগ ও বিদেশী দ্রব্য বর্জনের যুগ চলেছে। সেই সময় রবীন্দ্রনাথ যে উদার আন্তর্জাতিক চেতনার পথে ক্রমোন্নতি দেখেছিলেন অনেকটা সেই পথ ধরেই সুনীতিকুমার বলেছেন, যারা দেশের কেন্দ্রীয় শক্তিটিকে চেনে না বা সেই শক্তির সঙ্গে কোথায় আমাদের অচ্ছেদ্য যোগ তা জানে না, তারাই বাইরের জগতের বিরাট পরিধির দিকে তাকিয়ে স্থৈর্য হারিয়ে ফেলে। জাতীয় জীবনের জাতীয় উৎকর্ষের 'কেন্দ্র'টি কোথায় তা যদি জানতে পারি, তাহলে বাইরের জগতে আমাদের চিন্তা যতই প্রসারিত হোক, আমরা অবশ্যই আত্মস্থ থাকবো। নিজেকে যেমন জানা দরকার, তেমনি আবার নিজের জানাটা কতখানি সম্পূর্ণ তা বুঝতে গেলে বাইরের জগৎকেও জানা দরকার। আত্মজ্ঞান এবং বহির্জ্ঞানেই সংস্কৃতির সম্পূর্ণতা।

এই 'সম্পূর্ণ সংস্কৃতি'র চেতনাতেই সুনীতিকুমার বুঝতে পেরেছিলেন, বেদ-উপনিষদের কাল' থেকে মুসলমান যুগ পর্যন্ত ভারতবর্ষের বিচিত্র ভাবসম্পদ যেমন আমাদের দেশীয় সংস্কৃতি-বৈচিত্র্যকে প্রকাশ করেছে তেমনি অন্যান্য দেশও যে কত বিচিত্র পদ্ধতিতে নতুন নতুন উদ্ভাবনার পথে সভ্য হয়েছে তা আমরা জানতে পারছি। এ সবই মানুষ হিসেবে আমাদের ঐতিহ্যগত, প্রেরণাগত হয়ে যাচ্ছে। কাজেই 'কালচার' বা মানসিক উৎকর্ষ এখন আর জাতিবিশেষের কৃতিত্ব নয়, 'কালচার' এখন বিশ্বমানবের সাধারণ সৃষ্টি, সাধারণ সম্পদ বা আজকের সংস্কৃতি-বিদের কাছে কমন কালচার। সাত-আট হাজার বছর ধরে ক্রমশঃ-সভ্য মানুষ যা করেছে তার মালিক বিশ্বমানব—বিশেষ কোন দেশ নয়। কাজেই সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বিশ্বের সমস্ত মানুষের জন্মগত অধিকার। এই অধিকারকে ছেড়ে দিয়ে দেশের কোণে ঘরের কোণে বসে থাকা অর্থহীন। বৈদিক যুগ যতই মহিমান্বিত হোক, পরবর্তী যুগের তুলনায় তাকে শ্রেয় বলে মনে করার কোন কারণ নেই। আনাতোল ফ্রাঁসের একটি কথা উদ্ধার করে সুনীতিকুমার বলেছেন, 'যে সদানন্দ বয়সে লোকে যে-জিনিস বোঝে না সেই জিনিসের আদর করে, সে বয়স আমি পেরিয়েছি। আমি আলো ভালোবাসি।' এই আধুনিক পৃথিবী যে 'স্বাধীন মন' দিয়েছে মানুষকে, সেই 'স্বাধীন মন' ভারতীয় প্রাচীন চিন্তার আবহাওয়ার মধ্যেই ছিল। এই মনোজগতের স্বাধীনতাই বাহ্য পরাধীনতার বেদনা অনেকটা কমিয়ে দেয়,

নইলে পরাধীন ভারতে সবই তো পাশবিক হয়ে যেতো। সুনীতিকুমারের মন্তব্য এক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ, যদিও তর্কসাপেক্ষ : 'বাইরের পরাধীনতা যতই কেন নিষ্ঠুর, যতই কেন কঠোর হোক না, মন যদি স্বাধীন থাকে তাহলে সে পরাধীনতা কিছুতেই স্থায়ী হয়ে থাকতে পারে না। সব চেয়ে সর্বনাশকর মনের স্বাধীনতার হানি। এই স্বাধীনতানাশের চেয়ে বাহ্য পরাধীনতা সহস্র গুণে শ্রেয়।'

সন্দেহ নেই, মনের স্বাধীনতা না থাকলে মনুষ্যত্ব মূল্যহীন হয়ে পড়ে। কিন্তু বাহ্য পরাধীনতা কোনো কারণেই শ্রেয় হতে পারে না যদি সে পরাধীনতা শিক্ষাদীক্ষার অভাব ঘটায়, দারিদ্র্য ও শোষণ দিন দিন বাড়িয়ে তোলে, চিন্তার স্বাধীনতা, বাক্যের স্বাধীনতা, শিল্পচর্চার স্বাধীনতা, বিচারের নিরপেক্ষতা—ন্যূনতম অধিকার রক্ষার স্বাধীনতাটুকুও ক্রমশঃ খর্ব করতে থাকে। এই নিষ্পেষণ আমাদের দেশে উনিশ শতক থেকে শুরু হয়েছিল বলেই তো স্বাধীনতা-আন্দোলন। দেশের স্বাধীনতা-আন্দোলনে আমাদের দেশপ্রেম অনেক সময় সংকীর্ণ ও স্বার্থান্ধ হয়েছে ঠিকই, কিন্তু স্বাধীনতা পাবার জন্যে সব রকম জানলা-খোলার উদারতাকে মনে রেখেও দেশপ্রেমকে প্রাথমিক প্রয়োজন বলেই মানতে হয় ; স্বাধীনতা প্রাপ্তির পরে অবশ্য স্বাধীনতা রক্ষায় সে দেশপ্রেমকে বিশ্বসংস্কৃতিনির্ভর না করে নিলে স্বাধীনতা রক্ষা হয় না। অতন্দ্র পাহারাতেই স্বাধীনতার দাম দিতে হয়। জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা দুটিকেই একসূত্রে বাঁধতে হয়। কিন্তু জাতীয়তার মূল চরিত্রশক্তিটুকু না জানা থাকলে 'আন্তর্জাতিকতা' ব্যাপারটাই ধোঁয়াটে হয়ে যায়। যাই হোক, স্বাধীন হই বা পরাধীন হই, মনের স্বাধীনতা রক্ষার চেষ্টা যে সব সময়েই করতে হবে সুনীতিকুমারের এই বোধ একান্তভাবেই সত্য, এবং সেইজন্যেই এই মানসিক স্বাধীনতা অর্জনের প্রথম ধাপে দেশপ্রেমকেই সম্বল করে 'ভারতপন্থা'কে তিনি বুঝতে চেষ্টা করেছেন। আর সেইজন্যেই তিনি ওই ভাবনেই বলেছেন :

'যারা ভারতের সভ্যতার উত্তরাধিকারী হয়েও হেলায় তাকে বর্জন ক'রছে, ভারতের উদার মনোভাবের আর অনুসন্ধিৎসার পরিবর্তে অসহিষ্ণুতা, আর আত্মঘাতী তামসিক অন্ধ বিশ্বাস এনে দেশে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি ক'রছে, বাইরের কোনও এক অর্বাচীন জাতিকে গুরু বলে মেনে নিয়ে, তাদের অন্তর্নিহিত সদ্‌গুণগুলিকে ধ'রতে না পেরে কেবলমাত্র বাহ্য বিষয়ে আচারে অনুষ্ঠানে তাদের অন্ধ অনুকরণের বৃথা চেষ্টা ক'রছে, নানা প্রকারে পিতৃপুরুষের অপমান ক'রছে, আর দেশের প্রতিষ্ঠার পক্ষে অন্তরায় হচ্ছে—আমাদের সমগ্র শিক্ষা সাধনা আর বোধনী আর রোধনী শক্তি দিয়ে তাদের এই পরমতা অসহিষ্ণুতা আর বিদ্বেষ ভাব, অন্ধ অনুচিকীর্ষা আর

নিজেদের সম্বন্ধে অজ্ঞতা, এই মনের বিরুদ্ধে ল'ড়তে হবে। ভারতীয় মনোভাবকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য এই অজ্ঞতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ একটা বড়ো আবশ্যক কার্য।'

কাজেই সুনীতিকুমার যে এই ভাষণে একটু আগেই মন্তব্য করেছেন, বাইরের পরাধীনতা নিষ্ঠুর হলেও মনের স্বাধীনতা থাকলে সেই নিষ্ঠুর পরাধীনতাকে কিছুটা আরামপ্রদ করে—সে মন্তব্য সম্পূর্ণভাবে সত্য নয়, কারণ পরাধীনতার মধ্যেই যে আত্মঘাতী অন্ধ বিশ্বাস ও ঐতিহ্য-বিরোধিতা, অন্ধ অনুকরণ ও অজ্ঞতাজনিত অপমান চলছে তা তাঁরই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। এই বিপদ স্বাধীনতা পাবার পরেও যে থাকতে পারে তারও প্রমাণ সাম্প্রতিক কালের উন্নতিশীল দেশে বা তৃতীয় বিশ্বে 'উন্নত' দেশের ক্ষমতা বিস্তারের চেষ্টা এবং উন্নতিশীল দেশের আভ্যন্তরীণ রাজনীতিকে প্রভাবিত করার চেষ্টা।

যাই হোক, রাজনৈতিক স্বাধীনতার লড়াইকে সুনীতিকুমার অস্বীকার করেননি, তবে রাজনীতিকে নেহাৎই বাইরের ব্যাপার—ক্ষমতা অধিকারের লড়াই বলে মনে করেছেন। আর আত্মোন্নতির সাধনাকে বলেছেন সামাজিক বা সাংস্কৃতিক সাধনা। তাই বলেছেন, 'পিতৃপিতামহের মূল্য বোঝেন আর তার মর্যাদা অক্ষুন্ন রাখতে চান, এমন প্রত্যেক শিক্ষিত ভারতীয়ের এদিকে কর্তব্য আছে। এটি রাজনৈতিক আন্দোলন নয়, এটি হচ্ছে সামাজিক সংগঠন, আর সমস্ত জাতের মানসিক শিক্ষা। রাজনৈতিক আন্দোলন অবশ্য চলবে, তাকে বাদ দিলে হবে না, কারণ সেটি হচ্ছে বাইরের মুক্তির জন্য ; কিন্তু সামাজিক মুক্তি, মনের স্বাধীনতা যাতে হয়,—যাতে অশিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত ছুৎ-মার্গী পুরোহিত আর ছুৎ-মার্গী মোল্লার আর পাদরির দলের অনুচিত প্রভাবের ফলে, আর প্রকৃত শিক্ষার অভাবে, আমাদের দেশের জনসাধারণের মনে ঐহিক ও পারত্রিক নানা ভীতি চিরকাল ধরে রাজত্ব করতে না পারে, সেদিকে লক্ষ্য দেওয়া বিশেষ দরকার হয়ে পড়েছে। এ জিনিসটিকে রাজনৈতিক আন্দোলনের চেয়ে নীচু স্থান দিলে আমাদের জাতি বাঁচবার বা অগ্রসর হবার সম্ভাবনা অতি অল্প।'

রাজনৈতিক আন্দোলনের উদ্দেশ্য যে সর্বাত্মক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনেরই নামান্তর এই সত্য শুধু সুনীতিকুমার কেন, বিশের দশকে যখন এই ভাষণটি লিখিত হয়েছিল তখন অনেকেই আমরা ভালো করে বুঝিনি। অথচ রাজনৈতিক আন্দোলনে জাতিভেদ, ধর্মীয় আদর্শের ভেদ, হিন্দু-মুসলমান সমস্যা আমাদের পদে পদে বাধা দিয়েছে। এই বিভেদগুলি আমরা দূর করতে পারিনি বলেই আমাদের রাজনৈতিক আন্দোলন সর্বাত্মক সংহতি লাভ করতে পারেনি।

সুনীতিকুমারের ওই ভাবণের কুড়ি বছর বাদে যখন মহাযুদ্ধের জন্তে এই বিভেদগুলির সঙ্গে অর্থনৈতিক বিভীষিকা যুক্ত হয়েছে, 'রক্তশোষক বণিক এবং অকর্মণ্য ও উচ্চ আদর্শহীন শাসক সম্প্রদায়ের হৃদয়হীনতা হেতু' দেশের মধ্যে বড় মারাত্মক একটা দুর্ভিক্ষ এসেছে. তখন দেশের সাংস্কৃতিক বিপর্যয় ঘটেছে বলে সুনীতিকুমার ব্যথিত হয়েছেন। 'ইতিহাস ও সংস্কৃতি' প্রবন্ধে (১৩৫১) সুনীতিকুমার দুর্ভিক্ষ ও শোষণের ফলে মধ্যবিত্ত কৃষক, শিল্পী, শ্রমজীবী শ্রেণীগুলি প্রায় বিধ্বস্ত হয়ে গেল বলে দুঃখ প্রকাশ করেছেন। এবং বুঝতে পারা গেছে, পরাধীনতা তো বটেই আন্তর্জাতিক রাজনীতির চক্রান্ত ও লালসা যে কোনো দেশের সামাজিক বা সাংস্কৃতিক সাধনাকে নষ্ট করে দিতে পারে।

২

সেইজন্তেই স্বাধীনতার সন্ধিক্ষণে 'সংস্কৃতি' নামে একটি প্রবন্ধে (১৩৫৩) সুনীতিকুমারকে সাংস্কৃতিক সাধনার সমর্থনে 'সংস্কৃতি'র একটি পরিচ্ছন্ন সংজ্ঞার্থ করে নিয়ে ভারতীয় সংস্কৃতির মূল বৈশিষ্ট্যগুলিকে নিষ্কাশিত করে নিতে দেখি। 'একাধারে সভ্যতা-তরুর পুষ্প আর তার আভ্যন্তর প্রাণ বা মানসিক অনুপ্রেরণা যা, তাই হচ্ছে culture'। সভ্যতা হলো সংস্কৃতির বাইরের রূপ। তার ভেতরের কথাটা হলো 'তার মানসিক আর আনুভবিক দৃষ্টিভঙ্গি বা বিচার, তার উপলব্ধি, আর তার বাহ্য সাধনা আর প্রকাশ, তার দর্শন সাহিত্য শিল্প সংগীত প্রভৃতি, তার মানসিক প্রবৃত্তি আর তার অবচেতনা, তার নৈতিক আদর্শ আর তৎপ্রকাশক সহজ ক্রিয়া আর কৃত্রিম পরিপাটি।' এই সবকিছুকে সভ্যতা ছাড়া আর একটা সর্বঙ্কর সংজ্ঞা দিতে সুনীতিকুমারের ইচ্ছে হয়েছে—যে সংজ্ঞাটি ইউরোপে culture শব্দরূপে দেখা গিয়েছে।

ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাস থেকে এই সাংস্কৃতিক সূত্র-সন্ধানের চেষ্টায় সুনীতিকুমার যে কটি উল্লেখযোগ্য সূত্র পেয়েছেন সেগুলি এই : (১) সমন্বয়, (২) তত্ত্বানুসন্ধিৎসা, (৩) অহিংসা (অহিংসার ব্যাখ্যায় তিনি বলেছেন 'এই অহিংসা কেবল vegetable world বা উদ্‌ভিদ-জগতের উপযোগী নিষ্ক্রিয় অথবা পরপরিচালিত ব্যাপার নয়। এর পিছনে আছে ন্যায়-দৃষ্টি ও সহানুভূতি; আর ন্যায়-দৃষ্টি আছে বলেই হিংসার পথে মূর্তি গ্রহণ করতেও ক্ষেত্রবিশেষে বাধা নেই), (৪) দম বা আত্মদমন, (৫) ত্যাগ, (৬) অপ্রমাদ, (৭) জীবনের সবক্ষেত্রে সত্য, শিব, সুন্দরের আবাহন, (৮) হিন্দু-ইসলাম মিশ্রণে সূফী দৃষ্টিকোণ-সমন্বিত ভক্তিবাদ,

(৯) ইওরোপীয় সংস্কৃতির মাধ্যমে খ্রীষ্টান সাধনার প্রেম, মৈত্রী ও আত্মত্যাগের আদর্শ ও জনসেবা, (১০) সোস্যালিজ্‌ম্‌ বা সম্পত্তি-সাম্য ও সমাজ সংস্কারের নানা আদর্শ, (১১) নানা নতুন দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি আর সাহিত্য-শিল্পের মাধ্যমে তার প্রকাশ।

ভারতীয় সংস্কৃতির এই যে মিশ্র ও জীবন্ত রূপকে সুনীতিকুমার লক্ষ্য করেছেন এই রকম জীবন্ত সাংস্কৃতিক চরিত্র সব দেশেরই থাকা উচিত বলে তিনি মনে করেন এবং তাঁর মতে প্রত্যেক দেশই তার ঐতিহ্য অনুসারে নিজস্ব সাংস্কৃতিক রূপটিকে গড়তে গড়তেই বিশ্বের সমস্ত দেশের সংস্কৃতিবিকাশের সঙ্গে যুক্ত হবে এবং যোগাযোগের মাধ্যমে এক 'মৌলিক বিশ্বসংস্কৃতি' গড়ে তুলবে—'বিভিন্ন দেশের প্রাকৃতিক আবেষ্টনী অনুসারে, বিভিন্ন জাতির ঐতিহ্য ভাষা প্রভৃতির বৈচিত্র্যকে আশ্রয় করে বহুরূপ হয়ে যা বিরাজ করবে, আর পৃথিবীর তাবৎ মানব-জাতি বা মানবসমাজকে তাদের সহজ সাধারণ মানসিকতার প্রতিষ্ঠায় সম্মিলিত ক'রে এক ক'রে তুলবে।'

বলা বাহুল্য, যে এগারোটি সাংস্কৃতিক লক্ষণের কথা বলা হয়েছে, ভারতীয় সংস্কৃতির ইতিহাসে এগুলি সার্বভৌম সত্য ছিল না, ধীরে ধীরে একটি-দুটি সূত্র বা একত্রে কয়েকটি সূত্র স্পষ্ট হয়েছে। শেষ দুটি সূত্রে যে নতুন সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের ইঙ্গিত রয়েছে তা অবশ্যই সাম্প্রতিক কালের ব্যাপার। কেননা যে জাতিগত ও শ্রেণীগত বিভেদের ওপরে আমাদের পূর্বে লিখিত সাংস্কৃতিক সূত্রগুলি দাঁড়িয়েছিল—সমন্বয়, তত্ত্বানুসন্ধান, অহিংসা, ত্যাগ বা অপ্রমাদ ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যগুলি—সেগুলি সোস্যালিজ্‌ম্‌-এর পরিপ্রেক্ষিতে নতুন রূপ অবশ্যই নিয়েছে এবং নেবে। সুনীতি-কুমার যে-বিশ্বসংস্কৃতিকে উপলব্ধিতে এনেছেন আজকের সমাজবিজ্ঞানীরা তারই একটু রকমফেরকে বলেছেন Common culture বা যৌথ সংস্কৃতি—যে সংস্কৃতিতে ব্যক্তি ও গোষ্ঠীগত সংহতির মধ্যে বিশেষ জটিল কিন্তু অপরিহার্য ত্যাগ ও আত্মদমনের পারস্পরিক লেনদেন চলে এবং পরিবর্তিত অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে শুধু ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর কৃচ্ছ্রসাধন নয়—ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর পারস্পরিক প্রয়োজনবোধেই মিলন ঘটে এবং নতুনতর সম্পর্কের চেতনায় আমাদের শিল্পসংস্কৃতি চিহ্নিত হয়। রেমন্ড্‌ উইলিয়াম্‌স্‌ তাঁর 'কালচার অ্যাণ্ড সোসাইটি' (১৯৬১) বইটির শেষ সিদ্ধান্তে বলেছেন: 'in the working class movement, while the clenched fist is a necessary symbol, the clenching ought never to be such that the hand cannot open, and the fingers

extend and give a shape to the newly forming reality.'

'সংস্কৃতি' এই মুঠো খোলার প্রবণতায় সব সময়েই চিহ্নিত। সুনীতিকুমার যে সংস্কৃতির বিস্তারিত লক্ষণ-সূত্রগুলি দিয়েছিলেন তাতে আভ্যন্তরীণ ঘাত-প্রতিঘাতে সংস্কৃতির চিরবহমান রূপের ইঙ্গিত ছিল : 'সংস্কৃতি জীবনের সঙ্গে জড়িত—সেইজন্য এর চরম রূপ কোনো এক সময়ে চিরকালের জন্যে বলে দেওয়া যায় না।' এবং সামাজিক পরিবেশই যে 'সংস্কৃতি'-কে প্রকাশ করে তারও ইঙ্গিত ছিল। কেবল, যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক বাস্তব পরিবেশ ও কারণগুলি সংস্কৃতি-বিকাশের সহায়তা করে সেগুলিকে ততটা স্পষ্ট করে তিনি ব্যাখ্যা করেননি।

আচার্যের কিছু স্মৃতি

নীলরতন সেন

মৃত্যুর বোধ হয় মাস তিনেক আগে হিন্দুস্থান পার্কের বাড়িতে আচার্য সুনীতিকুমারের সঙ্গে শেষবার দেখা হয়েছে। তখন তিনি চোখের ছানিতে কষ্ট পাচ্ছিলেন। তবু দেখা করার অনুমতি মিলেছিল। যখনই প্রয়োজন হয়েছে, সাক্ষাৎকারের অনুমতি চেয়ে পত্র লেখার সঙ্গে সঙ্গে উত্তর পেয়েছি। দেখা করতে গিয়েও কখনো নিরাশ হতে হয়নি। এই তারুণ্যে দীপ্ত, নিরভিমান, আশ্চয স্মৃতিধর, অজস্র অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ, সহৃদয়, পরহিতৈষী, পরম জীবনরসিক, জ্ঞানবৃদ্ধ অসাধারণ মানুষটির সঙ্গে যিনি অন্ততঃ একবারও পরিচিত হবার সুযোগ পেয়েছেন সেই দুর্লভ অভিজ্ঞতা কখনো বিস্মৃত হতে পেরেছেন মনে হয় না। গত কয়েক বছর ধরেই দেশের সর্বস্তরে মানুষের নৈতিক অবক্ষয় দেখে তিনি বেশ মানসিক অশান্তি ভোগ করছিলেন। সেদিনও নানা কথাবার্তার মধ্যে বললেন, 'আর বাঁচতে ইচ্ছে নেই। চারপাশে এত নৈতিক বিপর্যয় দেখছি, এবং নিজেকে অসহায় বোধ করছি যে আর সহ্য করতে পারছি না। আমাদের মতো পুরোনো মূল্যবোধে বিশ্বাসী মানুষদের এখন চলে যাওয়াই ভালো।' মৃত্যু যে এত কাছে এসে গেছে সেদিন তা বুঝতে পারিনি। সুনীতিকুমার নিজেও বুঝেছিলেন কিনা বলতে পারব না।

আচার্য সুনীতিকুমারের সান্নিধ্যে আসবার প্রথম সুযোগ ঘটেছিল ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আধুনিক ভারতীয় ভাষার, এম. এ. ক্লাসের, ছাত্র হিসাবে। তখন যে ক'জন বিশিষ্ট অধ্যাপক আমাদের বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছিলেন ভাষাচার্য সুনীতিকুমার ছিলেন তাঁদের অন্যতম। রবীন্দ্রস্নেহধন্য বিশ্ববিশ্রুত ভাষাতত্ত্ববিদ্ সুনীতিকুমারের কাছে আমরা বাংলা ভাষাবিজ্ঞান পড়বার সুযোগ পাব সেটা তখন ছাত্রছাত্রীমহলে বেশ উত্তেজনাপূর্ণ আকর্ষণের বিষয় ছিল। প্রথম দিন ক্লাসে এসেই জানতে চাইলেন, তাঁর 'ভাষাপ্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ' গ্রন্থটি আমরা পড়েছি কিনা। প্রায় সবাইকেই কবুল করতে হল, স্কুলে তাঁর বইটি পাঠ্য হলেও দুরূহতার অজুহাতে দূরে সরিয়ে রেখে অপেক্ষাকৃত সহজ ব্যাকরণের সাহায্যে আমরা ম্যাট্রিকুলেশনের দেউড়ী পেরিয়ে এসেছি। তারপর আই. এ., বি. এ. পড়বার সময় ব্যাকরণ পড়ার বিশেষ দরকারই পড়েনি। সামান্য যেটুকু ভাষাতত্ত্বের জ্ঞান দরকার হয়েছে আচার্য সুকুমার সেনের 'ভাষার ইতিবৃত্তে'ই কাজ চলে

গেছে। তাঁর বিশ্ববিশ্রুত ODBL গ্রন্থটির নাম জানা ছিল। চেহারা দেখার তখনো সুযোগ হয়নি। লোকমুখে শুনতাম, বিদ্বজ্জনের জন্যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এ বইটির অল্প কিছু কপি মাত্র ছেপেছিলেন এবং প্রকাশের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সে কপিগুলি ফুরিয়ে গেছে। ছাত্র হিসাবে পরে অবশ্য বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে এ বইটি ব্যবহারের আমরা সুযোগ পেয়েছিলাম।

ক্লাস নিতে এসে সুনীতিকুমার ব্যাকরণাতঙ্কগ্রস্ত সুকুমারমতি ছাত্রছাত্রীদের অবস্থা সহজেই বুঝে নিয়েছিলেন এবং ওই বিপুলায়তন (তখন দু খণ্ডে বড আকারের সহস্রাধিক পৃষ্ঠায় প্রকাশিত) মূল গ্রন্থ থেকে প্রাসঙ্গিক পাঠ্য অংশগুলি সহজ করে ক্লাসে বুঝিয়ে দিতেন, সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজনীয় ক্লাসনোটও ইংরেজিতে লিখিয়ে দিতেন। তখন বাংলা এম. এ. ক্লাসের ছাত্রছাত্রীরাও ভাষাতত্ত্বের পত্রটির উত্তর ইংরেজীতে লিখতেন। দ্রুত নোট নেবার কায়দাটিও তিনি আমাদের শিখিয়ে দিতেন। বড বড় এবং বহুল-ব্যবহৃত শব্দগুলির কেবলমাত্র আদ্যক্ষর দিয়ে লিখতে বলতেন। বেশ মনে আছে, আমাদের কয়েকদিন পড়াবার পরই কয়েকটি আন্তর্জাতিক ভাষা ও ভারতবিদ্যা বিষয়ক সম্মেলনে ভারতের প্রতিনিধি হিসেবে যোগ দিতে তাঁকে কিছুদিনের জন্য ইউরোপ চলে যেতে হয়েছিল। ফিরে এসে অবশ্য আমাদের কোর্স পডিয়ে দিয়েছিলেন। ছাত্রছাত্রীদের তিনি নিছক ভাষাতত্ত্বের পাঠ দিয়েই সন্তুষ্ট থাকতেন না, প্রাসঙ্গিক নানা বিষয়েও আলোচনা করতেন। তাঁর জ্ঞান-জগতের বিস্তৃত পরিধির পরিচয় পেয়ে আমরা মুগ্ধ ও বিস্মিত হতাম। শুধু ভাষাতত্ত্বে নয়, প্রাচ্যবিদ্যায়, নৃতত্ত্বে, চিত্রশিল্পে, সমাজ-বিদ্যায়, সাহিত্যে—সর্বত্রই তাঁর জ্ঞানালোকের বিচ্ছুরণ ঘটত। তাছাড়া কবিগুরুর হাতে তখনই তিনি অমরত্ব লাভ করেছেন। 'শেষের কবিতা'র নায়ক অমিত শিলঙ্ পাহাডের নির্জন বাসকালে যে বইগুলিকে সঙ্গী করেছিল তার মধ্যে একটি হল সুনীতি চাটুজ্যের বাংলা ভাষাতত্ত্বের বই। এই তারুণ্যদীপ্ত অসাধারণ প্রতিভাবান অধ্যাপকটি সর্বদিক থেকেই আমাদের মন জয় করে নিয়েছিলেন।

এম. এ. পাসের পর কর্মসূত্রে কয়েক বছর আচার্য সুনীতিকুমারের সঙ্গে যোগাযোগ শিথিল হয়েছিল। সে যোগাযোগ আবার ঘনিষ্ঠ হল, যখন উনি আমার গবেষণা-পত্রের অন্যতম পরীক্ষক হলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মৌখিক পরীক্ষার আহ্বান পেয়ে এসে দেখি আমার দুজন আচার্য সুনীতিকুমার ও প্রিয়রঞ্জন (সেন) পরীক্ষা নিতে এসেছেন। তাঁরা উভয়েই আমাকে কোনও প্রশ্ন না করে পরবর্তী কাজ সম্পর্কে সস্নেহ পরামর্শ দিলেন। সুনীতিকুমার সেদিন ধ্বনিবিজ্ঞানের

এই বিশেষ শাখা ছন্দশাস্ত্রে রবীন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, প্রবোধচন্দ্র ও অমূল্যধনের দান সম্পর্কে অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক আলোচনা করলেন। সেদিনই ওঁর নিরভিমানতার আর একটি পরিচয় পেলাম। বললেন, 'আমি অজ্ঞতাবশত ODBL-এ বাংলাছন্দের কিছু ভুল দৃষ্টান্ত দিয়েছি, ভুল ব্যাখ্যাও করেছি। প্রবোধবাবু আমার সে ভুল সংশোধন করে দিয়েছেন। যদি বইটির নতুন সংস্করণ ছাপা হয় ওই ভুল সংশোধন করতে হবে।' কয়েক বছর পূর্বে (১৯৭১-এ) লণ্ডনের জর্জ অ্যালেন অ্যাণ্ড আন্‌উইন্‌ থেকে বইটি পুনঃপ্রকাশিত হয়েছে। নতুন সংযোজিত তৃতীয় খণ্ডে তিনি উক্ত ভ্রম (প্রয়োজনীয় স্বীকৃতি-সহ) সংশোধন করে দিয়েছেন।

আচার্য সুনীতিকুমারকে কটকে নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনে মূল সভাপতিরূপে পেয়েছি, সিমলায় ভারতীয় সাহিত্য সম্পর্কিত দীর্ঘ পনের দিনের আলোচনা-চক্রে পেয়েছি, দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে দীক্ষান্ত ভাষণ দানের সময় পেয়েছি, দিল্লীর সাহিত্য একাডেমীর একাধিক অনুষ্ঠানে সভাপতি হিসাবে পেয়েছি, তাঁর 'সুধর্মা' বাসভবনে, ন্যাশনাল লাইব্রেরীর অফিসে, গত দুই দশক ধরে নানা উপলক্ষে বহুবার সাক্ষাৎকার ঘটেছে। ইদানীং আমার 'চর্যাগীতিকোষ' ফটোমুদ্রণ-সংস্করণের সম্পাদনার ব্যাপারেও তিনি নানাভাবে বিশেষ সাহায্য করছিলেন। গত বিশ-পঁচিশ বছর ধরে এই মহান মানুষটির সান্নিধ্যে আসবার দুর্লভ সুযোগে তাঁকে যেভাবে বুঝবার ও জানবার অবকাশ পেয়েছি তারই ভিত্তিতে তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবনচিত্র এখানে উপস্থিত করছি।

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে, ২৬শে নভেম্বর তারিখে হাওড়া জেলার শিবপুরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর মুখেই শুনেছি, পূর্বপুরুষ সামবেদীয় (কাশ্যপ গোত্রীয়) ব্রাহ্মণ ছিলেন। কনৌজ থেকে একাদশ-দ্বাদশ শতকে তাঁরা বঙ্গদেশে এসেছিলেন। তাঁর এক পূর্বপুরুষ সুলোচন রাজা বল্লালসেন কর্তৃক সম্মানিত হন এবং বাংলাদেশে (বর্তমান পশ্চিমবঙ্গে) 'ছাটুতি' নামে গ্রাম উপঢৌকন লাভ করেন। সুনীতিবাবুর মতে, 'ছাটুতি' গাঁয়ের ব্রাহ্মণ—এই অর্থে 'চাটুর্য্যা' বা 'চাটুয্যে' নামে তাঁরা পরিচিত হয়েছিলেন। পরে সংস্কৃত করে ওটা 'চট্টোপাধ্যায়' হয়ে ওঠে। ওঁদের পরিবার নাকি বাংলায় তুর্কী অভিযানের সময় পূর্ববঙ্গের ফরিদপুর অঞ্চলে চলে গিয়েছিলেন। সুনীতিকুমারের প্রপিতামহ ভৈরব-চন্দ্র অষ্টাদশ শতকে আবার হুগলীতে এসে বসবাস শুরু করেন। তাঁরই পুত্র, সুনীতিকুমারের ঠাকুর্দা ঈশ্বরচন্দ্র কর্ম উপলক্ষে কলকাতায় বাড়ি তৈরী করে বাস করতে থাকেন। পিতা হরিদাসও কর্মসূত্রে বরাবর কলকাতায় কাটিয়েছেন।

সুতরাং সুনীতিকুমার পুরাপুরি কলকাতার মানুষ। অবশ্য কৌতুকছলে তিনি নিজেকে 'বাটি' ('বাঙ্গাল' ও 'ঘটি'র সংমিশ্রণ) বলে পরিচিত করতেন।

ন বছর বয়সে সুনীতিকুমার কলকাতায় মতিলাল শীল ফ্রী স্কুলে ভর্তি হন। সেখান থেকে স্কটিশ চার্চ কলেজে এবং তারপর প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়াশুনা করেন। ১৯১১-তে তিনি ইংরেজি অনার্স নিয়ে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান নিয়ে বি. এ. পাস করেন। ১৯১৩-তে প্রাচীন ও মধ্যযুগের ইংরেজী সাহিত্য ও ভাষাতত্ত্বে বিশেষ পাঠ গ্রহণ করে এম. এ. পাস করেন। এখানেও তিনি প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেন। ভাষাবিজ্ঞানের প্রতি ছাত্রাবস্থা থেকেই তাঁর বিশেষ আকর্ষণ ছিল। এম. এ. পাসের পর বৈদিক পণ্ডিতের কাছে বৈদিক সংস্কৃতের পাঠ গ্রহণ করেন। ১৯১৬-তে তিনি 'An Essay towards an Historical and Comparative Grammar of the Bengali Language' বিষয়ে গবেষণা-প্রকল্পের জন্য পি. আর. এস. বৃত্তি লাভ করেন। এই কাজের নমুনা স্বরূপ 'The Sounds of Modern Bengali' অংশটি প্রস্তুত করে এই বৃত্তি লাভ করেছিলেন। এ সময়েই তিনি 'Comparative Philology with special reference to the Bengali Dialects' নামক তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব বিষয়ক নিবন্ধ রচনা করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে University Jubilee Research Prize লাভ করেন। প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ গবেষক হিসাবে খৃঃ ১৯১৬-১৮ এই তিন বছরে তিনি 'Bengali Verb and Verb-roots, A Study of the Language of the Old Bengali Carya Poems', এবং 'Notes on Bengali Phonetics' নামে তিনটি সুচিন্তিত প্রবন্ধ রচনা করেন। এগুলি একটি মনোগ্রাফ হিসাবে প্রকাশিত হয়েছিল। এম. এ. পাসের পর সুনীতিকুমার এক দিকে যেমন গবেষণা-কর্মে আত্মনিয়োগ করেছিলেন, অন্য দিকে তেমনি বিদ্যাসাগর কলেজে ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর শিক্ষণ-বিভাগে ইংরেজি ভাষা সাহিত্যের অধ্যাপনা করতে থাকেন। আমরা সুনীতি-কুমারকে অধ্যাপকরূপে পেয়েছি তাঁর তারুণ্যদীপ্ত প্রৌঢ় জীবনে। যাঁরা তাঁর প্রথম জীবনে ছাত্ররূপে পাঠ গ্রহণের সুযোগ পেয়েছেন তাঁদের অনেকেই নিশ্চয়ই এখনো বেঁচে আছেন। স্মৃতিচারণের সাহায্যে যদি তাঁদের কেউ সেই প্রথম পর্বের তরুণ সুনীতিকুমারের চিত্র-আলেখ্য উপহার দিতে পারেন, তাঁর জীবনের এই অপেক্ষাকৃত অস্পষ্ট যুগটির উপর হয়তো নতুন আলোকপাত হতে পারে।

সুনীতিকুমার চব্বিশ বছর বয়সে, ১৯১৪-তে, এম. এ. পাসের পরের বছর কমলা

দেবীকে (১৯০০-১৯৬৪) বিয়ে করেন। কমলা তখন মাত্র চোদ্দ বছরের কিশোরী। তাঁদের প্রথম সন্তান সুমনকুমারের জন্ম হয় আরও চোদ্দ বছর পর, ১৯২৭-এ। তিনি পেশায় একজন রসায়ন-বিজ্ঞানী; একটি আন্তর্জাতিক সংস্থার সঙ্গে শর্করা ও প্রোটিন-বিশেষজ্ঞ হিসাবে যুক্ত রয়েছেন। এর পর একে একে তাঁদের পঞ্চকন্যা রুচি (১৯২৯), রমা (১৯৩১), লীলা (১৯৩২), সতী (১৯৩৪) এবং শুচি (১৯৩৬)-র জন্ম হয়।

১৯১৯-এ ভাষাতত্ত্ব অধ্যয়নের উদ্দেশ্যে ভারত সরকারের বৃত্তি নিয়ে সুনীতি-কুমার লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হন। সেখানে তিনি প্রখ্যাত ভাষাতত্ত্ববিদ ড্যানিয়েল জোন্‌স্-সহ কয়েকজন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ভাষা-বিজ্ঞানীর কাছে ধ্বনিবিজ্ঞান, ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবিজ্ঞান, প্রাকৃত ইন্দো-ভারতীয়, পারশী, প্রাচীন আইরিশ, প্রাচীন ইংরেজি ও গথিক ভাষার পাঠ গ্রহণ করেন। ১৯২১-এ তাঁর সুবিখ্যাত গবেষণা-গ্রন্থ 'Indo-Aryan Linguistics—Origin and Development of the Bengali Language'-এর জন্য লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি. লিট্. উপাধি লাভ করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে তাঁর এই থিসিসের পরীক্ষক ছিলেন—গবেষণা-নির্দেশক ডঃ এল. ডি. বার্নেট, স্যার জর্জ গ্রীয়ারসন এবং অধ্যাপক জুলে ব্লক। তাঁদেরই পরামর্শক্রমে তিনি গ্রন্থটির পরি-মার্জনা করেন এবং কয়েক বছর বাদে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সেটি প্রকাশিত হয়। লণ্ডনে গবেষণা ও পাঠ সমাপ্ত করে ১৯২১-২২—এক বছর তিনি ফ্রান্সে অতিবাহিত করেন। সেখানে Professors Jules Bloch, Jean Przyluskri এবং আরও কয়েকজন বিশিষ্ট ভাষাবিদের সান্নিধ্যে এসে Indo-Aryan, Slav ও Indo-European, Austro-Asiatic, Greek এবং Latin ভাষা-বিজ্ঞানের পাঠ গ্রহণ করেন।

১৯২২-এ দেশে ফিরে মাত্র ৩২ বছর বয়সে এই তরুণ প্রতিশ্রুতিবান ভাষা-বিজ্ঞানী ভারতীয় ভাষাবিজ্ঞান ও ধ্বনিতত্ত্বের 'খয়রা অধ্যাপক' হিসাবে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই খৃঃ ১৯২৬-এ তাঁর পরিমার্জিত ডি. লিট্.-এর গবেষণা-গ্রন্থটি 'The Origin and Development of the Bengali Language' নামে দুই খণ্ডে, xci+১১৭৯ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়।

এর-পর সুনীতিকুমারের জীবনের আর একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল, রবীন্দ্রনাথের অন্যতম ভ্রমণসঙ্গী রূপে ১৯২৭-এ তিন মাসের জন্য মালয়, সুমাত্রা,

জাভা, বালী, শ্যাম প্রভৃতি বৃহত্তর ভারতের অংশস্বরূপ পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ ভ্রমণ। সুনীতিকুমার এই ভ্রমণের বিশদ বিবরণ তখন প্রবাসী পত্রিকায় প্রকাশ করেন। সেই ভ্রমণ-কথা ১৯৪০-এ 'দ্বীপময় ভারত' নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। পরে 'রবীন্দ্র সংগমে দ্বীপময় ভারত ও শ্যামদেশ' নামে (১৯৬৪) পুনঃপ্রকাশিত হয়। এখনো রবীন্দ্রজীবনী-লেখকগণ কবির এই ভ্রমণপর্বের সঠিক তথ্য-উপকরণের জন্য সুনীতিকুমার প্রদত্ত বর্ণনার উপরেই নির্ভর করেন।

ভ্রমণসঙ্গী তরুণ ভাষাবিজ্ঞানী অধ্যাপক সুনীতিকুমার সম্পর্কে কবি সেদিন মন্তব্য করেছিলেন,

'আমি তাঁকে (সুনীতিকুমারকে) নিছক পণ্ডিত বলেই জানতুম। অর্থাৎ আস্ত জিনিষকে টুকরো করে ও টুকরো জিনিসকে জোড়া দেওয়ার কাজেই হাত পাকিয়েছেন ব'লে আমার বিশ্বাস ছিল। কিন্তু এবারে দেখলুম, বিশ্ব বলতে যে ছবির স্রোতকে বোঝায়, যা ভিড় করে ছোটে এবং মুহূর্ত স্থির থাকে না, তাকে তিনি তালভঙ্গ না করে মনের মধ্যে দ্রুত এবং সম্পূর্ণ ধরতে পারেন, আর কাগজে কলমে সেটা দ্রুত ও সম্পূর্ণ করে তুলতে পারেন।'

সুনীতিকুমার সেবারে ওদেশের শিল্প, সংস্কৃতি ও ভাষার সঙ্গে ভারতীয় শিল্প, সংস্কৃতি ও ভাষার সাদৃশ্য আবিষ্কার করেছিলেন, ভারত-সংস্কৃতি সম্পর্কে এবং রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে কয়েকটি মূল্যবান বক্তৃতা করেছিলেন আর ইংরেজি বাংলা প্রবন্ধে ও ভ্রমণ-কাহিনীতে তাঁর অভিজ্ঞতার বর্ণনা বিশদভাবে লিপিবদ্ধ করেছিলেন।

১৯৩৫-এ সুনীতিকুমার লণ্ডনে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক ধ্বনিবিজ্ঞান সম্মেলনে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিত্ব করেন; সেখানে ভারতীয় বিভাগে সভাপতিত্ব করেন। সেবারে তিনি অষ্ট্রিয়া, হাঙ্গেরী, চেকোশ্লোভাকিয়া, জর্মানী ও ফ্রান্সে পরিভ্রমণ করেন। বার্লিনের ওরিয়েণ্টাল ইন্‌স্‌টিট্যুটে বিশেষভাবে আমন্ত্রিত হয়ে ভারত-সংস্কৃতি বিষয়ে বক্তৃতা করেন।

১৯৩৮-এ তিনি আবার কয়েকটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনে প্রতিনিধিত্ব করতে ইউরোপের কয়েকটি দেশে গিয়েছিলেন। তাঁর বক্তৃতার বিষয় ছিল ধ্বনি-বিজ্ঞান, মানবীয় বিদ্যা, প্রাচ্যবিদ্যা এবং ভারত-সংস্কৃতি।

১৯৪০-এ গুজরাট বিদ্যাসভা আয়োজিত বিশেষ বক্তৃতামালায় সুনীতিকুমার Indo-Aryan and Hindi বিষয়ে আটটি লিখিত ভাষণ পাঠ করেন। পরে (১৯৪২) উক্ত নামে সেই ভাষণগুলি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে। ১৯৬০-এ বর্ধিতাকারে Indo-Aryan and Hindi গ্রন্থটি পুনঃ প্রকাশিত হয়েছে। হিন্দী

ভাষা-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বইটির মূল্য অপরিসীম। ১৯২৭-এর পর থেকে সুনীতিকুমার একজন বিশিষ্ট ভাষাবিজ্ঞানী, প্রাচ্যবিদ্যায় সুপণ্ডিত এবং রবীন্দ্র-বিশেষজ্ঞ রূপে বিশ্বের দরবারে প্রতিষ্ঠা ও যশ লাভ করেন। দেশে ও বিদেশে বহু আন্তর্জাতিক সম্মেলনে কখনো সভাপতিরূপে, কখনো বিশিষ্ট সভ্য বা বিশেষজ্ঞরূপে যোগদানের আমন্ত্রণ লাভ করেন। রাশিয়া, চীন, আফ্রিকা, দক্ষিণ-আমেরিকা, আরব-পারস্য, গ্রীস সহ বিশ্বের প্রায় সমস্ত দেশেই বিভিন্ন উপলক্ষে বহুবার তিনি পরিভ্রমণ করেছেন। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলেও নানা উপলক্ষে বারবার তাঁকে ঘুরতে হয়েছে। ১৯৩৮-এ ইউরোপ ভ্রমণের পর তিনি 'ইউরোপ ১৯৩৮' বইটি রচনা করেন। তাঁর 'ভারতের ভাষা ও ভাষা সমস্যা' বিশ্বভারতী-লোকশিক্ষা-গ্রন্থমালার অন্তর্ভুক্ত হয়ে ১৯৪৪-এ প্রকাশিত হয়। ইউরোপ, এশিয়া ও আফ্রিকার সংস্কৃতি বিষয়ে তাঁর বিচিত্র অভিজ্ঞতার সঞ্চয় বলা যেতে পারে দুই খণ্ডে প্রকাশিত 'সাংস্কৃতিকী' (১৯৬১, ১৯৬৫) এবং ইংরেজিতে রচিত Africanism (১৯৬০) গ্রন্থটি। এই সময়ের মধ্যে তাঁর রচিত আরও দুটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হল, Languages and the Linguistic Problems (১৯৪৫) এবং Kirata-jana Kriti (১৯৪৭)।

১৯২২ থেকে ১৯৫২—দীর্ঘ তিরিশ বছর খয়রা অধ্যাপক ও তুলনামূলক ভাষা বিভাগের প্রধান রূপে অধ্যাপনা করবার পর সুনীতিকুমার অবসর নিয়ে বঙ্গীয় লেজিস্‌লেটিভ কাউন্সিলের সভাপতি নির্বাচিত হন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তাঁকে Emeritus Professor of Comparative Philology পদে বরণ করে সম্মানিত করেছিলেন।

১৯৫২ থেকে ১৯৬৫—তের বছর ধরে তিনি বিশেষ যোগ্যতার সঙ্গে এই কাউন্সিল পরিচালনার দায়িত্ব পালন করেন। ইতিমধ্যে তাঁকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ পদে নানারূপ দায়িত্বের কাজ করতে হয়েছে। তার মধ্যে একটি প্রধান কাজ হল, সরকারী ভাষা-কমিশনের সদস্যের দায়িত্ব পালন। আজ যে হিন্দী ভারতের সরকারী রাষ্ট্রভাষা রূপে গণ্য হয়েছে সে ব্যাপারে সুনীতিকুমারের কিছুটা ভূমিকা ছিল। পরে অবশ্য বার বার তিনি হিন্দীপ্রেমীদের আগ্রাসী মনোভাবের নিন্দা করেছেন, তাঁদের সতর্কও করে দিয়েছেন। ১৯৫৮-তে তিনি রাশিয়া ও চীনে, সাম্যবাদী নতুন ভাবধারার সঙ্গে পরিচয় সাধনের উদ্দেশ্যে গিয়েছিলেন; ১৯৫৯-৬০-এ তিনি অস্ট্রেলিয়া, ইন্দোনেশিয়া, শ্যাম, আফ্রিকার নবজাগ্রত দেশসমূহে পরিভ্রমণ করেন। এ সময় সুনীতিকুমার অনেকটা ভারতের সাংস্কৃতিক দূতের

ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। ভারত-সংস্কৃতিকে তিনি বিশ্বের দরবারে মহিমান্বিত করে তুলেছিলেন। ঠিক পাশাপাশি আবার তিনি বিশ্বের বহু দেশের সংস্কৃতিকে ভারতবাসীর কাছেও সুস্পষ্ট করে তুলেছিলেন।

১৯৬৫-তে তিনি National Professor of India for Research in the Humanities পদে বৃত হন এবং কাউন্সিল সভাপতি পদে ইস্তফা দিয়ে পুরোপুরি গবেষণার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ইতিপূর্বে ১৯৬৩-তে রাষ্ট্রপতি তাঁকে 'পদ্মবিভূষণ' উপাধিতে সম্মানিত করেন। সে বছরই (৮ই ডিসেম্বর তারিখে) তাঁর বিগত অর্ধশতাব্দী কালের সুখ-দুঃখের জীবনসঙ্গিনী কমলা দেবীর লোকান্তর ঘটে। ডিসেম্বরেই কটকে তাঁর নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনে মূল সভাপতি হবার কথা। উদ্যোক্তারা ভাবছিলেন, হয়তো তাঁর আসা হবে না। কিন্তু ব্যক্তিগত শোক তাঁর কর্তব্যবোধকে বিচলিত করতে পারে নি। যথাসময়েই তিনি সেখানে উপস্থিত হন, এবং মূল সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। আদর্শে ও কর্তব্যবোধে তিনি রবীন্দ্রনাথেরই যোগ শিষ্য ছিলেন।

এবারেই তিনি কটক থেকে ভুবনেশ্বর এলেন উড়িষ্যার সংস্কৃতি নিয়ে আর্তবল্লভ মহান্তি বক্তৃতা দিতে।[১] এর আগে ১৯৫৪-তে গৌহাটিতে তিনি আসামের ইতিহাস ও সভ্যতা সম্পর্কে বাণীকণ্ঠ কাকতি স্মারক বক্তৃতা দিয়েছিলেন।[২] আবার দক্ষিণী দ্রাবিড় ভাষা সাহিত্য নিয়ে ১৯৬৩-তে আন্নামালাই বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষণ দান করেন।[৩] ১৯৬৫-তে ইম্ফলে (মণিপুর) ভাষা-সংস্কৃতি সম্পর্কে আতমবপু শর্মা স্মারক বক্তৃতা দেন[৪]; ১৯৬৭-তে চণ্ডীগড়ে গুরু গোবিন্দ সম্পর্কে লিখিত ভাষণ পাঠ করেন।[৫] আর ভারত-সংস্কৃতির বৈচিত্র্য ও সমন্বয় নিয়ে বলেন কমলা বক্তৃতা-মালায় ১৯৪৭-এ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে, এবং ১৯৫৯-এ বিশ্বভারতীতে।[৬]

---

১ The People, Language and Culture of Orissa (১৯৬৬)।

২ The Place of Assam in the History and Civilisation of India (১৯৫৫)।

৩ Dravidian (১৯৬৫)।

৪ Religions and Cultural Integration of India : Atambapu Sarma of Manipur (১৯৬৭)।

৫ Guru Gobind Sing (১৯৬৭)।

৬ Indianism and the Indian Synthesis (১৯৬২)।

ভারত-সংস্কৃতির বৈচিত্র্য ও সমন্বয়—এ দুয়ের সূত্র—সমাজ, সংস্কৃতি, সাহিত্য ও ভাষার মাধ্যমে তিনি সন্ধান করছিলেন, উপরোক্ত ভাষণগুলি তারই সাক্ষ্য বহন করে।

সুনীতিকুমার আরও যে সব বিশিষ্ট সম্মান লাভ করেছেন তার কয়েকটি এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। বিদেশে রোম বিশ্ববিদ্যালয় এবং ভারতে দিল্লী, ওসমানিয়া ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সম্মানসূচক ডি. লিট উপাধিতে ভূষিত করেছে। শান্তিনিকেতন তাঁকে 'দেশিকোত্তম' উপাধি দিয়েছে। হিন্দী সাহিত্য সম্মেলন হিন্দী ভাষায় তাঁর গবেষণার স্বীকৃতিস্বরূপ 'সাহিত্য বাচস্পতি' উপাধি দিয়েছে। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ 'বাংলাভাষা-পরিচয়' গ্রন্থটি উৎসর্গ করতে গিয়ে তাঁকে 'ভাষাচার্য' বিশেষণে ভূষিত করেছেন। তিনি একাধিকবার এশিয়াটিক সোসাইটির, সাহিত্য একাডেমীর এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সভাপতিপদে বৃত হয়েছেন। ১৯৬৮-তে International Phonetic Association-এর লণ্ডন সম্মেলনে তাঁকে সভাপতি নির্বাচন করা হয়। সুতরাং দেশবিদেশের বহুবিধ দুর্লভ সম্মান অযাচিতভাবে তাঁর ভাগ্যে জুটেছিল। কিন্তু বিশেষ লক্ষণীয়, এই সকল বিশিষ্ট স্বীকৃতি সত্ত্বেও তাঁর হৃদয়ের ঔদার্য অকৃপণভাবে সর্বস্তরের সকল মানুষের প্রতি সমভাবে বর্ষিত হয়েছে।

পূর্বেই উল্লেখ করেছি, সুনীতিকুমার ঐতিহাসিক ও তুলনামূলক ভাষা-বিজ্ঞানের (Historical and Comparative Linguistics) একজন বিশিষ্ট গবেষক ছিলেন। তাঁর মুখ্য কাজ ইন্দো-আর্য ভাষা হিসাবে বাংলা এবং অন্যান্য পূর্বী নব্য আর্য ভাষার পরিচয় দান। হিন্দীভাষাকেও তিনি এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করেছেন। ইদনীং গত দু-তিন দশক ধরে বর্ণনামূলক ভাষা-বিজ্ঞানের চর্চা ইউরোপে এবং যুক্তরাষ্ট্রে বিশেষ প্রাধান্য পেয়েছে। নতুন করে এ আলোচনার প্রবর্তক হলেন লিওনার্দ ব্লুমফিল্ড। তিনি খৃঃ ১৯১৪-তে প্রকাশিত 'Introduction to the Study of Language'-এ প্রথম এই নতুন আলোচনা-রীতির প্রবর্তন করেন। তবে তখন এ রীতি ভাষাবিদ্‌দের দৃষ্টি আকর্ষণ করে নি। ১৯৩৩-এ 'Language' নামে এ গ্রন্থের নতুন সংস্করণ প্রকাশের পর Descriptive Linguistics বা বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের চর্চা ধীরে ধীরে জনপ্রিয়তা লাভ করল। Bloomfield স্পষ্ট করেই তাঁর গ্রন্থের ভূমিকায় জানিয়ে দেন, খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ-তৃতীয় শতকে পাণিনি যে সংস্কৃত ভাষার ব্যাকরণ রচনা করেছিলেন সেখান থেকে আধুনিক ইউরোপীয় ভাষাবিদ্‌গণ বর্ণনাত্মক ভাষাবিজ্ঞান চর্চার সূত্র গ্রহণ করেন। সুনীতিকুমার যেহেতু

Beams, Hoernle, ভাণ্ডারকর বা Jules Bloch-এর আদর্শে[৭] ঐতিহাসিক ও তুলনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের ভিত্তিতেই বাংলা ও হিন্দী ভাষার পরিচয় দিয়েছেন, সে কারণে একালের কিছু সমালোচক তাঁকে অপ্রগতিশীল, 'রক্ষণশীল' দৃষ্টিভঙ্গির ভাষাতাত্ত্বিক বলে অনেকটা অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখে থাকেন। কেউ কেউ পরোক্ষে তাঁর বিরূপ সমালোচনাও করে থাকেন। কিন্তু তাঁরা খবর নিলে জানতে পারতেন, সুনীতিকুমার পুণায় এবং মাদুরাইয়ে অনুষ্ঠিত সাম্প্রতিক কালের ভাষা-বিষয়ক আলোচনাচক্রে নিয়মিত উপস্থিত থেকেছেন, এবং বর্ণনাত্মক ভাষাবিজ্ঞানের, এমনকি আরও নবীন রীতির Transformental এবং Structural বিশ্লেষণ-ভঙ্গিরও বক্তব্য সযত্নে অনুধাবন করেছেন। নতুনকে গ্রহণের উদারতা তাঁর কত বেশী ছিল তার পরিচয় পেতে হলে লেখকের ১৯৬৯-এ মাদুরাই বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত ভাষণাবলী (Linguistics in India গ্রন্থভুক্ত) পাঠ করতে হবে। তিনি বরাবরই পুণা, দিল্লী, আন্নামালাই প্রভৃতি বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে যে Descriptive Linguistics-এর চর্চা চলেছে তাকে স্বাগত জানিয়েছেন; কিন্তু Historical এবং Comparative Linguistics-এর চর্চার গুরুত্ব যে কিছুমাত্র কম নয় সে কথাও স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। Descripitive এবং Historical দু রীতির ভাষা-বিশ্লেষণের মাধ্যমেই একটি ভাষার পূর্ণাঙ্গ পরিচয় পাওয়া সম্ভবপর। সুনীতিকুমার বাংলাভাষার Historical আলোচনার বনিয়াদ গড়ে দিয়ে গেছেন, নবীন ভাষাবিজ্ঞানীদের অহেতুক বিরূপ সমালোচনার মনোভাব ত্যাগ করে এবারে বাংলাভাষার ক্ষেত্রে descriptive বিশ্লেষণরীতিটির যথার্থ প্রয়োগ করতে হবে। সেই প্রয়োজনীয় গ্রন্থটি এখনো অলিখিত রয়ে গেছে, অধ্যাপক আবদুল হাই কেবলমাত্র বাংলা ধ্বনিবিজ্ঞানের বিশ্লেষণে অগ্রসর হয়েছিলেন। অকাল তিরোধানে তাঁর কাজ অসমাপ্ত রয়ে গেছে।

সুনীতিকুমারের জগৎ-জোড়া খ্যাতি শুধু ভাষাবিজ্ঞানী হিসাবে নয়, তাঁকে একজন Indologist, ভারততত্ত্ববিদ হিসাবেও বিশেষ স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। তিনি মূলত ছিলেন একজন মানবপ্রেমী বা হিউম্যানিস্ট। সে কারণেই বিভিন্ন দেশের মানুষের সাহিত্য, শিল্প, সংস্কৃতি, ভাষা সর্ববিষয়েই তাঁর গভীর আগ্রহ ছিল। তা

৭ Jules Bloch-এর Formation de la Langue Marathe বইটির আদর্শে সুনীতিকুমার তাঁর ODBL এবং Indo-Aryan and Hindi বই দুটি রচনা করেন।

ছাড়া এ যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মনীষী কবি রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কেও তাঁর গভীর পড়াশুনা ছিল। ভারতীয় চিত্রশিল্পের তিনি একজন মরমী সমালোচক ছিলেন,—মানুষের জীবনের প্রায় সমস্ত দিক সম্পর্কেই তাঁর অসীম কৌতুহল লক্ষ্য করা গেছে। তাঁর ইংরেজি, বাংলা ও হিন্দী গ্রন্থ-সংখ্যা (রচিত ও সম্পাদিত) যথাক্রমে ২৫, ২৬ এবং ৭। প্রবন্ধ, পুস্তক-পরিচয় ও গ্রন্থ-ভূমিকা সংখ্যা প্রায় আট শত। সংস্কৃত, উর্দু, গুজরাটি, ইতালীয়, ফরাসী, জার্মান ভাষাতেও তাঁর কিছু কিছু রচনা অনূদিত হয়েছে। এই রচনাবলীর মধ্যে সাহিত্য, চিত্রকলা, সমাজ, শিল্প, ভাষা, ব্যক্তি-মানুষ, ভ্রমণকথা, নৃতত্ত্ব, সংগীত, শিক্ষা,—জীবনের প্রায় সমস্ত দিকেরই বহু বিচিত্র তথ্য-ভিত্তিক আলোচনা রয়েছে। এই প্রাণবন্ত, সহৃদয়, বলিষ্ঠ মনের মানুষটির সঙ্গে একবার যাঁর আলাপের সুযোগ হয়েছে তিনিই অনুভব করেছেন, স্মৃতিশক্তি ও বিশ্লেষণী প্রতিভায় সুনীতিকুমার ছিলেন অনন্যসাধারণ মানুষ। খেতে এবং খাওয়াতে তাঁর জুড়ি মেলা ভার ছিল। হাসিঠাট্টা, গল্পগুজবেও তিনি ছিলেন এক-জন চমৎকার মজলিসী মেজাজের মানুষ। সুনীতিকুমারের মতো ছাত্রবৎসল শিক্ষক এ-যুগে বেশী নেই। যখনই যে কোনও সমস্যা নিয়ে তাঁর কাছে উপস্থিত হয়েছি, সাধ্যমত সর্বতোভাবে তিনি সে-সমস্যার সমাধান করতে চেষ্টা করেছেন। আমাদের কাছে সত্যিসত্যিই তিনি ছিলেন এক জীবন্ত এন্সাইক্লোপিডিয়া বিশেষ। অপরের মতামত শ্রদ্ধার সঙ্গে তিনি শুনতেন, সর্বদা একমত হতে না পারলেও সে-মতের মূল্য দিতে কিছুমাত্র কার্পণ্য করতেন না। ধর্মবিশ্বাসে বোধহয় শেষ পর্যন্ত তিনি ছিলেন অজ্ঞেয়বাদী বা agnostic। পরলোক বা জন্মান্তর নিয়ে প্রশ্ন তুললে বলতেন, যা জানি না তার অস্তিত্ব-অনস্তিত্ব নিয়ে কি বলব ?

এত বয়সে, নানা কর্মব্যস্ততার মধ্যেও সুনীতিকুমার আধুনিক বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে খোঁজ-খবর রাখতেন। একবার মনে আছে আমায় বলেছিলেন, "আবদুল জব্বার নামে একটি যুবক 'বাংলার চালচিত্র' লিখছেন 'দেশ' পত্রিকায়। লেখাগুলি আশ্চর্য রকমের ভালো। পড়ে দেখবেন।"

তাঁর আরও কিছু কিছু উক্তি মনে রাখবার মতো। পত্নীবিয়োগের অব্যবহিত পরেই কটকে নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনে গিয়ে তিনি যে সুচিন্তিত ভাষণটি পাঠ করেন তার মধ্যে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ দশগ্রন্থ নিম্নোক্ত গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের নাম করেন।

(১) সংস্কৃত রামায়ণ ও মহাভারত : বাল্মীকি ও ব্যাস-রচিত।

(২) গ্রীক ইলিয়াড ও ওডিসি : হোমার-রচিত।

—সেই সঙ্গে ইসকিলাস, সোফোক্লিস ও ইউরিপিডিসের নাটকাবলী।

(৩) হিব্রু পুরাণ ও বাইবেল।

(৪) আরব্য রজনী।

(৫) ওয়েল্‌শ্‌, ইংরেজি ও ফরাসীতে লেখা রাজা আর্থারের রম্যন্যাস কাহিনী।

(৬) পারসী শাহ্‌নামা : ফের্দৌসী রচিত।

(৭) শেক্‌স্‌পীয়রের নাটকাবলী।

(৮) জার্মান কবি গ্যেটের রচনাবলী।

(৯) টলস্টয়ের রচনাবলী।

(১০) রবীন্দ্র রচনাসম্ভার (বাংলা ও ইংরেজি)।

আমরা প্রশ্ন তুললাম, কালিদাস, ভার্জিল, দান্তে, ওমর খৈয়াম, রোমা রোলাঁ—এঁদের নাম কি বিবেচ্য নয়? সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর দিলেন, আয়ু অল্প, বাধা অনেক। দীর্ঘজীবীরা এঁদের লেখা সময় থাকলে অবশ্যই পড়বেন। আর যাঁদের আরও সময় কম, বা ইংরেজিটা ভাল জানেন না, তাঁদের প্রতি আমার আর একটি পরামর্শ, ভাল ভাবে যত্ন নিয়ে রবীন্দ্রসাহিত্য পড়ুন,—একজন পূর্ণাঙ্গ মননশীল মানুষ হয়ে ওঠবার সব শিক্ষাই পাবেন। তাঁর এমন বহু উক্তি, anecdotes এখনো কানে বাজছে। শেষ দিকে গত কয়েক বছর তিনি রামায়ণের কাল ও কাহিনী-উৎস নিয়ে পড়াশুনা করছিলেন, একটি গ্রন্থ রচনায় হাতও দিয়েছিলেন। সে কাজ অসমাপ্ত থেকে গেল।

সুনীতিকুমার দীর্ঘ সাতাশি বছরের একটি পূর্ণ জীবন কাটিয়ে গেলেন। প্রথম জীবন থেকেই, তাঁর ODBL গ্রন্থটি প্রকাশের কাল থেকে, ঘরে-বাইরে তিনি সম্মান ও স্বীকৃতি লাভ করেছিলেন। সে স্বীকৃতি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশ্বের দরবারে 'ভারতের সাংস্কৃতিক দূত' রূপেই তিনি গৃহীত হয়েছিলেন। এই সম্মানিত আসনের অমর্যাদা কখনো করেন নি। এবারে সম্পূর্ণ কর্মক্ষম থাকতে থাকতেই পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে চলে গেলেন। বর্তমান নীতিভ্রষ্ট বাংলা তথা ভারতীয় সমাজ তাঁকে কিছুকাল ধরেই পীড়িত করছিল। নিজেকে এই সমাজের পক্ষে বেমানান মনে করছিলেন। বিদায় নেবার জন্যে মনে মনে প্রস্তুতও হয়ে ছিলেন। তবু সেই বিদায়ক্ষণ যখন উপস্থিত হল, অগণিত ভক্তমণ্ডলীর কাছে, দেশের মানুষের কাছে সে-বিদায় ইন্দ্রপতনের মতোই একটি কঠিন বেদনায় বুকে এসে বাজল। খবর পেয়েছিলাম, ছানি অপারেশন ভালই হয়েছে। দু-চার দিন বাদেই বাড়ি ফিরবেন। ইচ্ছা ছিল, তারপর গিয়ে দেখা করব। সে সুযোগ আর ঘটল না। সুধর্মার দোতলা-তেতলা বোঝাই তাঁর গ্রন্থ ও অন্যান্য জিনিসের দুর্মূল্য সংগ্রহশালাটি এবার সত্যিই অনাথ

হল। ব্যক্তি সুনীতিকুমারের উষ্ণ সান্নিধ্য আর পাওয়া যাবে না। এবারে তাঁর নানা স্বাদের বিপুল রচনা-সম্ভারের মধ্যেই তাঁকে পাবার, জানবার ও বোঝবার চেষ্টা করতে হবে। সুনীতিকুমারের ইংরেজি ও বাংলা রচনাবলী সহজে ও সুলভে পাবার পথ যদি তাঁর গুণগ্রাহীরা করে দিতে পারেন সেটাই হবে তাঁর যথোপযুক্ত স্মৃতি-রক্ষণ। তাঁর বহু মূল্যবান ভাষণ বেতার-কর্তৃপক্ষের কাছে tape-এ ধরা থাকবার কথা। তার থেকে কিছু নির্বাচন করে একটি লঙ্-প্লেইং রেকর্ড প্রকাশ করা যদি সম্ভব হয়, গুণগ্রাহী উদ্যোক্তারা সে-কথাও ভেবে দেখতে পারেন। হিন্দুস্থান পার্কের চারতলা 'সুধর্মা' ভবনটিকে তাঁর সুযোগ্য পুত্র-কন্যারা যদি একটি পিতৃস্মারক মিউজিয়ম ও গবেষণা ভবনে রূপান্তরিত করতে পারেন দেশবাসী তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ থাকবেন। সুনীতিকুমারের একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনী লিখতে হবে। সে কাজের অনেক মালমশলা সংগ্রহ করে রেখেছেন তাঁর 'সকল রচনার ভাণ্ডারী' শ্রীঅনিলকুমার কাঞ্জিলাল। 'জিজ্ঞাসা' প্রকাশনের তত্ত্বাবধায়ক শ্রীশ্রীশ কুণ্ডু 'Sunitikumar Chatterji: The Scholar and the Man' পুস্তিকাটি প্রকাশ করে তাঁর জীবনী রচনার কাজ কিছুটা সহজ করে রেখেছেন। এবারে যোগ্য ব্যক্তিকে সে কাজে অগ্রসর হতে অনুরোধ জানিয়ে বক্তব্য শেষ করা যেতে পারে।

সুনীতিকুমার

শ্রীপান্থ

সুনীতিকুমারের সঙ্গে আমার মুখোমুখি পরিচয় ফোনে। উপলক্ষ ছিল আমার পক্ষে নিতান্ত ব্যক্তিগত। পারিবারিক বিপর্যয়ের মুহূর্ত। সুতরাং ফোনটা ছিল সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত। তারের অন্য প্রান্তে কিংবদন্তীর পুরুষ সুনীতিকুমারের কণ্ঠস্বর শুনে অতএব চমকে উঠেছিলাম। তারপর অনেকক্ষণ ধরে অনর্গল নানা কথা। মুগ্ধ বিস্মিত আমি শ্রোতার ভূমিকায়। যেন ওঁর বিখ্যাত আড্ডার এক কোণে বসে আছি।

সব কথা এখানে অবান্তর। দুটি বাক্য এখনও কানে বাজছে। কথা প্রসঙ্গে এক সময় বললেন—বিশ্বাসে আমি অজ্ঞেয়বাদী। ঈশ্বর আছেন কি নেই জানি না। তা নিয়ে মাথাও ঘামাই না। কথাটা সামান্য। এদেশে নিশ্চয় বিস্তর নাস্তিকও আছেন। কিন্তু আশি পেরিয়ে একজন বাঙালী পণ্ডিত যখন স্পষ্ট গলায় কোনও স্থির বিশ্বাসের কথা বলেন অবাক না হয়ে পারি না। বিশেষত, চারদিকে যখন ভূতপূর্ব বিশ্বাসীদেরই সংখ্যা বেশী। কেউ বলেন—আমিও, মশাই, একসময় ভূতে ভগবানে বিশ্বাসী ছিলাম। কেউ বলেন—আমরাও একসময় মার্কসবাদী ছিলাম। কারও কথা—জ্যোতিষ শাস্ত্রে আমারও, ভাই, বিশ্বাস ছিল না। ইত্যাদি।

আমাদের বিশ্বাস সমূহ বড়ই নড়বড়ে। যে কোনও কারণেই হোক, আমাদের ধারণ-ক্ষমতা অতিশয় কম। আমার মনে হয়, এ ব্যাপারে উজ্জ্বল ব্যতিক্রম সুনীতি-কুমার। সুনীতিকুমারও হয়তো নানা বিষয়ে মত বদল করেছেন। কিন্তু জীবনের মৌল বিশ্বাসগুলো ছিল তাঁর অবিচল, অটল। দু-চার বার কথা বলার পর অন্তত আমার তাই ধারণা। রামায়ণ-বিতর্কের পর একদিন দেখা করতে গিয়েছিলাম ওঁর সঙ্গে। সেদিন যেভাবে তিনি নানা পৌরাণিক দেবদেবীর চরিত্র আলোচনা কর-ছিলেন অন্ধ বিশ্বাসীরা তা শুনলে নিশ্চয় কানে আঙুল দিতেন কিংবা মূর্ছা যেতেন। সেদিনও আমি সমান বিস্মিত। কেননা, আমার সামনে বসে একজন বাঙালী বিদ্বান। বয়স তাঁর নব্বুইয়ের কাছাকাছি। দৃষ্টিশক্তি কমে এসেছে। আশ্চর্য, এখনও তিনি অবলীলায় বেছে চলেছেন দানা আর ভুষি। অথচ, আমাদের বিদ্যা-বুদ্ধির অঙ্গনে চারদিকে কত না 'ভুষি-কেলেঙ্কারি'!

স্যর

সুভদ্রকুমার সেন

আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় আমার বাবার মাস্টারমশাই এবং সেই সুবাদে আমাদের বাড়ির প্রত্যেকের 'স্যর'। স্যরের সম্পর্কে লিখতে আমার সংকোচ হয়। তাই এই সংকলনের সম্পাদক মশাই যখন স্যরের সম্পর্কে আমাকে লিখতে অনুরোধ করলেন তখন আমি মৌখিক সম্মতি দিয়েছিলুম মাত্র। তারপর অনেকদিন কেটে গেছে। সম্পাদক মশাই যখন যেখানে দেখা হয়েছে তাগাদা দিয়েছেন আর আমিও 'হচ্ছে, হবে' বলে কালহরণ করেছি। কিন্তু শেষকালে সম্পাদক মশাই এমন একটি কথা বললেন—যার অর্থ হল এই যে যেহেতু সম্পাদক মশাই কোনো বৃহৎ পত্রিকা-গোষ্ঠীভুক্ত নন সেহেতু আমি তাঁকে হয়রানি করাচ্ছি। এর পর তাঁকে আর ফেরানো গেল না। যদিচ জানি যে এ ব্যাপারে আমাকে তিনি সম্পূর্ণরূপে ভুল বুঝেছেন। কিন্তু স্যরের সম্পর্কে লিখতে আমার সংকোচের কারণটা প্রথমে পরিষ্কার করে বলা দরকার।

স্যরের সঙ্গে আমাদের সুদীর্ঘ ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ। এই যোগাযোগ যে কতদিনের তা হয়ত অনেকেই জানেন না। বাদলদার (শ্রীসুমনকুমার চট্টোপাধ্যায়ের) জন্মের আগে থেকে আমার বাবার সঙ্গে স্যরের পরিচয়। এম. এ. পাস করার পর আমার বাবা যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে রিসার্চ ছাত্র তখন তিনি রোজ সকালে স্যরের সুকিয়াস রো-র বাড়িতে যেতেন। তারপর স্যর যখন হিন্দুস্থান পার্কে 'সুধর্মা'য় উঠে গেলেন তখন দুজনের দেখা হত বিশ্ববিদ্যালয়ে। আমাদের যখন টেলিফোন এল তখন দিনের মধ্যে অন্ততঃ একবার ফোনে কথাবার্তা না বললে গুরু শিষ্যের কারুরই বোধহয় পেটের ভাত হজম হত না। এই সুদীর্ঘ ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের জন্যে স্যরকে আমাদের এত নিজের, এত কাছের মানুষ বলে মনে হয় যে তাঁর সম্পর্কে গুছিয়ে রীতিমত আড়ম্বর করে কিছু লিখতে গেলে সব গুলিয়ে যায়। তিনিও আমাদের সঙ্গে এত সহজ আচরণ করেছেন যে তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্য, গম্ভীর ব্যক্তিত্ব তাঁর ও আমাদের মধ্যে কোনো ভয়ের পর্দা টানে নি। আমরা তাঁকে শ্রদ্ধা করি, ভালবাসি ; তিনিও আমাদের স্নেহ করেছেন। তিনি আমাদের গুরুজন, এই বোধটা যে-কোনো ভাবেই হোক অত্যন্ত অল্প বয়সে আমাদের মনে ঢুকে যায় বা ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। দেখেছি, পারিবারিক কোনো সমস্যা বা সামাজিক ক্রিয়াকর্মের সূত্র-

পাতে বাবা সব সময়েই স্তুরের মতামত নিচ্ছেন। সুতরাং স্তুর যে আমাদেরই এক-জন নন এই বোধটা আমাদের কখনো হয় নি। আর নিজের লোকের সম্পর্কে লেখা শক্ত এবং অনুচিত। সেই কারণে যখন কোনো একটি বাংলা দৈনিকপত্রের তরফ থেকে 'আমার বাবা' শীর্ষক ফিচারের জন্যে লেখার অনুরোধ আসে তখন আমি আমার অক্ষমতার কথা জানাই। একটি মাসিক-পত্রিকার তরফ থেকে অনু-রূপ অনুরোধ এলে আমি আবার আমার অক্ষমতার কথা জানাই।

প্রশ্ন করা যেতে পারে যে, বেশ তো, এত কাছ থেকে দীর্ঘদিন যখন দেখার সৌভাগ্য হয়েছে তখন সে বিষয়ে লিখতেই বা আপত্তি কি? এই প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব বসুর একটি কথা আমার মনে পড়ে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারভাঙ্গা হলের সামনের চাতালে দাঁড়িয়ে বুদ্ধদেববাবু তাঁর শান্ত নম্র গলার ধীর বাচন-ভঙ্গীতে বলেছিলেন—"জানো সুভদ্র, কোনো মানুষই আর একজন মানুষকে কি সম্পূর্ণরূপে জানতে পারে? অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ রক্তের বন্ধনে বা সামাজিক বন্ধনে আবদ্ধ দুটি মানুষও কি পরস্পরকে কখনো চিনতে বা জানতে পারে?" এই কথাটি আমি মনে প্রাণে বিশ্বাস করি। স্তুরকে কি আমি সম্পূর্ণ চিনতে বা জানতে পেরেছি? 'হ্যাঁ' বলার মত স্পর্ধা আমার নেই। আবার প্রশ্ন করা যেতে পারে, বেশ তো, যেটুকু বোঝা গেছে সেটুকুর ওপরই তো লেখা যেতে পারে। আমার উত্তর, সে তো ব্যক্তিগত কথা, ব্যক্তিগত স্মৃতি। ব্যক্তিগত স্মৃতি একান্তভাবেই ব্যক্তিগত থাকা বাঞ্ছনীয়। ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখ হাসিকান্নার অনুভূতি অন্দরমহলের জিনিস। জীবনের বন্ধুর বিসর্পিল পথে চলতে গেলে মানুষের সবচেয়ে বড় সান্ত্বনা, সবচেয়ে বড় সঞ্চয়, সবচেয়ে বড় আশ্রয় এই সব সুরভিত রমণীয় সুখস্মৃতি। এই সব স্মৃতি আমাদের চলার পথকে আলোকিত করে, উত্তাপে ক্লিষ্ট করে না। অথচ এই সব সুখস্মৃতি বেশির ভাগই গড়ে ওঠে আপাতঃ দৃষ্টিতে অত্যন্ত সাধারণ ঘটনা বা সামান্য কথাকে কেন্দ্র করে। তাই শঙ্কা হয় যে এই সব সামান্য ঘটনাকে স্মৃতির মণিকোঠা থেকে বের করে জন-সমক্ষে বার করে আনলে তাদের হয়ত বেআব্রু করা হবে। তাই যতদূর সম্ভব ব্যক্তি-গত প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে স্তুরের সম্বন্ধে আমার এই সামান্য লেখার প্রয়াস করব।

॥ ২ ॥

স্তুর বিশ্ববিশ্রুত পণ্ডিত। কিন্তু অনেকেই জানে না যে কি পরিমাণ modesty তাঁর ছিল। জ্ঞানের পরিধি সুবিশাল ছিল বলেই তিনি জানতেন যে শেখার জানার শেষ নেই। এ প্রসঙ্গে দু-একটা কথা বলি। স্তুরের এক বিশেষ স্নেহভাজন

যুবক একটি বিষয়ের ওপর তাঁর অধীনে গবেষণা করতে চাইলে তিনি তাকে বলেছিলেন যে ঐ ব্যাপারে তোমার চেয়ে আমি সামান্যই বেশি জানি—(যদিও এই সামান্যই বেশি জানাটা আক্ষরিক অর্থে আদৌ সত্যি নয়)—সুতরাং তোমাকে guide করবার মত competence আমার নেই। যুবকটি অবশ্য শেষ পর্যন্ত স্যরের অধীনে অন্য বিষয়ে গবেষণা করেছিল। ছাত্রের বা ছাত্রের ছাত্রের কাছে এমন কথা বলবার মত সাহস ও ঔদার্য খুব কম লোকেরই আছে। আর এক বিষয়েও স্যরের অদ্ভুত ঔদার্য ছিল। সেটা হল ঋণ স্বীকার। যার কাছে যতটুকু ব্যবহারের উপযুক্ত তথ্য পেয়েছেন তা সব সময়েই স্বীকার করতেন। কারুর কাছে হয়ত একটি শব্দের হদিস পেয়েছেন, যখনই সে ব্যাপারে কোথাও লিখেছেন তখনই তার নাম উল্লেখ করতেন। আরো একটা কথা বলার দরকার। কতিপয় বর্ণনাত্মক ভাষা-বিজ্ঞানের বাঙালী গবেষক মনে করতেন যে স্যর তাঁদের বিরুদ্ধবাদী। বিশুদ্ধ জ্ঞান-চর্চার ক্ষেত্রে স্যরের কোনো পক্ষপাত ছিল না। যে গবেষক বা অধ্যাপক ভাল কাজ করতেন তাঁর কথাই তিনি শতমুখে বলতেন। মার্কিন পদ্ধতি অনুপ্রাণিত বর্ণনাত্মক ভাষা-বিজ্ঞানের চর্চায় ভারতবর্ষে যে কজন ভাল কাজ করেছেন তাঁদের মধ্যে শ্রীঅশোক কেলকার, অধ্যাপক ভাদরাজ কৃষ্ণমূর্তি ও অধ্যাপক ভি. আই. সুব্রমণিয়ম-এর কথা তিনি পঞ্চমুখে বলতেন। তিনি সব সময়ই কাজ করতে উৎসাহিত করতেন। কেউ কাজ করলে বা করছে জানলে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে সাহায্য করতেন, উৎসাহ দিতেন। তাঁর নিজের ছাত্রেরা কাজ করছে না বলে আক্ষেপ করতেন। তিনি তাঁর ছাত্রদের সব সময়ে মাক্ষিকীবৃত্তি পরিহার করে হংসবৃত্তি অবলম্বন করতে উপদেশ দিতেন।

লেখাপড়াকে তিনি কি পরিমাণে ভালবাসতেন তার একটা উদাহরণ দিই। জার্মানীর বিখ্যাত প্রকাশন-সংস্থা Carl Winter একটি নতুনভাবে তুলনামূলক ইন্দো-য়ুরোপীয় ব্যাকরণ প্রকাশের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। এই বইয়ের প্রধান সম্পাদক নিযুক্ত হন বিশ্ববিখ্যাত পণ্ডিত Jerezy Kurylowicz। এই ব্যাকরণের ক্রিয়াপদ খণ্ডটি লেখার দায়িত্ব পান আমেরিকার Harvard বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঘা ভালকো (স্যরের অতি প্রিয় বিশেষণ) পণ্ডিত Calvert Watkins। বইটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে আমি আনাই। বইটি আমার হাতে এলে বইটির কথা আমি স্যরকে বলি। স্যর বইটি দেখতে চাইলে একটা বড় ছুটিতে বইটি স্যরকে দিই। বইটি পড়ে ফেরত দেবার সময় তিনি যে কথাগুলি বলেছিলেন তা আজও আমার কানে বাজে : "বইটা পড়তে পড়তে আনন্দে আমার চোখে জল এসে গেছে।

দেখো, কত নতুন কথা শেখবার আছে! আরো যদি দশ বছর আগে বইটা পেতুম তো বড় ভাল হত!"

বইয়ের প্রসঙ্গে আরো দুটো মজার ঘটনার কথা বলি। জার্মানী থেকে প্রকাশিত কোনো বই কিনতে হলে আমি জার্মানীর একটি দোকান থেকে আনাই। হিত্তি (Hittite) ভাষার ওপর Heinz Kronasser-এর Vergleichende Laut und Formenlehre des Hethitischen বইটির কথা স্যরকে আমি বলি। স্যর শুনে খুব আগ্রহ প্রকাশ করে বললেন, "বাহ, এই রকম একটা বই খুঁজছিলুম।" Sturtevant-এর A Comparative Grammar of Hittite বইটি স্যরের ছিল। Kronasser ইন্দো-হিত্তি (Indo-Hittite) মতাবলম্বী তো ননই, অধিকন্তু Laryugeal theory-ও স্বীকার করেন না। তবে তাঁর পুস্তকে জার্মান পাণ্ডিত্যের ছাপ স্পষ্টভাষিত। যাই হোক. স্যর আমাকে প্রশ্ন করলেন, আমি বইটি কি ভাবে আনালুম? আমি বললুম। স্যর সব শুনে বললেন, "বেশ, আমিও তা হলে ঐ ভাবে বইটা আনাব।" এই ঘটনার মাস খানেক পরে একদিন ন্যাশনাল লাইব্রেরীতে স্যরের কাছে গেছি, স্যর বললেন, "ওহে, জার্মানীর দোকান থেকে আমাকে একটা Invoice পাঠিয়ে লিখেছে যে আগে দাম দিলে তবে ওরা বই পাঠাবে। তোমাকে কি ওরা আগাম দাম পাঠাতে বলে?" আমি বললুম, "না। আমাকে আগাম দাম পাঠাতে হয় না।" স্যর বিশেষ উদ্বিগ্ন হয়ে বললেন, "তবে আমাকে কেন ও রকম লিখলে?" এ কথার কি উত্তর দেব? তবে স্যরের এই শিশু-সুলভ উদ্বেগ মনে মনে ভারি উপভোগ করেছিলুম। শেষ পর্যন্ত স্যর বইটা আনিয়েছিলেন কি না জানি না। এই প্রসঙ্গে ঐ জার্মান বইয়ের দোকানটির সম্বন্ধে একটি ঘটনার উল্লেখ না করে পারছি না। এই বছরের গোড়ার দিকে ঐ দোকানকে Norbert Oettinger-এর Stammbilduyg des Hethitischen Verbum বইটি পাঠাতে বলি। মাস তিনেক পরে জার্মানী থেকে একটা প্যাকেট এল। খুলে দেখি Oettinger-এর অন্য একটি বই ভুল করে পাঠিয়েছে। আমি তৎক্ষণাৎ বইটি রেজিস্ট্রি করে ফেরত পাঠালুম। আর আলাদা একটা চিঠি পাঠালুম। তাতে লিখেছিলুম যে Oettinger-এর যে বই চেয়েছিলুম তার বদলে তোমরা অন্য বই পাঠিয়েছ। এটা কি করে সম্ভব হল? এই চিঠি পাবার সাত দিনের মধ্যে ঐ দোকানের কর্তৃপক্ষ নিজ ব্যয়ে ঐ বইটি বিমান-ডাকযোগে আমাকে পাঠিয়ে দেন। এই ঘটনার কথা আনন্দ পাবলিশার্সের শ্রীবাদল বসুকে বললে তিনি বলেন যে ও দেশেই এ রকম ব্যাপার সম্ভব।

স্যর যে কেবলমাত্র লেখাপড়াই ভালবাসতেন তাই নয়; বইয়ের ওপর তাঁর যত্নও ছিল অসাধারণ। প্রত্যেকটি বইকে ভাল করে ব্রাউন পেপারের মলাট দিতেন। যাঁদের স্যরের লাইব্রেরী ঘুরে দেখবার সৌভাগ্য হয়েছে তাঁরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন যে ভারী মোটা বইকে তিনি মাঝে মাঝে উলটে রাখতেন। এর কারণ হল এই যে ক্রমাগত একদিকে চাপ না পড়ে এবং বইয়ের বাঁধাই যেন নষ্ট না হয়। এই মলাট দেবার প্রসঙ্গে একটা ঘটনার কথা বলি। একদিন সন্ধ্যেবেলায় সুধর্মার দোতলার মাঝের ঘরে বসে আছি। স্যর Nora Chadwick-এর মধ্য-য়ুরোপের লোকগাথার ওপর কেম্বিজ বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত একটা বই আমাকে দেখতে দিলেন। বইটা দেখে ফেরত দিতে যাচ্ছি স্যর আমাকে প্রচ্ছদটা খুলে দেখতে বললেন। ব্রাউন পেপারের মলাটটা খুলে মূল প্রচ্ছদটা দেখতে আমি ইতঃস্তত করছিলুম, কেননা বইয়ের মলাট তত পরিপাটি করে আমি দিতে পারি না। কিন্তু স্যরের কথায় খুলে দেখলুম। বেশ সুন্দর ডিজাইন। কিন্তু গোল বাধল তার পরই। আমি যতই চেষ্টা করি না কেন, মলাট আর কিছুতেই খাপে খাপে বসে না। তখন স্যর বললেন, "দাও, আমাকে দাও।" তারপর তিনি অসাধারণ ক্ষিপ্রতায় সুচারু ভাবে মলাট দিয়ে দিলেন। সেদিন বড়ই লজ্জিত হয়েছিলুম।

স্যরের যে modesty-র কথা গোড়ায় বলেছি তার আরো একটি দৃষ্টান্ত দিই। ঘটনাটি স্যরের ছাত্র আমার শিক্ষাগুরু বর্তমানে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজির অধ্যাপক দেবদাস সেনের কাছে শোনা। দেবদাসবাবু তখন সবেমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে লেকচারার রূপে নিযুক্ত হয়েছেন। একদিন তিনি ক্লাস শেষ করে প্রফেসারস্ রুমে বসে আছেন এমন সময় স্যর এলেন। দেবদাসবাবুকে দেখে এগিয়ে এসে স্যর বললেন, "দেবদাসবাবু, আমাকে একটা Old English-এর ক্লাস দিতে পারেন? My knowledge of Old English is getting rusty." দেবদাসবাবু তৎক্ষণাৎ নিজের ক্লাসটি স্যরকে দিয়ে দিলেন। সাধারণ ভাবে একজন অধ্যাপক (প্রোফেসার) সপ্তাহে চার থেকে ছটি ক্লাস নেন। সেখানে নিজে যেচে ক্লাস নেওয়া! এ কথা বোধ করি সবাই জানেন যে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব ছাড়াও ইংরেজি, বাংলা, সংস্কৃত, পালি, হিন্দি প্রভৃতি বিভাগে স্যর ক্লাস নিতেন। নিজের ছাত্রের কাছে এই ভাবে বলতে পারা মনের কতটা প্রসার, বিশুদ্ধ জ্ঞানচর্চার প্রতি কি প্রগাঢ় অনুরাগ থাকলে সম্ভব, তা সহজেই অনুমেয়।

॥ ৩ ॥

অনেকেই হয়ত জানেন না যে স্যরের রসিকতা-বোধ ছিল অসাধারণ আর তাঁর গল্পের ভাণ্ডার ছিল অফুরন্ত। তাঁর রসিকতা প্রধানতঃ verbal humour। এমন কিছু কিছু মজার Expression তিনি ব্যবহার করতেন যা সহজেই মুজতবা আলী ব্যবহার করতে পারতেন। কিছু নমুনা দিই। আমাদের অতি-পরিচিত 'উড়ে এসে জুড়ে বসল' তাঁর ব্যবহারে হয়েছিল 'came উড়ে and sat জুড়ে'। ঘড়ির 'কাঁটায় কাঁটায়' হয়েছিল 'thorn to thorn'। 'বেড়ে' (< বড়িয়া) হয়েছিল 'ব্রে'। 'মুর্গী'কে ঠাট্টা করে বলতেন 'সীতাপতি বিহঙ্গম' (= রামপাখি)। কখনো-সখনো 'পুত্রহীনার নন্দন' (= আঁটকুড়ির পুত) কথাটি ব্যবহার করতেন। স্যরের রসিকতার আর একটি উদাহরণ দিই। এটি আমার শিক্ষক স্কটিশ চার্চ কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যাপক ও স্বনামধন্য নাট্যকার, স্যরের ছাত্র শ্রীসুশীলকুমার মুখোপাধ্যায়ের কাছে শোনা। স্যর সুশীলবাবুকে বলেছিলেন যে শিক্ষকতা করতে হলে পঞ্চবকার গুণ থাকা চাই (পাঠক, তুলনা পঞ্চমকার দোষ)। এই পঞ্চ বকার কি কি ? এক নম্বর হল 'বপু', মানে শারীরিক আয়তনে ছাত্রদের ভয় পাইয়ে দিতে হবে। দু নম্বর হল 'বচন', অর্থাৎ অনর্গল কথা বলতে পারার ক্ষমতা। তিন নম্বর হল 'বিনয়' (সেটা আসল বা মেকি যাই হোক না কেন), অর্থাৎ মুখে একটা অর্থহীন হাসি টেনে সমুদ্রের তীরে নুড়ি কুড়িয়ে পেয়েছি গোছ একটা নিউটনী ভাব। চার নম্বর হল 'বুদ্ধি'। হঠাৎ কিছু আটকে গেলে বা কোথাও ঠেকে গেলে কায়দা করে অজ্ঞতাকে ঢেকে রাখতে পারা। (পাঠক, শিশিরকুমার ভাদুড়ী মহাশয়ের সম্পর্কে প্রচলিত 'Do I look like a dictionary ?' গল্পটি স্মরণ করুন।) এবং পাঁচ নম্বর বা সব শেষ হল "কিঞ্চিৎ বিদ্যা"।

স্যরের কাছে শোনা একটি গল্প শোনাই। এক বুড়ির দুই ছেলে। সেবার শীতের শুরুতেই প্রচণ্ড ঠাণ্ডা পড়েছে। বুড়ি ছেলেদের ডেকে বললে, "বাবা, শীতে বড্ড কষ্ট হচ্ছে। একটা গরম চাদর কিনে দে বাবা।" ছেলেরা বললে, "মা, তিন তিরিশে নব্বুইটে দিন (অর্থাৎ অগ্রহায়ণ, পৌষ আর মাঘ—শীতের তিনটি মাস) কোনো রকমে কাটিয়ে দাও। বুড়ি আর কি করে ! তার যা কাপড়চোপড় ছিল তাই দিয়ে শীতের সঙ্গে যুঝতে লাগল। কিন্তু মাঘের শীত আর বুড়ি সহ্য করতে পারলে না। বুড়ির যখন অন্তিম কাল উপস্থিত, তখন দুই ছেলে একটা গরম চাদর দিয়ে বুড়িকে ঢেকে তার বন্ধ হয়ে আসা মুখ ফাঁক করে গরম দুধ ফোঁটা ফোঁটা ঢালতে

ঢালতে বলতে লাগল, "মা, বল পাচ্ছ ? মা, বল পাচ্ছ ?" গল্পটি বলার সময় স্তর চোখে মুখে এমন ভাব ফুটিয়ে তুলতেন সে যিনি দেখেন নি তিনি কল্পনা করতে পারবেন না।

॥ ৪ ॥

স্তরের সম্বন্ধে লিখে শেষ করা যায় না। তবুও এক জায়গায় থামতেই হয়। তাই দেবদাসবাবু কৃত শেক্সপীয়রের একটি পরিবর্তিত উক্তি উদ্ধার করে শেষ করছি। [অনেক কথা বলতে চাই নি, আবার অনেক কথা বলতে চেয়েছি—বলি নি, তারা আমার না-বলা বাণী হয়েই থাক্।]

"We shall not look upon his like again."

স্মৃতিতে সমর্পিত হয়ে

তুষার চট্টোপাধ্যায়

প্রথাগতরূপে শতবর্ষে সমর্পিত হবার পূর্বেই যে আমরা আচার্য সুনীতিকুমারকে স্মরণ করতে পারছি তা এক দুর্লভ সৌভাগ্য। শতবর্ষ পালনের প্রথার আবর্তে ভবিষ্যতে কি ঘটবে জানি না, কিন্তু এই মুহূর্তে সুনীতিকুমারের ন্যায় একটি নামের তীর্থ স্মরণে স্থাপিত হবার অবকাশ নিঃসন্দেহে মহান সম্ভাবনায় উৎসর্গিত। মনে পড়ে, তাঁর নিকট সংস্পর্শে আমার দুর্লভ সৌভাগ্য হয়েছিল একটি বিতর্কের সূত্রে। বিতর্কের মূল বিষয় ছিল—দক্ষিণ রায়। দীর্ঘ কয়েক বছর ক্ষেত্রানুসন্ধানে লব্ধ তথ্যের ভিত্তিতে এবং আধুনিক লোকসংস্কৃতি-বিজ্ঞানের তত্ত্বের আলোকে তখন মনে হচ্ছিলো দক্ষিণ রায় বাঘের দেবতা নয়, মৌল তাৎপর্যে দক্ষিণ রায় কৃষিসংশ্লিষ্ট উর্বরতা জাদু বিশ্বাস-মূলক কর্তিত নৃমুণ্ডের পূজা। নূতন প্রতিপাদ্য যাচাই করার প্রেরণায় তখন নীহাররঞ্জন রায়, নির্মলকুমার বসু, প্রবোধচন্দ্র সেন, শশীভূষণ দাশগুপ্ত, আশুতোষ ভট্টাচার্য, বিনয় ঘোষ, সুকুমার সেন, অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবীপদ ভট্টাচার্য, সুরজিৎ সিংহ, রমেশচন্দ্র মজুমদার, চিন্তাহরণ চক্রবর্তী প্রভৃতি অনেকের কাছেই গিয়েছিলাম। প্রায় সকলেই বিতর্কিত আলোচনার মাধ্যমে আমার বক্তব্যের নূতনত্বকে অভিনন্দিত করেছিলেন, অনেকে লিখিত ভাবেও মন্তব্য প্রকাশ করেছিলেন। বলা বাহুল্য, তাঁদের মধ্যে আচার্য সুনীতিকুমার অন্যতম প্রধান।

মনে পড়ে, প্রথমবার গিয়ে তাঁকে পাইনি। ন্যাশনাল লাইব্রেরীর নিজস্ব কক্ষে তিনি কয়েকজন বিদেশী গবেষকের সঙ্গে আলোচনায় ব্যস্ত ছিলেন। অনিলদা (আমাদের পূর্ব-পরিচিত শ্রদ্ধেয় অনিল কাঞ্জিলাল) কথা বলে আমার সাক্ষাতের জন্য আরেকটি দিন স্থির করে জানিয়ে দিলেন। তারিখটি সঠিক মনে নেই। পূর্ব-নির্দিষ্ট দিনে সঠিক সময়ে হাজির হলাম। অনিলদা ভিতরে নিয়ে গিয়ে পরিচয় করিয়ে দিলেন। নীচু হয়ে তাঁর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতে অগ্রসর হতেই তিনি হাত বাড়িয়ে আমার পায়ে হাত দিতে গেলেন। আমি সভয়ে ও সসঙ্কোচে সরে যেতেই তিনি হেসে বললেন—আমি পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করা পছন্দ করি না, যিনি আমার পায়ে হাত দেন, আমিও তাঁর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করি ; আমরা সকলেই সমান। সময় নষ্ট না করে বসুন, কাজের কথা বলুন। দূর থেকে অনেকবার

দেখেছি। প্রথমবার নিকট-সান্নিধ্যে এসে কেমন যেন লাগল। নিজের ভাবনার সঙ্গে ঠিক যেন মিল হলো না। মনে হলো বড় কঠিন, বড় নির্মম। অবশ্য বলা বাহুল্য, পরবর্তী কালে আরও ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে এসে বুঝেছি—আমার প্রাথমিক ধারণা একান্তই ভ্রান্ত। শুধু পাণ্ডিত্যে বা প্রতিভায় নয়, হৃদয়ধর্মেও তিনি ছিলেন মহান। আচার্য সুনীতিকুমারের মহান ব্যক্তিত্বের এক দিকে ছিলো ক্ল্যাসিকধর্মী সুদৃঢ় বন্ধন এবং অপর দিকে ছিলো মুক্ত প্রাণের অসামান্য সহৃদয়তা।

আচার্য সুনীতিকুমারের সহৃদয়তার বিভিন্ন দিক নিয়ে বলার অধিকারী আমি নই। লোকসংস্কৃতির একজন নগণ্য ছাত্র হিসাবে কতিপয় জিজ্ঞাসা নিয়ে অত্যন্ত সসঙ্কোচে আমি তাঁর কাছে বার বার গেছি। এই যাওয়া-আসা ও আলাপ-আলোচনার মধ্য দিয়ে আমি বার বার উপলব্ধি করেছি—তরুণ গবেষকের নূতন বিষয়গত অন্বেষায় বা মৌলিক গবেষণার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন অনুপ্রেরণার উৎস। অনেক ক্ষেত্রে তাঁর পূর্বতন স্বকীয় সিদ্ধান্তের বিরোধিতাকেও তিনি নবতর তথ্য বা যুক্তির আলোকে পুনর্বিচার করতে দ্বিধা বোধ করতেন না। এ বিষয়ে দক্ষিণ রায় প্রসঙ্গে আলোচনায় তাঁর কাছে যে শিক্ষা লাভ করেছি, তা তাঁর প্রগতিশীল মনশীলতারই স্বাক্ষর বহন করে। দীর্ঘকালব্যাপী ব্যাপক ক্ষেত্রানুসন্ধানলব্ধ তথ্য ও আধুনিক নৃতত্ত্ব ও লোকসংস্কৃতির বিজ্ঞানসম্মত তত্ত্বগত বিচার-বিশ্লেষণে যখন আমার মনে হয়েছে যে 'দক্ষিণ রায় ব্যাঘ্র দেবতা' সম্পর্কিত প্রচলিত মতামত সমূহ উপযুক্ত যুক্তি ও তথ্যনির্ভর নয়, তখন আমি একে একে প্রায় প্রত্যেক প্রধান গবেষকদের সঙ্গে আলোচনায় নিমগ্ন হয়েছি। বলা বাহুল্য, কতিপয় ব্যক্তি ছাড়া পূর্বাচার্যগণের প্রায় সকলেই কম বেশী আমার যুক্তির সারবত্তা মেনে নিয়েছিলেন। আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক 'লোকপিতা' ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য এবং প্রখ্যাত নৃতত্ত্ববিদ অধ্যাপক নির্মল-কুমার বসুর নির্দেশে আমি সারাভারত বিজ্ঞান-কংগ্রেসের নৃতত্ত্ব-বিভাগে লোক-সংস্কৃতি-বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে দক্ষিণ রায় বিষয়ক একটি প্রবন্ধ পেশ করি (৫৬তম বিজ্ঞান-কংগ্রেস, ৩-৯ জানুয়ারী ১৯৬৯, বোম্বাই)।

এই সম্মেলনে বিষয়টি খুবই বিতর্কের সূত্রপাত করে, তবে উপস্থিত সকলেই আমার যুক্তি ও তথ্যের অকাট্যতাকে স্বীকার করে নেন। তদানীন্তন ভারত সরকারের সেন্সাস-অধিকর্তা অশোক মিত্র, আই. সি. এস. মহাশয়ের আগ্রহে দক্ষিণ রায় বিষয়ক বিজ্ঞান-কংগ্রেসের প্রবন্ধটি জেলা হ্যাণ্ডবুকে প্রকাশিত হয় (Daksin Roy—A popular Folk-God : District Census Hand Book—1961, 24 Parganas, Govt. of India, vol. II, Appendix 3,

Pages 25-26)। দক্ষিণ রায় সম্পর্কিত আলোচনার সূত্র ধরে সুনীতিকুমার আমাকে ইংরেজীতে একটি প্রবন্ধ লিখে তাঁকে দেখাতে বলেন। আমি সাগ্রহে তাঁকে একটি লেখা দিই। তিনি লেখাটি পড়ে স্থানে স্থানে সংশোধন করেন এবং আমার লিখিত প্রবন্ধের শিরোনাম পরিবর্তন করে দেন "The Cult of Dakshin Ray"। এ প্রবন্ধটির উপরে নিজে হাতে লেখেন—"Recommended & forwarded for acceptance by the Asiatic Society, for reading at a monthly meeting and publication in the Journal", 25. 7. 1969। আমি তাঁর হস্তাক্ষর যুক্ত ঐ প্রবন্ধটি আর পেশ করি নি, অমূল্য সম্পদ হিসাবে আমার সংগ্রহে রেখে দিয়েছি। এই রকম অপর একটি ঘটনা ঘটেছিল সাহিত্য আকাদেমীর ব্যাপারে। প্রফুল্ল দত্ত গোস্বামী সম্পাদিত "বার মাসে তের গীত" অসমীয়া লোকসাহিত্য গ্রন্থটি দেখিয়ে এরকম একটি বাংলা গ্রন্থের পরিকল্পনা করে দিতে এবং সাহিত্য আকাদেমীর আঞ্চলিক সম্পাদক মহাশয়কে উদ্দেশ্য করে একটি পত্র লিখে আনতে বলেন। আমি তাঁর নির্দেশ মত সব করলাম। তিনি উপরে নিজ হাতে লিখে দিলেন, "Prof. Tushar Chattopadhyay's letter along with the scheme submitted by him may be placed before the Bengali Advisory Committee. The committee may call him and finalise the thing with him" 8. 6. 1970। সাহিত্য আকাদেমীর হাতে ঐ প্রস্তাবের কি পরিণতি ঘটেছে বা ঘটবে জানি না, কিন্তু একজন নবীন গবেষকের কার্যে উৎসাহ প্রদানকারী আচার্য সুনীতিকুমারের স্বাক্ষর সম্বলিত ঐতিহাসিক দলিল হিসাবে তার প্রতিলিপি আজও আমার কাছে সংরক্ষিত আছে।

রবীন্দ্রনাথ ও লোক-সংস্কৃতি বিষয়ক গবেষণার সূত্রে আমি সুনীতিকুমারের কাছে লিখিত রূপে দশটি প্রশ্ন পেশ করি (৫. ৬. ১৯৭০)। অনিলদাকে দিয়ে একদিন ন্যাশনাল লাইব্রেরীর পাঠাগার-কক্ষ থেকে আমাকে ডেকে আনিয়ে তিনি ঐ সম্বন্ধে আমাকে মুখে মুখে অনেক কথা বলেছিলেন। আমার প্রশ্নের তালিকা ও তাঁর উত্তরের "নোট" আমার কাছে এখনো রক্ষিত আছে। বলা বাহুল্য, তাঁর উত্তর ও নির্দেশ আমার পরবর্তী রবীন্দ্র গবেষণার কাজে খুবই সহায়ক হয়েছিলো। মনে পড়ে, কাজ তিনি এ বিষয়ে আমাকে বিশেষ ভাবে প্রভাত মুখোপাধ্যায়, নীহাররঞ্জন রায়, গোঁসাইজী ও প্রবোধচন্দ্র সেন মহাশয়ের সঙ্গে আলোচনা করতে বলেন। কর্তাভজা ধর্ম ও সাহিত্য, বাউল লালন ফকির, মতুয়া ধর্ম ও সাহিত্য, চর্যাপদ-

সহজিয়া প্রভৃতি নানা বিষয়ে বিভিন্ন সময় তাঁর কাছে নানা জিজ্ঞাসা নিয়ে উপস্থিত হতাম। তিনি সর্বদা সহাস্যে আমার সঙ্গে আলোচনা করতেন এবং প্রায় প্রতি ক্ষেত্রে নূতন নূতন জিজ্ঞাসার সৃষ্টি করতেন।

শুধু গবেষণা নয়, ব্যক্তিগত-পারিবারিক বিষয় সম্পর্কেও তিনি ছিলেন অত্যন্ত স্নেহপ্রবণ ও সহানুভূতিশীল। আমার স্ত্রী রত্নার মৃত্যুর পর (৩০. ৭. ১৯৭৪) তিনি অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়েছিলেন বলে অনিলদার মুখে শুনেছি। অনিলদার কাছেই শুনেছি, তিনি বেশ কয়েকদিন আমাদের বাড়ির কাছে হাজরা রোডে গাড়ি থামিয়েও, চোখের জল মুছে শেষ পর্যন্ত ফিরে গেছেন। অনিলদাকে নাকি বলতেন —আমি তুষারের সামনে দাঁড়াতে পারবো না। কিন্তু আশ্চর্য, ঠিক এক মাস পরে (৩০. ৮. ১৯৭৪) তিনি আমাকে এক দীর্ঘ পত্র লেখেন—

"...এ শোকের সান্ত্বনা নাই। সংসারী মানুষের পক্ষে এত বড় বিপদ তো আর কিছুই হইতে পারে না। আমার হৃদয়ের সম্পূর্ণ সমবেদনা, সহানুভূতি, আপনার নিকট জানাইতেছি—আমিও আপনার মত হতভাগ্য, তবে আমার গৃহিণী পঞ্চাশ বৎসরে আমার ঘর-সংসার গুছাইয়া দিয়া তবে গিয়াছেন। আপনার পূর্ণ যৌবনে বিনা মেঘে বজ্রপাত হইয়া গেল—ইহার পিছনে কি আছে, মানুষের তাহা জানিবার তো উপায় নাই। আপনার দুইটি মাতৃহীন পুত্র কন্যাকে এখন অবলম্বন করিয়া চলিতে হইবে...আপনি মনে শান্তি পান, যাহা ভবিতব্য তাহা মানিয়া লইবার শক্তি পান, সামনের কঠোর জীবনকে ব্রত রূপেই গ্রহণ করিয়া চলিবার শক্তি লাভ করুন। ইহা ব্যতীত আর কি সহানুভূতির কথা বলিতে পারি? আপনার পরলোকগতা সাধ্বী পত্নীর উদ্দেশ্যে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করি, আপনার সন্তানদের আশীর্বাদ করি যেন তাহারা মায়ের অভাব আপনাকে পাইয়াই কথঞ্চিৎ পূরণ করিয়া লইতে পারে। একটু সামলাইয়া উঠুন, পরে আপনার সঙ্গে দেখা করিব।..."

কিছুদিন পরে আমিই তাঁর সঙ্গে দেখা করেছিলাম। জাতীয় গ্রন্থাগারে জাতীয় অধ্যাপকের মুখোমুখি বসে বেদ, উপনিষদ, পুরাণ, বিভিন্ন দেশের শাস্ত্র-পুরাণ, বিভিন্ন মনীষীর জীবন ইত্যাদি বিষয়ে সেদিন এত কথা শুনলাম যে আমি বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেলাম। অনিল কাঞ্জিলাল মহাশয় সামনে ছিলেন, তিনিই এক সময় বাড়ি ফেরার কথা বললেন। আসন্ন সন্ধ্যার ম্লান আলোয় জাতীয় গ্রন্থাগারের উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে দুই হাতে আমার দুই কাঁধ ধরে প্রবল ঝাঁকুনি দিয়ে বললেন —দমে গেলে চলবে না, থেমে গেলে চলবে না; আপনি সামান্য নন, আপনার

কাছে আমাদের অনেক প্রত্যাশা। তারপর দুই হাতে আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরে শিশুর মত ঝর ঝর করে কান্নায় ভেঙে পড়লেন। সম্ভবত অনিলদা গাড়ির দরজা খুলে দাঁড়ালেন। আমাকে আমাদের পৈত্রিক বাড়ি কালীঘাটে (১।বি, রানী শংকরী লেন) পৌঁছে দিয়ে গাড়ি চলে গেলো। আমার কাছে সেদিন অসামান্য শিক্ষাবিদ সুনীতিকুমার সংবেদনশীলতার মূর্ত প্রতীক হিসাবে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলেন। সেদিনই সম্ভবত উপলব্ধি করলাম পূর্ণাঙ্গ মানুষ ও মহান মনীষী কাকে বলে।

একবার মনে পড়ে, নানা প্রকার অহেতুক নিন্দা ও মিথ্যা কুৎসার আক্রমণে খুবই বিমর্ষ হয়ে পড়েছিলাম। লোকসংস্কৃতি অনুশীলনের ক্ষেত্রে আমার যে দীনতম সক্রিয়তা অনেকে তা মসীলিপ্ত করতে তৎপর হয়েছিলেন, শিক্ষাগত বিতর্কের মাধ্যমে নয়, একান্ত ব্যক্তিগত মিথ্যাচার ও নিন্দা-কুৎসার আধারে। এই রকম সময়ে একদিন সুনীতিকুমারের সস্নেহ সতর্ক দৃষ্টিতে আমার বিমর্ষতা ধরা পড়ে গেল। তিনি সব শুনে বললেন—পরনিন্দা অক্ষমের অস্ত্র যা সক্ষমের সাফল্যের পরোক্ষ স্বীকৃতি। আপনার মৌলিক যোগ্যতা অযোগ্যদের ঈর্ষার কারণ হচ্ছে—বলে তিনি হেসে উঠলেন। বললেন—অনেকে যখন নিন্দে করছে বা কুৎসা রটাচ্ছে তখন বুঝতে হবে আপনার কিছু হচ্ছে, আপনি এগুচ্ছেন। প্রকৃতপক্ষে আমার কি হচ্ছে তা বুঝতে না পারলেও এ সত্য উপলব্ধি করেছি যে সুনীতিকুমার তরুণ গবেষকের উৎসাহকে নির্বাপিত করে দিতে চাইতেন না, তিনি অনায়াসে প্রাণের উদ্দীপনাকে সংক্রামিত করে দিতেন অন্যের মধ্যে।

একদা বিশ্বভারতী পত্রিকায় প্রকাশিত লোকসংস্কৃতির তত্ত্ব সম্পর্কিত আমার একটি প্রবন্ধ পড়ে (লোকসংস্কৃতি ও তত্ত্বজিজ্ঞাসা, বিশ্বভারতী পত্রিকা, মাঘ-চৈত্র ১৩৭৬, পৃঃ ৩২৩-৩৩৫) তিনি আমাকে এই বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা মূলক গ্রন্থ রচনা করতে উৎসাহিত করেন। অবশ্য ইংরেজী "ফোকলোর" শব্দের প্রতিশব্দ হিসাবে আমার প্রস্তাবিত "লোককৃতি" শব্দ সম্পর্কে তাঁর আপত্তি প্রকাশ করে "লোকযান" শব্দের পক্ষে তাঁর যুক্তি প্রদর্শন করেন। আমি সাধ্যমত আমার যুক্তি তাঁর কাছে পেশ করি। শেষ পর্যন্ত তাঁর রচিত "Kirata-Jana-Kriti" গ্রন্থের দৃষ্টান্তে বিদগ্ধ সংস্কৃতির বিপরীত কোটিতে অবস্থিত সংস্কৃতিকে "লোককৃতি" অভিধায় সুচিহ্নিত করার যৌক্তিকতা নিবেদন করি। তখন তিনি সহাস্যে বলেছিলেন—আমারই অস্ত্রে আমাকে নিধন করলেন। মোটের উপর "লোককৃতি" শব্দের সার্থকতার কথা মেনে নিয়েও তিনি প্রকাশ্যে "লোকযানে"র দাবী প্রত্যাহার করেন নি। অবশ্য আমি ব্যবহারিক ও প্রচলনগত সিদ্ধির কথা স্মরণে রেখে সাধারণভাবে "লোকসংস্কৃতি"

শব্দটি ব্যবহারের প্রস্তাব করেছিলাম। পরবর্তী কয়েকটি লেখায় সুনীতিকুমারকে 'লোকসংস্কৃতি' শব্দটিও সাধারণভাবে ব্যবহার করতে আমরা দেখেছি। মনে হয় এ ব্যাপারে তিনি খুবই উদার ও নমনীয় মনোভাব শেষ পর্যন্ত পোষণ করতেন। এই সম্পর্কে শ্রদ্ধেয় অনিলকুমার কাঞ্জিলাল মহাশয়ের স্মৃতিকথা ও মন্তব্য প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায়—

"আমার স্মরণে আছে যে, বিভিন্ন সময়ে গবেষণা সংক্রান্ত নানা আলোচনার জন্য শ্রীমান্ তুষার চট্টোপাধ্যায় অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কাছে যাতায়াত করতেন। এই রকম আলোচনায় আমিও অধিকাংশ সময়ে উপস্থিত থাকতাম। একবার, মনে পড়ে, ইংরেজি 'ফোকলোর' শব্দটির বাংলা প্রতিশব্দ বিষয়ে বিশেষ আলোচনা হয়। শ্রীমান্ তুষার সুনীতিকুমারের 'কিরাত জনকৃতি' গ্রন্থের 'কৃতি' শব্দের দৃষ্টান্তে 'লোককৃতি' শব্দটির ব্যবহারের প্রস্তাব করেন। এ বিষয়ে কিছু আলোচনার পরে অধ্যাপক মহাশয় পরিহাসছলে শ্রীমান্ তুষারকে বলেন—'তুমি দেখছি আমার অস্ত্রে আমাকেই ঘায়েল করছো, তা বেশ; তবে তোমাকে এ বিষয়ে সর্বভারতীয় স্তরে আলোচনা তুলতে হবে।'

বিভিন্ন সময়ে অধ্যাপক সুনীতিকুমার শ্রীমান্ তুষারকে আউল-বাউল-কর্তাভজা-দক্ষিণ রায়-ভাদু-টুসু-সহজিয়া-চর্যাপদ-মতুয়া-ভীম প্রভৃতি বিষয়ে মৌলিক গবেষণার ব্যাপারে উৎসাহ-পরামর্শ-উপদেশ-নির্দেশ দিতেন আর তাঁর গবেষণার কাজকর্মের মৌলিকতায় আনন্দ প্রকাশ করতেন।

এই প্রসঙ্গে আমি বাংলা ১৩৬৭ সালে শারদীয় 'স্বাধীনতা' পত্রিকায় প্রকাশিত অধ্যাপক সুনীতিকুমারের "কৃষ্ণ আফ্রিকার কৃতি" প্রবন্ধে ব্যবহৃত "কৃতি" শব্দটিও শ্রীমান্ তুষারের নজরে এনেছি। আশা করি, এ থেকে 'ফোকলোর'-এর প্রতিশব্দ হিসাবে 'লোককৃতি' শব্দটির যৌক্তিকতা অধিকতর প্রতিষ্ঠিত হবে। ফোকলোরের প্রতিশব্দ হিসাবে 'লোককৃতি' শব্দ ব্যবহারে অধ্যাপক সুনীতিকুমারের অনুমোদন ছিল বলেই ধরে নেওয়া যেতে পারে।

অনিলকুমার কাঞ্জিলাল

১৮ জানুয়ারী, ১৯৮৩

ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের নিকট সান্নিধ্যে এসে বার বার মনে হয়েছে, তিনি ছিলেন অত্যন্ত ছাত্রবৎসল। তিনি প্রায়শই আমার লোকসংস্কৃতি বিষয়ক আলোচনার সূত্রে বিশেষ ভাবে শ্রীগোপাল হালদার ও ডঃ সুকুমার সেনের কথা

বলতেন। ছাত্রাবস্থা থেকে মার্ক্সবাদী আন্দোলনের সঙ্গে সম্পর্কিত থাকায় গোপাল হালদার ছিলেন আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় সংস্কৃতি-ভাবনার পথপ্রদর্শক; তাঁর "সংস্কৃতির রূপান্তর" ও "বাঙালী সংস্কৃতি প্রসঙ্গ" ছিল আমাদের মনন-ভাবনার অন্যতম প্রধান পাথেয়। পরবর্তী কালে বিনয় ঘোষের "পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি"-ও ছিল সমগোত্রীয় গ্রন্থ। আর আচার্য সুকুমার সেন ছিলেন আমাদের শ্রদ্ধেয় শিক্ষক। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. এ. ক্লাসে তাঁর কাছে আমরা ভাষাতত্ত্ব পড়েছি। শিক্ষক হিসাবে পরম শ্রদ্ধেয় হলেও সবিনয়ে বলা যায় লোকসাহিত্য-লোকসংস্কৃতি সম্পর্কিত তাঁর মতামত আমাদের কাছে সব সময় সমর্থন বা গ্রহণযোগ্য মনে হত না। দক্ষিণ রায়, কর্তাভজা, মতুয়া, বাউল প্রভৃতি বিষয় নিয়ে অনেক সময় তাঁর সমীপে যেয়ে ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসতে হয়েছে। অবশ্য আমার অনুরোধে তিনি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের লোকসংস্কৃতি বিষয়ক আলোচনা-চক্রে লোকভাষা বিষয়ে একটি মূল্যবান প্রবন্ধ পেশ করেছিলেন (লোকসাহিত্যের ভাষা—শ্রীসুকুমার সেন। পশ্চিমবঙ্গের লোকসংস্কৃতি, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৭১, পৃ: ৭২—৭৭)। এ কথা আমি কৃতজ্ঞচিত্তে চিরকাল স্মরণ করবো। দক্ষিণ রায়, বাউল, কর্তাভজা, প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনায় ডঃ সেনের সঙ্গে কোনো সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে উপনীত হতে না পারার নৈরাজ্য থেকে মুক্তি দেবার জন্য একদিন আচার্য সুনীতিকুমার আমার সমস্ত তথ্যাদি সহ তাঁর জাতীয় গ্রন্থাগারের ঘরে আমায় আহ্বান জানান। দিনটি ছিল ৩১শে আগস্ট ১৯৭৩ খৃষ্টাব্দ। আমি যথাসময়ে গিয়ে দেখি, সুনীতিকুমারের ঘরে আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক সুকুমার সেন উপবিষ্ট আছেন। আমি উপস্থিত হতেই অনিলদা আমাকে ঘরে নিয়ে গেলেন। তারপর সম্ভবত ২৷৩ ঘণ্টা ব্যাপী দক্ষিণ রায়, বাউল, লালন, কর্তাভজা, মতুয়া, লোকসংস্কৃতি প্রভৃতি নানা বিষয়ে আলোচনা হলো। প্রধানতঃ সুনীতিকুমারের উদ্যোগে বিভিন্ন বিষয়ে আমি যথাসাধ্য যুক্তি-তথ্য-প্রমাণাদি সহযোগে আমার মৌলিক মতামত ব্যক্ত করলাম এবং আচার্য সুনীতিকুমার ও সুকুমার সেন সহ অনেকের প্রচলিত মতামত সাধ্যমত খণ্ডনে সচেষ্ট হলাম। আলোচনা শেষে সুনীতিকুমার মহান উদারতার সঙ্গে আমার প্রয়াসের মৌলিকত্বকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করলেন এবং সুকুমার সেনও আমাকে অভিনন্দন জানালেন। আমি তখন তাঁদের উভয়ের নিকটেই নিবেদন করলাম যে আমাদের আজকের আলোচনা বা আপনাদের মূল্যবান মতামতের কোন তথ্যই তো থাকলো না, ভবিষ্যতে আপনাদের অবর্তমানে কেউই এর সত্যতা হয়ত স্বীকার করবে না। আমার কথা শুনে সুনীতিকুমার সহাস্যে কাগজ কলম তুলে নিলেন এবং নিজ হাতে

কিছু লিখলেন। লেখা শেষ হলে সমস্ত অংশটি সুকুমার সেনকে পড়ে দেখতে বললেন। তারপর উভয়ে নিজ নিজ স্বাক্ষর করে কাগজটি আমার হাতে দিয়ে দিলেন। ঐ কাগজের লেখাটি ছিল নিম্নরূপ—

কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ডক্টর শ্রীযুক্ত তুষাররঞ্জন চট্টোপাধ্যায় বহুদিন ধরিয়া বাংলা দেশের—সমগ্র বঙ্গভূমির—লোকসংস্কৃতি, লৌকিক ধর্ম, লোকসাহিত্য লইয়া যে গবেষণা করিয়া আসিতেছেন, তাহাতে সাম্প্রতিক কালের বাংলা লোকসংস্কৃতি সম্বন্ধে অতি মূল্যবান অজ্ঞাতপূর্ব নূতন তথ্য আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছেন। সুন্দরবন অঞ্চলে "বাঘের দেবতা" বলিয়া পরিচিত দক্ষিণ রায় সম্বন্ধে তিনি যে নূতন সংবাদ আমাদের দিয়াছেন তাহাতে এই লৌকিক দেবতার যথার্থ প্রকৃতি সম্বন্ধে আমাদের কাছে নূতন আলোকপাত হইয়াছে। তাঁহার পূর্বে এইভাবে এই জটিল প্রশ্নের সমাধানে আর কেহই হাত দেন নাই। সম্প্রতি তিনি কর্তাভজা, লালন ফকির এবং মতুয়া—এই সমস্ত লৌকিক ধর্ম-সম্প্রদায় ও ধর্মগুরুদের সম্বন্ধে, গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া এবং সম্প্রদায় সমূহের গুরুদের সঙ্গে মিলিয়া যে সমস্ত নূতন তথ্য বাহির করিয়াছেন, সেগুলি প্রকাশিত হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়। আমরা শ্রীযুক্ত তুষাররঞ্জনের হাতে লেখা গানের খাতা, বই, জীবনচরিত, ছাপা বই এবং মূল্যবান নথিপত্রের ফোটো দেখিয়া বিস্মিত ও আনন্দিত হইয়াছি। কর্তাভজা, আউল-সম্প্রদায়, মতুয়া-সম্প্রদায় প্রভৃতির আধ্যাত্মিক গানের যে সংগ্রহ, মুখের গানে ও হাতে লেখা এবং ছাপা খাতা ও বই হইতে উপস্থাপিত করিবার কাজে হাত দিয়াছেন—প্রকাশিত হইলে তাহা হইতে বাংলা সাহিত্যের একটি বিশেষ মূল্যবান দিক খুলিয়া যাইবে। ইঁহার আরব্ধ এই কাজের দ্বারা বঙ্গ-সরস্বতী গৌরবান্বিত হইবেন। বাঙ্গালী ও তাহার সাহিত্যের একটি অজ্ঞাতপূর্ব মনোহর নূতন দিক সম্বন্ধে পরিচয় লাভ করিয়া নূতন সাহিত্যিক রসানন্দের অধিকারী হইবে—বাংলা সাহিত্যের পরিধিরও নূতন প্রসার ঘটিবে। আমরা শ্রীযুক্ত তুষাররঞ্জনের অন্বেষণ-কার্যের সার্থকতা সম্বন্ধে পূর্ণভাবে সচেতন হইয়া, গৃহীত কার্যে তাঁহার পূর্ণ সাফল্য কামনা করি॥

ইতি—শুক্রবার ১৪ই ভাদ্র, ১৩৮০ বঙ্গাব্দ,
৩১শে আগস্ট ১৯৭৩ খৃষ্টাব্দ।
স্বাক্ষর :—শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।
শ্রীসুকুমার সেন।

সুনীতিকুমার সর্বদাই তথ্যনিষ্ঠ, নিরাসক্ত, যুক্তিগ্রাহ্য গবেষকের দৃষ্টি দিয়ে সত্যের

উদ্ঘাটন করার কথা বলতেন। বিতর্ক বা সমালোচনার সৃষ্টি করার জন্যই স্বকীয় মৌলিক সিদ্ধান্ত নির্দ্বিধায় প্রকাশ করতে উৎসাহ দিতেন। বিরুদ্ধ পক্ষের প্রতিকূলতা অধিকাংশ ক্ষেত্রে রচনার প্রাণশক্তি ও বক্তব্যের সারবত্তারই স্বাক্ষর বহন করে চলে তিনি মনে করতেন। অবশ্য বিরুদ্ধ পক্ষের যুক্তির আলোকে নিজস্ব বক্তব্যকে যাচাই ও অধিকতর শানিত করে নিতে বলতেন। আচার্য সুনীতিকুমার তরুণ গবেষকের প্রতি, তা সে আমাদের ন্যায় যত নগণ্যই হোক না কেন, কত সহানুভূতিশীল ছিলেন তারই কিছু ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার স্মৃতিচারণ করতে প্রয়াসী হয়েছি। শোকে তাঁর কাছে যেমন পেয়েছি সান্ত্বনা, তেমনই লোকসংস্কৃতি অনুশীলনে পেয়েছি সঠিক পথনির্দেশ। সৌখিন লোকসংস্কৃতি চর্চায় যথেচ্ছাচারের অবসান ঘটানো, এবং তত্ত্বগত সুদৃঢ় ভিত্তিভূমিতে বিজ্ঞাননিষ্ঠ স্বতন্ত্র শিক্ষাগত শৃঙ্খলায় লোকসংস্কৃতি চর্চার পথ প্রশস্ত করার ক্ষেত্রে অনেকের ন্যায় তিনিও ছিলেন আমার অন্যতম প্রধান উৎসাহদাতা। প্রতিবাদী বক্তব্য পেশ করেও তাঁর কাছে লাভ করেছি পরিতৃপ্তির প্রতিভাষণ এবং নূতন জিজ্ঞাসার পথে অগ্রসর হবার উপযোগী প্রত্যয়নিষ্ঠ প্রশ্রয়। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার স্মৃতিতে স্থাপিত হয়ে আমার বার বার মনে হয়—আচার্য সুনীতিকুমার শুধুমাত্র উনিশ-শতকী কর্তব্যনিষ্ঠা, পরিশীলিত চিন্তাধারা, সুদৃঢ় মননশীলতা ও উদার মানবিক গুণাবলীর অধিকারী ছিলেন না; সেই সঙ্গে ছিলেন তরুণ গবেষকদের অনুপ্রেরণার নিরন্তর উৎস।

যা হারিয়ে যায়

নবনীতা দেবসেন

কিছু কাল আগে আমরা হারিয়েছি আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়কে। বাৎসরিক তর্পণকার্য সমাগত। আমার এই নিবন্ধ কিছু স্মৃতি কুড়িয়ে এনে শ্রদ্ধার্ঘ জানানো মাত্র, তাঁর মতো বিশ্বজ্জনের মূল্যায়নের স্পর্ধা করি না, দীপশিখা ধরে সূর্য প্রদর্শনের মতো। এ লেখা নেহাৎই ব্যক্তিগত স্বগতোক্তি, স্মৃতিতর্পণ। এক যুগের পক্ষ থেকে আরেক যুগকে প্রণতি জানানো। সুনীতিবাবু, হরেকৃষ্ণবাবু—এঁদের সঙ্গে সঙ্গে একটি যুগ দ্রুত অন্তর্হিত হচ্ছে, আর ক্রমাগত দরিদ্র করে দিয়ে যাচ্ছে আমাদের।

সুনীতিবাবু ছিলেন আমার পিতা স্বর্গত নরেন্দ্র দেবের চেয়ে দু-বছরের ছোট। ছেলেবেলায় উত্তর-কলকাতাতে তাঁরা একই মাঠে ফুটবল খেলতেন, একজন ছিলেন সুকিয়া স্ট্রীটের বাসিন্দা, অন্যজন ঠনঠনে কালীতলায়। বড় বেলাতেও তাঁরা গৃহ নির্মাণ করলেন একই পাড়ায়, এক রাস্তায়। 'সুধর্মা' থেকে 'ভালো-বাসা' এক মিনিটের হাঁটাপথ। যার ফলে কাকাবাবুর ছোট মেয়ে ডুটির সঙ্গে এক মাঠে খেলা করেছি আমিও। বাবা-মায়ের সাহিত্য-স্বজনের সংসারে আজন্মই দেখছি আত্মার সম্পর্কেই আত্মীয়তা। তাই সুনীতিবাবু আর তাঁর স্ত্রী আমার কাকাবাবু-কাকিমাই ছিলেন। ছেলেবেলায় ওঁদের বাড়ির প্রত্যেকটি ক্রিয়াকর্মে আমার মার একটি জরুরি ভূমিকা থাকতো, আমাদের বাড়িতেও তেমনি কাকিমার। একবার আমরা রাজগীর বেড়াতে গিয়েছি, তখন আমি আট-ন বছরের, কাকাবাবু-কাকিমাও গিয়েছেন। একদিন দুপুরে কাকাবাবু-কাকিমা আমাদের বাড়িতে এসেছেন নেমন্তন্ন খেতে, আর আমি তাঁদের সামনে বসে বসে মনের সুখে আরেক রকম নেমন্তন্ন খাচ্ছি।—অর্থাৎ দাঁতে নোখ কাটছি।

—নোখ খাসনি, খবরদার, নোখ খাসনি, অসুখ করবে।—কাকিমা বারণ করলেন। আমি তাড়াতাড়ি হাত নামিয়ে নিই। একটু পরে আবার ভুলে ভুলে মুখে আঙুল। এবং তৎক্ষণাৎ—ফের? বারণ করলুম না? হাত নামা বলছি—কাকিমার বকুনি। কিন্তু স্বভাব যায় না মলে। অতএব পাঁচ মিনিট বিরতির পরেই আবার আমি যথাপূর্বম। এবার কাকিমা মা হয়ে গেলেন—ফের অসভ্যতা! বলতে বলতেই ঠাস করে একটি থাবড়া আমার গালে। ভাত খেতে খেতেই। বাঁ হাতে।

আচমকা। অভিমানে আমি কেঁদে ফেলি, কিন্তু এই নিদারুণ দুঃসময়ে মা, বাবা এমন-কি কাকাবাবু কেউই আমার পক্ষ নিতে এগিয়ে এলেন না। বরং যেন ধন্য হয়ে গিয়ে চমৎকার সমবেত সঙ্গীত গেয়ে উঠলেন—এইবারে ঠিক হয়েছে। আমি ছুটে বাগানে পালিয়ে গিয়ে খুব কেঁদেছিলুম—হে ভগবান, কেন আমার নোখ খাওয়ার বদ অভ্যেসটা সারিয়ে দিচ্ছ না? কিন্তু ভগবান অদ্যাপি ওটি সারাননি। আমার আঙুল আজ এমনি অবিকল কুষ্ঠরোগীর মতো হতো না যদি কাকিমার কাছাকাছি থাকতুম। বড়ো হয়ে তখন আমি বিদেশে—একদিন মার চিঠিতে হঠাৎ খবর পেলুম, কাকিমা আর নেই। যে কাকিমা বজ্র-বিদ্যুৎকে অতো ভয় পেতেন—সেই কাকিমা এখন বজ্রবিদ্যুতেরই দেশে! কাকিমার সেই থাবড়াটার জন্য সেদিন খুব মন কেমন করেছিলো।

এখন তো স্বয়ং মা হয়েছি, বন্ধু-বান্ধবদেরও সন্তান হয়েছে। কিন্তু এমন জোরালো বন্ধন কি আমাদের যুগে আর বজায় আছে? ঘনিষ্ঠ বন্ধুর অবাধ্য বাচ্চাটা যদি কথা না শুনে অসভ্যতা করে, আমরা কি মাতৃস্থানীয়ের অধিকার-বলে তাকে থাবড়া মারতে সাহস করবো? তাতে বন্ধুর সঙ্গে চিরবিচ্ছেদ হয়ে যাবার সম্ভাবনাই নব্বই ভাগ। এই যে বন্ধু-কন্যাকে নিজের সন্তানের সঙ্গে অভিন্ন মনে করে সোহাগ এবং শাসন করবার আন্তরিক শক্তি, এই অমূল্য সংযোগ এখন আর গড়েই ওঠে না। বন্ধু তো দূরস্থান, জ্যাঠা খুড়োই কি আর থাবড়া বসাতে সাহস করেন আপনাপন অষ্টমবর্ষীয়া ভাইঝির মহার্ঘ গণ্ডদেশে? এমন-কি বাপ-মারও যেন আর সেই আত্ম-বিশ্বাস নেই যে ভুল-বোঝাবুঝি হবে না। যা করছি, ভালোর জন্যেই করছি, এ নিয়ে কেউই সন্দেহ করবে না, এ নিশ্চয়তা কখন যেন আমাদের রক্তের ভেতর থেকে উবে গেছে। সব বাঁধনগুলোই আলগা হয়ে যাচ্ছে। পিতামাতা যত বৃদ্ধ হন, সন্তানের ওপরে ততই তাঁদের স্নেহের অধিকারের জোর কমে যেতে থাকে। আর বাবা-মায়ের মৃত্যুর পরে সহোদর-সহোদরাও আবাল্যের প্রতিবেশী মাত্রে পর্য-বসিত হয়ে যায়। এই সব দেখতে দেখতে এখন কাকিমার হাতের সেই থাবড়াটার জন্যে হৃদয় প্রাণ তৃষিত হয়ে ওঠে।

কাকাবাবুর কাছে আমি এক দিকে যেমন সন্তান, আরেক দিকে তেমনি শিষ্যও ছিলুম। বাবার মৃত্যুর পরে কাকাবাবু পিতৃব্যের যোগ্য কর্তব্য করেছেন, আগা-গোড়াই আমার পাশে থেকে দাহ শ্রাদ্ধ ইত্যাদি কৃত্য বিষয়ে সময়োচিত পরামর্শ যুগিয়ে এবং সহযোগিতা করে। আমার বাবার চতুর্থী শ্রাদ্ধক্রিয়াতে পৌরোহিত্য করেছিলেন কাকাবাবু। পরম সেই সৌভাগ্য, সে-কৃতার্থতা আমার মন থেকে

কোনোদিনই মুছবে না। এবং সেই উপলক্ষে তাঁর যুক্তিবাদী পণ্ডিত মননের এক আশ্চর্য পরিচয় পেয়েছিলুম।

কাকাবাবু কাজ শুরুই করলেন আমাকে যে মন্ত্র পাঠ করিয়ে, তা উচ্চারণ করতে আমারই সংস্কারে বাধলো। আমি একেই অব্রাহ্মণ, তায় নারী,—কিন্তু এ যে গায়ত্রী, কাকাবাবু! এক ধমক দিয়ে কাকাবাবু বললেন—তুমি লেখাপড়া শিখেও এমন মূর্খের মতন কথাটা বললে? যে মানুষ বেদ উপনিষদ পড়েছে, মন্ত্রের মানে যে বোঝে, যার জীবনধর্ম হচ্ছে অধ্যয়ন এবং অধ্যাপনা—তাকে গায়ত্রী পড়াবো না, পড়াতে হবে কোনো নিরক্ষর ভৃতকে, যে ঘটনাচক্রে ব্রাহ্মণ-বংশে জন্মেছে? এর পরে আর প্রশ্ন চলেনি। এই উত্তরের বিভায় অশীতিপর সুনীতি-বাবুর নির্মোকহীন, যুক্তিযুক্ত অন্তরলোকটিও উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল উপস্থিত প্রত্যেকের সামনে। ঘটনাটি তুচ্ছ, কিন্তু এতে সুনীতিবাবুর মনের যে দিকটি চেনা যায়, তাচ্ছিল্যের নয়। যৌবনে যিনি ছিলেন গোঁড়া ব্রাহ্মণ, বার্ধক্যে পৌঁছে তাঁর এই সংস্কারমুক্তি, এ কেবল তাঁর দূরপ্রসারী জীবনবোধেরই ফলিত প্রমাণ। তাঁর পাণ্ডিত্য, তাঁর জ্ঞান তাঁকে জীবন থেকে বিচ্যুত, খণ্ডিত করেনি, বরং সংযুক্ত ঘনিষ্ঠ করেছিল।

কাকাবাবুর সংস্কারমুক্ত মনের আরেকটি পরিচয় পেয়েছিলুম ১৯৭৫-এ, আমার মা শ্রীমতী রাধারাণী দেবী যখন শরৎচন্দ্র স্মৃতি বক্তৃতামালা দেন, কলকাতা বিশ্ববিদ্যা-লয়ের অনুরোধে সেই বক্তৃতা যখন কলকাতার একটি প্রসিদ্ধ সাপ্তাহিক পত্রে ধারা-বাহিক প্রকাশিত হচ্ছিল, তখন শরৎচন্দ্রের ভার্যা বিবাহিতা ছিলেন কি না এই প্রসঙ্গে শ্রীমতী রাধারাণী দেবী নিঃসংকোচে জানান যে, তাঁদের জ্ঞাত তথ্য অনুযায়ী তিনি যদিও নিঃসন্দেহে ধর্মপত্নীই ছিলেন, কিন্তু তথাকথিত বিবাহ হয়নি। অর্থাৎ কমন-ল-ওয়াইফ বলতে ইয়োরোপে যে সংজ্ঞাটি বহুপ্রচলিত এও তেমনিই। শরৎচন্দ্রকে যাঁরা বলেন ভীরু এবং সংস্কারাচ্ছন্ন হিন্দু—তাঁদের প্রতি এই তথ্য এক চ্যালেঞ্জ। এতে প্রমাণ হয় যে নিজের জীবনে তিনি সংস্কারান্ধ ছিলেন না। মন্ত্র না পড়েও তিনি বৈধ স্ত্রীর মর্যাদা দিতে সক্ষম হয়েছিলেন তাঁর জীবনসঙ্গিনীকে।

কিন্তু হলো উল্টো। এই বিষয়টি নিয়ে এক শরৎ-বিশেষজ্ঞ তুমুল বিরুদ্ধতার লবি গড়তে আরম্ভ করে দিলেন। এতে নাকি শরৎচন্দ্রের সম্মানহানি হয়েছে। সেই সময়ে সুনীতিবাবু প্রতিবেশী হিসেবে মাকে টেলিফোন করে বলেছিলেন যে তিনিও চিরকাল এই খবরই সত্য বলে জানতেন—যে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর স্ত্রীর হিন্দু-বিবাহ হয়নি এবং মার যে সেকথা লেখবার সৎসাহস আছে এজন্য মাকে তিনি

অভিনন্দিত করেন। সেই বইটি যখন প্রকাশিত হয় তখন নিজের মন্তব্য সুনীতিবাবু একটি চিঠির মারফত জানান এবং ডাঃ সুকুমার সেনের অভিমতও নিজে থেকেই আমন্ত্রণ করেন। এ বিষয়ে ঐতিহাসিক ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতটিও তিনি জেনে নিতে বলেন। ওঁরা তিনজনেই মায়ের অভিমতের অনুকূলে রায় দিয়েছিলেন। সেই চিঠিগুলি বইয়ের শেষে সংযোজিত হয়েছিল সুনীতিবাবুর পরামর্শে।

এই ঘটনাটিতে তিনজন জীবন-অভিজ্ঞ জ্ঞানবৃদ্ধ মানুষের খোলা, সত্যসন্ধ, তরুণ মনের যে পরিচয় পাওয়া গিয়েছিলো,তার হোতা ছিলেন কাকাবাবুই।

কাকাবাবুর সঙ্গে আমার নতুন করে নিয়মিত যোগাযোগ ঘটলো ১৯৭০ থেকে, যাদবপুরে কাজ নেবার পরে। মাঝে দীর্ঘ বারো বছর, পাক্কা এক যুগ, অজ্ঞাত-বাসে কেটেছে, গার্হস্থ্যে, বিদেশ-বিভুঁইয়ে। তার মধ্যেও অবশ্য যোগাযোগ থেকেছে। সুনীতিবাবুর সঙ্গে আমার গুরুশিষ্য সম্পর্কটি নিতান্ত নিজেরই পাতানো, যদিও তাঁর শিষ্যত্বের যথার্থ যোগ্যতা আমার নিশ্চয়ই এখনও অর্জন করা হয়নি।

বাল্মীকিরামায়ণ চর্চা, এবং তুলনামূলক সাহিত্য—এই দুটি বিন্দুতে ঘটেছিল কাকাবাবুর সঙ্গে আমার অন্তরের যোগ। থীম ও ফরমুলা বিশ্লেষণ করে, আমার প্রয়োজন অনুযায়ী ধরাবাঁধা শব্দচয়নের কায়দা এবং কাব্যের সামগ্রিক গাঠনিক তাৎপর্য বিচার করে বাল্মীকি রামায়ণকে কাব্য হিসেবে না দেখে মৌলিক মহা-কাব্য হিসেবে তাঁর মূল্য নির্ধারণের একটি প্রয়াস আমি বিগত তেরো-চৌদ্দ বছর ধরেই করছি। মাঝে মাঝে আমি কলকাতায় এলে বা কাকাবাবু দিল্লিতে গেলে এ নিয়ে তাঁর সঙ্গে কথা হতো। এ বিষয়ে আমার যখন যে লেখা বেরিয়েছে তাঁকে অফ্‌প্রিন্ট দিয়েছি, কাকাবাবু মহা উৎসাহে পড়েছেন, মতামত বলেছেন।

রামচন্দ্র বিষয়ে কাকাবাবুর অবতারবাদ-বিরোধী অভিমতে আমারও সর্বান্তঃ-করণের সমর্থন ছিলো কেবলমাত্র একটি প্রসঙ্গে ছাড়া। ওই বিষয়টি নিয়ে নানা বই পড়ে নিজে নিজে ভেবে বিদেশের পণ্ডিত এবং এখানে ফাদার আঁতোয়ানের সঙ্গে বিশদ আলোচনা করে, আমার মনে হয়েছে, ইলিয়াডের সঙ্গে রামায়ণের কাঠামোর যে সাদৃশ্য সেটির কারণ 'গ্রীক প্রভাব' নয়, তৎকালীন বিশ্বের মানব-সমাজের সাধারণ যুগধর্ম ও নৈতিক মূল্যবোধের সমমমিতা। ইলিয়াড ও রামায়ণ ছাড়াও আরো বহু 'হিরোয়িক এপিকে' জগৎ জুড়ে ওই একই ধাঁচের ঘটনার কাঠামো পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে চৌদ্দটি এপিকের কাঠামো বিশ্লেষণ করে লেখা আমার প্রবন্ধটি পড়ে খুশি হয়ে আমাকে রামায়ণের ওপর কাজটি সমাপ্ত করতে কাকাবাবু খুব তাড়া দিতেন, উৎসাহ দিতেন। আমার এক দিকের ব্যস্ততা অন্য দিকের আলস্যে

এবং সর্বধ্বংসী দীর্ঘসূত্রতায় সেই কাজ এখনও অসম্পূর্ণ, এরই মধ্যে কাকাবাবু হঠাৎ চলে গেলেন।

'তুলনামূলক সাহিত্য' এই বিষয়টি নিয়ে রবীন্দ্রনাথের পরেই যে দুজন সবচেয়ে বেশি মাথা ঘামিয়েছেন এদেশে, তাঁরা হলেন পণ্ডিত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এবং কবি বুদ্ধদেব বসু। কবির চেয়ে পণ্ডিতের উৎসাহ এ বিষয়ে কম ছিল না। যদিও ভারতবর্ষের বিশ্ববিদ্যালয়ে তুলনামূলক সাহিত্যধারা আনায় ভগীরথ ছিলেন বুদ্ধদেব বসুই, ভারতবর্ষে ভারতীয় সাহিত্যের তুলনামূলক অধ্যয়ন-আপ্যায়ন হোক, এ কিন্তু সুনীতিবাবুর আন্তরিক অভিরুচি ছিল। বিশ্বসাহিত্যে তাঁর জ্ঞান ছিল দূরপ্রসারিত। ভাষাচার্য তো কেবল নীরস বৈয়াকরণই ছিলেন না। শিল্প, সাহিত্য, সঙ্গীত, নৃত্যকলা, নাটক—নানা ভিন্ন শাখায় বয়ে গিয়েছিলো তাঁর রুচি এবং জ্ঞান। তাঁর 'রবীন্দ্রনাথ ও বিশ্বসাহিত্য' বইটির বয়স বেশি হয়নি, কিন্তু 'বৈদেশিকী' নামে ছোটো বাংলা বইটির বিষয়বস্তু তুলনামূলক বিশ্বসাহিত্যই—এবং সেটি যখন প্রকাশিত হয় তখনও ভারতবর্ষে পেশাদারী তুলনামূলক সাহিত্যচর্চা শুরু হয়নি। এখন মিথ নিয়ে শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ডাঃ সুকুমার সেন যে ধরনের মূল্যবান গবেষণা করছেন, তাকেও আমি বিশুদ্ধ তুলনামূলক সাহিত্যচর্চা বলি। ডাঃ সুকুমার সেনের মতো ছাত্র যিনি রেখে গিয়েছেন, সেরকম মাস্টার মশাই কি এদেশে আর পাবো আমরা? যেভাবে পড়ানো হয়, যেভাবে পড়া হয়, যেভাবে পরীক্ষা দেওয়া হয়, যেভাবে খাতা দেখা হয়, যেভাবে নম্বর বাড়ানো হয়—সব কিছু দেখেই মনে হয় শিক্ষা ক্ষেত্রে 'শেষের সেদিন ভয়ংকর' সমাগত।

কাছেই থাকি, তাই যখন-তখন ছুটে ছুটে কাকাবাবুর কাছে চলে যেতুম, যখনই কোথাও ঠেকে যেতো, বেধে যেতো। তাঁর অমূল্য লাইব্রেরিটিকে অবাধ ব্যবহারের সুযোগ দিয়েছিলেন তিনি আমায়। কোনো প্রবন্ধ লিখছি, অমনি বইপত্র ঘাঁটতে ছুটেছি; কিছু অনুবাদ করতে গিয়ে হয়তো ঠেকে গেছি কোনো আঘাটায়—অমনি অভিধান কিংবা উপদেশ খুঁজতে ছুটেছি। আর বইপত্রই শুধু নয়, কাকাবাবুর সঙ্গে কথা বলে চিন্তাটাকে খেলিয়ে নিতেও ছুটেছি বারবার। প্রত্যেক সময়েই কিছু না কিছু জরুরি উদ্ভাস নিয়ে, ধনী হয়ে, ধন্য হয়ে ফিরেছি। এখন কেবলই আফসোস হয়—কেন আরো যাইনি, কেন রোজ যাইনি, কেন এত ভুল করলুম?

শুধুই কি বাল্মীকি রামায়ণ? তা কেন? ওঁর কাছে পাওয়া যেতো সব কিছু। তুলসীদাসের রামচরিতমানসের চারশো বছর পূর্তি উৎসব হচ্ছে এস-ও-এ-এস-এ,

কাকাবাবুর কাছে পাঠ নিতে ছুটলুম সেমিনারে যাবার আগে। ইণ্ডিয়ান লিটারেচার অ্যাজ ওয়ান লিটারেচার নিয়ে বলতে হবে বিদেশে—আগে দৌড়োও কাকাবাবুর কাছে। দাক্ষিণাত্যে লিটারেচার অফ দি ইস্টার্ন রিজিয়ন বিষয়ে বক্তৃতা দেবো, একবার কাকাবাবুর সঙ্গে কথা না বললে কি হয়? যাই লিখবো, যাই বলবো তাঁর সঙ্গে কথা বলে না নিলে যেন স্বস্তি নেই। তিনিও গেলে খুব খুশি হতেন, প্রাণ ঢেলে সাহস যুগিয়েছেন, মনে নানাভাবে বল দিয়েছেন। যেমন সার্থকতার শুভক্ষণে, তেমন আমার দুঃখের মুহূর্তে, পরাজয়ের মুহূর্তে, কাকাবাবুর আশীর্বাদী হাত পিতৃস্নেহে মাথায় পেয়েছি।

গত বছর ২৭শে মে কাকাবাবু চলে যাবার একদিন আগেই তাঁর কাছে সকালবেলায় গিয়েছিলুম। জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' ইংরিজি কাব্যে অনুবাদ করেছেন মার্কিনী এক অধ্যাপিকা, বইটিতে নানা জায়গায় কাকাবাবুর উল্লেখ রয়েছে। সেই বইটি ওঁকে দেখাতে নিয়ে গিয়েছিলুম। যদিও তখন কাকাবাবুর চোখের ছানি অপারেশন হয়েছে, দুই চোখেই পটি বাঁধা। জানি, বইটা দেখতে পাবেন না। তবু খুশি হবেন, এই ভেবে নিয়ে যাওয়া। খুশি হলেনও। এক জায়গায় ভুল করে ওঁর নাম ছাপা হয়েছে এস. এন. চ্যাটার্জী। শুনে কাকাবাবু সুন্দর, অমলিন হাসলেন, মজা পেলেন। একটুও বিচলিত হলেন না। তাতে কী হয়েছে, অন্যত্র তো পুরো নামটা ঠিক চেহারাতেই আছে? যারা জানবার, ঠিকই জানবে।

আলোচনা শুরু হয়ে গেল জয়দেব নিয়ে। একটি সমালোচনায় আমি ঠাকুরের সেই "ওতে গীত আছে কিন্তু গোবিন্দ নেই" উক্তিটি উল্লেখ করেছি শুনে কাকাবাবু খুব খুশি। ওঁরও সেটাই মত—বললেন—'ওটা আসলে স্ট্রেট পর্নোগ্রাফি, ভক্তি-লিটারেচারের ছদ্মবেশে শুদ্ধ ইরটিক লিটারেচার ছাড়া কিছু নয়—এ বিষয়ে সুশীলদের মতটাই ঠিক।...জয়দেবের মিউজিক্যাল কোয়ালিটি ছাড়া অন্য কোনো কাব্যগুণও নেই, ভাবগাম্ভীর্য নেই, কোনো আত্মিক উত্তরণ ঘটান না তিনি—' এই সব বলতে বলতে কাকাবাবু ছন্দের প্রসঙ্গে চলে এলেন। বাংলা লোক-ভাষার ছন্দ কীভাবে জয়দেব সংস্কৃতে ব্যবহার করেছেন সেইটে আমাকে বোঝাতে গিয়ে আবৃত্তি শুরু করলেন—'ধীর সমীরে যমুনাতীরে বসতি বনে বনমালী—' তার পরেই হঠাৎ থেমে পড়ে নিজের মনে বিড়বিড় করতে লাগলেন। ওদিকে দুই চোখ বাঁধা—কোনো ভাবান্তর তো ধরবার উপায় নেই—আমি অবাক। হঠাৎ থামলেন যে? তবে কি মনে পড়ছে না? তাই কখনো হতে পারে? কাকাবাবুর স্মৃতিতে জয়দেব আটকে যাচ্ছে এও কি সম্ভব? আমিই কি তবে

ধরিয়ে দেব? কিন্তু আমার তো কাকাবাবুর ঠিক বিপরীত ক্ষমতাটাই আছে —অসামান্য বিস্মৃতিশক্তি। তবু, জয়দেব এমনই যে পংক্তিটা মনে পড়লো। এবং মনে পড়বামাত্র পুরো ব্যাপারটা স্বচ্ছ হয়ে গেল,—কাকাবাবু কেন হঠাৎ থেমে গিয়ে বিড়বিড় করতে লাগলেন! ভোলেননি, বরং উল্টোই—ঠিকই মনে পড়েছে, কিন্তু কন্যার সামনে উচ্চার্য নয় বলেই উচ্চারণ করেননি। অথচ এই কাকাবাবুরই কিন্তু মুখে খারাপ কথা আটকাতো না। একবার ১৯৬৪তে দিল্লীতে (ইণ্টারন্যাশনাল ওরিয়েণ্টালিস্টস কংগ্রেসে) কাকাবাবুকে একঘর লোকের সামনে যা বলতে শুনেছিলুম! তখন সদ্য আফ্রিকা ঘুরে এসেছেন তিনি। 'জেনোসাইড ইন আফ্রিকা' বলে একটি লেখাও বেরিয়েছে তখন তাঁর। এক বাঙালী অধ্যাপক প্রশ্ন করলেন—'আফ্রিকাতে গিয়ে স্যার আপনি কেমন ছিলেন?' 'কেন চেহারা দেখে বুঝতে পারছো না? আদর যত্নে আমার মুখখানি কেমন রাঙা টুকটুকে হয়েছে দেখছো না, ঠিক বাঁদরের পশ্চাদ্দেশের মতন?' চটপট উত্তর দিলেন সরল ভাষায়, ভাষাচার্য সুনীতিকুমার। নিজের মুখের জন্য ঈদৃশ অলৌকিক উপমা আর জগতে দ্বিতীয় কেউ খুঁজে পেতেন কিনা সন্দেহ। কালিদাস তো নিশ্চয়ই না।

সেই দুর্ধর্ষ কাকাবাবুকেও হার মানিয়ে ছাড়লেন কবি জয়দেব। অমন ডনবৈঠক করা জিহ্বাগ্রেও তিনি তাঁর শুশ্রূষাকারিণী নার্স, কন্যাসমা আমি এবং পুত্রবধূ ছায়াবউদির সামনে উচ্চারণ করতে পারলেন না পরের সর্ববিদিত পংক্তিটি —পীন পয়োধর পরিসর মর্দন কম্পিত করযুগশালী। না, পিতাপুত্রীতে, শ্বশুরবধূতে একত্রে বসে উচ্চারণ করবার মতো ভগবতপূজার মন্ত্র জয়দেবের পুণ্য কলমে উৎসারিত হয়নি। কাকাবাবুর সেই অপ্রতিভ নৈঃশব্দ্য কিন্তু মাত্র কয়েকটি মুহূর্তের। তক্ষুনি তিনি অন্য উদাহরণ আনলেন, অন্য পংক্তি—রচয়তি শয়নং, সচকিত নয়নম্ —ইত্যাদি। তারপরে হঠাৎ রাগ করে বললেন—নাঃ। না তুমি বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাসের সমতুল্য হতে পেরেছ ভক্তির সারল্যে, না হয়েছো কালিদাসের সমকক্ষ কাব্যগুণে, যতই ছন্দকুশলী ধ্বনিকুশলী হও না কেন, তুমি একটি ফোর্থ-রেট কবি। দেহকে উত্তীর্ণ হয়ে দেহাতীতে পৌছানো তোমার সাধ্যে কুলোয়নি। কালিদাস সেইটে পেরেছিলেন।' বলেই কুমারসম্ভব থেকে আবৃত্তি শুরু করলেন। আমি শুনতে শুনতে মুগ্ধ মোহিত হতে হতে বললুম—ইশ! আমরাও তো পড়াচ্ছি? আমাদের ছাত্রছাত্রীদের কী দুর্ভাগ্য—আমাদের মতো হতভাগা মাস্টার পেয়েছে! আমাদের মতো অসীম গুরুভাগ্য নিয়ে আসেনি এরা! আমরা তো কিছুই জানি

না। কাকাবাবু গম্ভীর হয়ে গিয়ে বললেন—'আমিও কিছুই জানি না। কীই বা জেনেছি? কতটুকু জেনেছি? আর যেটুকু জেনেছি সেটা জেনেই বা কার কী লাভ হয়েছে জগতে? এত পড়াশুনো করে কীই বা হয়? এসব পড়াশুনোর আর আমি কোনো মূল্যই পাইনে। আমি আজকাল খুব ডিসইলিউশনড হয়ে গেছি এসব ব্যাপারে। এবং ঈশ্বর, পরলোক—সব ব্যাপার নিয়েই আমার মনে এখন অশেষ প্রশ্ন জেগেছে—আমি হঠাৎ ভয় পেয়ে যাই।' মনে মনে বলি, তাহলে আমাদের কী হবে? আমরা যে এখন এইসব নিয়েই চেষ্টা করছি একটা পরিপূর্ণ জীবন গঠন করতে? এতদিন আপনাদের মতো মানুষকে চোখের সামনে দেখতে পেয়েছি বলেই তো এই সাহস। মনে হয়েছে, এই পূর্ণতার কণামাত্র পেলেও ধন্য হয়ে যাবো—বাঁচা সার্থক হবে। আমরা পা রাখবো কোন্ আশার ভিত-পাথরে? কিন্তু মুখে এসব কথা কিছুই বলা হয় না। মুখে বলি—'কিন্তু, কাকবাবু, এসব কক্ষনো আপনার মনের কথা নয়—এ নিশ্চয় অভিমানের কথা।' কেন অভিমান, কার ওপরে অভিমান, এসব উহ্য প্রশ্নে না গিয়ে কাকাবাবু বলেন, 'দূর! এসব মান-অভিমানের ব্যাপারই নয়, রিয়্যালাইজেশনের ব্যাপার। বেশিদিন বাঁচলেই বোঝা যায়, এই পৃথিবীটা বড় ওঁচা জায়গা। বুঝলে? এখানে জাস্টিসের চেয়ে ধরাধরির জোর বেশি, সত্যের চেয়ে দলাদলির জোর বেশি, যে বেশ করে হাত দুটো চেপে ধরতে জানে, কিংবা খুব টাকা ছড়াতে জানে, সে যা চাইবে তাই পাবে। যারা সত্য নিয়ে ধর্ম নিয়ে সুবিচারের আশায় বসে থাকবে, তারা আঙুল চুষবে।' 'আমি এবারে বলেই ফেলি—'তাহলে আমাদের কী হবে, কাকাবাবু? যদি মনে করেন পড়াশুনোরও মূল্য নেই, সত্য বিশ্বাসেরও মূল্য নেই, তবে আমরা কিসের ওপরে দাঁড়াই? বহির্জীবন যাদের ঠকিয়েছে, অন্তর্জীবন তো তাদের কিছু এনে দেবে?' চোখ বাঁধা, কাকাবাবুর কণ্ঠস্বর হঠাৎ নরম স্নেহবিগলিত হয়ে পড়ে, —'না না, তোমরা পড়বে না কেন, তোমরা পড়বে বৈকি। তোমরা পড়াশুনো করে যাও। আমার কথা শুনে শুনে তোমাদের যুগ তো ডিসিশান নেবে না, নিজেরা নিজেরা যে যেখানে পৌঁছবে। আমিই কি বাপ-খুড়োদের মূল্যবোধ মতে চলেছি? এ সবই যুগের সঙ্গে পাল্টে পাল্টে যায়। বুড়ো হয়েছি, এখন আমার মায়া মোহ সব ঘুচে যাচ্ছে। বুড়ো হলে এমনিই হয়। মনে নেই যে-রবীন্দ্রনাথ একদিন লিখেছিলেন—'মর্তে যেন না মুছে যায় মিথ্যে মায়াগুলি' —তিনিই মৃত্যুর আগে শেষ কবিতায় বললেন—'তোমার সৃষ্টির পথ রেখেছো আকীর্ণ করি বিচিত্র ছলনা জালে হে ছলনাময়ী'। সেই মিথ্যে মায়াগুলি আর এই

ছলনাজাল কি এক জিনিস? মোটেই নয়। কত তিক্ততা এখানে। আমারও তেমনি এখন মনে হয়, আমার বিদ্যার্জন এবং বিদ্যা বিতরণে জগতের কোনই উপকার হয়নি। ভক্তি ব্যাপারটাও আমার ঠিক আসে না। কোথাও যেন কোনো অর্থ খুঁজে পাইনে। এককালে ছিলুম হিন্দু ব্রাহ্মণ, এখন আমি অ্যাগনস্টিক। অর্থাৎ অজ্ঞ, আমি জানি না। মনে হয়, বিশ্বাসটা থাকলেই ভালো হতো, কিন্তু ওটা হারিয়ে ফেলেছি।' এমনভাবে বললেন যেন হাত ফসকে বলটা অন্ধকারে ঝোপের মধ্যে গিয়ে পড়েছে। একটা কিছু বিশ্বাস থাকলেই ভালো হতো—বললেন, 'তোমার তো বিশ্বাস আছে, তুমি তা ছাড়বে কেন? এখন তোমাদের গড়ে ওঠবার সময়।'

এই সময়ে নার্স এসে তাঁকে খেতে ডাকলো। অনেকক্ষণ এসেছি। কোথা দিয়ে যে সময় কেটে যায় কাকাবাবুর কাছে এলে!

উঠে আসি, কিন্তু মনটা বেশ খারাপ হয়ে গেল আমার। আজকাল প্রায়ই কাকাবাবু এই রকম হতাশার কথা বলেন। অথচ ওঁর মতো পরিপূর্ণতা কজন মানুষ জীবনে পায়? এখনও দেহে মনে অফুরন্ত প্রাণশক্তি, চিন্তায় হৃদয়ে অফুরান উষ্ণতা। কোথায় ওঁর এই শূন্যতাবোধের উৎস? জ্ঞানযোগ কর্মযোগ দুটোতেই উনি সাফল্য অর্জন করেছেন, নাই থাকলো ভক্তি। তবে কেন এই ব্যর্থতাবোধ? কোথা থেকে এসেছে এই আঘাত? পুত্রকন্যার অসীম ভালোবাসা; ছাত্রছাত্রী দেশবাসীর অসীম শ্রদ্ধা উনি আজও পেয়ে চলেছেন—তবে?

মন খারাপ করে ফিরে আসি। আমি এখনও জীবন-অনভিজ্ঞ, তাই হয়তো আজও আমার ঈশ্বরের মঙ্গলমূর্তিতে বিশ্বাস আছে, গুরুজনের স্নেহাশীর্বাদে নির্ভরতা আছে। শিল্পের শাশ্বত সত্যে শ্রদ্ধা আছে। এই ব্যর্থতাবোধই কি বার্ধক্য? সেই শেষ দেখা।

পরদিন সন্ধ্যায় রেডিও খুলেই মা পাষাণ হয়ে গেলেন। আমি ছুটলুম সুধর্মাতে। কিন্তু কাকাবাবু আর বাড়িতে ছিলেন না।

ঘরোয়া পরিবেশে

ছায়া চট্টোপাধ্যায়

আমার উপর ফরমাশ হয়েছে আমার শ্বশুর-মহাশয়ের ঘরোয়া জীবন সম্বন্ধে কিছু লেখবার। প্রথমেই ভাবছি কোথা থেকে শুরু করব। যাঁকে আমি দীর্ঘ আটাশ বছর ধরে প্রতিদিন দেখেছি, বাবার মত ভক্তি করেছি, সেবা করেছি, যাঁর কাছ থেকে কন্যার অধিক স্নেহ পেয়েছি, তাঁর বিষয়ে কিছু লেখা আজ বড় কঠিন। আমি প্রথম যখন বাবাকে দেখলাম, বাবার সংস্পর্শে এলাম, সেই শুরু থেকে শুরু করাই বোধ হয় ভাল হবে।

১৯৪৮ সালের অক্টোবর-নভেম্বর মাস। একদিন স্কুল থেকে ফিরতেই মা বললেন, "তাড়াতাড়ি স্কুলের পোশাক বদলে তৈরী হয়ে নাও। সুনীতিবাবু ও তাঁর স্ত্রী আমাদের বাড়ি বেড়াতে আসবেন, তুমিও সে সময় সামনে থেকো, আজ আর বিকেলে পড়ে কাজ নেই।" আমার তখন টেস্ট পরীক্ষা চলছে। পরদিন ইংরাজী পরীক্ষা। এদিকে এত বড় একজন পণ্ডিত আসছেন, তাঁর সামনে কি বলব না বলব এই সব ভেবে আমি তো প্রমাদ গুণলাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই বাবা ও মা আমাদের বাড়ি এসে পৌঁছুলেন। বাবা পরেছেন সাধারণ মিলের ধুতি, সুতির সাদা পাঞ্জাবি, কাঁধে মুগার চাদর। সৌম্য মূর্তি, হাসি-হাসি মুখ, ঝকঝকে চোখ, শক্ত বলিষ্ঠ চেহারা, এখনও চোখের সামনে জ্বলজ্বল করছে। আর মা পরেছেন লালপাড় তাঁতের শাড়ি, সাদা জামা, কপালে সিঁদুরের টিপটি ঝলমল করছে। সেই প্রথম বাবাকে দেখলাম, মাকেও। দুজনকেই প্রণাম করলাম।

বাবা সস্নেহে ডেকে কাছে বসালেন। এমন স্নেহপূর্ণভাবে স্কুল, পড়া ইত্যাদি সম্বন্ধে নানা ছোটখাটো প্রশ্ন করতে ও কথা বলতে লাগলেন যে খানিকক্ষণের মধ্যেই আমার ভয় কেটে আমি বেশ সহজ হয়ে গেলাম। ঘণ্টাখানেক কাটার পর বাবাই আমার শাশুড়ীকে ডেকে বললেন, "ওগো, একে তোমরা এবার ছেড়ে দাও। টেস্ট পরীক্ষা চলছে, এখন শুধু বসিয়ে রেখে সময় নষ্ট করা উচিত নয়।" আমি তো মনে মনে খুব খুশী হচ্ছি ওঁর এই সহানুভূতি দেখে। কিন্তু আমার দুই মা-ই এই ব্যাপারে সমান অবুঝ। ওঁরা বললেন, "সারা বছর তো পড়েছে, এখন এক বেলা না পড়লে কি আর এমন ক্ষতি হবে! আর একটু থাকুক।" বাবা এদিকে আমার অবস্থা বুঝে ছটফট করছেন, অথচ জোর করে ওঁদেরও কিছু বলতে পারছেন না।

এই ভাবে নটা অবধি কাটিয়ে ওঁরা চলে গেলেন। সেই প্রথম দিনেই এই ভাবে বাবার স্নেহের, তাঁর অপরের সুবিধে-অসুবিধে বোঝবার ক্ষমতা ও অন্যের সামান্য অসুবিধেতেও ব্যস্ত হয়ে পড়ার পরিচয় পেয়েছিলাম।

১৯৪৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে আমাদের বিয়ে হয়ে গেলো। বিয়ের পরদিন কুশণ্ডিকার সময় বাবা সমানে বসে ছিলেন। এখনও যেন চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি। ওঁর মা ও বাবার কথা ভেবে মাঝে মাঝে চোখের জল ফেলছেন। মন্ত্রের বিশেষ বিশেষ জায়গাগুলির মানে ও তাৎপর্য নিয়ে যখন আলোচনা করছিলেন তখন তাঁর মানে বুঝে আমিও নিজেকে গৌরবান্বিতা ও ভাগ্যবতী মনে করছিলাম এর আগেও তো আমার দিদির বিয়ের সময় ও অন্য বিবাহে কতবারই বিবাহের মন্ত্র শুনেছি, কিন্তু এমন করে তার মানে ও তাৎপর্য কোন দিনই কেউ বুঝিয়ে দেয় নি। ফলে মন্ত্রগুলি কতকগুলি অবোধ্য সংস্কৃত শ্লোকই রয়ে গিয়েছিল। আমরা তো ছোট থেকেই জানি, ছেলে বিয়ে করতে যাবার সময় মাকে বলে যায় "মা, দাসী আনতে যাচ্ছি"। বাবাই প্রথম বোঝালেন, আমাদের বিবাহের মন্ত্রে আছে, "সম্রাজ্ঞী শ্বশুরে ভব:"। তার মানে—"শ্বশুরগৃহে সম্রাজ্ঞীর মত বিরাজ কর"। বাবা বললেন, "ছোটবেলায় মাকে হারিয়েছি, তাঁকে আমরা ঠাকুমার দেখাদেখি বউমা বলতাম। বাদলের বউকেও আমি বউমা বলবো।" এই ভাবে মায়ের স্থান দিয়ে, সম্মান দিয়ে নিজের বাড়িতেই নিয়ে এসেছিলেন।

সংসারে নানা ঘাত-প্রতিঘাতে যখনই মন চঞ্চল হয়েছে বাবার কাছে ছুটে গেছি, বাবা ছোটখাটো উপদেশ ও কথার মধ্যে দিয়ে মনকে শান্ত করে দিয়েছেন। বাবা বলতেন, "বউমা, সংসারে কেউ আসে দিতে, কেউ আসে নিতে। কেউ আসে ভোগ করতে, কেউ আসে সেবা করতে। তুমি ভাববে আমি দিতে এসেছি, সেবা করতে এসেছি। তাহলে আর কোন কিছুতেই কষ্ট পাবে না। যা পাবে, সেটা পাওনা নয়, উপরি পেয়ে গেছি ভাববে, তাতে অল্পেই সন্তোষ পাবে।"

বাবার মত এত অল্পেতেই খুশী হতে, সন্তুষ্ট হতে আর কারোকে কখনও দেখি নি। নিজের, পরের, সবার জন্য এমন সমান ভাবে চিন্তা করতেও আর কাউকে দেখি নি। বাড়িতে কোন চাকরের অসুখ করেছে, বাবা দিনের মধ্যে তিন-চারবার নিজেই যান তাকে দেখতে। সে কি খাবে না-খাবে জিজ্ঞেস করছেন। তাকে কি ওষুধ দিলাম খোঁজ নিচ্ছেন, এ তো শেষ দিন অবধি দেখেছি।

বাবা খুব খেতে ভালোবাসতেন এ খবর অনেকেই জানেন, কিন্তু বাবা যে তার থেকে কত বেশী খাওয়াতে ভালোবাসতেন সে খবর অনেকেই জানেন না। বিয়ের

পর দেখেছি, বাবার কাছে একটি জাপানী ছাত্র প্রতি রবিবার পড়তে আসত প্রায় বছর খানেক ধরে। প্রতি রবিবার সকাল থেকেই বাবা ব্যস্ত হয়ে পড়তেন, তাকে কি খাওয়াবেন সেই চিন্তায়। জাপানীরা মাছ ও ভাত খেতে ভালোবাসে। তাই তার জন্য তিন-চার পদ বিভিন্ন রকম মাছ রান্না না করিয়ে তাঁর শান্তি হত না। তাকে সামনে বসিয়ে খাইয়ে এত তৃপ্তি পেতেন যে মনে হত যেন নিজেই খেয়েছেন। তিন-চারটি গরীব ছেলে এ বাড়িতে থেকে খেয়ে পড়াশোনা করত। বাবা সব সময় তারা ঠিকমত খেয়েছে কি না বামুন-ঠাকুরের কাছে নিজেই খোঁজ করছেন দেখেছি। বাড়িতে হয়ত কারোকে খাওয়ানো হবে, বাবা সকাল থেকেই খোঁজ নিচ্ছেন কি কি রান্না করা হবে। যাঁরা খাবেন তাঁদের বিশেষ কোন খাদ্যের প্রতি বিশেষ প্রীতির খবর আমাদের কিছু জানা আছে কি না। লোককে খাইয়ে এত তৃপ্ত হতেন যে, বলার নয়।

যখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে হেড-এগ্‌জামিনার ছিলেন, বাড়িতে খাতা দেখার সময় সবার জন্য বিকেলে জলখাবারের এলাহি ব্যবস্থা করতে হত। বাড়িতে কোন বিদেশী অতিথি সকালে বা বিকেলে চায়ের সময় এলে তাঁদের ভালো ঘিয়ে চিঁড়ে ভাজা, কড়াইশুঁটির ঘুগনি ও কিসমিস বাদাম দিয়ে তৈরী সুজির হালুয়া খাওয়াতে ভালোবাসতেন। তাঁরাও দেখতাম, বাজারের মিষ্টি, সিঙ্গাড়ার চেয়ে এই খাবার তৃপ্তি করে খেতেন। বাবা বলতেন, সন্দেশ রসগোল্লা আমাদের যতই প্রিয় হোক, বিদেশীদের রসনা এত বেশী মিষ্টি খেতে অভ্যস্ত নয়। তাই তাদের ওসব মিষ্টি খেতে বেশী অনুরোধ করা উচিত নয়।

বাবা অনেক দরিদ্র ছাত্রকে সাহায্য করতেন, কিন্তু সে বিষয়ে কোন উল্লেখ তিনি পছন্দ করতেন না। দুপুরে বা রাত্রে ভিখারিণীর "মাগো, দুটি খেতে পাই মা" ডাক শুনে শুনে আমরা এত অভ্যস্ত হয়ে গেছি যে তা আর সব সময় মনকে তেমন নাড়া দেয় না। অথচ বাবা ওই ডাক সহ্য করতে পারতেন না। ছুটে এসে বলতেন, "বৌমা, তোমার রান্নাঘরে কিছু বাড়তি ভাত বা রুটি হবে নাকি? দাও না ওকে।" বাবার আকুলতা দেখে বলতে পারতাম না যে, আজকাল রেশনের যুগে দু-একজনের মত ভাত রাখার অভ্যাস আমরা গৃহস্থ-বাড়িতে ছাড়তে বাধ্য হয়েছি। সবার থেকে দু-এক মুঠো কমিয়ে তাকে দিতে হত। সে তো নিত্যকার ঘটনা। শীতের সময় কোন ভিখারিণীর ছেঁড়া পোশাক বা বাচ্চার খালি গা দেখে ব্যস্ত হয়ে পড়তেন। ঐ ভাবেই ছুটে এসে বলতেন, "দেখ তো বাপু, তোমাদের একখানা পুরনো কাপড় হবে কি না!" আমি হয়ত একদিন বললাম, "বাবা, ওদের দিয়ে দেখেছি, খানিক

বাদেই সেটা বদলে ঐ ছেঁড়া কাপড় পরেই আবার ভিক্ষা করবে।" বাবা বলতেন, "অভাব বলেই তো করে বৌমা। এবার দিয়ে দেখ, যদি না পরে তো একে আর দিও না।" এইভাবে মানুষের উপর তাঁর অসীম মমতা ও বিশ্বাসের পরিচয় বার বার পেয়েছি।

এই তো সেদিনের একটি ঘটনা মনে পড়ছে। এই বছরই বৈশাখ মাসের শেষের দিকে একদিন দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর রাস্তার দিকের গাড়ি-বারান্দায় গিয়ে দেখি, আমাদেরই বাড়ির সামনের ফুটপাথে প্রচণ্ড রোদের মধ্যে মধ্যবয়সী একটি মেয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ে রয়েছে। তাকে ঘিরে বেশ ভিড়, কিন্তু কেউই কিছু করছে না। আমরা যতই ওদের বলছি মেয়েটির মাথায় একটু জল দিতে বা আমাদের বাড়ির সামনের কৃষ্ণচূড়া গাছের ছায়ায় এনে শোয়াতে, কেউ কিছুই শুনছে না। এদিকে মেয়েটির হাত ফুটপাথের গরমে পুড়ে লাল হয়ে উঠেছে দেখতে পাচ্ছি। বাবা তো এই সব দেখে ব্যস্ত হয়ে ছুটোছুটি করছেন। পারলে নিজেই নীচে গিয়ে ওর শুশ্রূষা করেন, এমন মনের অবস্থা। শেষে আমাদের বাড়ির চাকর ড্রাইভার মিলে তাকে গাছের ছায়ায় এনে তার মুখে, মাথায় জল দিতে তার জ্ঞান ফিরে এল। বাবা এবার ব্যস্ত হয়ে পড়লেন তার পোড়া হাতে ওষুধ দেবার জন্যে, তার ভিজে কাপড় বদলাবার জন্যে একটি কাপড় ও খাদ্যের ব্যবস্থার জন্যে। আমি তার জন্য তুলো, বার্নল, একটি পুরনো কাপড় ও খাদ্যের ব্যবস্থা করার পর একটু শান্ত হয়ে বললেন, "ওকে বল, এখন খেয়ে, রোদ না পড়া পর্যন্ত আমাদের বাড়িতে বিশ্রাম নিতে। রোদ পড়লে বাড়ি যাবে। কিন্তু ওর বাড়ি তো বরানগরে বলছে। এতটা পথ যাবে কি করে? ওকে বাস-ভাড়া ও রাত্রে খাবারের জন্যে কিছু পয়সা দাও।" আমি বাস-ভাড়ার জন্য একটি ও খাবারের জন্যে দুটি টাকা দিলে, নিজে আবার দুটি টাকা দিয়ে পাঁচটি টাকা পুরো করে ওকে দিয়ে তবে ওঁর শান্তি হল। এমনই সবার জন্য ওঁর মায়ের মত মমতা ও চিন্তা ছিল।

আমার শাশুড়ী-মা খুব ভালো রাঁধতে পারতেন। আমিষ নিরামিষ দু-রকম রান্নাই তিনি সমান দক্ষতায় রাঁধতেন। বাড়িতে কেউ খেলে তিনি পুরনো বামুন সব রাঁধতে জানা সত্ত্বেও নিজের হাতে দু-একটি পদ রাঁধতে ভালোবাসতেন। বিকেলে খাবার ও নিত্যনতুন রান্না নিজে হাতে করতে ভালোবাসতেন। কিন্তু আমরা নতুন কোন রান্না করব শুনলে বাবা খুব উৎসাহিত করতেন। একদিনের ঘটনা মনে পড়ছে। ঐ রকম কোন পত্রিকায় দেখে মাংসের মেটে, কিমা ও সুজি দিয়ে একটি রান্না করব ঠিক করলাম। বাবাকে বলতে বাবা তো খুব উৎসাহিত করলেন আমায়।

বাবার ছেলেকে কিন্তু জানালাম না। সকালবেলায় তার নানা উপকরণ যোগাড় হল। বিকেলবেলায় বেশ পরিশ্রম করে ঐ রান্না শেষ হলে খুশী মনে অপেক্ষা করতে লাগলাম, বাবা এবং তাঁর ছেলে অফিস থেকে ফিরলে খাইয়ে একেবারে অবাক করে দেব। বাবা আগে ফিরলেন। আমি তো তাড়াতাড়ি, বাবা মুখ হাত ধুতে ধুতে, গরম করে নিয়ে এলাম। বাবা খুব উৎসাহ করে খেলেন, আমাকে খুশী করতে আর একটু চেয়েও নিলেন। আমিও পরিতৃপ্ত হয়ে এবার বাবার ছেলের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলাম। খানিক বাদে তিনি ফিরলে তাঁকেও খেতে দিলাম। তিনি উৎসাহ করে এক চামচ মুখে নিয়েই বললেন, "একি? এটা কি হয়েছে? বিশ্রী আঁশটে গন্ধ, আঠা-আঠা মত, ঠাকুর, এটা কি করেছ?" আমার অবস্থা তখন বোঝাবার নয়। লজ্জার সঙ্গে বলতে বাধ্য হলাম যে, ঠাকুর নয়, আমিই রেঁধেছি। বাবা কিন্তু আমায় জানতেও দেননি যে, এত বিশ্রী রান্না হয়েছে। আমাকে পরে বললেন, "তাতে কি হয়েছে বৌমা, এক বারেই কি সব ঠিক হয়? রাঁধতে রাঁধতেই ভাল হবে। আমার তো এমন কিছু মন্দ লাগল না বাপু।"

রাত্রে বাড়িতে কেউ না খেয়ে শুয়ে পড়লে বাবা অস্থির হয়ে পড়তেন ও তাকে না খাইয়ে কিছুতেই ছাড়তেন না। আমার ছোট ননদদের মধ্যে কেউ হয়ত পড়া শেষ করেই শুয়ে ঘুমুতে লেগেছে, ঘুম ছেড়ে উঠতে চাইছে না খেতে—বাবা শুনে তার কাছে গিয়ে, "রাত্রিবেলা পেটের মধ্যে হাতি নাচবে, ঘোড়া লাফাবে" ইত্যাদি নানা কথা বলে উঠিয়ে, হাসিয়ে, খাইয়ে তবে ছাড়তেন।

বাবার সঙ্গে বাবার ছেলের সম্পর্কটিও ছিল বড় মধুর। এঁদের পিতা-পুত্রের সম্পর্কের মত এত নিবিড় ভালবাসা ও গভীর শ্রদ্ধার সম্পর্ক, এত স্নেহ ও বিশ্বাসের সম্পর্ক, এত সহজ বন্ধুত্বের সম্পর্ক আমি আর কোনও পিতা-পুত্রের মধ্যে দেখি নি। বাবার ঘরোয়া জীবন সম্বন্ধে লিখতে বসে তাই এ সম্বন্ধে কিছু না লিখলে লেখা কেমন যেন অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। সাধারণতঃ আমাদের দেশে দেখা যায় পিতা-পুত্রের মধ্যে সম্পর্ক হয় ছেলের দিকে মুখ্যতঃ ভক্তি, শ্রদ্ধার ও বাধ্যতার আর পিতার দিকে স্নেহের ভরসার ও আদেশের। বাবা ও তাঁর ছেলের মধ্যে সম্পর্ক ছিল একটু অন্য রকমের। দুজনের মধ্যে অসম্ভব আণ্ডারস্ট্যাণ্ডিং ছিলো। বিয়ের পর থেকেই দেখছি, বাবার সম্পর্কে ওঁর অসম্ভব ভক্তি, শ্রদ্ধা, গৌরববোধ ও ভালবাসা। আর বাবারও ছেলের প্রতি অসম্ভব স্নেহ, বিশ্বাস, ভরসা ও বন্ধুর মত ব্যবহার। মা ও বাবার মধ্যে প্রায়ই ছেলে কাকে বেশী ভালবাসে এই নিয়ে ঠাট্টা, তর্ক ও অভিমান হতে দেখেছি। মা বলতেন, "আমি এত কষ্ট করলাম, মানুষ করলাম, আর ছেলে

এদিকে সব সময় বাপের দিকে আছেন!" বাবা শুনে হাসতেন। ওঁর ২০-২১ বছর বয়সে আমাদের বিয়ের ব্যাপারে, কি সাংসারিক যে কোনও বিষয়ে ছেলের সঙ্গে পরামর্শ না করে, ছেলেকে না জিজ্ঞেস করে কোন কিছুই করতেন না। উনিও সকল ব্যাপারেই বাবাকে সাহায্য করার জন্য, বাবাকে সাংসারিক নানা ঝঞ্ঝাট থেকে বাঁচাবার জন্যে সেই বয়সেই আপ্রাণ চেষ্টা করতেন ও সংসারে নানা দৈনন্দিন ঝামেলা নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন।

বাবা হাসতে হাসতে বলতেন, "বাদলের আমার প্রতি ভালবাসা, যেন গ্রাম্য বিধবা মায়ের একমাত্র সন্তানের প্রতি অবুঝ ভালবাসার মত। ও যেন আমায় তুলোর বাক্সের মধ্যে রাখতে পারলে বাঁচে।" বাবার স্বাস্থ্য এমনিতে খুব ভাল থাকলেও শেষের দিকে আট-দশ বছর ডায়াবিটিস, ব্লাড-প্রেসার ও হাই ব্লাড-কোলেস্টেরল ইত্যাদি অল্প অল্প হয়েছিল। তাই প্রতি মাসে একবার রক্ত-পরীক্ষা, ব্লাড-প্রেসার পরীক্ষা ও ই-সি-জি করানো হতো। সেই পরীক্ষার রিপোর্ট অনুসারে ও ডাক্তারের পরামর্শ মত তাঁর খাওয়া কমাতে হত। উনি হয়ত কোনবার রিপোর্টে ডায়াবিটিস কমেছে দেখে খুশী হয়ে বললেন, "মিষ্টি খাওয়া বন্ধ করে কত তাড়াতাড়ি তোমার সুগার কমে গেল দেখছ তো বাবা।" বাবা মিটিমিটি হাসলেন। পরে বললেন, "লুকিয়ে কিনে একটু-আধটু মিষ্টি আমি রোজই খেয়েছি। তাতে কিছুই ক্ষতি হয় নি, দেখলে তো বাবু।"

বাবার কিউরিওর ও লাইব্রেরীর ঘর খুবই প্রিয় ছিল। আমি এ বাড়িতে যখন প্রথম আসি তখন দেখেছি বাবার লাইব্রেরীর সব বই একটি ঘরেই ধরে যেত। তারপর ধীরে ধীরে এই আটাশ বছরে বই-এর সংখ্যা বাড়তে বাড়তে এখন তাঁর বইয়ে একটি তলা পুরো ভরে যায়। কিউরিও-ও সেই অনুপাতে বেড়েছে। বাবা যখনই বাইরে কোথাও যেতেন, সব খরচ বাঁচিয়ে বই ও কিউরিও সংগ্রহ করে আনতেন। টাকা, পয়সা, জামা, কাপড়, ঘরবাড়ি কোন কিছুর প্রতিই তাঁর তেমন আকর্ষণ ছিল না, একমাত্র বই ও মনের মতো কিউরিও দেখলে লোভ সামলাতে পারতেন না। বাবার ছেলেও বাবার দুর্বলতার কথা জানতেন। তাই সুযোগ পেলেই এদেশ ও বিদেশ থেকে বাবার পছন্দমত কিউরিও সংগ্রহ করতেন।

বাবার অতবড় লাইব্রেরীতে কোন্ আলমারীর কোন্ তাকে কোন্ বই আছে তা তাঁর সম্পূর্ণ জানা ছিল। দরকার হলেই সঙ্গে সঙ্গে বার করে ফেলতে পারতেন। এমনই তাঁর অদ্ভুত মনে রাখার ক্ষমতা ছিল। বাবার বইগুলি মনের মত করে গুছিয়ে রাখার জন্যে তাঁর ছেলে বাড়ির চার তলাটি তৈরী করালেন। অনেক

যত্নে, অনেক চিন্তা করে তার প্ল্যান হল। খানিকটা তৈরী হয়ে প্রায় শেষ হয়ে এলে, বাবাকে একদিন উপরে নিয়ে গিয়ে দেখিয়ে অবাক করে দিতে চাইলেন। বাবা যদিও সবই কিছু কিছু জানতেন, তবু দেখে খুব খুশী হলেন। ওঁর আশা মত অবাক হলেন ও প্রশংসা করলেন। এদিকে বাবা অনেকদিন ধরেই ভাবছিলেন নিজের আত্মজীবনী লিখবেন। উনিও মাঝে মাঝে বাবাকে উৎসাহিত করতেন ওটি শুরু করতে। কিন্তু চোখের দৃষ্টি ছানির জন্য খারাপ হতে থাকায় শুরু করতে দেরি হচ্ছিল। বাবা যখন ওটি লিখতে শুরু করলেন, আমাদের বললেন, "বাদলকে এখন কিছু বলো না, বেশ খানিকটা লেখা হয়ে গেলে, দেখিয়ে অবাক করে দেব।" এইভাবে ওঁদের বাবা ও ছেলের মধ্যে অবাক করে দেবার খেলা চলত।

বাবা ও তাঁর নাতির মধ্যে সম্পর্কটিও ছিল ভারী মজার।

আমাদের বিয়ের বহুদিন পর, আমাদের একমাত্র ছেলে সুচিৎ জন্মায়, বাবার সে ছিল চক্ষের মণি। দশদিন বয়সে নার্সিং-হোম থেকে বাড়িতে আসার পরদিন থেকেই তিনি ওকে প্রতি সকালে বেদমন্ত্র পাঠ করে শোনাতেন। যখন একটু বড় হল, দাদুর মুখে শুনে শুনে সেও তোতাপাখির মত বেদমন্ত্র পাঠ করতে শিখল। বাবা এতে ছেলেমানুষের মত গর্ববোধ করতেন ও সবাইকে ওর পাঠ শোনাতে চাইতেন। প্রতিদিন স্কুলে যাবার সময়ে ওঁকে প্রণাম করার পর ও রাত্রে শুতে যাবার আগে ওর মাথায় চুমা না দিলে তাঁর শান্তি হত না। সুচিতের পড়া ও স্বাস্থ্য সম্বন্ধে অত্যন্ত যত্নবান ছিলেন। সুচিৎও পড়ার সময় বা কোনো বইয়ের কোন বিষয় না বুঝতে পারলেই ছুটত দাদুর কাছে। জানত, ওর সব প্রশ্নের উত্তর মুহূর্তেই ওঁর কাছে পেয়ে যাবে। এখন ও দিন দিন আরও বড় হবে। ওর জিজ্ঞাসার পরিধি দিন দিন আরও প্রসারিত হবে। কিন্তু সেই প্রাণময় বিশ্বকোষকে ও আর কাছে পাবে না ওর সব জিজ্ঞাসার সমাধান করে দেবার জন্যে।

বাবা চিরকাল ভোর চারটেয় উঠতেন। বাবার জুতোর খট-খট আওয়াজে আমাদের ভোরবেলার ঘুম ভেঙে যেত। ঘুম থেকে উঠে এক ঘণ্টা খালি হাতে ব্যায়াম করতেন। বাবা যাবার আট-দশ দিন আগে পর্যন্ত এর অন্যথা হয় নি। তারপর বারান্দায় বসে এক ঘণ্টা খবরের কাগজ পড়তেন ও তারপর সবার সঙ্গে সেই নিয়ে আলোচনা ও গল্প করতেন। সকালে আটটায় খাবার খেতেন। তারপর বসে লেখাপড়ার কাজ করতেন। সেই সময় ৯টার পর থেকে ১২টা পর্যন্ত বহু সাক্ষাৎ-প্রার্থী তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসতেন। কেউ কেউ হয়ত তাঁর জলখাবার আগেই এসে হাজির হতেন। আমি বিরক্ত হয়ে বলতাম, "উনি একটু অপেক্ষা

করুন। আপনি খাবার খেয়ে দেখা করুন, নইলে কথায় কথায় খেতে বেলা হয়ে যাবে।" বাবা তাতে রাজী হতেন না। বলতেন, "কত দূর থেকে হয়ত কোন বিশেষ দরকারে এসেছেন, দেখ না চট করে চুকিয়ে দিয়ে আসব।" এই সময় নানা মজার ঘটনাও মধ্যে মধ্যে ঘটত।

একবার এক ভদ্রলোক এসে বাবাকে বললেন, বাবা যদি তাঁর বইকে রবীন্দ্র-পুরস্কার বা অ্যাকাডেমি পুরস্কার না পাইয়ে দেন তবে তিনি আমাদের বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে আত্মহত্যা করবেন। বহু কষ্টে বুঝিয়ে, বেশ কয়েক ঘণ্টা পরে তাঁকে আত্ম-হত্যাব ইচ্ছা ত্যাগ করিয়ে বাড়িতে পাঠানো সম্ভব হল।

বাবা সাড়ে বারোটায় স্নান করে একটায় খেতে বসতেন। খেতে খেতে নানা বিষয়ে গল্প ও আলোচনা করা তাঁর চিরদিনের অভ্যাস ছিল। এই সময়ে কত যে মজার মজার গল্প করতেন, গল্পচ্ছলে কত বিষয়ে যে কত কথা তাঁর কাছ থেকে আমাদের জানা হয়ে যেত তার শেষ নেই। খেয়ে উঠে জাতীয় গ্রন্থশালায় তাঁর অফিসে যেতেন। সেখানে বিকেল ৫টা পর্যন্ত নানা চিঠির জবাব, নানা বই ও প্রবন্ধ লেখা, থিসিস দেখা ইত্যাদি কাজ করতেন। তার পর ৬টায় বাড়ি ফিরে আসতেন। গত আট-দশ বছর রাত্রে চোখে ভাল দেখতে পেতেন না বলে সন্ধ্যের পর আর পড়াশুনা করতে পারতেন না।

বাড়ি ফিরে খাবার খেয়ে একটু শুতেন ও শুয়ে শুয়ে কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, গীতা ঘটক, অর্ঘ্য সেন প্রমুখ গায়ক-গায়িকাদের রবীন্দ্রসঙ্গীতের লং-প্লেয়িং রেকর্ড শোনা তাঁর খুব প্রিয় ছিল। প্রতিদিনই এগুলি শুনতেন। আর ভালবাসতেন ধ্রুপদ গান। ডাগার ভ্রাতারা যখনই কলকাতায় গান করতেন, বাবা শুনতে যেতেন উৎসাহ ভরে। ইউরোপীয় বাজনার মধ্যে বীটোফেন ও বাক্ তাঁর প্রিয় ছিল। বিশেষ করে বীটোফেনের "এরইকা" ও "ফিফ্থ সিম্ফনি।" এ ছাড়াও রবি-শঙ্করের বাজনা। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের গানের রেকর্ড—যেমন আর্মেনিয়ান, আরবীয়, স্পেন দেশীয় গান শুনতে ভালবাসতেন।

রাত্রে নটায় খেতে বসতেন। সাড়ে নটা থেকে দশটার মধ্যে শুয়ে পড়তেন। তবে ১৯৬৫-৬৬ সাল পর্যন্ত, যতদিন চোখ ভাল ছিলো, রাত্রে বারোটা-একটা পর্যন্ত নিজের লাইব্রেরীতে বসে লেখাপড়ার কাজ করতেন দেখেছি। আমরা বেশ এক-ঘুম দিয়ে উঠে দেখেছি বাবার লাইব্রেরী-ঘরে তখনও আলো জ্বলছে।

বাবার আর একটি অভ্যাস ছিল, কারও কোনও লেখা পড়ে ভাল লাগলেই তাঁকে চিঠি লিখে উৎসাহ দেওয়া। তাঁর ঠিকানা জানা না থাকলে, যেখান থেকে

তাঁর লেখা বেরিয়েছে সেখানে ফোন করে বা তাঁর পরিচিত কারো সন্ধান জানা থাকলে তাঁর কাছ থেকে তাঁর ঠিকানা যোগাড় করে চিঠি লিখে তাঁকে উৎসাহ দিয়ে তবে তাঁর শাস্তি হত। কোন লেখা ভাল লাগলে আমাদেরও সেটি পড়ে দেখতে ও কেমন লাগল বলতে হত। এই ভাবে তিনি বহু অধুনা-বিখ্যাত কিন্তু তখন নতুন ও অপরিচিত লেখককে উৎসাহিত করেছেন তাঁদের প্রথম লেখা পড়েই। তখনকার পুরনো যুগের মানুষ হয়েও বাবার মন সামাজিক ও ধর্মীয় সকল দিকেই অত্যন্ত উদার ছিল। কোন ব্যাপারেই গোঁড়ামি সহ্য করতে পারতেন না। মেয়েরা লেখা-পড়া করুক, নিজের পায়ে দাঁড়াক এটা সব সময় চাইতেন। আমিও বিয়ের পর যেবার ইংরেজীতে এম এ. পাস করলাম, বাবা ও মার আনন্দ দেখার মত। আত্মীয় বা বন্ধু পরিবারের মধ্যে কেউ আন্তঃ-প্রদেশীয় বা অসবর্ণ বিবাহ করলে তিনি তাদের নিমন্ত্রণ করে বাড়িতে খাওয়াতেন, তিনি যে তাদের গ্রহণ করেছেন সুখী মনে এটা বোঝাবার জন্যই।

বাবা জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সুস্থ ছিলেন। কখনও কারও সাহায্য বা সেবার প্রয়োজন তাঁর হয় নি। বাবা বলতেন, "ছুটতে পারলে দাঁড়াবে না, দাঁড়াতে পারলে বসবে না, আর বসতে পারলে শোবে না।" শেষদিন, চলে যাবার এক ঘণ্টা আগেও, আমরা তাঁর বৌমা ও মেয়েরা যখন তাঁর বুকে পায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছি, মাথায় বাতাস দিচ্ছি, তিনি তখন অত কষ্টের মধ্যেও জিজ্ঞেস করছেন, "তোমাদের হাত ব্যথা করছে না তো?"

বাবার কথা লিখতে বসে আজ কত কথা ও কত ঘটনাই যে মনে পড়ছে তার শেষ নেই। মনে হচ্ছে, কিছুই লেখা হল না। বাবার বিরাট পাণ্ডিত্যের কথা, তাঁর অসাধারণ জ্ঞানের কথা অনেকেই লিখবেন এবং লিখেছেন। কিন্তু প্রতিদিনের ঘরোয়া জীবনেও তিনি যে কত মহৎ, উদার, স্নেহশীল ও অসাধারণ ছিলেন তার সামান্য পরিচয় যদি এই লেখায় তুলে ধরে থাকতে পারি তাহলেই নিজেকে সার্থক মনে করব।

সুনীতিকুমার ঃ শিল্পী ও শিল্পকলা-রসিক

প্রদ্যোত সেনগুপ্ত

আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বিশ্বময় পরিব্যাপ্ত—পৃথিবীর যেখানে যেখানে বিদ্যাচর্চার আয়োজন বা পাণ্ডিত্যের স্বীকৃতি আছে, সর্বত্রই তিনি বিদ্বজ্জনের প্রণাম ও অভিনন্দন লাভ করেছেন। ধর্ম-সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তাঁর যুক্তি-পারম্পর্যে গ্রথিত বিশ্লেষক মন, বস্তুনিষ্ঠ ও পরিচ্ছন্ন মনন নিঃসন্দেহে 'এনসাইক্লোপীডিক্' গভীরতায় স্বতন্ত্র। সুনীতিকুমারের রচিত ভ্রমণকাহিনীগুলির মধ্যেও তাঁর মনোজীবনের এই অভ্রান্ত শিল্পসংকেত দ্যোতিত—অনুপুঙ্খ পরিচ্ছন্ন বর্ণনারীতির মধ্যেও রস-পরিবেশনের আয়োজন তথ্যমুখীন ও বস্তুনিষ্ঠ। ভাষাতত্ত্বকে সুনীতিকুমারের মনীষা বৃহৎ শাস্ত্রের মর্যাদা দান করেছে। এ ক্ষেত্রেও তাঁর অধ্যয়ন এবং অনুশীলনের মধ্যে গবেষকের বিপুল শ্রমের সঙ্গে শিল্পীর মর্মরস সংমিশ্রিত ছিল। এই দুর্লভ স্বাতন্ত্র্যের উল্লেখ করেই সুনীতিকুমার প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন: "সুনীতির মনে সুগভীর তত্ত্ব ভাসমান চিত্রকে ডুবিয়ে মারেনি এই বড় অপূর্ব।" সুনীতিকুমারের মনোজীবনকে আরও স্পষ্টভাবে রবীন্দ্রনাথ বিশ্লেষণ করেছিলেন 'জাভা যাত্রীর পত্র' গ্রন্থে: "আমি তাঁকে নিছক পণ্ডিত বলেই জানতুম। অর্থাৎ আস্ত জিনিসকে টুক্‌রো করা ও টুক্‌রো জিনিসকে জোড়া দেওয়ার কাজেই তিনি হাত পাকিয়েছেন বলে আমার বিশ্বাস ছিল। কিন্তু এবার দেখলুম বিশ্ব বলতে যে ছবির স্রোতকে বোঝায়, যা ভিড় করে ছোটে এবং এক মুহূর্ত স্থির থাকে না তাকে তিনি তাল ভঙ্গ না করে মনের মধ্যে দ্রুত এবং সম্পূর্ণ ধরতে পারেন এবং কাগজে-কলমে সেটা দ্রুত এবং সম্পূর্ণ তুলে নিতে পারেন। এই শক্তির মূলে আছে বিশ্বব্যাপারের প্রতি তাঁর মনের সজীব আগ্রহ।" সুনীতিকুমারের ভাষা-সংস্কৃতি ও সাহিত্যানুশীলনের এই মনোজীবনের ভূমিকা বৃহৎ ও মহৎ পরিচয়ে এক শিল্পীরই ভূমিকা। হীরকখণ্ডের মতো বহু ভাব-বিভঙ্গে বিচ্ছুরিত তাঁর অনন্য ব্যক্তিত্ব এই মহান শিল্পীর ভূমিকাতেই ভাস্বর। তাঁর সুগভীর পাণ্ডিত্য ও বিশ্বমুখীন বিদ্যাবত্তার মূলেও এই শিল্পীর মহান ভূমিকা, যেখানে তিনি 'শিক্ষায় সংস্কৃতিতে জাগ্রত বৃহত্তর সমাজের স্বচ্ছন্দ স্বীকৃতি'তে আচার্যরূপে বরেণ্য, সেখানেও মনন-প্রণালীতে তিনি শিল্পী। তাঁর ভ্রমণরসিক বক্তা বা রাজনীতিক পরিচয়ের মধ্যেও এই বৃহত্তর শিল্পী-আত্মা সংগুপ্ত। সুনীতিকুমারের মনোজীবনের যথার্থ শিল্পী-পরিচয়ের এই আত্মিক সূত্রটুকু নির্ধারণ

করে এবারে আমরা তাঁর বহিরঙ্গ জীবন-পরিচয়ের এক বিরল ও বিস্ময়কর পরিচিতির মধ্যে যাব।

চিত্রকর এবং বিশিষ্ট শিল্পরসিক হিসেবে পণ্ডিত ও গবেষক সুনীতিকুমারের স্বক্ষেত্র কখনই চিহ্নিত নয়। তথাপি এ পরিচয়েও তিনি বিশিষ্ট পর্যালোচনার দাবী রাখেন। আর তাঁর বৃহত্তর শিল্পীমন যে এ জাতীয় কর্ম বা চিন্তা প্রয়াসের মধ্য দিয়ে অপ্রত্যক্ষভাবে সুসমঞ্জস তার ইঙ্গিত আমরা পূর্বেই দিয়েছি। এই বিরল প্রতিভার কারণেই ভাষা-ব্যাকরণ-শব্দ-লিপি-অক্ষর-হরফের মধ্যে নিমগ্নচেতন গবেষক সুনীতিকুমার ছবি আঁকেন, ছবি আঁকতে ভালোবাসেন, ছবির রসিক ও রসপ্রমাতা। ভাষাতত্ত্বের শ্রেণীকক্ষে অধ্যাপনায় রত সুনীতিকুমার নাকি তাত্ত্বিক নীরসতাকে শৈল্পিক চিত্তাকর্ষকত্বে সহজতর করে ধরতেন। বর্ণের উচ্চারণ-প্রণালী বা বাগ্‌যন্ত্রের তাত্ত্বিক শাস্ত্রীয় প্রণালীকে চিত্রিত পন্থায় সুনীতিকুমার পরিবেশন করতেন—একটি উচ্চারণ স্থান থেকে অন্য স্থান পর্যন্ত জিহ্বার অবস্থান বা পরিভ্রমণ পথটি তিনি নাকি অঙ্কিত করতেন। গুরুমুখী বিদ্যার তত্ত্ব রসগ্রাহী চিত্তে চিহ্নিত হয়ে যেতো। ব্ল্যাকবোর্ডে চকে আঁকা মানুষের মুখ—সংবৃত বা বিবৃত মুখ, কোন মুখের জিহ্বা তালু বা মূর্ধা-স্পর্শী, কারুর জিহ্বা হয়তো বা দন্ত-স্পর্শী। সুনীতিকুমারের ভাষা ও ব্যাকরণ-বিষয়ক কোন কোন গ্রন্থে স্বহস্ত-অঙ্কিত কিছু ছবি মুদ্রিত আছে; বিভিন্ন অটোগ্রাফের সমীক্ষা নিলেও সুনীতিকুমারের ছবি আঁকার প্রতিভা ও শিল্প-সাধনার পরিচয় পাওয়া যাবে।

পরিমল গোস্বামী আচার্য সুনীতিকুমারের প্রতিভার এই দিকটি বিষয়ে মন্তব্য করেছিলেন—"আইনস্টাইনের মতো উচ্চ গণিতবিদও বেহালা নিয়ে মেতে উঠতে অসুবিধা বোধ করতেন না। সুনীতিবাবুর হাতে বেহালা দেখিনি, কিন্তু কল্পনার চোখে ছবি আঁকার তুলি দেখেছি। এবং তাঁর আঁকা ছবি দেখেছি। তারও আগে দেখেছি চিত্রকলার প্রতি গভীর মমত্ব।" শনিবারের চিঠি (জুলাই ১৯৩৪)-এ সুনীতিকুমারের একটি ব্যঙ্গ রচনা এবং স্বহস্ত-অঙ্কিত 'পাকা হাতে আঁকা একখানি রেখাচিত্র' মুদ্রিত হয়। 'কথাসাহিত্য' পত্রিকার সুনীতিকুমার সংবর্ধনা সংখ্যায় (জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৯) পরিমল গোস্বামী সুনীতিকুমারের ছবি আঁকার প্রতিভার মূল্যায়ন প্রসঙ্গে স্মৃতিচারণ করেছেন: "যে ছবিগুলি তিনি আমায় পাঠিয়েছেন তা শুধু পাওয়ার দিক দিয়ে আশাতীত নয়, আঁকার ভঙ্গীর দিক দিয়ে আশাতীত। একেবারে পাকা হাত। রেখাঙ্কনে কোথাও সঙ্কোচ নেই, আত্মপ্রত্যয়ের দৃঢ়তা এবং বহু অভ্যাসের ঋজুতা এর প্রত্যেকটি অংশে। কম্পোজিশন-জ্ঞান অসামান্য।

বহু অভ্যাস কথাটি ব্যবহার করেছি সাধারণ অর্থে। আমি জানি না তিনি এ বিদ্যা বহুদিন চর্চা করেছিলেন কিনা। আমি তাঁকে এ কথা জিজ্ঞাসা করে জেনে নিতে পারতাম, কিন্তু ইচ্ছা করেই করিনি। কারণ তাতে তাঁর এ পরিপক্ব শিল্পকৃতির কোন নতুন ব্যাখ্যা হত না। সমস্ত ব্যাখ্যা পড়ে আছে চোখের সামনে তাঁর ছবির মধ্যেই।" সুনীতিকুমারের আঁকা ছবির মধ্যে অ্যাকাডেমিক পদ্ধতির বিরোধিতা করে দৃপ্ত আত্মবিশ্বাসের সম্পূর্ণতা অনেক ক্ষেত্রে পাওয়া যায়।

শিল্পী সুনীতিকুমার মনে-আত্মায়-ধ্যানে কী পরিমাণে শিল্প-মনস্ক এবং শিল্পাসক্ত ছিলেন—এবার তার পর্যালোচনা করা যেতে পারে। কাব্য-সংগীত ইত্যাদির অমৃত-আস্বাদনের মতো শিল্পাস্বাদনও যে আমাদের জীবনে অপূর্ব প্রাণ-প্রৈতি এনে দিতে পারে, এ বিষয়ে সচেতন আস্থার পরিচয় মেলে সুনীতিকুমারের স্বীকারোক্তিতে—"সংসারবৃক্ষে আমরা নূতন অমৃত ফলের অধিকারী হইব, আমাদের দৈনন্দিন জীবনের দীনতার মধ্যে নূতন সম্পদ আমরা পাইব।" এই নূতন সম্পদ উদ্‌ঘাটন ও তার মূল্যাবধারণার দায়িত্ব তিনি রাষ্ট্রীয় শিক্ষা-পরিচালনার বিভাগীয় দায়িত্ব রূপেই নির্দেশ দিয়েছেন। ইতিহাসের বইয়ের মাধ্যমে ছবির সাহায্যে ছাত্রদের মধ্যে প্রাচীন ও মধ্যযুগের শিল্পধারার প্রত্যক্ষ পরিচিতি উদ্‌ঘাটিত করে দিতে তিনি প্রয়াসী। এই জাতীয় চিত্রময় বইয়ের প্রয়োজনীয়তা বিষয়েই তিনি স্মৃতিচারণ করেছেন—"প্রায় ৩৮ বৎসর পূর্বে Smith সাহেবের প্রাচীন গ্রীসের ইতিহাস··· তাহার কতকগুলি অতি মোটা রকমের কাঠে খোদা ছবি হইতে আমি অবিনশ্বর গ্রীক শিল্পের সঙ্গে প্রথম পরিচিত হই, Bury সাহেবের গ্রীক ইতিহাসের বড় বই···তাহাতে প্রকাশিত গ্রীক মুদ্রার কলমে-আঁকা ছবি হইতে গ্রীক মুদ্রার সৌন্দর্যে প্রথম আকৃষ্ট হই। ভারতের ইতিহাস বিষয়ে এ দুই বইয়ের মতো চিত্রময় বই তখন আমাদের কালে দুর্লভ কেন, অলভ্য ছিল; প্রাচীন ভারতীয় গৃহাদি, মুদ্রা, ভাস্কর্য-চিত্র প্রভৃতির নিদর্শন সমেত যদি কোনও সচিত্র বই তখন পাইতাম, কত না খুশী হইতাম।"

ইতিহাসের মধ্যে বাস্তব-সভ্যতার চর্চার পথকে তিনি চিত্র-সহযোগে উন্মোচিত করার পন্থায় বিশ্বাসী ছিলেন। জ্ঞান-বর্ধন ছাড়াও এর মধ্য দিয়ে তরুণ মনে যথার্থ কৌতূহল সঞ্চার করে শিল্পানুরাগ উৎপন্ন করতে তিনি অভিলাষী ছিলেন। এই জাতীয় শিল্পানুরাগকে তিনি জীবনের উপযোগী পাথেয়ের শাশ্বত মূল্যে অভিষিক্ত করেছেন। শিল্পকে সংস্কৃতির প্রকাশ-মাধ্যম হিসেবে ব্যাখ্যা করে চিত্তপ্রসাদ বা আধ্যাত্মিক রসানন্দের ঊর্ধ্বে ঐতিহাসিক মহত্তর বোধের (Historic Con-

sciousness) সমর্থক রূপে সুনীতিকুমার দেখতে অভিলাষী। ভারতীয় শিল্পের বিভিন্ন প্রান্তিক প্রকাশকে তিনি ইতিহাস বইয়ের সংচিত্রিত রূপের মধ্য দিয়ে পেতে চেয়েছেন—পাঠার্থীদের চোখ ও চিন্তাকে যুগপৎ উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছেন। সুনীতি-কুমারের সংগঠনশীল মন এ বিষয়ে আশাবাদী ধারণায় সোচ্চার—"ঐতিহাসিক ভূচিত্রাবলীর মতো ঐতিহাসিক চিত্রাবলীর প্রচুর প্রয়োগ হওয়া উচিত। চলচ্চিত্র সহযোগে ইতিহাসকে ও ভূগোলকে দৃষ্টিগোচর করাইবার ব্যবস্থা, চিত্রচর্চারই সহায়ক হইবে। আশা করি এই কার্য ঐতিহাসিক ও শিল্পাশ্রয়ী উভয়ের সহযোগিতায় সহজসাধ্য হইবে—তখন যুগধর্মের এবং মানুষের আধ্যাত্মিক প্রেরণার প্রকাশরূপে, শিল্পের আলোচনা আরও ব্যাপক করিয়া, জীবনে আরও কার্যকর করিয়া তুলিবার সুযোগ মিলিবে।"

শিল্পকলার চর্চাকে সুনীতিকুমার জীবনের অন্যতম প্রধান আনন্দ-রূপে গ্রহণ করেছিলেন—'ইহাকে আমার একটি ব্যসন বলিয়া বর্ণনা করিতে পারি।' ভাষাশ্রিত সাহিত্য বা বাঙ্ময় ভিন্ন মানব-সংস্কৃতির আরও কয়েকটি শিল্পকলাকে তিনি সংস্কৃতির অঙ্গীকৃত করেছেন—কেননা শুধুমাত্র বাঙ্ময়কে মুখ্য বলে ধরে নিলে সংস্কৃতির সামগ্রিক প্রতীতি ঘটে না। বাস্তুশিল্প, ভাস্কর্য ও চিত্রবিদ্যাকে তিনি মানসিক ও আধ্যাত্মিক সংস্কৃতির নেত্রগ্রাহ্য এবং স্থিতিশীল রূপময় প্রকাশ হিসেবে দেখেছেন। শিল্পকে তিনি 'রূপ বা নেত্র-গ্রাহ্য সৌন্দর্যের আভ্যন্তর আত্মা' হিসেবে প্রণতি জ্ঞাপন করেছেন—"ওঁ নমস্তে চিত্তে বিশ্বরূপাত্মকায়।" বাহিরের পরিদৃশ্যমান রূপ-জগৎ ও অন্তর্লীন অদৃশ্য মনোজগৎ এই দুইয়ের পারস্পরিক শক্তি—এক দিকে রূপের অনুকৃতি, অপর দিকে রূপের মাধ্যমে অরূপের অভিব্যক্তির জন্যে মানুষকে শিল্পচেতনায় উদ্বুদ্ধ করে। পরিদৃশ্যমান জগৎ এবং আধিমানসিক জগতের মধ্যে কোন বিরোধ রূপশিল্পের যাথার্থ্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে না। সুনীতিকুমার বলেছেন: "অনুকৃতি এবং অভিব্যক্তি—প্রতিস্পর্ধন ও প্রকাশ—এই দুইটি-ই শিল্পের মৌলিক বা মুখ্য প্রেরণা।" এই মৌল প্রেরণা দুটি অখণ্ড মানবজাতির মধ্যে এক—যদিচ বিভিন্ন দেশে-কালে পারিপার্শ্বিক স্বাতন্ত্র্য ও বিশিষ্টতা বর্তমান। উল্লিখিত দুই সমসূত্রের কারণে মানবমনের শিল্পময় প্রকাশ অখণ্ড। সার্থক শিল্প আচার্যের মতে তাই বিশ্বমানবের সম্পত্তি। তা 'মানবসমাজের কৃত্রিম জাতি-বিভাগের ঊর্ধ্বে যেমন সাধারণ একটি মানবিকতা বিদ্যমান'—ঠিক তেমনি। শিল্পের প্রকাশভঙ্গী নানা প্রকারের, কিন্তু শ্রেষ্ঠ শিল্প রচনার মধ্যে এমন একটা সার্বজনীনতা বিদ্যমান, তার মুখ্য প্রাণ-বস্তু এক এবং দেশকালাতিগ—যে শ্রেষ্ঠ জাতীয় শিল্পকে

কখনই পরস্পর-বিরোধী পর্যায়ে ফেলা চলে না।

অনুকৃতি এবং অভিব্যক্তির পরেই সুনীতিকুমার শিল্পের আবশ্যকতার বা প্রয়োজনবাদের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। সকল যুগে সকল জাতির মধ্যে শিল্পের প্রয়োজন একরূপ থাকে না। আদিম যুগে যে সম্মোহনী বা জাদুর প্রয়োজন শিল্প-প্রাণের সঙ্গে অন্বিত ছিল—পরবর্তীকালে মানুষের আধ্যাত্মিক চিন্তার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে তা দেবপ্রতীকমূলক শিল্প-প্রয়াসে উন্নীত হল। আবার বর্তমানে সৌন্দর্য-বোধের দ্বারা উদ্বোধিত অপার্থিব অনুভূতির সূক্ষ্ম চৈতন্য শিল্পের উদ্দেশ্য হিসেবে নির্দিষ্ট হচ্ছে। শিল্পকলার এই স্বরূপ-বিশ্লেষণে গবেষক সুনীতিকুমারের তথ্যভিত্তিক পর্যালোচনাও দৃষ্টি আকর্ষণ করে—তিনি প্রসঙ্গত হিন্দু, গ্রীক ও চীনা জাতির পৃথক মনোভঙ্গী সত্ত্বেও রূপ-শিল্পকে মানবের প্রধান কৃতিত্বরূপে সাদরে বর্ণনা করার কথাও উল্লেখ করেছেন। ভারতবর্ষে দৈনন্দিন জীবন থেকে শিল্পকে পৃথক করে দেখা হত না বলেই রূপ-শিল্পের পৃথক বিশ্লেষণে সমালোচক পণ্ডিত আবির্ভূত হননি। সুনীতিকুমার ইতিহাসের মনীষা-মন্বিত রসানুভূতি দিয়ে শিল্প-চেতনার বিশ্লেষণ করেছেন—"এই সহজ সৌন্দর্যবোধের স্রোতস্বতী আর্য ও অনার্য-নির্বিশেষে ভারতের সামাজিক ও ব্যক্তিগত জীবনে কখনও অবলুপ্ত হয় নাই। মুসলমান ধর্ম ও ধর্মানুষ্ঠান তাহার মূর্তি বা রূপ-বিরোধী ভাব-সম্পুট ভারতে লইয়া আসিলেও রূপরসিক পারস্যের প্রভাবে ইতিপূর্বেই এই ধর্মের রূপ-বিরোধিতা অনেকটা খর্ব হইয়া গিয়াছিল বলিয়া তুর্কী, ঈরাণী ও অন্য বিদেশীয় মুসলমানের আগমনে এ-দেশের রূপ-শিল্পের ধ্বংস ঘটে নাই ;—বরঞ্চ, পারস্যের মুসলমান সভ্যতার সহিত ভারতের হিন্দু-মনোভাবের আশ্চর্য সাহচর্য ঘটায়, ভারতে মোগল চিত্রকলার উদ্ভব সম্ভবপর হইয়াছিল।" শিল্পের উদ্দেশ্য বা আদর্শ বিষয়ে মানুষকে উন্নত ও উন্নীত করতে সুনীতিকুমার ঐতরেয় ব্রাহ্মণের বচন উদ্ধৃত করে বলেছেন—"শিল্পসমূহ আত্মসংস্কৃতির কারণ।"

বিংশ শতকের প্রারম্ভে বাঙালীর শিল্পবোধ এবং প্রয়াস যে নতুন পথ ধরেছিল—"সেক্ষেত্রে বাহিরের স্পর্শ কার্যকর হইয়াছিল", ভগিনী নিবেদিতা ও ঈ. বী. হ্যাভেল প্রমুখ ইউরোপীয় মনীষীদের দ্বারা প্রাচীন ভারতীয় শিল্পের চর্চা এবং প্রতিস্পর্ধী ইউরোপীয়-রেনেসাঁস এবং গ্রীক শিল্পের পার্শ্বে প্রাচীন ভারতীয় শিল্পের গৌরবময় প্রতিষ্ঠা, ভারতের শিল্পীদের আর একবার অন্তর্মুখী হইতে উৎসাহ দিল ;···ইহার ফলে আশার বাণী এবং কৃতকারিতার গৌরব লইয়া দেখা দিলেন শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ।" ভারতের শিল্পসাধনায় অবনীন্দ্রনাথের প্রতি সুনীতিকুমারের অত্যন্ত সশ্রদ্ধ মনোভাব

ছিল। পুলিনবিহারী সেন সম্পাদিত "ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব্ ওরিয়েণ্টাল আর্ট" প্রকাশিত মুখপত্রের বিশেষ গোল্ডেন জুবিলী সংখ্যাতেও সুনীতিকুমার অবনীন্দ্রনাথের শিল্প মূল্যায়ন করে একটি বিশেষ প্রবন্ধ লিখেছিলেন। বিশ্ব শিল্প সভায় নন্দলালের প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন—"একাধারে প্রাচীন শিল্পের প্রাণরস ও তাহার শক্তিটুকু আহরণ করিয়াছেন, এবং আধুনিক ভারতীয় জীবনের সর্বাঙ্গীণ সত্যতম এবং সুন্দরতম রূপময় প্রকাশ করিয়াছেন।"

শিল্পী ও শিল্পরসিক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর আত্মিক দৃষ্টি দ্বারা ভারতের সঙ্গে বৃহত্তর ভারতের গভীরতর আত্মীয়তার সম্পর্ক আপন অন্তরে ধারণ করতে সমর্থ হয়েছিলেন। সেই গভীরতর চৈতন্যের মধ্য দিয়ে নতুন করে আমাদেরও আত্মাবিষ্কারের সম্ভাবনা রয়েছে।

কবি ও ভাষাচার্য

অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য

পণ্ডিতাগ্রগণ্য অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়কে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ভাষাচার্য উপাধি প্রদান করেছিলেন। কবি তাঁর জীবনসায়াহ্নে, ১৩৪৫ বঙ্গাব্দে 'বাংলা ভাষা-পরিচয়' শীর্ষক গ্রন্থখানি 'ভাষাচার্য শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় করকমলে' উৎসর্গ করেন।

১৯২৬ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দুই খণ্ডে The Origin and Development of the Bengali Language গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। সুনীতি-কুমারের বয়স তখন পঁয়ত্রিশ।

এরই পরের বৎসর ১৯২৭-এ, ১৩৩৪ বঙ্গাব্দে, গুরুদেবের সঙ্গে সুনীতিবাবু জাভা-যাত্রী হলেন। সেই ভ্রমণের বিবরণ আছে কবির জাভা-যাত্রীর পত্র গ্রন্থে। অপর দিকে সুনীতিবাবু এই ভ্রমণের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন দ্বীপময় ভারত শীর্ষক গ্রন্থে।

জাভা-যাত্রীর পত্রে রবীন্দ্রনাথ সুনীতিবাবুর রচনা প্রসঙ্গে যে কথাগুলি লিখেছেন, তা উদ্ধৃত করি—

'সকলপ্রকার রচনাই স্বাভাবিক শক্তির অপেক্ষা করে। চিঠি-রচনাও তাই। আমাদের দলের মধ্যে আছেন সুনীতি। আমি তাঁকে নিছক পণ্ডিত বলেই জানতুম। অর্থাৎ, আস্ত জিনিসকে টুকরো করা ও টুকরো জিনিসকে জোড়া দেওয়ার কাজেই তিনি হাত পাকিয়েছেন বলে আমার বিশ্বাস ছিল। কিন্তু এবার দেখলুম, বিশ্ব বলতে যে ছবির স্রোতকে বোঝায়, যা ভিড় করে ছোটে এবং এক মুহূর্ত স্থির থাকে না, তাকে তিনি তালভঙ্গ না করে মনের মধ্যে দ্রুত এবং সম্পূর্ণ ধরতে পারেন আর কাগজে-কলমে সেটা দ্রুত এবং সম্পূর্ণ তুলে নিতে পারেন। এই শক্তির মূলে আছে বিশ্ব-ব্যাপারের প্রতি তাঁর মনের সজীব আগ্রহ। তাঁর নিজের কাছে তুচ্ছ বলে কিছুই নেই, তাই তাঁর কলমে তুচ্ছও এমন একটি স্থান পায় যাতে তাকে উপেক্ষা করা যায় না। সাধারণত, এ কথা বলা চলে যে শব্দতত্ত্বের মধ্যে যারা তলিয়ে গেছে শব্দচিত্র তাদের এলেকার সম্পূর্ণ বাইরে, কেননা চিত্রটা একেবারে উপরের তলায়। কিন্তু, সুনীতির মনে সুগভীর তত্ত্ব ভাসমান চিত্রকে ডুবিয়ে মারে-

নি এই বড়ো অপূর্ব। সুনীতির নিরন্ধ্র চিঠিগুলি তোমরা যথাসময়ে পড়তে পাবে—দেখবে এগুলো একেবারে বাদশাই চিঠি। এতে চিঠির ইম্পিরিয়ালিজম; বর্ণনা সাম্রাজ্য সর্বগ্রাহী, ছোটো বড়ো কিছুই তার থেকে বাদ পড়েনি। সুনীতিকে উপাধি দেওয়া উচিত—লিপিবাচস্পতি কিংবা লিপিসার্বভৌম কিংবা লিপিচক্রবর্তী।'

১৩৩৪-এর চৈত্র মাস। সে-সময় কলকাতায় সাহিত্যের রস-আদর্শ, রুচি, শ্লীল-অশ্লীলের মানদণ্ড নিয়ে সাহিত্যসেবীদের মধ্যে রীতিমত মতান্তর ও মনান্তর চলছিল। কবি কলকাতায় এলে তাঁকে এ ব্যাপারে মধ্যস্থতা করবার জন্য অনুরোধ করা হয়। কবির সভাপতিত্বে জোড়াসাঁকোর বিচিত্রা ভবনে সভা বসে ৪ এবং ৭ চৈত্র। এই সভায় অন্যান্যদের সঙ্গে যোগ দেন সুনীতিকুমার, অপূর্বকুমার চন্দ, প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ, নীরদচন্দ্র চৌধুরী, অমল হোম, প্রমথ চৌধুরী, অবনীন্দ্রনাথ ও সজনীকান্ত দাস।

এই সভায় সুনীতিবাবু কবিকে বলেছিলেন, 'সামাজিক প্রাণী হিসাবে সাহিত্যিকের সামাজিক বিধি-ব্যবস্থাকে ভাঙবার কতটা অধিকার আছে আপনি বিচার করবেন।' এর উত্তরে রবীন্দ্রনাথ যা বলেন তা সাহিত্যের পথে গ্রন্থের অন্তর্গত সাহিত্য সমালোচনা নিবন্ধে লিপিবদ্ধ আছে।

সুনীতি চাটুজ্যে যে-সব জ্ঞান-গম্ভীর গ্রন্থাদি লেখেন তা বোধ হয় সাধারণ মানুষের জন্য নয়। এ প্রসঙ্গে স্বভাবতই শেষের কবিতার অমিত রায়ের কথা মনে পড়ে। গল্পে সে-ও সাধারণ মানুষ নয়; বরং অসাধারণ। তার সম্পর্কে কবির বর্ণনা—

''কিছুদিন ওর কাটলো পাহাড়ের ঢালুতে দেওদার গাছের ছায়ায় বই পড়ে পড়ে। গল্পের বই ছুঁলে না, কেননা, ছুটিতে গল্পের বই পড়া সাধারণের দস্তুর। ও পড়তে লাগলো সুনীতি চাটুজ্যের বাংলা ভাষার শব্দতত্ত্ব।'

রবীন্দ্রনাথ নিজেও সুনীতিবাবুর O. D. B. L. গ্রন্থটি গভীর মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন করেছিলেন।

১৩৩৬-এর ভাদ্রে শেষের কবিতা বেরলো, আর ওই বছরেরই ২৫ মাঘ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের বিশেষ অধিবেশনে কবি পড়লেন শব্দ-চয়ন শীর্ষক একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ। বিভিন্ন ইংরেজি শব্দের যথোপযুক্ত বাংলা প্রতিশব্দ কি হবে তার তালিকা। প্রবন্ধের শেষে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

'যা সংগ্রহ করতে পেরেছি, তা শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমারের প্ররোচনায় প্রকাশ করবার জন্য তাঁর হাতে অর্পণ করলুম। অন্তত এর অনেকগুলি শব্দ বাংলা লেখকদের

কাজে লাগবে বলে আমার বিশ্বাস।'

১৩৩৮ অগ্রহায়ণে বিচিত্রায় ছান্দসিক প্রবোধচন্দ্র সেন যে-প্রবন্ধ লেখেন, তারই উত্তর দিতে গিয়ে ওই পত্রিকার পৌষ-সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথ নিজের বক্তব্যের সমর্থনে 'বাংলার বিখ্যাত ধ্বনিতত্ত্ববিদ সুনীতিকুমারের বিধান' উপস্থিত করেন।

১৯৩২ সালে (১৩৩৯ বঙ্গাব্দে) রবীন্দ্রনাথ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে বিশেষ অধ্যাপক পদ গ্রহণ করেন। সুনীতিবাবুও সে-সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক। কিন্তু যে-মুহূর্তে রবীন্দ্রনাথ হলেন অধ্যাপক, সেই মুহূর্তে অপর সকলে অধ্যাপকের উচ্চ মঞ্চ থেকে ছাত্রদের আসনে এসে বসে গেলেন।

সেদিনের বাংলা বিভাগের ছাত্র শশিভূষণ দাশগুপ্ত লিখেছেন—

'তখন আশুতোষ বিল্ডিং-এর ১৮-সি সংখ্যক ঘরে বাংলা ষষ্ঠ বার্ষিক শ্রেণীর ক্লাশ হইত; কবি সেই ঘরেই আসিলেন। সেদিনও অবশ্য আমরা বাংলার ছাত্ররা ব্যতীতও অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপক প্রিয়রঞ্জন সেন প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ের বহু অধ্যাপককে ছাত্রদের আসনে দেখিতে পাইলাম। কবি আসিয়া অধ্যাপকের আসন গ্রহণ করিলে কবির পক্ষ হইতে অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় আমাদের নাম ডাকিলেন। তখন আমাদের রবীন্দ্রনাথের বলাকা পাঠ্য ছিল। আমরা কবিকে অনুরোধ করিলাম বলাকার দুই একটি কবিতা পড়াইতে। তিনি কোনও নির্দিষ্ট কবিতা অবলম্বন না করিয়া বলাকার কবিতাগুলি কোথায় কি পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে এবং কি মানসিক অবস্থানের মধ্যে রচনা করিয়াছিলেন তাহা তাঁহার অননুকরণীয় ভাষা ও ভঙ্গিতে বর্ণনা করিতে লাগিলেন।'

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত বাংলা বানানের নিয়ম গ্রন্থের ভূমিকায় শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় লেখেন, 'কিছুকাল পূর্বে রবীন্দ্রনাথ চলিত বাংলা ভাষার বানানের রীতি নির্দিষ্ট করিয়া দিবার জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে অনুরোধ করেন।' কবির অনুরোধ অনুসারে শ্যামাপ্রসাদ এ-বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। ১৯৩৫ সালে বাংলা বানান সংস্কার কমিটি গঠন করা হয়। সদস্য হলেন প্রমথ চৌধুরী, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, বিজনবিহারী ভট্টাচার্য প্রমুখ। সভাপতি ও সম্পাদক হন যথাক্রমে রাজশেখর বসু ও চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য।

কমিটির তিন সদস্য সুনীতিকুমার, চারুচন্দ্র ও বিজনবিহারী একদিন কবির কাছে যান। হীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়ের একটি রচনায় এদিনের সুন্দর বিবরণ পাই—

"রবীন্দ্রনাথের মুখ থেকে সাহিত্য সম্পর্কে কিছু শোনার আগ্রহ ছিল। কিন্তু বাধা পড়ল সুনীতিবাবু, চারুবাবু ও বিজন ভট্টাচার্যের আগমনে।

'তারপর কি খবর?' রবীন্দ্রনাথ তাঁদের অভ্যর্থনা করলেন।

'বানান পরিষদের দায়িত্ব পড়েছে ঘাড়ে। তাই বাংলা বানান সম্বন্ধে আপনার কিছু মতামত দরকার,' বলে নিজেকে একটু এগিয়ে দিলেন সুনীতিবাবু।

ক্ষণকাল মৌন থেকে রবীন্দ্রনাথ বললেন, 'বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যোগাযোগ তো ছিল না কোনদিন। ও পথ মাড়াই নি। আমার মতামত?'

'আপনার মতামত ছাড়া কি বাংলা ভাষার কোনো পরিবর্তন করা চলে! বিশেষ করে আমাদের যুগে যখন আপনাকে পেয়েছি।' বলে সুনীতিবাবু বানানের কথা পাড়লেন। 'কতকগুলো শব্দের মৌলিক রূপটা বজায় রাখবার জন্য চলতি বানান কিছু কিছু পরিবর্তন করতে চাইছি।'

'যথা?' রবীন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাইলেন।

সুনীতিবাবু বললেন, 'যেমন গরু। আমরা বানান লিখি গরু। কিন্তু আমার মনে হয় শব্দটা গো-রূপা থেকে এসেছে। সুতরাং বানানটা গরু না হয়ে গোরু হলেই ভাল হয়।'

'হাঁ। অন্তত কলেবর বৃদ্ধি হয়। গাইগুলো দিন দিন যেমন ক্ষীণ হয়ে পড়েছে, কলেবর বাড়ানো ভালো নিশ্চয়ই, কিন্তু তাতে দুধ বাড়বার সম্ভাবনা আছে কি?' রবীন্দ্রনাথ কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টিতে মুখ তুলে চাইলেন। কারো পক্ষেই হাসি সংবরণ করা সম্ভব হল না।"

রবীন্দ্রনাথের পরামর্শ এবং আরো দু শত বিশিষ্ট লেখক ও অধ্যাপকের মতামত নিয়ে বাংলা বানানের নিয়ম সংকলনের খসড়া হল। খসড়া চূড়ান্তভাবে অনুমোদনের সময় রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র স্বাক্ষর দেন।

এই সময় আর একটি কমিটি গঠিত হয়। তার কাজ বাংলা পরিভাষা সংগ্রহ। পরিভাষা কমিটির সদস্য হন সুনীতিকুমার, বিজনবিহারী ও চিন্তাহরণ চক্রবর্তী। সভাপতি রাজশেখর বসু, সম্পাদক চারু ভট্টাচার্য এবং সহ-সম্পাদক প্রমথনাথ বিশী। রবীন্দ্রনাথ এই কার্যে কর্ণধারের ভূমিকা গ্রহণ করেন।

এরই বছর দুই পরে ১৯৩৮ সালে কবি তাঁর গ্রন্থখানি ভাষাচার্যকে উৎসর্গ করেন।

শালপ্রাংশু

পলাশ মিত্র

সুনীতিকুমারের কাছে যে কদিন গিয়েছি, সে কদিনই মনের মধ্যে ভীরু হরিণের আনাগোনা ছিল। কখন কি জিজ্ঞাসা করবেন, কোন্ প্রশ্ন করবেন এবং আমার উত্তরে তাঁর কি প্রতিক্রিয়া হবে—সেই ভেবে প্রায়ই নিজেকে নিয়ে বড় বেশি ব্যস্ত থাকতুম। যদিও কখনও তিনি কোন প্রশ্ন করে, কোনও কটু বা কঠোর মন্তব্য করে আমাদের বিব্রত করতেন না। বরঞ্চ বলা যায়, সব সময়েই পরম স্নেহে কাছে ডেকে নিয়ে বসাতেন। কখনও তাঁর বাসভবনের একতলার ঘরে, কখনও বা দোতলার ঘরে। স্কুলের ক্লাস নাইনে যে সুনীতিকুমারের বাংলা ব্যাকরণ পড়েছি, এম. এ. ক্লাসে যাঁর O. D. B. L. পড়বার চেষ্টা করেছি এবং পরবর্তীকালে যাঁর পাণ্ডিত্যের গভীরতায় ও ব্যাপ্তিতে সবিস্ময়ে তাঁর প্রতি সুগভীর শ্রদ্ধায় মাথা নত করেছি—সেই হিমালয়সদৃশ পুরুষকে সামনাসামনি দেখব, তাঁর সঙ্গে কথা বলব এবং তিনি আমার সঙ্গে কথা বলবেন, এ সব এক সময় ধারণার বাইরে ছিল। সুতরাং যতই তিনি ভালবেসে কাছে নিতেন, আমাদের নানা সাহিত্যকর্মে উৎসাহ দিতেন, আমাদের কিন্তু 'জয় করে তবু ভয় কেন তোর যায় না' অবস্থা কাটতে সময় নিয়েছিল।

কিন্তু আচার্য সুনীতিকুমার ছিলেন সহজ-সরল। এক এক সময় শিশুর মতো সরলতা। দোতলার ঘরে থরে-থরে সাজানো থাকত দেশ-বিদেশের নানান সংগ্রহ। অতি উৎসাহে ও আনন্দে সে সব সংগ্রহ আমাদের দেখাতেন। তাঁর শোবার খাট জুড়ে থাকত বই। ভালো বই, ভালো থিসিস আমাদের দেখিয়ে লেখকের প্রশংসা করতেন। বলতেন, 'আমার সঙ্গে দেখা করতে এলে অনেকেই বলেন, কিছু লিখে দিন। কিন্তু শুধু শুধু আমি লিখবো কেন বলো?' তারপর ভালো বইয়ের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলতেন, 'কই, এদের বইয়ের জন্য তো আমাকে বলতে হচ্ছে না; আমি ঠিক লিখে দেবো।'

দেশের যুবসম্প্রদায়ের প্রতি তাঁর অপরিসীম ভালবাসা ছিল, কিন্তু দেশীয় কৃষ্টি-সংস্কৃতি সম্পর্কে তারা উদাসীন হওয়ায় তিনি বেদনা বোধ করতেন। ভাসা-ভাসা জ্ঞান বা চালাকি তিনি সহ্য করতে পারতেন না। কোনও ক্ষেত্রেই ভণ্ডামির পক্ষ নিতেন না। সব রকমের ভণ্ডামিতে তিনি প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ হতেন, বহু সময়ে তীব্র

ভাষায় ক্রোধ প্রকাশ করতেন। কেননা, অন্যায়ের সঙ্গে সুনীতিকুমারের কখনই ও কোনও সময়েই আপোস ছিল না।

নিজের চিন্তাভাবনা ও যুক্তিতে যাকে সঠিক মনে করতেন, তা প্রকাশ করতে তাঁর বাধা ছিল না। যুগপোষিত বিশ্বাসকে তা নাড়া দিলেও, সুনীতিকুমার ভীরু ব্যক্তিত্বের মানুষ ছিলেন না মোটেই। সত্য ন্যায় ও বিশ্বাসের জন্য অযুত প্রতিবাদও অনায়াসে অগ্রাহ্য করার মানসতা তাঁর ছিল।

এ প্রসঙ্গে রামায়ণ বিতর্কের কথা অনেকেরই মনে থাকার কথা। রামায়ণ সম্পর্কে সুনীতিকুমার যে তিনটি সিদ্ধান্ত পেশ করেছিলেন, তা হলো : এক, রামায়ণ বাল্মীকির রচনা নয়. এর লেখক চ্যবন। দুই, রামায়ণ মূলত পালি দশরথ-জাতক ও জৈন রামকথা অনুসরণে লেখা। আর তিন, হোমরের ইলিয়াড মহাকাব্যের প্রভাব আছে রামায়ণে।

কবিতা-পত্রিকা 'জীবনানন্দ'র পক্ষ থেকে রামায়ণ সম্পর্কে সুনীতিকুমারের আলোচনার সূত্রে একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করার মানসে ১৩৮৩-র বৈশাখের এক সকালে আচার্য সমীপে উপস্থিত হই। আমাদের এই প্রয়াস তাঁর অনুমোদন লাভ করে। কিন্তু তাঁর শরীর তেমন সুস্থ না থাকায় 'জীবনানন্দ' পত্রিকার রামায়ণ সংখ্যায় লেখা দেবার ব্যাপারে ঠিক নিশ্চয় করে কিছু বলতে পারেন না। তবে আমাদের নিরাশও করলেন না। পরে আর একদিন যোগাযোগ করতে বললেন। তাঁর আদেশ মত একদিন তাঁকে একটি চিঠি লিখলুম। উত্তরে আমাকে ইংরেজিতে তিনি জানালেন : I am terribly busy and besides what I want to say, I am thinking of writing it all in a book which I already in hand—'On the Ramayanas, its character, its genesis, its expansion and its exodus outside India, You will have to wait for this book, but I do not know when it will be possible for me to bring it out—at my age of 86.

এই চিঠি পাবার পর তাঁর কাছে ছুটে গেলাম। তিনি পরম স্নেহে মমতায় আমার পিঠে হাত বুলিয়ে বললেন, লেখাটি বেশ বড় হবে আর সময়ও নেবে। তা হলে পত্রিকার প্রকাশে দেরি হয়ে যাবে। আমি যেন কিছু মনে না করি।

আমার মনে করার কিছু ছিল না। তাঁর লেখা আমি না পেলেও যদি সেটি গ্রন্থাকারে বেরোয়, তা হলেও আমাদের পরম প্রাপ্তি। রামায়ণ সম্পর্কে এই মহামনীষীর রচনা যত শীঘ্র মুদ্রিত রূপ পায়, ততই আনন্দ। সুতরাং দুঃখ পেলাম না

সেই কারণে। কিন্তু চিঠির একটি অংশে কেমন যেন হতাশা! আচার্যর কাছে এরকম তো কখনও পাইনি। ছিয়াশী বছরের কথা উনি বলছেন কেন? দেহ ও মনের সুসমঞ্জস বিকাশ তাঁর মধ্যে লক্ষ্য করে আমরা কত আনন্দ পেতুম। চিত্তোৎকর্ষ আর দেহোৎকর্ষ—এই দুয়ের অপূর্ব সমন্বয়ের নামই তো সুনীতিকুমার।

তাঁর দেহ ছিল সুদীর্ঘ ও বলিষ্ঠ, পেশী ছিল সুগঠিত, অস্থি ছিল প্রশস্ত। দুর্বল ক্ষীণকায় বাঙালীদের মধ্যে এদিক থেকে তিনি উজ্জ্বল ব্যতিক্রম।

আচার্যকে দেখে আমার বারবার মনে পড়ত রবীন্দ্রনাথের কথা। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, দেহশক্তিহীন পণ্ডিত বা বুদ্ধিশক্তিহীন পালোয়ান, কেউ আদর্শস্থানীয় হতে পারে না।

আচার্যর সামনে যতবার দাঁড়িয়েছি, ততবারই রবীন্দ্রনাথের ঐ উক্তির মূর্তিরূপ দেখেছি তাঁর মধ্যে। এ আমার সারা জীবনের সম্পদ। পরম সৌভাগ্য।

সৌন্দর্যবোধ ও সুনীতিকুমার

অমিতাভ গুপ্ত

চলতি অর্থে রূপচর্যা বলি যাকে, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের অন্বিষ্ট ঠিক তা ছিল না। কবি হিসেবে তাঁকে আমরা চিনি না, ছবি আঁকিয়ে হতে চেয়েছিলেন নাকি কখনো অথবা ধ্রুপদী গানের ওস্তাদ তাও আমাদের জানা নেই। সবচেয়ে বেশি অবাক্ করে দেয় এই তথ্যটি যে তাঁর অজস্র রচনার মধ্যে নন্দনতত্ত্বের আলোচনা কিছুতেই সহজলভ্য নয়। অর্থাৎ যে সুনীতিকুমার আমাদের অনেক চেনা তিনি আচার্য ও জ্ঞানী, হয়ত গ্রন্থজীবী সুনীতিকুমার।

তবু, সেই সুনীতিকুমারই সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সবটুকু নয়। তিনিও তো খুঁজেছেন অপরূপকে—মানুষের অপরাজিত সৌন্দর্যবোধ যার সমার্থক—পেয়েছেন তাকে নিজস্ব জীবনচর্যায়, পথের সঞ্চয়ে। ১৯৪০ সনে প্রকাশিত তাঁর 'রবীন্দ্র-সংগমে দ্বীপময় ভারত ও শ্যামদেশ' গ্রন্থটিই আমাদের কাছে সুনীতিকুমারের সৌন্দর্যবোধের পর্যাপ্ত অভিজ্ঞান। এই গ্রন্থটি পাঠ করেও আমরা বুঝতে পারি, সুনীতিকুমারের জীবনচর্যায় মানুষের প্রাগুক্ত সৌন্দর্যবোধ কী বিপুল উল্লাসে ধরা পড়েছিল। রূপ তো কেবল ফর্ম অথবা অতিপ্রত্যক্ষ সিমেট্রি নয়। মানুষের জ্ঞানে ও চিন্তায়, কর্মে এবং অনুধ্যানে যে রসসঞ্চার ঘটে তাও কি সুন্দর নয়? তা-ও কি নয় রূপাভাস, সৌন্দর্যের অভিজ্ঞতা আমাদের? সুনীতিকুমারকে আমি কখনো দেখিনি, সুভগ বিদ্বৎজনের কাছে তাঁর ব্যক্তি-পরিচয়ের কিছু গল্প শুনেছি মাত্র, সেই না-দেখা সুনীতিকুমারের একটি চেহারা যেন আমার মনে পড়ে। টেবিলের উপর ঝুঁকে পড়েছেন তিনি, রাতের মোম জ্বলে জ্বলে তবু তার শেষ শিখাটিকে চাইছে আরো কিছুক্ষণ বাঁচিয়ে রাখতে: এই যে ধ্যানের মূর্তি, সেও কি নয় সুন্দরেরই ব্যঞ্জনা?

তাই যখন অন্য-এক সুনীতিকুমারের উদ্ভাস দেখি দ্বীপময় ভারতের অপূর্ব দিগন্তে, ধবলঢেউ ও লবণবাতাসের মুখোমুখি দাঁড়ানো সেই সুনীতিকুমারকে আমাদের অচেনা লাগে না।

'রবীন্দ্রসংগমে দ্বীপময় ভারত ও শ্যামদেশ' এমনই একটি গ্রন্থ যার সকল দিক-নির্ণয় আমাদের অসাধ্য: একটি অথবা দুটি দিগন্তের সন্ধান করে আমাদের আত্ম-

সমর্পণ করতে হয় গ্রন্থটিতে প্রতিফলিত সুনিতীকুমারের সৌন্দর্যচেতনায়। প্রসঙ্গত বলে রাখা ভালো, এই মহাজ্ঞানকোষের স্বাদ গ্রহণ করেননি যিনি এখনো— বাংলাসাহিত্যের অর্ধাংশ তাঁর অপঠিতই রয়ে গেল, কিংবা আরো কিছু বেশি। অবশ্য 'রবীন্দ্রসংগমে দ্বীপময় ভারত ও শ্যামদেশ' পড়বার সময়ই বা কই আজ আমাদের? যেটুকু সময় পাওয়া যায়, এ জীবনে, তা অতিচটুল পত্রিকায় ভ্রমণ-কারির চটুলতর আত্মবিজ্ঞাপন পাঠ করেই তো ব্যয় হয়, ব্যয় হতে থাকে। সুনীতি-কুমারের বইটি শুধু পড়ে থাকে লাইব্রেরির অন্ধকারে, নম্র অপেক্ষায়, আমাদের সাহিত্যরুচির বদল কবে হবে হয়ত তারই অপেক্ষায়।

পৃথিবীকে সুন্দর বলে চিনেছিলেন সুনীতিকুমার। মানুষও সুন্দর। মানুষের বেঁচে থাকার অভিজ্ঞতা আসলে সৌন্দর্যেরই অভিজ্ঞতা। পৃথিবীর রূপ চিনে নিতে যে-সুনীতিকুমার দ্বীপময় ভারত ভ্রমণে বেরিয়েছিলেন সেই মানুষটিকে কোনো লাইব্রেরির আঁটোসাঁটো পাহারায় তো মানায় না। কিংবা বলা ভালো, সেই মানুষ আর এই মানুষের আশ্চর্য সমন্বয় ঘটেছিল তাঁর চরিত্রে। সমন্বয়ের ফলশ্রুতি, 'রবীন্দ্রসংগমে দ্বীপময় ভারত ও শ্যামদেশ'।

গ্রন্থনামটিই, মনে হয়, বর্তমান নিবন্ধকারের মতো সাধারণ পাঠককে ভাবিয়ে তোলার পক্ষে যথেষ্ট। একদিন ভারতবর্ষ বলতে সমগ্র পৃথিবীকেই বুঝতাম আমরা। আজ জানি ভারতবর্ষ আরেকটু ছোট। বরাহমিহিরের কল্পনায় প্রতিভাত ভারত-বর্ষের সহস্রদল পদ্মের রূপটি আজ আর আমাদের চোখে ধরা পড়ে না, এমনকি সুনীতিকুমারের দেখা দ্বীপময় ভারতও আজ আর তত বেশি ভৌগোলিক সত্য নয়। তবু সেই ভারতবর্ষের অস্তিত্ব আজও যেন অনুভব করা যায়, সেই ভারতবর্ষের দিকেই অবিচ্ছিন্ন মানবস্রোত যেন প্রবাহিত হয়ে চলেছে। এ যেন তীর্থযাত্রা, এবং একালের ভারতবর্ষের এই তীর্থযাত্রা সম্পূর্ণ হয় রবীন্দ্রসংগমে।

রবীন্দ্রনাথের অভিজ্ঞানে বিশালতর ভারতবর্ষকে চিনেছেন সুনীতিকুমার, অথবা ভারতচেতনার অনশ্বর ব্যক্তি তাঁকে সাহায্য করেছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে চিনতে: তর্ক এখন থাক্। আমরা কেবল লক্ষ্য না করে পারি না রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সুনীতিকুমারের সম্পর্ক শুধুমাত্র গুরু ও শিষ্যের সম্পর্ক নয়। বিশালতর ভারতবর্ষকে যথার্থ জানতে হলে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গ প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে: দ্বীপময় ভারতকে দেখতে হয় অনেকটাই রবীন্দ্রদৃষ্টির প্রসাদে, জারিত হয় মন রবীন্দ্র-ভাবনায়। যব-দ্বীপ এবং ভারতবর্ষের ভাবগত যে সেতুবন্ধন ইতিহাসের কালে রচিত হয়েছে, যার প্রভাব এখনো দেখা যায় ভাষাসাদৃশ্যে—লক্ষ্য করেছিলেন সুনীতিকুমার। তারই

কাব্যরূপ আমরা পেয়েছি 'পরিশেষ' গ্রন্থের 'শ্রী বিজয়লক্ষ্মী' কবিতায় :

'এই যে-পথে হয়েছিল মোদের যাওয়া-আসা
আজো সেথায় ছড়িয়ে আছে আমার ছিন্ন ভাষা।'

অনুসন্ধিৎসু প্রশ্ন তুলতে পারেন, চিন্তাবিনিময়ের ক্ষেত্রগুলিতে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন কে, রবীন্দ্রনাথ, না কি সুনীতিকুমার? আমাদের মনে হয়, অন্তত 'রবীন্দ্রসংগমে দ্বীপময় ভারত ও শ্যামদেশ' গ্রন্থে বিধৃত বিবরণ পাঠ করে মনে হয়, এই বিনিময় ছিল সদর্থে, সর্বার্থেই পারস্পরিক—এবং, আগেই যে কথা বলা হয়েছে, উভয়ের সম্পর্ক ঠিক গুরু ও শিষ্যের সম্পর্ক ছিল না। ফলে, সুনীতিকুমারের কোনো দিনলিপিতে (১৮ অগাস্ট ১৯২৭) যখন পাঠ করি তাঁর মন্তব্য, 'কবির সঙ্গে নানা বিষয়ে খুব আলাপ-আলোচনা জমল' তখন স্বভাবতই আমাদের ক্ষুব্ধ হতে হয় এই ভেবে যে সেই 'আলাপ-আলোচনা'র বিশদ বিবরণ আজ আর পাওয়ার কোনো উপায় নেই।

২৪ অগাস্ট ১৯২৭-এর দিনলিপিতেও এ ধরনের বাক্‌সংযম আমাদের পীড়িত করে। তবে অনেকক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর আলাপের দীর্ঘতর বর্ণনা তিনি রেখেছেন। জাহাজের ডেকে বসে কয়েকটি ঘণ্টা অনবদ্য আড্ডা দিয়ে চলেছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, এই দৃশ্য কল্পনা করলেই আমরা এক ধরনের কাব্যিক উচ্ছ্বাস অনুভব করি। উচ্ছ্বাস, আবেগপ্রবণতা শুনেছি আধুনিক রুচিসম্মত নয়। অতএব, এ প্রসঙ্গ থাক। রবীন্দ্রনাথের যে ছবি সুনীতি-কুমারের কলমে ধরা পড়েছে তারই দিকে বরং দৃষ্টি ফেরানো যাক। এ ছবি আমাদের না-দেখা ছবি। ১৯২৭ সনে 'মালায়া ট্রিবিউন' নামক একটি সংবাদ-পত্রের ষড়যন্ত্রে কিভাবে রাজনৈতিক ফাঁদ পাতা হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের জন্য, এবং স্বদেশের কয়েকজন বিখ্যাত ব্যক্তিও কিভাবে সেই ফাঁদটিকে বিস্তার করতে সাহায্য করেছিলেন, তার সম্পূর্ণ আলেখ্য দিয়েছেন সুনীতিকুমার। এই বিবরণে, অপমানে পাণ্ডুর যে বৃদ্ধের মুখের আদল ধরা পড়ে—মৃত্যুর আগে পর্যন্ত যাঁকে অজস্র উদ্‌ভ্রান্ত আত্মরতিময় লেখকের নিত্য অপ্রিয় অশালীনতা (মৃত্যুর পরেও, এখনো, ভাগ্যিস তিনি আর বেঁচে নেই) সইতে হয়েছে—সেই বৃদ্ধই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। সেই বৃদ্ধকে, ভ্রমণকালে, নিকট বন্ধুর মমতা দিয়ে ঘিরে রেখেছিলেন সুনীতিকুমার। কখনো আবার, তাঁরই প্রতি, মৃদু বক্রোক্তির সুযোগ করে নিয়েছেন। অসুস্থ, ক্লান্ত রবীন্দ্রনাথকে যখন কোনো ভোজসভায় যোগ দিতে বাধ্য করা হয় তখন সুনীতি-

কুমার মন্তব্য করেন : 'উপায় নেই, তাঁর প্রতিষ্ঠার গৌরবের ভার তাঁকেই বহন করতে হবে।'

ইতস্তত মন্তব্য, এবং কয়েকটি বর্ণনার ফলে রবীন্দ্রনাথ ও সুনীতিকুমারের ব্যক্তিগত সম্পর্কের স্বরূপটি 'রবীন্দ্রসংগমে দ্বীপময় ভারত ও শ্যামদেশ' গ্রন্থে সহজেই তাই আমাদের কাছে প্রত্যয়িত হয়। যে রবীন্দ্রনাথের নিজের কবিতার—সুনীতিকুমারের কথায়ই আমরা প্রথম জানতে পারি—'নিজের তর্জমা ছাড়া অন্য কারো তর্জমাতেই পূর্ণ প্রীতি হয় না'; যে রবীন্দ্রনাথ ধনীর দৈন্যের অহংকারে এবং সজ্জিতের রূপের বিদ্রূপে, তাঁর ব্যক্তিগত আচরণেও প্রতিক্রিয়া দেখাতেন, সেই রবীন্দ্রনাথকে সুনীতিকুমার আপন করে চিনেছিলেন, ছোট ছোট প্রাত্যহিক ঘটনায়। সুনীতিকুমারকেও বোধকরি অতি নিকট বলেই জেনেছিলেন রবীন্দ্রনাথ, কেননা তাঁরই অনুযোগে কখনো 'সাগরিকা' কবিতায় একটি নতুন স্তবক যোগ করতে হয় রবীন্দ্রনাথকে, কখনো বা কোনো পদস্থকে পূজার মুদ্রা শেখানোর কথা ভাবতে হয়।

ব্যক্তিগত পরিচয়ের এই ঘনিষ্ঠ অভিজ্ঞতার ফলে, সুনীতিকুমারের সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ যে মন্তব্য করেছিলেন তার গুরুত্ব এবং প্রাসঙ্গিকতাকে চূড়ান্ত বলে মেনে নেওয়া ছাড়া আমাদের কোনো উপায় নেই। সার্টিফিকেট দিতে, শুনেছি, রবীন্দ্রনাথ, অন্যান্য আর সমস্ত বিষয়ের মতোই, অত্যন্ত উৎসাহী এবং দক্ষ ছিলেন। কিন্তু সুনীতিকুমার সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য সার্টিফিকেট নয়, ভাষার উচ্ছ্বাসও নয় : বিশ্লেষণধর্মী, বিদ্যুৎ-ঝলকের মতো সম্পূর্ণ চিনিয়ে দেয় আমাদের সুনীতিকুমারের চরিত্রটিকে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'আমি তাঁকে নিছক পণ্ডিত ব'লেই জানতুম। অর্থাৎ আস্ত জিনিসকে টুকরো করা ও টুকরো জিনিসকে জোড়া দেওয়ার কাজেই তিনি হাত পাকিয়েছেন ব'লে আমার বিশ্বাস ছিলো। কিন্তু এবার দেখলুম, বিশ্ব বলতে যে ছবির স্রোতকে বোঝায়, যা ভিড় ক'রে ছোটে এবং এক মুহূর্ত স্থির থাকে না, তাকে তিনি তাল-ভঙ্গ না ক'রে মনের মধ্যে দ্রুত এবং সম্পূর্ণ ধরতে পারেন, আর কাগজে-কলমে সেটা দ্রুত এবং সম্পূর্ণ তুলে নিতে পারেন। এই শক্তির মূলে আছে—বিশ্ব-ব্যাপারের প্রতি তাঁর মনের সজীব আগ্রহ।' পাঠককে মনে করিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন নেই যে আমাদের বর্তমান আলোচনার মূল প্রতিপাদ্য রবীন্দ্রনাথ ও সুনীতিকুমারের পারস্পরিক সম্পর্ক নয় : আমরা এখানে সুনীতিকুমারের সৌন্দর্যচেতনার নির্মাণ এবং ফলশ্রুতি চিনে নিতে চেষ্টা করছি মাত্র। যে সৌন্দর্যচেতনার যথার্থ প্রতিফলন ঘটেছে 'রবীন্দ্রসংগমে দ্বীপময় ভারত ও

শ্যামদেশ' গ্রন্থে, তার বিশ্লেষণ করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথের কথা অনিবার্য ভাবেই এসে পড়ে। তাই, রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ। 'মনের সজীব আগ্রহ' নিয়ে বিশ্ব-পৃথিবীকে যখন দেখেছেন সুনীতিকুমার, অভিষিক্ত করেছেন তাঁর মননকে সৌন্দর্যের অপরূপ অভিজ্ঞতায়, তখনই রবীন্দ্রনাথ রয়েছেন, তাঁরই খুব কাছে, বিশ্বরূপের খেলাঘরে ক্রীড়ারত সেই দুরন্ত বালক রবীন্দ্রনাথ।

বিশ্বরূপের অভিজ্ঞতা অর্জন অবশ্য সকলের মধ্যে ঘটে না। সুনীতিকুমারের ঘটেছিল, তার কারণ এই মাত্র নয় যে তিনি ছিলেন অনন্যসাধারণ; তাঁর মানসিক গঠনের একটি স্বাভাবিক কবিপ্রবণ রূপতৃষ্ণা ছিল। বাইরের দিক থেকে, বন্ধুজনেরা যেমন হয়ত দেখেছেন, গ্রন্থভুক্ ছিলেন তিনি: বহুভাষাবিদ্, জাতীয় অধ্যাপকের চেহারাটি যেমন হলে যথার্থ মানায়। অন্যত্র ('World Literature and Tagore') তিনি জানিয়েছেন, 'The greatest joy I received in my life for over 60 years has been from the study of art and history and culture'. 'Study' শব্দটি আমাদের যেন প্রতারিত না করে। শিল্প, ইতিহাস ও কৃষ্টি আসলে বহু মানুষের অথবা সমগ্র মানুষের বেঁচে থাকার আখ্যান, এবং পটভূমিও বটে। মানুষের কৃষ্টি ও শিল্পের পাঠ গ্রহণ সম্পূর্ণ হয় না মানুষকে অতি প্রত্যক্ষ ভাবে, ঘনিষ্ঠ ভাবে না জানলে। এ কথা নিশ্চয়ই মনে করিয়ে দিতে হবে না যে সাহিত্যের পাঠক সুনীতিকুমার সাহিত্যের মধ্যে মানুষকেই খুঁজেছেন। তাঁর সেই খোঁজা, সেই মানব-অন্বেষারই পরিপূরক, 'দ্বীপময় ভারত ও শ্যামদেশ' গ্রন্থের স্মৃতিলিপিগুলি।

অজস্র চরিত্রের বর্ণনা আছে এই গ্রন্থে, কোনো কোনো চরিত্রকে ঘিরে গল্প এমন দানা বেঁধে উঠেছে যে পাঠক অনায়াসে কয়েকটি সুখপাঠ্য কাহিনীর রসাস্বাদ লাভ করেন; কাহিনীর কেন্দ্রবিন্দুতে কখনো থাকেন অমায়িক ডক্টর রজার্স, কখনো কোনো রোদনশীল তামিল যুবক; কখনো বা খুব ক্ষয়াটে চেহারায় প্রবল আধ্যাত্মিক চেতনা নিয়ে কোনো রাজামশাই, অথবা এক আমেরিকান পাদ্রী। সর্বোপরি আছে শ্রীমতী ফতিমার আকর্ষক চরিত্র যা অবলম্বন করে যে কোনো লেখকের শ্রেষ্ঠ উপন্যাসটি রচিত হতে পারে। তালিকা বাড়িয়ে লাভ নেই। আমরা কেবল লক্ষ্য করি মানবচরিত্রের পাঠ গ্রহণে সুনীতিকুমার কত বেশি উৎসুক, কত ব্যাপৃত!

তাঁর মনের রসায়নে তাই মানুষের বহুবিচিত্র রূপটি উঠেছে রাঙিয়ে। এও কি নয় কোনো সৌন্দর্যসাধকেরই মনের রসায়ন? ভ্রমণকালে, সুনীতিকুমার কেবল

বিদ্বানদের সঙ্গে বিচরণ করেননি,—ঘুরে বেড়িয়েছেন ইপোর বাজারে, আহার গ্রহণ করেছেন কখনো সস্তা চীনে রেস্তোর‍াঁয় কখনো বৌদ্ধ ভজনালয়ের রন্ধনশালায়। যেসব জায়গায় যাওয়া রবীন্দ্রনাথের কখনো সম্ভব হয়নি : এই ভ্রমণেই তিনি যেন হয়ে উঠেছেন ক্রমশঃ কবির পরিপূরক—'আমায় নইলে ত্রিভুবনেশ্বর, তোমার প্রেম হ'ত যে মিছে।' এবং, এই সুনীতিকুমারকে আমরা দেখি, যদিও কখনো বক্তৃতাদান করতে হয় তাঁকে, ভ্রমণকালেও, ভারতীয় চিত্রশিল্প অথবা শিক্ষা-ব্যবস্থার উপরে, তথ্যজ্ঞান দিয়ে তিনি তাঁর গ্রন্থকে গুরুভার করতে চাননি। মধ্য-যুগের মন্দির বা গীর্জার পরিকল্পনা এসেছে পাহাড এফোঁড় ওফোঁড করা গুহা দেখে, এই চমৎকার তথ্যটি তিনি খুব অবহেলার সঙ্গেই জানিয়ে দেন এবং পরক্ষণেই উৎসাহ প্রকাশ করেন কোনো এক ব্যারিস্টার মশাইয়ের জটিল চরিত্রের বর্ণনায় যিনি রবীন্দ্রনাথকে বিশ্বভারতীর বদলে death-ray আবিষ্কার করবার জন্য অনুরোধ করেন। মানুষের কল্পনাশক্তি এবং ইতিহাসচেতনার বিবর্তন সম্পর্কে, আমরা টের পাই, সুনীতিকুমারের অনেকটাই বলবার আছে; তিনি কিন্তু অধিকতর মনোযোগ দিয়ে বর্ণনা করেন সুদখোর মহাজনের শিকার সাধারণ মালয়ের কথা।

এই হল সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সৌন্দর্যচেতনা। যে প্রবল প্রাণশক্তি, মননশক্তি তাঁর ছিল সেই শক্তি দিয়েই তিনি রূপময় পৃথিবীকে গ্রহণ করেছেন আপন বলে। সুনীতিকুমারের লেখায় বলিদ্বীপের মেয়েদের সুদীর্ঘ বর্ণনা (জনপদকন্যাদের মুখে অস্ফুট প্রশ্নময় ভাবটি তাঁর মনোহর লেগেছিল), তাদের বেশ-বাসের ইতিহাস, স্নানরতা সুন্দরীর প্রসঙ্গও আমাদের বিরক্ত করে না। সমস্ত অভিজ্ঞতাকে তিনি তাঁর সৌন্দর্যচেতনা দিয়েই তো দীপ্ত করে তুলেছেন, এবং মেয়েরাও তো মানুষ। মানুষ-ই সুনীতিকুমারের কাছে সৌন্দর্যের প্রতীক।

সুনীতিবাবুর অপ্রকাশিত পাণ্ডিত্য

সত্যরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

১৯৪২ সাল। ঠিক চল্লিশ বছর আগের কথা। 'ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ' বেরুলো সুনীতিবাবুর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। সে এক 'বমশেল'। ব্যাকরণের এক নতুন দিক, নতুন যুগ। যাঁরা এতকাল বাংলা ব্যাকরণ পড়াচ্ছিলেন বা পড়ছিলেন, তাঁরা আবার নতুন করে বাংলা ব্যাকরণ পড়তে আরম্ভ করলেন। ধ্বনিতত্ত্ব, রূপতত্ত্ব ও বাক্যরীতিতে বিভক্ত হলো বাংলা ব্যাকরণ। শিখতে হলো বাংলা বর্ণের উচ্চারণ-বিধি ও ধ্বনি-পরিবর্তনের নিয়ম। জানতে হলো অপিনিহিতি, অভিশ্রুতি, স্বরভক্তি, স্বরসঙ্গতি প্রভৃতি। নতুন করে বুঝতে হলো বাংলা শব্দগঠন-প্রণালী—কৃৎ, তদ্ধিত ও সমাস এবং আরও অনেক কিছু। ১৯৪৩ সালের ম্যাট্রিক পরীক্ষায় প্রথম যখন এসব বাংলা ব্যাকরণের প্রশ্নপত্রে দেখা দিল। তখন বজ্রাঘাত হলো পরীক্ষার্থীদের ওপর। সেই থেকে প্রচলিত হলো বাংলা ব্যাকরণের এক নতুন ধারা। যুগ-প্রবর্তক হয়ে রইলেন আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। নিরূপিত হলেন বর্তমান যুগের পাণিনি বলে। এই বাংলা ব্যাকরণের মাধ্যমেই চল্লিশ বছর আগে আমি সুনীতিবাবুর প্রথম নাম শুনি। তখন আমি স্কুলের ছাত্র।

ঠিক তার দশ বছর পরে ১৯৫২ সালে প্রথম দর্শন পেলাম আচার্য সুনীতিকুমারের কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে। ধন্য হলাম ওঁকে দেখে, মুগ্ধ হলাম ওঁর সঙ্গে কথা বলে। মনে হলো, এক দুর্লভ দেবদর্শন বটে। কত অমায়িক ও সাদাসিধে লোক। অথচ কি প্রকাণ্ড প্রগাঢ় তাঁর পাণ্ডিত্য। তার পর থেকে ঠিক মৃত্যুর আগের দিন পর্যন্ত (২৮শে মে ১৯৭৭ যখন চতুর্থ বার ইংলণ্ড যাই তখন পর্যন্ত) সুনীতিবাবুর সঙ্গে আমার গুরু-শিষ্য সম্পর্ক অটুট ছিল। কখনও তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তি কমেনি। আজও নয়। যতবার তাঁর লেখা পড়ি ও ভাবি, তত বারই মস্তক আনত হয় শ্রদ্ধায় ও পাণ্ডিত্যে। ভাবি, মানুষ এত জানে কি করে? যাঁরা ওঁর মুখ থেকে শুনেছেন তাঁরা বলেছেন 'বাণীর বরপুত্র'। যাঁরা প্রশ্ন করতেন, তাঁরা বলতেন, এ রকম উত্তর দিতে 'স্বয়ং সরস্বত্যপি ন শক্যতে' (স্বয়ং সরস্বতীও দিতে পারেন না)। যাঁরা জ্ঞান-ভাণ্ডারের তল্লাসী

ছিলেন, তাঁরা বলতেন, 'চলমান বিশ্বকোষ' (moving encyclopaedia)। আনাচে-কানাচে তাঁর বহু পাণ্ডিত্যের পরিচয় পড়ে আছে। বহু পাণ্ডিত্যের খোঁজ-খবর অনেকে আজও রাখেন না। অপ্রকাশিত ও অজানা এরকম দু-একটা পাণ্ডিত্যের পরিচয় এখানে উল্লেখ করছি মাত্র।

১৯৭১ সাল। তখন আমি লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের 'স্কুল অব ওরিয়েন্টাল অ্যাণ্ড আফ্রিকান স্টাডিজ'-এ ভারতীয় বিভাগে প্রাচীন ভারতের সাহিত্য ও ভাষাতত্ত্ব পড়াই। স্কুলের বিশাল গ্রন্থাগার। অসংখ্য বই। সব হাতের মধ্যে। নিজের ইচ্ছেমত বই বেছে নিয়ে পড়া যায়। প্রায় অধিকাংশ সময় কাটে তখন গ্রন্থাগারে। হঠাৎ একদিন ক্রমদীশ্বরের (১৩শঃ শতাব্দী) সংক্ষিপ্তসার-নামক সংস্কৃত ব্যাকরণের মধ্যে যে প্রাকৃতাংশ আছে, তার একটা সংস্করণ হাতে এলো। সংস্করণটি ভারতীয়। কলকাতা থেকে ছাপা, বোধ হয় ১৮৮৬ বা ১৮৮৮ সালে। (বইয়ে কোন সন তারিখ ছিল না)। বলাই বাহুল্য, এই সংস্করণটি বহু প্রমাদপূর্ণ। তাই বহু স্থলে প্রাকৃত সূত্রের অর্থ হৃদয়ংগম করা সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। বিশেষ করে বিদেশীদের পক্ষে। স্যার জর্জ অ্যাব্রাহাম গ্রীয়ারসন এই প্রমাদপূর্ণ সংস্করণটি ব্যবহার করতেন এবং বহু স্থলেই সূত্রের মানে ধরতে না পেরে ভারতীয় পণ্ডিতদের শরণাপন্ন হতেন। আর কে সেই ভারতীয় পণ্ডিত হবেন গ্রীয়ারসনের ? সুতরাং ডাক পড়লো ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের। সুনীতিবাবু কিন্তু মূলতঃ ইংরেজী বি-গ্রুপের এম্. এ.। গথিক, জার্মানিক, প্রাচীন ও মধ্য যুগের ইংরেজী ভাষাতত্ত্ব দখল করে নিয়েছেন। লণ্ডনে গিয়ে ভারতীয় আর্য-ভাষাতত্ত্ব রপ্ত করেছেন। পড়েছেন সংস্কৃত, পালি, প্রাকৃত, অপভ্রংশ, নব্যভারতীয় আর্যভাষা। থিসিস করেছেন বাংলা ভাষার উৎপত্তির ওপরে। পেলেন ডি. লিট. লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। কিন্তু এ রকম নজির অনেক আছে। কেন গ্রীয়ারসন সুনীতিবাবুকেই বেছে নিলেন এবং ভাবলেন, সুনীতিবাবুই এসব জটিল সূত্রের উত্তরের সমাধান করতে পারবেন, তার একটা কারণ আছে।

১৯১৯ সালে সুনীতিবাবু যখন লণ্ডনে যান বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে গবেষণার জন্য, তখন স্কুল অব ওরিয়েন্টাল অ্যাণ্ড আফ্রিকান স্টাডিজ-এর দু-বছর বয়স। নিয়ম অনুসারে গবেষণার্থীকে আগে পি. এইচ-ডি. করতে হবে। কিন্তু সুনীতি-বাবু চাইলেন প্রথম বারেই ডি. লিট. করতে। বাদ সাধলেন থিসিস-বোর্ডের লোকেরা। বললেন, "হবে না। আগে পি. এইচ-ডি., পরে ডিঃ লিটঃ।"

সুনীতিবাবু জানালেন, "ভারতীয় সরকারের বৃত্তি তিন বছরের জন্য। সুতরাং সময় পাওয়া যাবে না দুটো করবার।" আবার অনুনয় করলেন থিসিস-বোর্ডের লোকদের কাছে। কিন্তু বিশেষ কোন ফল হল না। ঠিক সে সময়েই মনীষী গ্রীয়ারসন একজন ভারতীয় তথা বাঙালী স্কলার চাইছিলেন যে তাঁর কয়েকটি প্রাকৃত ব্যাকরণের হস্তলিখিত পুথির কতকগুলো পাঠের সমাধান করে দিতে পারবে। বোর্ডের লোকেরা সুনীতিবাবুকে গ্রীয়ারসনের সঙ্গে এ ব্যাপারে সাক্ষাৎ করতে বললেন। সুনীতিবাবু ভগ্নহৃদয়ে গ্রীয়ারসনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। গ্রীয়ারসন তখন রামশর্মা তর্কবাগীশের প্রাকৃত কল্পতরু সম্পাদনা করছিলেন। তিনি সেই পুথির নানান জায়গার পাঠ ও অর্থ বুঝতে পারছিলেন না। তাই একজন ভারতীয় স্কলারের শরণাপন্ন হতে চেয়েছিলেন। সুনীতিবাবুকে সেসব স্থল দেখালেন এবং সুনীতিবাবুও একে একে তার পাঠোদ্ধার করে দিলেন। সুনীতিবাবু ইতিপূর্বে প্রাকৃত কল্পতরু দেখেন নি, পড়া তো দূরের কথা। কারণ, তখনও প্রাকৃত কল্পতরু ছেপে বেরোয় নি। গ্রীয়ারসন সুনীতিবাবুর পাণ্ডিত্য-মিশ্রিত তীক্ষ্ণ বুদ্ধি দেখে বিস্মিত ও অত্যন্ত খুশী। কৌতূহলাক্রান্ত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি এখানে কি করতে এসেছ?" সুনীতিবাবু তাঁর অভিপ্রায় বললেন। "এসেছিলাম ডি.লিট. করতে। কিন্তু তোমার বোর্ডের লোকেরা বলছে পি. এইচ-ডি. করতে। তাই মুশকিলে পড়েছি।" গ্রীয়ারসন তৎক্ষণাৎ জবাব দিলেন, "তুমি যে আমার বইয়ের এত পাঠোদ্ধার করে দিলে, তাতেই তো পি. এইচ-ডি. হয়ে গেল। আবার কেন?" তখন গ্রীয়ারসন সুনীতিবাবুকে যাতে একবারে ডি. লিট.-এ ভর্তি করে নেওয়া হয় তার জন্যে সুপারিশ করলেন। গ্রীয়ারসনের অনুরোধে ও সুপারিশে সুনীতিবাবুকে ডি. লিট.-এ ভর্তি করে নিলেন। ঠিক সেই সময়ে সুশীলকুমার দে মহাশয়েরও একই সমস্যা হলো। সুনীতিবাবু উদার মনের পরিচয় দিলেন। তিনি দে-মহাশয়ের জন্যও গ্রীয়ারসনকে অনুরোধ করলেন। তিনিও ডি.লিট.-এ ভর্তি হয়ে গেলেন। তাই গ্রীয়ারসন সুনীতিবাবুর পাণ্ডিত্যের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। এ কথা গ্রীয়ারসন বহু স্থলে লিখেও গেছেন। ১৯২৫ সালে Sir Asutosh Mookerjee Silver Jubilee—Vol. III, Orientalia—Part 2-তে গ্রীয়ারসনের একটি লেখা প্রকাশিত হয়—"The Eastern School of Prakrit Grammarians and Paiśāū Prakrit নামে। সেখানে গ্রীয়ারসন সুনীতিবাবুর অবদানের যে স্বীকৃতি দিয়েছেন, তা অত্যন্ত

প্রশংসনীয়। রামশর্মা তর্কবাগীশের প্রাকৃত কল্পতরু সম্পাদন করা অত্যন্ত দুরূহ কাজ। এ প্রসঙ্গে গ্রীয়ারসন বলেছেন—

"The task has been by no means easy. The old Bengali characters are difficult to read, and, in places, the text is atrociously corrupt. In those parts which the author had in common with Markaṇḍeya, I had the latter's grammar as a guide and check. For the rest I gratefully acknowledge the kind help which I have received from Dr. Thomas, the Librarian of the India Office, and from Dr. Suniti Kumar Chatterji whose presence in London gave me a fortunate opportunity of availing myself of his accurate scholarship and of his familiarity with old Bengali script. I desire to emphasise my indebtedness to those two gentlemen, as, without their help, I should not have ventured to write this paper."

... .

"The last two pādas of the second verse are corrupt, and have been conjecturally emended, and for the emendations I am indebted to a suggestion of Dr. Suniti Kumar Chatterji."

এবার ক্রমদীশ্বরের প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক। স্কুল অব্‌ ওরিয়েন্টাল অ্যাণ্ড আফ্রিকান স্টাডিজ-এর গ্রন্থাগারে ক্রমদীশ্বর প্রাকৃত ব্যাকরণের যে সংস্করণটি আছে, তার প্রথম পত্রে এরূপ লেখা আছে—

"সংক্ষিপ্তসারস্য প্রাকৃতাধ্যায়ঃ
নাটকাদি-গ্রন্থসঙ্গীতং
প্রাকৃতাভিধানঞ্চ।" [104692]

স্কুলের গ্রন্থাগারে স্থিত বইটির আরও একটু বিশেষত্ব আছে। সে বইয়ের সঙ্গে বাঁধানো আছে সুনীতিবাবুর এক চিঠির অংশ যা তিনি লিখেছিলেন গ্রীয়ারসনের এক চিঠির উত্তরে। গ্রীয়ারসন ক্রমদীশ্বরের প্রাকৃতাংশের কতকগুলো পাঠ বুঝতে না পেরে, সুনীতিবাবুকে তার মানে বুঝিয়ে দিতে বলেছিলেন।

সুনীতিবাবু তখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনাত্মক ভাষাতত্ত্বের খয়রা অধ্যাপক। তাই তিনি কলকাতা থেকে উত্তর পাঠালেন। সেই বইটিতে গ্রীয়ারসনের চিঠিটি নেই। কিন্তু সুনীতিবাবুর চিঠির অংশ থেকে জানতে পারা যায় গ্রীয়ারসনের অভিপ্রায়। এ চিঠির অংশ ছাড়া আরও একটা মূল্যবান তথ্য আছে। ক্রমদীশ্বরের প্রাকৃত ব্যাকরণের যে কোনদিন ইংরেজী অনুবাদ হয়েছিল তা জানা ছিল না। সেই সংস্করণটির গোড়াতেই বাঁধানো আছে ইংরেজী অনুবাদ—প্রথম অধ্যায়ের এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ের ১৭নং সূত্র পর্যন্ত। অনুবাদ কোনদিন সম্পূর্ণ হয়েছিল কি না আজও আমার জানা নেই। তাই আমি ইংরেজী অনুবাদের ও সুনীতিবাবুর চিঠির অংশ জেরক্স (Xerox) করে নিয়ে আসি। আজ এর একটা ঐতিহাসিক মূল্য আছে বলে মনে করায় নীচে চিঠির অংশটি উদ্ধৃত করছি।

Extract from a letter from Dr. Suniti Kumar Chatterji dated Calcutta 22 January 1924 to Sir George A. Grierson, K. C. I. E.

About the sūtra in Kramadiśvara which you mentioned in your letter, I find the following reading in the Devanāgari edition of Kramadiśvara's Prākṛtādhyāya (which I have borrowed from a friend of mine):

70. Séṣo nāgare vā sa kādāu। (not rā sa kādāu as in Jocobi's reading).
sa prākṛta-miśraḥ upanāgare gāthādāu। mahārāṣtryāṁ।

71. Ka-da-dha-bha-ẏāḥ prakṛtyā vā।
'mōāi' 'mōdadē' vā। 'madhukari surabhi malaye'।
'Vā Sa kādāu' or 'vā sakādāu', or 'vā sa kādāu' does not give any sense. (rākṣakādāu = in the dramatic performances called 'rākṣasa', etc. I think your emendation to

71. Upanāgarē gāthādāu mahārāṣṭryāṁ ka-da-dha-bha-yāḥ prakṛtyā vā)

is the best solution of the line that I can subscribe to.
The examples quoted is a 'gatha', too.

সুনীতিবাবুর মনোনীত পাঠ গ্রীয়ারসন পছন্দ করেছিলেন কি না, জানা নেই। তবে সুনীতিবাবুর পাঠ যে অনেকাংশে সমীচীন ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কেন আমি সুনীতিবাবুর এই পাঠ বিচারের প্রতি বিশেষ আগ্রহী হই, তার একটা কারণ আছে।

১৯৬৪ সালে 'Eastern School of Prakrit Grammarians'-নামে আমার এক থিসিস কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়। তার এক বছর বা দু বছর আগে আমি থিসিসের উপাদান সংগ্রহ করে জমা দিই। থিসিসের মুখ্য উপজীব্য বিষয় ছিল—এক সুদীর্ঘ ভূমিকা, ক্রমদীশ্বরের প্রাকৃত ব্যাকরণের সম্পাদনা। বররুচির প্রাকৃত প্রকাশের বিদ্যাবিনোদাচার্যের প্রাকৃত পাদটীকার সম্পাদনা ও আরও ছোটখাটো সাতখানা প্রাকৃত ব্যাকরণের সংশোধিত পাঠ দেওয়া। ক্রমদীশ্বরের প্রাকৃত ব্যাকরণ সম্পাদনা করি সাতখানা পুথি থেকে। আমার ক্রমদীশ্বরের সংস্করণটি মূলতঃ ছাপা হয়ে যায় ১৯৬৬ সালে। কিন্তু তখন বেরুতে পারেনি। কারণ আমি হঠাৎ বৃত্তি পেয়ে বিদেশে চলে যাই। বিদেশ থেকে ফিরে এসে মুদ্রিত ফর্মা আমেদাবাদে পাঠাবার পর প্রাকৃত গ্রন্থ পরিষদ আমেদাবাদ থেকে ১৯৮০ সালে বইটি প্রকাশিত করে। তাই সুনীতিবাবুর চিঠির অংশ আমার বইয়ে দেওয়া সম্ভব হল না। বারান্তরে দেবার ইচ্ছে রইলো। তাই সুনীতিবাবুর টিপ্পনীর প্রতি আমার বিশেষ আগ্রহ ছিল। কিন্তু আমার বইয়ের পাঠের সঙ্গে সুনীতিবাবুর বা গ্রীয়ারসনের পাঠের মিল নেই।

সুনীতিবাবুদের পাঠ আছে—

শেষো নাগরে বা স কাদো। (৫.৭০)

স প্রাকৃতমিশ্রঃ উপনাগরে গাথাদো। মহারাষ্ট্র্যাম্।

ক-দ-ধ-ভ-বাঃ প্রকৃত্যা বা। (৫.৭১)

মোঅই মোদদে বা। মধুকরি সুরভি মলয়ে।

আমার বইয়ের পাঠ হলো—

শেষো নাগরে বা স্কাদো। (৫.৬৭)

স প্রাকৃতমিশ্রঃ উপনাগরে গাথাদো। মহারাষ্ট্র্যাং চ।

ক-দ-ধ-ভ যাঃ প্রকৃত্যা বা। (৫.৬৮)

মোঅই মোঅদি মোদদে বা। মধুকরি সুরভি মলয়ে।

এ ছুটি সূত্রকে সংশোধিত করে গ্রীয়ারসন পাঠ করেছেন—"উপনাগরে গাথাদৌ মহারাষ্ট্র্যাং ক-দ-ধ-ভ-য়াঃ প্রকৃত্যা বা ॥ এ সংশোধিত পাঠ সুনীতি-বাবুও সমর্থন করেছেন। "বা সকাদৌ" সম্পর্কে সুনীতিবাবু যে সমাধান দিয়েছেন (রাক্ষসাদৌ) তা খুবই প্রণিধানযোগ্য।

আসলে 'ক-দ-ধ-ভয়াঃ প্রকৃত্যা বা' সূত্রটি শৌরসেনী ভাষার লক্ষণ। ক্রমদীশ্বরের মতে 'ক', 'দ', 'ধ', 'ভ' ও 'য' শৌরসেনী ভাষায় বিকল্পে লোপ হয়। তাই উদাহরণ দিয়েছেন 'মোঅই' ও 'মোঅদি'। এখানে 'দ'-কারের একবার লোপ হয়েছে, আর একবার লোপ হয়নি। পরের উদাহরণের মধ্যে 'ক', 'ধ', 'ভ' ও 'য'-এর লোপ দেখানো হয়নি—মধুকরি সুরভি মলয়ে। খ্রীস্টিয়ান লাস্‌সেন (Christian Lassen)-মহোদয়ও লাতিন ভাষায় লেখা তাঁর Institutiones Linguae Pracriticae-নামক গ্রন্থের পরিশিষ্টে (পৃঃ ৫০-৫১) এগুলোকে শৌরসেনী ভাষার লক্ষণ বলে ধরেছেন। ক্রমদীশ্বরের প্রাকৃত ব্যাকরণের হস্তলিখিত পুথিতে এ সূত্রগুলোকে স্পষ্টভাবে শৌরসেনী বলে অভিহিত করা হয়নি। তাছাড়া, এ সূত্রটির অভিপ্রায়ও খুব একটা স্পষ্ট নয়। কারণ প্রাকৃত বৈয়াকরণ দ্বাদশ শতাব্দীর হেমচন্দ্রের মতে অসংযুক্ত ও অনাদি ত-কার দ-কারে পরিণত হয়। যেমন, ততঃ>তদো [তো দোনাদৌ শৌর-সেন্যামযুক্তস্য (৪।২৬০)]। এরূপভাবে থ ও হ-কার ধ-কারে পরিণত হয়। যেমন, কথং>কধং, ইহ>ইধ [থো ধঃ (৪।২৬৭) ও ইহ-হচোর্হস্য (৪।২৬৮)]। কিন্তু কেবল ভূ-ধাতুর ভ-কার শৌরসেনীতে ভ-রূপেই থাকতে পারে [ভুবো ভঃ (৪।২৬৯)] যেমন, ভবতি>ভোদি। কিন্তু য-কার সম্বন্ধে হেমচন্দ্রের কোন সূত্র নেই। তবে হেমচন্দ্র বলেছেন, সংযুক্ত 'য' অর্থাৎ 'র্য' বিকল্পে শৌর-সেনীতে 'য্য' হয়। [ন বা র্যো য্যঃ (৪।২৬৬)]। যেমন, আর্য>অয্য বা অজ্জ। 'ক'-কারের অবস্থান সম্পর্কে কারুর কোন সূত্র নেই। সাধারণ মহারাষ্ট্রী প্রাকৃতের নিয়ম অনুসারেই চলতে পারে।

'শেষো নাগরে বা সকাদৌ'-সূত্রটিও খুব গোলমেলে। এটার সম্পর্কে তিন রকম পাঠ দেওয়া হয়েছে। (১) যদি 'বা সকাদৌ'-কে 'রা সকাদৌ'= রাসকাদৌ করা হয়, তাহলে মানে হবে যেমন 'রাসক'-জাতীয় রচনায় (যেমন আব্দুল রহমানের সন্দেশ রাসক) নাগর বা উপনাগর ব্যবহার হয়; এবং তার লক্ষণাবলী মহারাষ্ট্রীর অনুরূপ। (২) যদি পাঠ 'রাক্ষসাদৌ' করা হয়, তাহলে অর্থ করা যেতে পারে যে নাগর বা উপনাগরে 'রাক্ষস' প্রভৃতি শব্দের

'ক্ষ' মহারাষ্ট্রীর মত হবে। অর্থাৎ 'রাক্ষস' হবে 'রক্‌খস'। এরকম একটা মানে করার নজীরও আছে। রামশর্মা তর্কবাগীশ প্রাকৃত কল্পতরুতে নাগরাপভ্রংশ ভাষার লক্ষণাবসারে (৩. ১. ৩.) এ কথাই বলেছেন (ক্ষস্যাপি রাক্ষসমুখে স ইহোপদিষ্টঃ)। (৩) আর যদি 'স্কাদৌ' ধরা হয়, তাহলে মানে হবে 'স্ক'-প্রভৃতি (অর্থাৎ স্ক, ষ্ক, ক্ষ ইত্যাদি) মহারাষ্ট্রী ভাষার অনুরূপ (অর্থাৎ এগুলো 'ক্‌খ'-তে পরিণত হবে)। অথবা এর আর একটা মানেও করা যেতে পারে। স-কারাদি সুব্‌ বিভক্তি (=স্‌-কাদৌ) নাগরে বা উপনাগরে বিকল্পে লোপ পায়। এ কথা রামশর্মাও বলেছেন (সর্বত্র সুপ্‌-লুক্‌ প্রকৃতেশ্চ দীর্ঘঃ। ৩.১.৮.)। আসলে সূত্র দুটি খুব অস্পষ্ট। উদাহরণও পর্যাপ্ত নয়। কাজেই খুব একটা স্পষ্ট সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব নয়। সাতটি হস্তলিখিত পুথিও এ ব্যাপারে খুব একটা সাহায্য করতে পারেনি।

এ তো গেল পাণ্ডিত্যের কথা। সাধারণ শিক্ষিত মানুষ পর্যন্তও সুনীতিবাবুর সঙ্গে কথা বলে কেমন আনন্দ পেতেন ও সেই কথার মাধ্যমে তাঁর পাণ্ডিত্য দেখে আশ্চর্যান্বিত হতেন, তারও একটা পরিচয় দিচ্ছি।

আজ থেকে বিয়াল্লিশ বা তেতাল্লিশ বছর আগের কথা। সুনীতিবাবুর বয়স তখন প্রায় পঞ্চাশ। জোসেপ্পে তুচ্চি (Giuseppe Tucci) একবার কলকাতায় এলেন তিব্বতে যাবার পথে। তাঁর সঙ্গে এলেন ফোস্কো মারাইনি (Fosco Maraini) এবং আরও অনেকে। তুচ্চি কলকাতায় এসে পুরনো বন্ধু সুনীতিবাবুর সঙ্গে দেখা করতে চাইলেন। সুনীতিবাবু ধুতি-চাদর পরিহিত বাঙালী সেজে তুচ্চির সঙ্গে দেখা করতে গেলেন গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলে। সুনীতিবাবু যখন গেলেন, তখন তুচ্চি হোটেলে ছিলেন না। কিন্তু তুচ্চির সহযাত্রী ফোস্কো মারাইনি সুনীতিবাবুকে অভ্যর্থনা জানালেন এবং বললেন—"তুচ্চি একটু বাইরে গেছেন, এক্ষুনিই আসবেন। আপনি একটু বসুন।" সুনীতিবাবু যথারীতি বসলেন ও মারাইনির সঙ্গে কথা জমালেন। দেশে ফিরে গিয়ে মারাইনি তাঁর তিব্বত ভ্রমণের অভিজ্ঞতা লিখলেন ইতালী ভাষায়। সেটা ইংরেজীতে অনুবাদ করলেন এরিক্‌ মোসবাচের (Eric Mosbacher)। বইয়ের নাম দিলেন Secret Tibet। হাচিংসন (Hutchinson) লণ্ডন থেকে প্রকাশ করলেন ১৯৫২ সালে। বইটি এশিয়াটিক সোসাইটিতে আছে। এই বইটিতে (পৃঃ ৩৭-৪০) সুনীতিবাবুর সম্বন্ধে যে কথা আছে, সেটা আমার নজরে আনলেন এশিয়াটিক সোসাইটির গ্রন্থাগারিক শ্রীশিবদাস চৌধুরী

মহাশয়। সে বইয়ে ইতালীয় পর্যটক মারাইনি সুনীতিকুমার সম্পর্কে যা লিপিবদ্ধ করে গেছেন তার কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত করছি।

মারাইনি তাঁর বইতে বলেছেন যে, 'কলকাতা একটা নোংরা, জঙ্গলময় শহর। কিন্তু অসংখ্য দোষ-ত্রুটির মধ্যেও কলকাতার একটা শিক্ষার সুন্দর ঐতিহ্য ('a fine tradition of learning') আছে, যে ঐতিহ্যের বাহন হিসেবে আমি কেবল চ্যাটার্জীর নাম করছি। সে চ্যাটার্জী হলেন সুনীতিকুমার। মারাইনি বলছেন—

"In the midst of all this squalor and vice...there survives ...a fine tradition of learning. I shall not deal here with the museum (which is incidentally extremely interesting)···I shall mention only the lunch we had with Chatterji."

পরে তিনি সুনীতিবাবুর একটা সুন্দর বর্ণনা দিলেন—

"Chatterji is a Bengali, an old friend of Tucci's, and he teaches philology at Calcutta University. He is a man of about fifty, of average height, sturdy without being stout, dark-skinned and dark-haired. He dresses in Indian style and wears spectacles. One is immediately struck by his wide forehead and intelligent eyes. He has the pleasing appearance of the scholar. He arrived at the hotel today while Tucci was out, so I received him; we sat in the lounge and talked."

তুচ্চি না আসা পর্যন্ত সুনীতিবাবু মারাইনির সঙ্গে কথা চালিয়ে গেলেন। মারাইনি সুনীতিবাবুর ইংরেজী জ্ঞানের, পাণ্ডিত্যের ও স্মরণ-শক্তির ভূয়সী প্রশংসা করলেন। সুনীতিবাবুও ওঁর সঙ্গে এমনভাবে কথা আরম্ভ করলেন যেন মনে হলো মারাইনি ওঁর বহুদিনের পুরনো বন্ধু। তাই মারাইনি লিখছেন—

"Chatterji has an excellent knowledge of English. As often happens with men who have devoted their whole lives to humane studies, he started talking immediately, as if we were old friends, recalling persons, books, places and events."

মারাইনির এক প্রশ্নের উত্তরে সুনীতিবাবু বলে চলেছেন—

"Yes, yes; Rome; I had a friend in Rome once ; his wife was a Pole, I think, or something of the sort. He started a literary review called...I can't remember what it was called, but the name's of no importance...On the cover it had a star and a wave; I liked that very much. When I was in Rome I told my friend that they were very fine symbols indeed; The star reminded me of Emerson : 'Hitch your cart to a star.' There's a poem of Tagore's, you know—it moves me every time I read it—I can't remember at the moment what it's called, but the title's of no importance, but what it's about is this. It's a conversation between a star in the sky and a little oil lamp in an ordinary Indian house. You, little lamp, are the star of the house; I, little star, am a lamp in the sky', and so on. That sort of thing may strike you as slightly rhetorical, but Indians find it very moving;"

সে লাউঞ্জে আরও যাঁরা বসে ছিলেন, তাঁরা সবাই সুনীতিবাবুর কথা উপভোগ করছিলেন এবং অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে তাঁর দিকে নিবদ্ধ দৃষ্টিও রেখেছিলেন। কিন্তু সুনীতিবাবু বলে চলেছেন—

"In every Indian home a lamp is lit by the woman of the house as soon as she awakens every morning. It's a beautiful rite, ancient and full of poetry; The lamp is taken into the family chapel, and is then used to light other lamps. It's an intimate little domestic ceremony that greatly appealed to my Italian friend...what was his name ? Oh, well, it's of no importance....I told him all about it in English, and he liked it so much that he said he would translate it into your language..."

মারাইনি বলছেন যে চ্যাটার্জী ধুতির এক কোণা দিয়ে চশমা পুঁছতে পুঁছতে বলে যাচ্ছেন—

"Symbols are a very important thing in life. The stars and the wave! But man is more important than symbols, just as the living are more important than the dead. I remember a dinner-party to which I went once in Florence. I sat next to an American lady, who kept going into ecstasies about old Italian music and old Italian poetry. In the end a young man of your country said with a laugh: 'My dear lady, modern Italians exist as well!' I recalled that incident some time ago when I was asked to go to Udaipur, in Rajputana, to give a lecture. Udaipur, you know, is rather like Florence, a city famous for its great artists and warriors, and for all the heroes who defended our country against the Muslim invaders five hundred years ago. At Udaipur there are sacred memories of memorable events at every step..."

সুনীতিবাবুর বক্তব্য শেষ হতে না হতেই তুচ্চি এসে গেলেন এবং দূর থেকে পরিচিত কণ্ঠে "My dear Chatterji" বলে সম্বোধন করে পরস্পর পরস্পরকে অভিবাদন জানালেন। এর পর ওঁরা মধ্যাহ্ন-ভোজনের জন্য হোটেলেরই এক শীতাতপনিয়ন্ত্রিত রেস্তোরাঁতে গেলেন—তুচ্চি, সুনীতিবাবু ও মারাইনি। এঁদের সঙ্গে ছিলেন কর্নেল মোজে (Colonel Moise) এবং পিয়েরো (Piero)। খাবার টেবিলে সুনীতিবাবু ও তুচ্চির কথোপকথন শুরু হলো। কিছুক্ষণ সাধারণ বার্তালাপের পর দুটি সিংহের বিদ্যার ('two lions of learning') লড়াই চলতে লাগলো। সে এক অপূর্ব শোভা। বাগ্‌যুদ্ধে অবতীর্ণ দুটি সিংহ। মারাইনির ভাষায়—

"It was an intellectual feast of the kind one rarely has the opportunity of attending, and I tried hard not to miss anything that was said. A remark about words in everyday use brought up the subject of the Munda languages, and from there it was but a step to the Dravidian languages. They mentioned works written by their colleagues..."I agree with Schmidt, but only on general lines."

...Tucci was the more scientific, in the German tradition, Chatterji more of a humanist, in the classical sense."

মারাইনি বলছেন, চ্যাটার্জীর ধীশক্তি ও বর্ণনাঢ্যের নৈপুণ্যে সমস্ত আলোচনা প্রাণবন্ত হয়ে উঠছে। যখন কোন বন্ধুর প্রসঙ্গে কোন কথা বলেন, তখন তাঁর নিখুঁত বর্ণনা দিয়ে বলেন—

"So-and-so passed through Calcutta two or three years ago...He's a tall, fair, silent man, with a little round wife always dressed in white, just like a tennis-ball, bouncing round him all the time! Then he would revert to quoting Kalidasa or the *Kangyur* in the course of comparing remote and present-day literatures and drawing conclusions that served to reconstruct the history of Asia."

এর মধ্যে, সুনীতিবাবু ও তুচ্চির কথা চরম পর্যায়ে জমে উঠেছে। দুজনেই খাওয়া ভুলে গিয়ে আলোচনায় মত্ত। তাঁরা বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের ইতিহাস তোলপাড় করে ফেলছেন। মারাইনির ভাষায় আবার বলি—

"The lions of learning continued. Both of them were in magnificent form. They were terrific. From the Munda languages they passed to Tibet, the Vighurs and the Nestorian Christianity of Central Asia. They mentioned Sir Aurel Stein, Marco Polo, and Von Le Coq, made excursions into Bactria and Persia, taking in Manichaeism, ancient coinages, and unpublished texts found in Himalayan monasteries. They followed Greek *motifs* across the steppes and oases of Central Asia. They laid the whole of Asia bare before us, took it to pieces, dissected it and put it together again in space and time. They revealed links and affinities, unexpected relationships, facts that threw light on whole orders of other facts. They filled the map of Asia with life and movement, turned history into a luminous fountain. With the eyes of gods, playing with ages and peoples like toys held

in their omnipotent fingers, we watched the unrolling of the immense pageant of the past."

সুনীতিবাবু তুচ্চিকে 'রোম' শব্দের ইতিহাস শোনালেন। তুচ্চি মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শুনছেন। সুনীতিবাবু বলছেন, 'রোম' শব্দটা "In Syria it was known as Hrim: Chinese merchants, venturing to the extreme west of the Asian world, met merchants venturing to the extreme east of the Mediterranean world. They spoke of the empire of Hrim, but the Chinese could not pronounce the name correctly ; the 'H' became 'Fu', and Hrim was translated first into Fu-rim and then, undergoing still further adaptation to the chinese mouth (which can pronounce 'l' but not 'r') it became Fulin. That is the name the chinese still use for Rome".

মারাইনি লিখছেন—সুনীতিবাবু আনন্দে আত্মহারা। তিনি কথা বলেই চলেছেন—খাবার যেমন তেমনিই পড়ে আছে। চ্যাটার্জী যা বলেন তুচ্চি তা মনোযোগ দিয়ে শোনেন। মারাইনি বলছেন, চ্যাটার্জীর প্রজ্ঞাশক্তি ও বিদ্যাবত্তা উচ্চ স্তরের মধ্যে প্রথম শ্রেণীর। মারাইনির ভাষায় চ্যাটার্জী রসিকও বটে। খাবার টেবিলের উল্টো দিকে এক সুন্দরী পার্শী ভদ্রমহিলা যখন উঠলেন, চ্যাটার্জী ওঁর দিকে তাকিয়ে কথার সূত্র হারিয়ে ফেললেন। মারাইনি মন্তব্য করছেন—

"Whenever anything fascinates him he becomes completely oblivious to his surroundings. But he is by no means blind. When the beautiful Parsee woman at the next table got up, he caressed her with the look of a connoisseur, and lost the thread of his argument. He's altogether simpler and more human than Tucci, but certainly no less learned. His intellectual equipment is of the first rank, and Tucci listened to him with great attention."

এ দুটি পুরুষসিংহের জ্ঞানগর্ভ আলোচনা সেদিন মারাইনিকে মুগ্ধ করেছিল। আজ সুনীতিবাবুও নেই, তুচ্চিও নেই। কিন্তু তাঁদের কথা শোনবার জন্য কোন

আগ্রহী মারাইনি আছে কি না জানি না। হয়ত বা থাকতে পারে, কারণ "কালো হ্যয়ং নিরবধি, বিপুলা চ পৃথ্বী"। কিন্তু এঁদের আলোচনা শোনবার আর সৌভাগ্য হবে না। সুনীতিবাবুর অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গেই যেন ভাষাবিদ্যায় স্থান শূন্য হয়ে গেল। কে তাঁর আসন পূর্ণ করবে, তা ভাববার বিষয়। সমস্যা এখনও আছে, কিন্তু উত্তর দেবার লোকের অভাব। সুনীতিবাবু ছিলেন জ্ঞান-গম্ভীর বিদ্যাবারিধি। তাঁর তুলনা তিনি নিজেই। যেমন

গগনং গগনাকারং সাগরঃ সাগরোপমঃ।
রাম-রাবণয়োর্যুদ্ধং রাম-রাবণয়োরিব॥

'আকাশের সঙ্গে কেবল আকাশেরই তুলনা হয়, সাগরের সঙ্গে সাগরের। আর রাম-রাবণের যুদ্ধের সঙ্গে যেমন রাম-রাবণের যুদ্ধেরই তুলনা হয়', তেমনি সুনীতিবাবুর বিদ্যার তুলনা সুনীতিবাবু নিজেই॥

Personal Glimpses of Dr. Chatterji

S. R. TIKEKAR

Polyglot scholars like Dr. Suniti Kumar Chatterji are rare. Their very life is a miracle. We often wonder how they could achieve so much during so short a time they walked on this earth.

My contact with the scholar was due to a variety of reasons. First and foremost, my daughter and his last daughter studied together at Santiniketan for some years. Secondly, I had recorded his recitations, on my tape-recorder, in many languages which he knew. They include Bengali, Sanskrit, Pali, Greek, Persian and pre-Islamic Arabic. This was done at his own residence in Calcutta in 1955. The quality of of that recording was surprisingly good, and sound engineers at All-India Radio studio could not believe that it was as old as that.

Proficiency and scholarship seem to have been part of Dr. Chatterji's life since his college days. He stood first class first at both the University examinations—B.A. and M.A. (1911 and 1913, Calcutta). Surprisingly, for his M.A., he had Old and Middle English, Germanic English and linguistics, as his special subjects.

Having secured scholarship for further study abroad Dr. Chatterji was admitted to the London University, where such well-known personalities as Dr. F. W. Thomas (Indo-European linguistics), Dr. L. D. Barnett (Prakrit and Indo-Aryan), Prof. Daniel Jones (Phonetics), Sir D. Ross (Persian)

and Prof. Robin Flower (Old Irish) were on the teaching staff.

From these savants, Dr. Chatterji picked up what best he could and by the dint of his own methodical work, added much more in each field of his study, so that in a short time, he became an accepted world authority as a linguist. It was obvious that in India, he was the first in many of the allied fields of the study of languages. He could score over others because of his mastery of Sanskrit.

For his D. Litt, the thesis was on *Origin and Development of the Bengali Language*, as part of Indo-Aryan Linguistics. This book in two parts has gone into a second edition, a third part of which contains additions as a result of further study. Even as Turner's *Dictionary of Nepali Language* is a model in lexiography, useful for many Indo-Aryan languages, Dr. Chatterji's volumes on Bengali language are useful for the study of other Indian languages.

Teaching for over 36 years at his *alma mater*, Calcutta University, Dr. Chatterji carried out his work and researches into the fields of his choice, with an ardour with which people generally pursue pleasure. Dr. Chatterji took great interest in man and his way of life, as speech was part of that life. Small groups of men living in pockets, less affected by the fast changing world, attracted his attention more, be they the non-Christian Negroes following the Voodoo religion of the African continent or the Newaris of Nepal.

In search of small groups and their sub-cultures, Dr. Chatterji travelled extensively to nooks and corners of the world and wherever he went he lectured to the learned

societies nearby. His wide range of topics for such lectures is quite baffling. Here is a sample of such studied lectures :

Kirata-jana Kriti—The Indo-Mongoloids (Jorhat, 1947); *Braille for Persian and Arabic* (1951); *What India Took from China* (Moscow 1960); *Iranianism*, (Tehran, 1961); *Dravidian* (Annamalainagar, 1963); *Nepal and India* (Kathmandu, 1963); *Phonetics of Classical Languages in the East* (Bangalore 1967).

It would be difficult to do justice to the work of such a polyglot scholar, steeped in learning for the major part of his adult life. His devoted students have brought out a handy book, *Suniti Kumar Chatterji, the Scholar and the Man* (*Jijnasa*, Calcutta-29, 1970) which supplies chronological information about the publications and of tours of Dr. Chatterji and provides an outline of the honours that came to be bestowed on him.

In his own way Dr. Chatterji had brought out a small personal offering of love and respect for his wife, who left him in 1964, after a long married life of half a century. Family matters are mentioned in it along with extracts from the vast messages and letters of condolence. You have a glimpse of the life of the Chatterjis and of a model of Indian womanhood in that tribute.

Smt. Chatterji knew only Bengali, unlike her husband who knew most of the Indian languages in addition to the classical languages of the world, ancient or modern. In one of his European tours, Dr. Chatterji had taken her to see the wide world and he was careful in describing to her the importance of places they were visiting.

This is what happened in Cologne : "In Cologne, when

we visited the great Gothic Cathedral, she was profoundly moved and she asked me whether it would be proper for her to sit down in a corner and say her *Hindu* prayers in that Christian edifice. On being told that it would be quite according to our Hindu ideas, as God was present everywhere, she was very happy to spend some time in prayer and meditation."

But the most touching part as narrated by Dr. Chatterji is about her preparations for the great departure :

"She had in the midst of her happy family life selected the *sari* and *choli* she was to wear on her funeral pyre. She had also laid by a small stock of sandal wood, which she had purchased at Mysore, for her own cremation."

Salutations to the Mother, who made it possible for Dr. Chatterji to pursue his delights in linguistic kingdoms of the wide world and to rise to such heights in scholarship, by shouldering all by herself the domestic burden. The Chatterjis were, in fact, what Kalidasa has called the universal parents, *Jagatah pitarau*, like Parvati and Parameshvara.

Although Dr. Chatterji had obtained all the honours due to his stature in the international world of learning, he was just a simple man to almost all who came in contact with him. His brilliance would shine forth when an occasion arose for him to talk on something. In conversation, he had hardly a peer ; he could keep any audience spell-bound for hours together.

Being the Chairman of the Bengal Legislative Council for 13 years and a member of the Rajya Sabha for many years, he had a rich fund of anecdotes relating to the Indian political field. In addition, he had undertaken many trips

round the world which enabled him to come into contact with the high-ups in many countries. Funny situations arising out of strange customs, manners and mannerisms, as also out of a variety of languages, made his repertory quite full and he was almost bubbling to give expression to his anecdotes. The one which I have enjoyed most is the story about Dr. Rajendra Prasad, on the eve of his taking the Oath of office as the President of the Republic of India and the subsequent "purification" of the Rashtrapati Bhavan at the hands of his family priest who had been specially brought to the capital from Patna.

Endowed with a remarkable memory, Dr. Chatterji was always a welcome guest. He could narrate many wonderful stories. He had the knack, quite unusual for scholars, to keep up friendship with any stray contacts and his happy-go-lucky attitude made everyone who met him forget one's own worries. An optimist, Dr. Chatterji never betrayed any sense of anxiety or worry and looked always cheerful and happy. That was perhaps his scoring point.

Sanskrit scholars are generally limited in outlook ; they seldom extend their scope of study beyond their immediate neighbours. Not so with Dr. Chatterji whose love for humanity was the widest ever known. He was enamoured of Greek literature and culture. He believed his thoughts were linked to Taoism, esoteric Hebraism and with Sufism (Islamic *tasawwuf*). That is perhaps why he, of all the scholars of East and West, South and North, could offer a well-studied monograph on *Africanism—The African Personality*.

Dr. Chatterji was a deep lover of poetry, and here language or age was no barrier to him. Can any one come up to

him in this respect ? His interest was known to be in : Old Irish poetry, Old Germanic poetry, Scandinavian epics, Baltic *Dainas* in Lithuaniam and Latvian, Pre-Islamic Arabic —by Amr-ul-Kaif, *Vephkhis Tqaosani* of Georgians, Armenian hero legends, Chinese and Japanese nature poems, Finnish *Kalevala* and the Ladakhi version of *Kesar Saga*.

Arya-Dravid problem regarding the people and the languages stirs up emotions, and unnecessary expression is given to "personal views" not based on scientific observations. Dr. Chatterji was above all such small differences ; he was always scientific and is known to have had no enemies. Among the Tamil scholars, Dr. Chatterji was known as *Nanneri Murugan*, which is the literal Tamil rendering of *Suniti Kumar*. In the Sankara-Shanmata Conference at Madras in 1969, Dr. Chatterji was invited to speak on *Kumara*. And he was fond of telling how his wife was greatly impressed by the Muruga temple at Palni. That shows how much he was one with the Tamilian ways of life and how much he had studied their literature.

True to Indian tradition, he saw everywhere a happy blend of many peoples of many cultures, all contributing to an emerging composite world culture.

About many national problems, Dr. Chatterji held definite views and he was bold enough to declare them openly. He liked the roman script for all Indian and allied languages because of its universality and ease of operations in mechanical handling. The study of English, he considered essential for Indian students, particularly at the higher stage. Obviously, he did not want to lose the advantage we have over many other nations in knowing English language so well,

having used it for over a century and a half. For a scholar of his stature, no language could be foreign.

*   *   *

This then was Dr. Suniti Kumar Chatterji the peerless linguist. One must be fortunate to have seen him, to have talked with him, to have listened to his delightful stories of many lands and of many people. Salutations to the polyglot!

Dr. S: K. Chatterji : Some Reminiscences

M. A. MEHENDALE

I do not remember now when exactly I met Professor Suniti Kumar Chatterji, but I do remember when I first heard of him. I was then a student for M. A. with Veda and Comparative Philology as my special group. I was then (1937-39) in Bombay. I used to meet frequently Rev. Father A. Esteller for my lessons in Comparative Philology. It was on one such occasion that he recommended to me Dr. Chatterji's two volumes—especially the Introduction—on the Origin and Development of the Bengali Language. This book was not listed among the books prescribed by the University for the M. A. course. But I remember how highly Fr. Esteller spoke about the book while recommending it to me. Then and later on many occasions when I had to refer to these volumes I realized that the words of my teacher's praise were not misplaced. And I am sure that this must have been the experience of all who have read these volumes.

Professor Chatterji was one of those few Indian linguists who enjoyed international prestige almost from the very beginning of their academic career. And he never lost this prestige at any time in his long, versatile career. I was therefore highly pleased when, subsequent to my getting the Ph. D. Degree of the Bombay University, I learnt that Dr. Chatterji was my examiner. It was quite common in those days to speak about the time-space context in discussions on Historical Linguistics. Dr. Chatterji added one more dimension to it by bringing in the third factor of what he called

the *pātra*-context, by which he probably meant the role played by the substratum in Historical Linguistics. This study still remains a desideratum on the Indian scene.

I came in close contact with Dr. Chatterji when the Deccan College Research Institute started organising Schools and Seminars in Linguistics since December, 1954. I then came to know Dr. Chatterji as a teacher and an administrator. He was no doubt the most respected member of the Faculty. His association with these Schools and Seminars continued for more than ten years. He taught various subjects from general like Introduction to Linguistics to very specific like Gothic. He was the past-master of the art of teaching. He knew how to keep the interest of the students alive. The information that he had to convey was enormous and he had many interesting anecdotes to tell. For his versatility he was called by his colleagues *kalikāla-sarvajña*.

But what impressed me most during these sessions of Schools of Linguistics was Dr. Chatterji's honesty. During these sessions lectures were arranged in the evenings by some scholars or students who were themselves teachers in schools and colleges in different parts of the country. On one such occasion, the Lecturer while referring to some obscure topic remarked :—"As you all know...". Here Dr. Chatterji raised his hand to say that he did not know what the lecturer was referring to. The audience was taken aback by the great courage displayed by Dr. Chatterji in admitting publicly that he did not know a certain thing. Such displays are rare. What surprised the audience further was the fact that the lecturer himself had to admit that he did not know what he was telling about.

Professor Chatterji : Some Reminiscences

H. D. SANKALIA

Professor Suniti Kumar Chatterji was one of the most literate scholars I have ever met. Not only did he have very wide interests, but he had the unique gift of making his talks very interesting and scholarly at the same time. I met him for the first time when under the auspices of the Rockfeller Foundation, Deccan College organised the first Language School or School of Modern Linguistics in Poona. Afterwards several more were organised until the responsibility of organising these was passed on to other Universities in the country. Before this happened, the Council of Management of Deccan College had decided to request Dr. S. M. Katre to devote all his attention to the Sanskrit Dictionary and appoint me in his place as Director. Dr. Chatterji, coming to know of this decision, introduced me to one of the audiences as "the coming man". Immediately neither myself nor the audience could understand the meaning of this joke. What he meant was : henceforward I would have to shoulder the responsibility of organising these linguistic schools and seminars at Poona and elsewhere.

This is one of the instances of Dr. Chatterji's sense of humour. However, because of his wide interests Dr. Chatterji took great interest in my archaeological excavations, particularly the one at Navdatoli in Madhya Pradesh. Here, as is now well known, we had found some unique pottery—footed cups and channel-spouted bowls. These reminded me of the

Iranians and I wondered whether the people of Navdatoli were not Aryans. Dr. Chatterji asked me to give a lecture on this subject in one of the meetings of the Linguistics Society of India in Poona. Later Dr. Sukumar Sen asked me to give this same lecture in the Asiatic Society in Calcutta. In Poona Dr. Chatterji wanted to know if in our excavations at Navdatoli we had found barley (*yava*), because this was the one grain which the Aryans preferred to wheat. At that time in 1957-58 the grain specimens excavated at Navdatoli had not been identified. So I could not answer this critical question. However, when later the grains were identified as barley and when similar grains were found at Inamgaon, I had thought several times of writing to Dr. Chatterji.

During one of his sojourns Professor Chatterji and Srimati Chatterji were our neighbours, staying in No. 36. Here there were not sufficient lights. I got these placed immediately, and he was very much pleased at this little gesture on our part.

Dr. Chrtterji was a great conversationalist ; so one never felt tired in his company. The last time I met him was in the Deccan Queen in 1970. Probably that was his last visit to Poona. In the train we had very interesting discussions on the political situation in the country. And I was surprised to find that he had no rigid views. He was prepared to change his way of life, as the conditions in the country demanded.

If we had a few more men like Dr. Chatterji this world would be a better and more pleasant place to live in.

Suniti Kumar Chatterji : Scholar and Humanist

R. K. DASGUPTA

When Suniti Kumar Chatterji joined Calcutta University as its Khaira Professor of Indian Linguistics and Phonetics in 1922, a very distinguished European linguist, Otto Jesperson, then a professor in the University of Copenhagen, had made an immensely quotable remark about his subject in his book, *Language : Its Nature, Development and Origin* published that year. 'While the philologist looked upon language as part of the culture of some nation', Jesperson said, 'the linguist looked upon it as a natural object ; and when in the beginning of the nineteenth century philosophers began to divide all sciences into the two sharply separated classes of mental and natural science, linguists would often reckon their sciences among the latter.' This distinction between philology and linguistics, one a humane or liberal discipline, the other a branch of natural science, has to be clearly understood when we consider the achievement of Suniti Kumar Chatterji as a scholar : we must believe in this distinction to call him a humanist.

Suniti Kumar himself accepted this distinction between philology and linguistics particularly when in his later years the new Descriptive Linguistics and its off-shoot Structural Linguistics claimed the status of a positive science. When Jesperson made the distinction between philology and linguistics fifty-five years ago Descriptive Linguistics had not yet matured into Structural Linguistics although the

exponents of Historical and Comparative Grammar, still the major concern of linguistics, were urging a strictly scientific analysis of their material. Franz Boop (1791-1867), the greatest among the founders of modern linguistic science, whose *Analytical Comparison of the Sanskrit, Greek, Latin and Teutonic Languages*, first published in German in 1816 and issued in a revised, rearranged and greatly improved English version in 1820, marks the beginning of Comparative Philology, said in 1836 that 'languages are to be considered organic natural bodies, which are formed according to fixed laws' and this idea of language as an organic body led to the idea of linguistics as a natural science.

Certainly Suniti Kumar did not reject the view that linguistics must be a scientific analysis of linguistic phenomena and that the tools and procedures of that analysis must necessarily be scientific. What he opposed was not really a scientific approach to language for he believed that a systematic and purposive investigation into the human speech must follow a scientific method. What he actually opposed was the view that the science of language to be a science at all must follow the methodology of the sciences which have nothing to do with linguistic studies. Linguistics, he said, must develop methods of its own and in so far as those methods were rational they would be necessarily affiliated to some of the basic principles of scientific analysis of any subject. The basic concepts of Historical Grammar derived support from the Darwinian theory of evolution and the idea of change or development through a process of evolution produced the idea of

comparable elements amongst the results of that change or development. What Suniti Kumar insisted was that the linguist must never take himself away from linguistic phenomenon which he thought was essentially a human phenomenon and that he must not devise scientific methods which would defeat the very purpose for which they were devised. He thought this had happened in Structural Linguistics. While he valued the linguists who refined the methodology of Historical and Comparative Grammar and depending on their findings developed a general philosophy of language and while he would be prepared to use the words science and philosophy as synonymous he suspected that what had emerged as Modern Linguistics or Structural Linguistics was developing as a science at the cost of linguistics itself.

Suniti Kumar's final repudiation of Structural Linguistics is contained in his presidential address at the Third World Congress of Phoneticians held in Tokyo in July 1976. 'Modern Descriptive and Structural Linguistics, brought completely under the shadow of the physical sciences and of Mathematics,' Suniti Kumar said in this address, 'is looked upon by its votaries as an established science which has made the old Historical and Comparative Method effete and useless and without significance.' Let us not take it as an old man's prejudice against whatever is new. Suniti Kumar was not incapable of comprehending the techniques and findings of Modern Linguistics: what is more he did not think that Descriptive Linguistics was a new literary discipline. He thought that whatever was really sound in Modern Linguistics had its roots in the linguistics of the

nineteenth and early twentieth centuries and that the work of Yaska and Panini anticipated the methodology of Descriptive Linguistics. 'Only during the last decade at the most,' he said in this address, 'Modern Descriptive and Structural Linguistics with its very imposing as well as expensive array of all sorts of machinery, instruments and gadgets and data collected with their help, and with the help of complicated computers, became most convincing in the field of both Western and then Indian Linguistic studies, proving its superiority to the old machineless method by its very presence with its elaborate paraphernalia.' Gazing at this new edifice of his chosen discipline Suniti Kumar asked himself one question—is human language amenable to mathematical treatment ? and the answer that welled up from his linguistic conscience was an emphatic 'no':

Suniti Kumar was, however, too scientific in temper to reject the idea of a true science of linguistics. But he asked for a true science of linguistics and a not a pseudo-science of linguistics. In a paper entitled 'The Levels of Linguistic Analysis' published in the *Proceedings of the Ninth International Congress of Linguists* (Cambridge, Mass., 1962) Suniti Kumar 'put a very strong plea for the need of combining both the old historical and comparative methods with their deep and wide study of the facts of a particular speech and the most up-to-date methods with the help of all scientific apparatus and gadgets for recording information.' While he would agree that '*puranam ity eva na sadhu sarvam*' he would affirm that '*navinam ity api na sadhu sarvam.*'

But Suniti Kumar was not a lonely crier against the dominance of Structural Linguistics. Only ten years before his

death Dr. Olga S. Akhmanova of Moscow presented a paper called 'Linguistics and the Quantitative Approach' at the Tenth Internal Congress of Linguistics held at Bucharest in in 1967 in which she mentioned the young modern structural linguist as a scholar 'so preoccupied with being up-to-date, has to spend so much time and effort to acquire even a superficial knowledge of mathematics that he has neither time nor energy left to concern himself with the innumerable vagaries and whimsicalities of natural languages.' Suniti Kumar loved to repeat a remark of R. A. Hall that 'Mathematical Linguistics except in a purely ancillary fashion is foredoomed to failure or to produce such a mutilated or distorted picture of its subject matter that the outcome is unusable and hence valueless.' What Suniti Kumar particularly deplored in the methodology of Structural Linguistics is that it did not favour historical study of a language. In his Tokyo address he quoted a remark of Sir Ralph Turner, the author of *A Comparative Dictionary of Indo-Aryan*, made in a letter addressed to him on 16 May 1969. About the American-inspired synchronistic linguisticians and their disciples Sir Ralph said in this letter that 'I cannot understand their complete lack of interest in the history of what they claim to be examining. It is like a geologist who professed no interest in how the rocks were formed.'

I have begun with this controversy about Structural Linguistics if only because we are liable to misjudge Suniti Kumar's contribution to linguistics if we think that he dogmatically clung to the school of Bopp in the age of Chomsky and that in keeping himself away from Structural Linguistics he virtually kept himself away from the main

currents of modern linguistics. He rejected Modern or Structural Linguistics because he was essentially a philologist and he thought classical linguistics was an aspect of philology. While he welcomed any movement to give classical linguistics a firmer scientific base he bravely opposed the methodology of those who in their zeal for what they would call a truly scientific procedure turned away from the traditional concerns of linguistics.

Structural Linguistics is only an aspect of the new intellectual movement which gave new dimensions to the disciplines like Philosophy, Economics and History. In the nineteen seventies we are wistfully waiting for the emergence of a new intellectual outlook which would resolve the present tension between the classical and the modern in Philosophy where metaphysics is now in retreat in a world dominated by the logical positivists. When Rudolph Carnap dismissed classical mataphysics as rubbish even many young students of philosophy in the great seats of learning in the world wondered if the entire tradition of philosophy built up through the ages could really be discarded overnight. Suniti Kumar put himself the same question about linguistics when the Structuralists abandoned the methods of classical linguistics. Perhaps before this century ends many more philologists would ask the new scientists of language if their mathematical approach to their subject would really yield the certitudes they seek when one of the most influential theories of modern physics is Heisenberg's Uncertainty Principle according to which complete quantitative measurement of certain states and processes in terms of the usual space-time co-ordinates is impossible.

Suniti Kumar, then, rejected Structural Linguistics because as a linguist of the classical school he never ceased to be a philologist, a lover of languages, an explorer into their nature and history who considered that exploration as a part of humane learning, a study of human civilization. He stated this view of linguistic studies whenever he had any occasion to define the scope of the discipline he had made his own. In his presidential address on 'The Study of New Indo-Aryan' delivered before the Section for Indo-Aryan Languages at the Eighth All-India Oriental Conference held in Mysore in December 1937 and published in Calcutta University's *Journal of the Department of Letters*, volume xxix he said that 'science, particularly a human science like Linguistics, cannot confine itself in its cloistered hopes and endeavours, its failures and successes, which do not have a direct bearing on the problems of life relating to speech and culture which are crying for solution'.

What must we then say about Suniti Kumar's contribution to linguistics ? Never did he make any claims about it in writing or in conversation. His autobiography which he began writing as late as December 1975, and it is printed in this year's Puja Number of *Jugantar*, comes up to 1908 when he was an 18-year old First Arts student in the Scottish Church College, Calcutta. The boyhood described in this unfinished autobiography is marked by precocity, but the precocity gives promise of a scholar of art and letters rather than that of linguistics. A school boy is obviously fascinated by literature before he can have any curiosity about the nature of the language in which that literature is produced. Suniti Kumar's intellectual interests during his teenage are

strikingly literary, philosophical and aesthetic; He speaks of his readings in the philosophical writings of Swami Vivekananda, the poetry of Tagore and his enthusiasm for the paintings of Abanindranath and for Greek art.

It is, however, most unlikely that Suniti Kumar would have written anything in detail about his own contribution to Indian linguistics even if he had the time to complete this autobiography. He was too modest to talk about his own achievements and even in his later years he was never vainly autobiographical in his conversation although he was full of interesting anecdotes about what he had seen and heard at home and abroad. In his presidential address on 'Linguistics in India' delivered at the Philology Section of the Oriental Conference held in Lahore in 1928 and printed in volume vii of the *Visva-Bharati Quarterly*, he mentions by name almost all Indian scholars then working on Indian linguistics but does not even obliquely introduce his *magnum opus*, the two-volume *The Origin and Development of the Bengali Language* which was then two years old. There is a style of mentioning one's own achievements by way of setting up an example of humility; Suniti Kumar avoids this exercise in modesty even in his paper on 'Linguistics in India' in the twenty-five years between 1917 and 1942 included in a volume called *Progress of Indic Studies : 1917-1942* edited by R. N. Dandekar and published by the Bhandarkar Oriental Research Institute in 1942. In 1942 Suniti Kumar had achieved an international reputation. He had presided over the Indian Section of the Second International Conference of Phonetic Sciences held in London in 1935. He had attended the Third International Congress of Phonetic

Sciences at Ghent, the International Congress of Anthropologists at Copenhagen and the International Congress of Orientalists at Brussels, all in 1938. He had been elected a Member of the Permanent International Committee of Linguistics, Paris and an Hon. Member of the Oriental Institute of Poland. But in Suniti Kumar's survey of Indian linguistics from 1917 to 1942 there is no mention of his *The Origin and Development of the Bengali Language.* When a scholar like Suniti Kumar is so silent about the significance of his outstanding work it was the duty of other scholars in the field to say something about its worth. It is, however, strange that the *Suniti Kumar Chatterji Jubilee Volume* presented to Suniti Kumar by the Members of the Faculty of the Three Schools of Linguistics, Deccan College, Poona, and the Linguistics Society of India in 1955 on the occasion of his sixty-fifth birth-day does not contain a single essay on his work as a linguist. After his death, several scholars wrote worthily on his personality and achievement. And all admirers of Suniti Kumar are grateful to the anonymous editor of a work called *Suniti Kumar Chatterji : The Scholar and the Man* published in 1970. It contains an immensely readable essay entitled 'Suniti Kumar Chatterji : Personality and Scholarship' by Dr. Sukumari Bhattacharji, a chronicle of his life compiled by Pronab Kumar Banerji, and select bibliography of his books and articles, in English, Bengali, Sanskrit and Hindi very carefully prepared by Anil Kumar Kanjilal.

It may not be easy to sum up the intellectual achievement of a scholar who was an eminent linguist and yet did not associate himself with the new movement in his subject

which led to the emergence of Structural Linguistics. Secondly, although professionally a linguist Suniti Kumar wrote on such diverse subjects as the culture of Africa, relations between India and Ethiopia and World Literature and Tagore. Thirdly, not a few have asked why the author of *The Origin and Development of the Bengali Language* which was published in 1926, that is, when he was thirty-six years of age, did not produce a second work on Indo-Aryan linguistics of comparable magnitude and significance in the remaining forty years of his life. Suniti Kumar read too widely and too profusely, they regret, to care for that concentration on his true subject which alone could enable him to produce a work of epic dimension on the evolution of New Indo-Aryan Languages from a comparative standpoint with appropriate observations on their links with Dravidian languages. They find promise of such a magnificent work in his *The Origin and Development of the Bengali Language* which is marked by an encylopaedic density of learning he alone could master.

While judging Suniti Kumar as a linguist it is important to remember that when he began his studies in linguistics in London University in 1919 the work of the Swiss scholar Ferdinand de Saussure (1857-1913) who is said to have brought about a Copernican revolution in linguistics was not much known in English. Saussure's lectures in French published by his pupils as *Course of General Linguistics* in 1916 had really no influence on Suniti Kumar's teachers in London, Daniel Jones, F. W. Thomas, L. D. Barnett, Denison Ross, Chambers and Grattan. Even when he was studying linguistics in Paris his professors, Jules Bloch, A. Meillet,

Paul Pelliot had scarcely any notion of a structural approach to linguistics. The work of Prince Nikolai Trubetzkoy (1890-1935), the central figure of the Prague School of Linguistics, who was profoundly influenced by the structural and relational theory of Saussure was not much known outside Czechoslovakia till its French translation by Cantineau appeared in 1949. Bloomfield's (1887-1949) *Language* which inaugurated modern American linguistics appeared in 1933. Suniti Kumar was forty-three years old and had taught his subject in Calcutta University for over ten years. Z. S. Harris's *Methods in Structural Linguistics* which developed certain aspects of Bloomfieldian linguistics appeared only a year before Suniti Kumar retired as a professor of Calcutta University in 1952. I have bored you with this calendar of modern linguistics only to show that it emerged as a new discipline with a new methodology when Suniti Kumar had already established himself as an exponent of the historical and the comparative method. And that method, he thought, had still great promise and was yet to lead to many striking revelations. Formal analysis of language as an exercise in morphophonemics in a synchronistic linguistic scene, that is, the state of a language at a given time, had little attraction for a scholar who was yet to make the best of his historical and comparative method in his chosen area of specialization, Indo-Aryan linguistics.

It is no less important to bear in mind the fact that modern linguistics developed under the impact, howsoever unperceived by the linguists themselves, of modern science, of new trends in man's inquiry into the structure of the

universe. There was no impact of this new spirit in scientific investigation on the intellectual life of our country at the time when Suniti Kumar was establishing himself as the foremost linguist in the 1920s and 30s. And once we realize that Suniti Kumar belonged to the generation of linguists who preceded those who founded the school of structural linguistics we may not ask why he had nothing to do with the latest development in linguistics, the transformational-generative linguistics the *locus classicus* of which, Noam Chomsky's *Syntactic Structures* was published only twenty years ago.

Let us not disparage Modern Linguistics while noting Suniti Kumar's understandable antipathy to it. No young Indian linguist may write a blasphemous obituary of ultra-modern linguistics like Ian Robinson's *The New Grammarian's Funeral* (1975) which gives but a dubious burial to Chomsky. Let it be a salutary check on wild modernism in linguistics to repeat to ourselves Einar Haugen's remark on American linguists in his presidential address on 'Directions in Modern Linguistics' at the meeting of the Linguistic Society at Chicago held in 1950, 'The very growth of an independent group of linguists has promoted a kind of scientific isolation, with even a hint of arrogance, which can only be deplored by those who believe that our science must continue to be international'.

Let us not then be unhappy about Suniti Kumar's standing aloof from Structural Linguistics. Let us not reflect on what he wanted not to do. It is more important to see what he actually did. His greatest achievement as a linguist is that he succeeded in refinding the tools and

procedures of comparative and historical linguistics to use them in presenting a uniquely comprehensive and scientific account of the evolution of one of the major Modern Indo-Aryan languages, Bengali, and in the process producing an excellent frame-work for similar accounts of the rest. It was a magnificent vindication of the intellectual powers of the Indian scholar in a field of enquiry which was then a part of western learning. Indian linguistics was the concern of the European and American scholars like Franz Bopp (1791-1867), Max Mueller (1823-1900) and others except that Ramakrishna Gopal Bhandarkar (1837-1925) traced the history of the modern Indo-Aryan vernaculars from the original Sanskrit in his Wilson Philological Lectures on *Sanskrit and the Derived Languages* delivered in Bombay University in 1877 and first published in the *Journal of the Bombay Asiatic Society* in 1883-89 and later issued as a book in 1914. It was indeed very strange that although it was Western studies in Sanskrit which gave a new direction to linguistic studies in the nineteenth century no Indian scholar before Suniti Kumar produced any linguistic work which could compare in magnitude and significance with Hoernle's (1841-1918) *Comparative Grammar of the Gaudian Languages* published as a book in 1880. Only four years before the publication of Suniti Kumar's *The Origin and Development of the Bengali Language* Otto Jesperson remarked in his *Language: Its Nature, Development and Origin* that 'the first acquaintance with Sanskrit gave a mighty impulse to linguistic studies and exerted a lasting influence on the way in which most European languages were viewed by scholars'. The Indian Sanskrits of the nineteenth century however

were perhaps too much preoccupied with the sacredness of the language to see that it was the mother of quite a few profane offsprings.

Suniti Kumar himself wittily remarks in his article on 'Linguistics in India' published in *The Visva Bharati Quarterly* in April-July 1929 that 'the sole classical language, Sanskrit, formed the life study of the old type of scholars and the traditional method' they followed was a *cul de sac* for modern philology. The old grammarians seemed to have done everything'.

In the twenties of this century the Bengali scholar discovered that he could make his mark in fields of studies which had been dominated for a century by the scholars of Europe and America. In the first decade of the century the Bengalis had shown their capacity to challenge the authority of their colonial masters. In the second decade Rabindranath gave them a place in the world of letters. It was in the twenties of the century that they established their eminence in research in literature and science. In that decade were published Dinesh Chandra Sen's work on *East Bengal Ballads* appeared in 1922-1924, S. K. De's *Sanskrit Poetics* in 1923, S. N. Sen's *Administrative System of the Marathas* in 1925, S.N. Das Gupta's *History of Indian Philosophy*, Vol. I in 1922, R.C. Majumdar's *Ancient Indian Colonies in the Far East*, Vol. I, in 1927, Jadunath Sarkar's *History of Aurangzeb* in 1925 and it was in that decade again that S. N. Bose published his Bose-Einstein Statistics and J. C. Bose his *Nervous Mechanism of Plants* in 1926. Suniti Kumar's *The Origin and Development of the Bengali Language* published by Calcutta University in two volumes in 1926 then repre-

sents a landmark in the intellectual history of modern Bengal, an authentic document of the Bengali people's ability to master the history of their language. At this distance of time, more than fifty years after its publication, it is difficult to realize what heroic intellectual endeavour was required to raise a magnificent linguistic edifice such as this at that time. As Suniti Kumar himself says in his preface to the book and we can now read it in its second edition published by George Allen and Unwin in 1970, in those days 'linguistic as a modern science is still in its infancy in India'. But when the work appeared the educated Bengali wondered at its grandeur and adored its author as the historian of the language of Chandidas, Ramprasad, Michael, Bankim and Rabindranath.

In an essay on John Beames (1837-1902) Suniti Kumar calls him 'the founder of Modern Indo-Aryan Linguistics' and none of us can grudge him this title. Beames's *Outlines of Indian Philology* published in 1867 is indeed a pioneer work and his *Comparative Grammar of the Aryan Languages of India*, the first volume of which appeared in 1872 really laid the foundation of Modern Indo-Aryan Linguistics. We must, however, remember that in the same year, that is, in 1872, appeared two works, Trumpp's *Sindhi Grammar* and Hoernle's *Essays in aid of a Comparative Grammar of the Gaudian languages* first published in the *Journal of the Royal Asiatic Society of Bengal*, which too made important contribution to Modern Indo-Aryan Linguistics. And we must add to these three important names in Modern Indo-Aryan Linguistics two more names—Jules Bloch whose *Formation de la langue marathe* has been rightly called by

Grierson 'the most important book dealing with the Modern Indian Languages that has appeared since the publication of Hoernle's *Grammar of the Gaudian Languages* in 1880'. In his preface to *The Origin and Development of the Bengali Language* Suniti Kumar says that in 'preparing the present work, the plan adopted by Professor Bloch in his *Formation de Langue marathe* has given me the clearest notion about what a book on the origin and development of a modern Indian language should contain'. The other path-finder in Modern Indo-Aryan Linguistics is Sir George Abraham Grierson (1851-1941) whom Mohitlal Majumdar calls '*bhasha-mahabharat rachayita*' obviously in appreciation of his eleven-volume *Linguistic Survey of India* published between 1904 and 1928. Suniti Kumar learnt a great deal from these four pioneers of Modern Indo-Aryan Linguistics particularly in respect of his methodology. But his work represents such a fine distillation of the accumulated learning in the field and it is so thorough in its attention to the minutest details of its subject that it deserves to be recognized as the fulfilment of the enterprise of the pioneers like Beames. Griseron himself so valued the work although he could not accept all its conclusions, In his foreword to *The Origin and Development of the Bengali Language*, Grierson says that Suniti Kumar 'has been able to bring together an amount of material which no European could ever have hoped to collect' and his work is 'the result of a happy combination of proficiency in facts and of familiarity with theory and exhibits a mastery of detail controlled and ordered by the sobriety of true scholarship'. If Beames is the founder of Modern Indo-

Aryan Linguistics Suniti Kumar is its master. The judgment may not make the spirit of Beames unhappy. In his autobiography published as *Memoirs of a Bengal Civilian* in 1961 Beames says about his labours on his *Comparative Grammar* as something that 'refreshed my weary soul in the midst of all the official trouble and worry'.

Sixteen years after the publication of *The Origin and Development of the Bengali Language* appeared Suniti Kumar's *Indo-Aryan and Hindi* consisting of eight lectures delivered before the Gujarat Vernacular Society in 1940 and published in 1942 (revised and enlarged second edition, 1960). As an example of historical and comparative linguistics it offers an excellent frame-work for a more comprehensive study of the evolution of all our north-Indian languages. Another sixteen years after the first publication of this work Roman Jakobson said in a paper entitled 'Typological Studies and their Contribution to Historical Comparative Linguistics' presented at the VIII International Congress of Linguistics held in Oslo in 1958 that 'the convergent and divergent evolution of cognate or contiguous languages yields rich information important for comparative historical research.' If ever another Suniti Kumar undertakes a study of our cognate and contiguous languages this *Indo-Aryan and Hindi* will be his model.

Although Suniti Kumar specialized in Modern Indo-Aryan Linguistics he was greatly interested in Dravidian studies. As early as 1924 he wrote an article on 'Dravidian Origins and the Beginnings of Indian Civilization' in *The Modern Review* of December that year and its basic ideas were developed in a series of three lectures on Dravidian

Origins and Dravidian literature delivered at Annamalai University in February 1963 and published as a book called *Dravidian* in 1965. As an exponent of universalism in human civilization he did not believe in the north-Indian's purity of Aryan blood and in papers like the one on 'Non-Aryan Elements in Indo-Aryan' in the Sylvan Levi Memorial Number of the *Journal of the Greater Indian Society* published in 1936 he repudiated the idea of such purity. How profound was his interest in Dravidian philology one can see from his paper on 'Old Tamil, Ancient Tamil and Primitive Dravidian' published in *Indian Linguistics* in 1954 and his address on Dravidian Philology at the inauguration of the Dravidian Philology. Department of Annamalai University in 1957 and published in *Tamil Culture* the same year. In his paper entitled 'Some Observations of Linguistic and Cultural Studies of Tamil and Dravidian' presented at the second International Conference of Tamil Studies held in Madras in 1968 he offered a blue-print for Dravidian research which our universities are yet to take as seriously as they should. It is significant that when he speaks with the literature produced in our four Dravidian languages he scrupulously avoids stressing their debt to Indo-Aryan. In the chapter on Tamil Literature in his *Languages and Literatures of Modern India* published in 1963 he does not miss to affirm that 'Tamil developed a literary mode of its own which is essentially South Dravidian.'

But Suniti Kumar must not be judged and valued as a linguist only. He contemplated humane learning as a study of human civilization as a whole and his interest in the

human speech was only a part of his interest in the human mind as it has manifested itself in human culture. In our academic circles a very wide range of intellectual interests is often discouraged as a form of dilenttantism and those who disparage it fail to see that specialization too can be an excuse for intellectual indolence. Suniti Kumar had an encyclopaedic density of learning in a large variety of subjects which he thought were only different aspects of the grand theme of human civilization. Our modern university system encourages a proliferation of academic disciplines mostly in terms of departmental budgeting and departmental authority and most of our universities are a kind of loose confederation of departmental kingdoms which have their occasional border skirmishes which are settled mostly to preserve the sovereignty of those kingdoms. The Indian academician's plea for inter-disciplinary approach to a subject is essentially an expression of his uneasy conscience about such fragmentation of learning. He first splits a discipline and then asks for links amongst its splinters. Suniti Kumar's extraordinarily capacious mind and broad intellectual outlook rose above this narrowness of our university faculties and extended his gaze beyond the subjects he studied for his academic degrees. About thirty years ago, Curtius, the German scholar, regretted that European literature had no place in the pigeon-holes of our universities. It was Suniti Kumar who regretted that the linguistic pigeon-holes of our universities were narrower still.

Of this wide-ranging intellectual interests we have a record in his twenty-eight books in English, more than four

hundred articles and two hundred reviews in the same language and twenty-five books and about two hundred articles in Bengali. This vast material deals with a very large variety of subjects; but as we read them carefully we begin to realize that they are essentially concerned with a single theme, human culture as it is revealed in human speech. His *Balts and Aryans: in their Indo-European Background* published in 1968, for example, is an inquiry into the Primitive Indo-Europeans or Indo-Hittites of whom the Aryans were a branch and into linguistic and cultural affinities between the Balts and Aryans. His *India and Ethiopia* published in the same year is again a study in linguistics in its bearing on cultural anthropology. It is indeed a very significant document of enlightened Indian's respect for other men's civilization. The most remarkable instance of Suniti Kumar's enthusiasm for a culture other than his own is his book *Africanism—The African Personality* published in 1960, a unique achievement for an authority on Indo-Aryan linguistics. In his preface to this book he claims that as 'human science Linguistics is linked up with all the other human sciences' and he adds that naturally 'he was drawn to Anthropology and Cultural History, Philosophy and Religion, and connected subjects of human interest'. He widened linguistics into a study of such subjects of human interest and the fruits of his intellectual labours for over half a century present the work of a scholar who was also a humanist.

Most of us are today too sophisticated to find anything more than a form of woolly universalism in the humanist ideal. We are either too chauvinistic or too clever to care for

humanism as a faith in the universality of human civilization. There is now a new wave of cultural nationalism in this country which negates this humanist ideal. St. Paul feared that his new faith would be foolishness to the Greeks. We claim that our old faith makes all others look foolish. Suniti Kumar never concealed his universalism to make a compromise with this intellectual swadeshi. In his foreword to *Africanism* Sarvapalli Radhakrishnan says that 'the author believes in the oneness of humanity, despite his varied manifestations.' And of this faith in the unity of human culture, in the diversity of its manifestation he made one of his most significant statements in his work *World Literature and Tagore* published in 1971. It is an expression of his concept of world literature as one literature through a study of what he calls ten great literary complexes—(1) The Indian epics, the *Ramayana* and the *Mahabharata* (2) The two epics of Homer (3) the Hebrew Bible (4) the national epic of Iran, the *Shahnamah* (5) the Arthurian Romances (6) *The Arabian Nights* (7) Shakespeare's plays (8) the works of Goethe (9) the works of Tolstoy and (10) the works of Rabindranath Tagore. The survey is indeed one of the finest things in Comparative Literature and is an important contribution to Comparative Literature in its bearing on the idea of World Literature. No other Indian writer has written so passionately in support of Goethe's idea of World Literature.

This universalist approach to culture prompted Suniti Kumar firmly to take his stand on some of the vital questions regarding our system of education and national language. That stand was against the strong currents of

intellectual swadeshi in India since Independence. His long, well-argued note of dissent to the *Report of the Official Language Commission* (1958) is a classic of our intellectual liberalism and none of us can read it without wondering at the courage of a scholar putting his logic and learning against the official policy of his country. Some time before the publication of the *Report* Suniti Kumar bravely and unambiguously stated his views on our language problem in an address published in the *Bulletin of the Ramakrishna Mission Institute of Culture* in January 1954 and later issued as a booklet by the International Book House, Bombay, the same year. 'By eschewing English', he said in this address, 'by doing away with it altogether, we shall become what is called in Sanskrit *kupa mandukas* or frogs in the well, thinking too much of our little world and cutting ourselves off from the rest of India and the world outside. At present when humanity is moving towards the evolution and acceptance of a single world culture, of course with local variations, presenting unity in the midst of diversity, the English language is also becoming the unique vehicle of that culture.' And about our official language he said that 'Hindi cannot just at the present moment be offered as a substitute to English, any more than Bengali, Marathi or Tamil can.' In two articles on 'Hindi Versus Sanskrit' first published in *Amritabazar Patrika* on 24 and 25 Aptil, 1957 and published as a pamphlet the same year Suniti Kumar affirmed that 'Hindi is not necessary for the vast majority of students in non-Hindi areas'. Why should the vast majority of students (for example in West Bengal) be condemned to waste several precious years of their life in learning a com-

plicated language which has no cultural or intellectual value for them. He asked and drew the attention of his readers to the 22-clause resolution on the language issue unanimously adopted by the two legislatures of West Bengal on 26 March and 2 July 1958. The resolution was jointly drafted by the Congress Party and the Opposition Groups under the leadership of Dr. B.C. Roy. It rejected the claim of Hindi to be India's official language and a compulsory subject of study in schools in non-Hindi-speaking areas and urged the inclusion of English in the Eighth Schedule of the Indian Constitution.

As an educationist Suniti Kumar valued Sanskrit as an important component of humane learning in this country and both in his paper on 'Indianism and Sanskrit' published in the *Annals of the Bhandarker Oriental Research Institute* in 1957 and the Report of the Sanskrit Commission of which he was Chairman, he affirmed that Sanskrit and English would sustain the synthesis of the East and the West in Modern India. About the place of English in our higher education he expressed his views in unmistakable terms in his Convocation address at the Annual Convocation of Calcutta University in 1968. 'India is a polyglot nation,' he said, 'where the binding force is not Hindi but English and the integration of India through higher education in science and the humanities can only be through English, as setting an international standard.' That the Government of India made him a National Professor in 1965 and maintained him in that position till his death on 29 May this year shows that he was too eminent as a scholar to suffer for his opinion.

This exponent of English in Indian education was himself a very distinguished writer in his own language and his Bengali works have given a new dimension to Bengali literature. When his *Vangala Bhashatattver Bhumika* appeared in 1929, that is, within three years of the publication of his *magnum opus*, the Bengali reader thought that this young linguist would write in his own language on the subject he had dealt with in his large English work. Actually even in the thirties his articles published in Bengali periodicals were mostly on linguistic subjects. It was his *Pashchimer Yatri* published in 1938 which established his reputation as a writer of travelogue and his greatest achievement in this genre is his *Dvipamay Bharat* published in 1940 and reissued in an enlarged and revised form as *Rabindra-Sangame Dvipamay Bharat O Shyam-Desh* in 1964. As a diary of his travel in 1927 in Malay, Java, Bali and Siam in the company of Tagore it is indeed one of the finest things to read in Bengali prose and it is amazing how the author has combined most interesting details of the journey of a poet and a scholar with flashes of insight into the cultural life of these countries.

Obviously Suniti Kumar the man is reflected more in his Bengali writings, in the essays included in his collection of essays like *Path-Chalti* published in two volumes in 1962 and 1964. And the delightfully personal tone of these essays also marks his *Europe 1938*, an account of his travel in Europe in 1938 published in 1945. Suniti Kumar shines in his travel and while moving from one country to another he can carry whole civilizations with him in all the details of their evolution through the ages. And while reading the

pages of his travelogue one wonders how one can make learning carefully acquired through long years of hard labour a part of one's intellectual temper. Both in writing and in conversation he was a striking example of learning becoming a part of one's life.

It seems now incredible that such a man lived and moved amongst us even six months ago, and when our children and grand-children will hear about his life and work, his matchless erudition and his abounding humanity, his broad sympathies and his courage of conviction and above all his faith in a universal human culture, they may take him as the hero of some old legend who just leapt into history and then withdrew himself into the world of legend again. But those of us who knew him have this happiness that his countrymen adored him and gave him their affection and respect and that even in his latter years when our intellectual life was warped by partisan politics he was the master of us all. 'Did not he magnify the mind, show clear/Just what it all meant ?' And all of us can say to ourselves that 'this in him was the peculiar grace/That before living he'd learn how to live.' And if we must look for some lesson in the story of this beautiful life beautifully lived it is this that true learning gives grace and gives it in abundance and that while it illumines minds it brings them together in a common intellectual endeavour to understand a common human destiny.

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ঃ জীবনপঞ্জী

পল্লব মিত্র

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় হাওড়া জেলার শিবপুর শহরে ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে নভেম্বর (১১ই অগ্রহায়ণ ১২৯৭ সাল) জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম হরিদাস চট্টোপাধ্যায় (১৮৬২ খ্রী,—১৯৪৫ খ্রী,)। মাতা কাত্যায়নী দেবী। পিতা কলকাতার এক বেসরকারী ইংরাজী অফিসে চাকুরী করতেন এবং তিনি সুকবি ও বেহালাবাদক ছিলেন। সুনীতিকুমার তাঁর চার ভায়ের মধ্যে ছিলেন দ্বিতীয়।

কলকাতার মতিলাল শীল ফ্রি স্কুল থেকে তিনি এণ্ট্রাস পরীক্ষায় পাশ করেন ষষ্ঠ স্থান অধিকার ক'রে। স্কটিশচার্চ কলেজ থেকে আই. এ. পাশ করেন তৃতীয় স্থান অধিকার ক'রে। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে ইংরাজী অনার্সে প্রথম স্থান অধিকার করে বি. এ. পাশ করেন প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে ইংরাজী সাহিত্যে এম. এ. (খ-বিভাগ) পাশ করেন। ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে বাংলা সরকারের সংস্কৃত পরিষদ আয়োজিত বৈদিক সংস্কৃত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি পান।

১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতার বিদ্যাসাগর কলেজে ইংরাজী অধ্যাপকপদে যোগ দেন। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরাজী ভাষার সহকারী অধ্যাপক নিযুক্ত হন।

১৯১৪ খ্রষ্টাব্দে কমলা মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। ১৯৬৪ খ্রীষ্টাব্দে স্ত্রী পরলোকগমন করেন। তাঁর একমাত্র পুত্র সুমন (জন্ম : ১৯২৭) ও পাঁচ কন্যা যথাক্রমে রুচি (জন্ম : ১৯২৯), রমা (জন্ম : ১৯৩১), নীলা (জন্ম : ১৯৩২), সতী (জন্ম : ১৯৩৪) এবং শুচি (জন্ম : ১৯৩৬)।

১৯১৯ খ্রষ্টাব্দ থেকে ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ভারতসরকারের বৃত্তি নিয়ে ভাষাতত্ত্ব পড়ার জন্য ইউরোপ যান। তাঁর অন্যতম অধ্যাপক ছিলেন ডানিয়েল জোন্স। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে ভাষাতত্ত্বে ডিপ্লোমা লাভ করেন এবং ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি. লিট্. উপাধি পান। তাঁর

গবেষণার বিষয় ছিল—"Indo-Aryan Linguistics—Origin and Development of the Bengali Language". ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়েও ভাষাতত্ত্ব শিক্ষালাভ করেন।

১৯২২ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে দেশে ফিরে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব বিভাগের 'খয়রা' অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি এই পদ থেকে অবসর নেন ও তারপর হন 'এমারিটের অধ্যাপক'।

১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে মালয়, সুমাত্রা, বালী, শ্যাম, জাভা প্রভৃতি দেশে তিনমাস ভ্রমণ করেন। ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিরূপে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক ভাষাতত্ত্ব সম্মেলনে, লণ্ডনে যোগ দেন। সেখানে তিনি ভারতীয় বিভাগের সভাপতি ছিলেন।

১৯৩৬-৩৭ খ্রীষ্টাব্দে ব্রহ্মদেশ ভ্রমণ করেন। ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে পুনরায় ইউরোপ যান। ১৯৪৮ খ্রী., ১৯৫০ খ্রী., ১৯৫১ খ্রী., ১৯৫২ খ্রী., ১৯৫৪ খ্রী., ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দে ও বিভিন্ন সময়ে তিনি এশিয়া ও ইউরোপের বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করেন ও ভাষাতত্ত্ব সম্মেলনে যোগ দেন।

১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতার রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটির ফেলো নির্বাচিত হন। পরে তিনি সভাপতিও নির্বাচিত হন (১৯৫৩ খ্রী. ও ১৯৭১ খ্রী.)। ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দে 'পদ্মভূষণ' ও ১৯৬৩ খ্রীষ্টাব্দে 'পদ্মবিভূষণ' উপাধিতে ভূষিত হন। ১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দে জাতীয় অধ্যাপকরূপে নিযুক্ত হন। ১৯৬৯ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডনে 'International Phonetic Association'-এর সভাপতি নিযুক্ত হন। ১৯৬৯ খ্রীষ্টাব্দের ২রা আগষ্ট সাহিত্য অকাদেমীর সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দে রবীন্দ্রপুরস্কার লাভ করেন। ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ বিধান পরিষদের সভাপতি ছিলেন। তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদেরও সভাপতি ছিলেন। এছাড়া আরও বহু দেশী ও বিদেশী গুরুত্বপূর্ণ সংস্থায় তিনি দায়িত্বপূর্ণ পদ অলঙ্কৃত করেছেন এবং নানাবিধ সম্মান ও উপাধি লাভ করেছেন।

১৯৭৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে মে (১৫ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৪ সাল) রবিবার, বেলা ৪'২০ মিনিটে ৮৭ বছর বয়সে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে সেইদিনই কলকাতায় পরলোকগমন করেন।

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ঃ গ্রন্থপঞ্জী

সুনীল দাস

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় সমগ্র জীবনে বহু গ্রন্থ রচনা ও সম্পাদনা করেছেন। শুধু তাই নয়, ছাত্রপাঠ্য বই ছাড়াও বিভিন্ন সময়ে প্রদত্ত বক্তৃতাগুলিকে নিয়ে বেরিয়েছে পুস্তিকা। বক্ষ্যমান তালিকায় এই দুই ধরনের বইগুলিকে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বাদ দেওয়া হয়েছে। এছাড়া বাদ দেওয়া হয়েছে তাঁর রচিত, সম্পাদিত হিন্দী ও সংস্কৃত বইগুলিকে। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, এশিয়াটিক সোসাইটি এবং ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে এই জাতীয় বহু পুস্তিকার সন্ধান পাওয়া যায়। অবশ্য এই তালিকাটি প্রস্তুত হয়েছে উল্লিখিত গ্রন্থাগারে রক্ষিত গ্রন্থ থেকে। তবে সব থেকে বেশি সাহায্য পেয়েছি সুনীতিকুমার চ্যাটার্জী; দি ম্যান এণ্ড দি স্কলার (জিজ্ঞাসা ১৯৭০) এবং সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের জীবন কথা বইএর শেষে শ্রীঅনিলকুমার কাঞ্জিলাল-কৃত 'গ্রন্থপঞ্জী' থেকে। গ্রন্থপঞ্জীতে শুধুমাত্র প্রথম সংস্করণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তবে যে ক্ষেত্রে প্রথম সংস্করণ লভ্য হয়নি যেখানে এর ব্যতিক্রম ঘটেছে। পরিশেষে বক্তব্য, কালানুক্রমিক এই গ্রন্থপঞ্জীটি সম্পূর্ণ নয়।

বাংলা-গ্রন্থ

১। **বাঙ্গালা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা**। কলিকাতা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯২৯।

২। **পশ্চিমের যাত্রী**। কলিকাতা, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ১৩৪৫।

৩। **ভারত সংস্কৃতি**। কলিকাতা, মিত্র ও ঘোষ, ১৩৫৪।

৪। **বৈদেশিকী**। কলিকাতা, বেঙ্গল পাবলিশার্স, ১৩৫০।

৫। **রবীন্দ্র-সংগমে দ্বীপময় ভারত ও শ্যামদেশ—দ্বিতীয় পরিবর্ধিত সং**। কলিকাতা, প্রকাশ ভবন, ১৩৭১।

৬। **ইউরোপ ১৯৩৮**। কলিকাতা, মিত্রালয়, ১৩৫১-৫২। ২ খণ্ড।

৭। **ভারতের ভাষা ও ভাষা-সমস্যা**। কলিকাতা, বিশ্বভারতী, ১৩৫১। (বিশ্বভারতী লোকশিক্ষা গ্রন্থমালা সংখ্যা ৪)

৮। **সাংস্কৃতিকী**। কলিকাতা, বাক্-সাহিত্য, ১৩৬৮-১৩৭২। ১ম ও ২য় খণ্ড।

৯। **সাংস্কৃতিকী**। কলিকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৮৩। ৩য় খণ্ড।

১০। পথ চল্‌তি। কলিকাতা, গ্রন্থ প্রকাশ, ১৩৬৯-৭১। ১ম ও ২য় খণ্ড।
১১। মনীষী-স্মরণে। কলিকাতা, জিজ্ঞাসা, ১৩৭৮।
১২। বাঙ্গালা ভাষা-প্রসঙ্গে। কলিকাতা, জিজ্ঞাসা, ১৩৮২।
১৩। সংস্কৃতি শিল্প ইতিহাস। কলিকাতা, জিজ্ঞাসা, ১৯৭৬।
১৪। জীবন-কথা। কলিকাতা, জিজ্ঞাসা, ১৯৭৯।

সম্পাদিত-গ্রন্থ

১। পাদ্রি মনো-এল্‌-দা-আস্‌সুম্প্‌-সাম্‌-রচিত বাঙ্গালা ব্যাকরণ। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও প্রিয়রঞ্জন সেন সম্পাদিত ও অনূদিত। কলিকাতা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৩১।

২। মানো এল্‌-দা-আস্‌সুম্প-সাম্‌। কৃপারশাস্ত্রের অর্থ-ভেদ। সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত ও সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় লিখিত প্রবেশক ও টীকা-সহ। কলিকাতা, রঞ্জন পাবলিশিং, ১৩৪৬।

৩। হরপ্রসাদ-সংবর্ধন-লেখমালা। নরেন্দ্রনাথ লাহা ও সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত। কলিকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্‌, ১৩৩৮-৩৯। ১ম ও ২য় খণ্ড।

৪। চণ্ডীদাস-পদাবলী। হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত। কলিকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৩৪১। ১ম খণ্ড।

৫। বিদ্যাসাগর-গ্রন্থাবলী। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত। মেদিনীপুর, বিদ্যাসাগর স্মৃতি রক্ষা সমিতি, ১৩৪৪-৪৬। ৩য় খণ্ড।

৬। চরিত সংগ্রহ। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় সংকলিত ও সম্পাদিত। কলিকাতা, মিত্র ও ঘোষ, ১৩৪৭।

৭। হরপ্রসাদ-রচনাবলী। অনিলকুমার কাঞ্জিলালের সহযোগিতায় সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় সংকলিত ও সম্পাদিত। কলিকাতা, ঈস্টার্ণ ট্রেডিং কোম্পানি, ১৩৬৬। ১ম খণ্ড।

৮। রামেন্দ্র-রচনা-সংগ্রহ। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও অনিলকুমার কাঞ্জিলাল নির্বাচিত ও সম্পাদিত। কলিকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৩৭১।

ENGLISH—BOOKS

1. The Origin and Development of the Bengali Language. Calcutta, Calcutta University, 1926. 2 vols. (Latest offset reprint from London, George Allen & Unwin in three parts, 1970-72.)
2. Bengali Self-Taught. London, Marlborough's Self-Taught series, 1927.
3. A Bengali Phonetic Reader. London, University of London, 1928.
4. Indo-Aryan and Hindi, Gujarat, Gujrat Vernacular Society, 1942.
5. Languages and the Linguistic Problems. London, Oxford University Press, 1943.
6. The National Flag. Calcutta, Mitra & Ghosh, 1944.
7. Kirātajana-Krtti—The Indo Mongoloids : their Contribution to the History and Culture of India. Calcutta, Asiatic Society, 1951.
8. The place of Assam in the History and Civilisation of India. Assam, Gauhati Univercity, 1955.
9. Africanism : the African Personality. Calcutta, Bengal Publishers, 1960.
10. Indianism and the Indian Synthesis. Calcutta, Calcutta University, 1962.
11. Languages and Literatures of modern India. Calcutta, Prakash Bhavan, 1963.
12. Dravidian. Annamalai University, 1965.
13. Rabindranath Tagore. Marathwada University, 1955.
14. The People, Language and Culture of Orisa. Bhubaneswar, Orisa Sahitya Akademi, 1966.
15. Religious and Cultural intergration of India. Imphal, Manipur Atombabu Research Centre, 1967.

16. Phonetics in the Study of Classical Languages in the East. Bangalore, University of Bangalore, 1967.

17. Guru Govinda Singh. Chandigarh, Punjab University, 1967.

18. Balts and Aryans : in their Indo-European Background. Simla, Indian Institute of Advanced Study, 1968.

19. Indian and Ethiopia : from the Century B.C. Calcutta, Asiatic Society, 1969.

20. World Literature and Tagore. Santiniketan, Visva-Bharati, 1971.

21. Iranianism, Iranian Culture and its impact on the world from Ackaemenian times. Calcutta, Asiatic Society, 1972.

22. Select Papers. New Delhi, People's Publising House, 1972.

23. Jayadeve. New Delhi, Sahitya Akademi, 1973.

24. India : a Polyglot Nation, and its linguistic Problems Vis-a-Vis National Integration. Bombay, Mahatma gandhi Memorial Research Centre, 1974.

25. A Shortend Arya Hindi Vedic Wedding and Initiation Ritual. Calcutta, Jijñāsā, 1976.

26. The Rāmāyana : Its Character, Genesis, History, Expansion and Exodus : A Resume. Calcutta, Prajñā, 1979.

27. Select writings. Delhi, Vikas Publishing House, 1978.

28. Select Paper. New Delhi, People's Publishing House, 1979.

29. New and Modern Indian Literatures and the Romances of Medieval Bengal. Calcutta, Asiatic Society, 1975.

30. The Various 'matters' in new or modern Indian Literature and the romances of mediaval Bengal (Gauda-Banga Ramya Katha). Calcutta, Asiatic Society, 1982. (Dr. Bimanbehari Majumdar Memorial Lecture, 1974).